Selling Agent :

D. M. Library

42 Cornwallis Street

Calcutta 6

Published by the Author and Printed by Debdas Nath,

SADHANA PRESS P. LTD. 76 Bepin Behari Ganguli Street. Calcutta 12

"پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے
خاک وطن کا مجھکو ہر ذرہ دیوتا ہے"
محمد اقبال

"পৎথর কী মূর্তোঁ মেঁ সমঝা হৈ তু খুদা হৈ ;
খাক্ উঅতন্ কা মুঝ কো হর্ জর্রা দেওতা হৈ।"

—ডক্টর ইক্‌বাল

"জ্ঞানদায়িনী মাতৃসমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
উর্দু ও ফার্সী বিভাগ-রূপ বেদিমূলে
আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি
ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে
উৎসর্গ করিলাম।"

—গ্রন্থকার

মুখবন্ধ

ভাষা ও সাহিত্যের মূল কথা পরম সত্যের রূপ নির্ধারণ ও সহৃদয় পাঠকদের নিকট তাহার ব্যাখ্যান। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ দার্শনিক *W. M. Urban* তাঁহার *Language and Reality*-তে বলিয়াছেন, "*The philosophy of language......is concerned with the evaluation of language as a bearer of meaniugs, as a medium of communication and as a sign or symbol of reality.*" সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই সেই জীবন-দর্শনের স্বরূপটি ধর্ম ও ভাষা ভেদে নানা ভঙ্গিতে আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছে। সেই একের বহু রূপ যেমন রহিয়াছে প্রকৃতিতে, তেমনি আছে মানব-মনের চিন্তাধারার ইতিহাসে। ইহাকে সাধারণভাবে আমরা উপলব্ধি করি নিজেদের ধর্ম ও সাহিত্যের মাধ্যমে। আধুনিক যুগে ইহাকে প্রকৃষ্টরূপে বুঝিবার জন্য তুলনা-মূলক ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও কৃষ্টির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইতেছে। আপনাকে জানা ও সঙ্গে সঙ্গে পরকেও জানা—ইহাই সঠিক জানা। যতদিন নিজকে জানার মধ্যে অপরকে জানার তত্ত্বটিও খুঁজিয়া না পাইব, ততদিন পরস্পরের প্রতি হিংসা ও দ্বেষের গ্লানি হইতে অব্যাহতি নাই।

আজিকার দিনের ভাষাসমস্যার প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও জাত্যাভিমানের ধর্মান্ধতা বা গোঁড়ামি হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে নানা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যকে অতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত আমাদের অনুধ্যান করিতে হইবে। সকল দেশীয় পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞই ইহা অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন ঠিকই। কিন্তু তাহার অনুসরণে যতটা হৈচৈ ও সাস-সাজ রব, ততটা আন্তরিকতা নাই—ইহাই দুঃখের বিষয়।

হুগলী মহসীন কলেজে উর্দু ও ফারসী অধ্যাপনাকালীন (১৯৪৮-৫৭) আবার নূতন উৎসাহে উর্দু পঠন-পাঠনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র উর্দু সাহিত্য রচনার প্রয়াস। একটি ভাষার সাহিত্য অন্য ভাষাভাষী পাঠকদের নিকট ইতিহাসাকারে সরবরাহ করা যেমন কঠিন ব্যাপার, তেমনি অতি নীরস কাজ। কোন বিদেশীয় যখন অন্য দেশের কৃষ্টি ও সভ্যতা বা সাহিত্যের মালমসলা আহরণে উৎসুক হয়, তখন আহরণকারীর নিষ্ঠা ও

শ্রদ্ধায় যে কোন ত্রুটি থাকিতে পারে না, ইহা স্বতঃই স্বীকার্য। এই ভিন-দেশীয় কৃষ্টির সরবরাহকারীকে উভয় দেশের (বা ভাষার) কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উৎসাহদান খুবই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এমন অনেক স্বার্থান্বেষী, সঙ্কীর্ণমনা আছেন, যাঁহারা নিজের কিছু অপরকে দিতে যেমন কুণ্ঠিত, তেমনি অন্যের নিকট হইতে কিছু পাইতে সন্দিগ্ধ। তথাপি এই বিশ্ব-পুণ্য-ভূমির সাগর-তীরে "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে"—না হইলে যে গত্যন্তর নাই।

এই দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে আমরা পরস্পরকে কতটুকু আর সাহায্য করিতে পারি, যদি না কেহ আগ্রহের সহিত আন্তরিকতা সহকারে এই আদান-প্রদান সম্মিলনে যোগদান করেন? এই সম্মিলন সম্ভব হয় বিভিন্ন সাহিত্যের ইতিহাস রচনা বা বিশ্ব-সাহিত্যের অনুবাদ মাধ্যমে। কিন্তু এই ইতিহাস বা অনুবাদ বস্তুতঃ মূল বিষয়ের স্থূল রূপ; এবং এই স্থূলরূপ ইতিহাসের মাধ্যমেই কেবল পরমবস্তুর বিষয়-তৃষ্ণা পাঠক-মনে আমরা জাগাইয়া তুলিতে পারি। আর ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে *G. E. Mueller* তাঁহার *Philosophy of Literature*-এ বলিয়াছেন, "*To the philosopher history appears as the self-realization of man in the totality of his existence. History shows of what man is capable.*"

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আমি এই গ্রন্থ লিখিয়া সমাপ্ত করি। এবং ইহা রচনাকালে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাসটি—সূচনা হইতে অতি-আধুনিককাল পর্যন্ত—বিবৃত করিতে সচেষ্ট হই। তবে পরবর্তীকালে ইহার সংস্পর্শ হইতে কিছুটা দূরে থাকায়, এখন ইহার প্রকাশকালীন অতি-আধুনিককালের ইতিবৃত্ত আর পুনর্বিবেচনা করিবার সুযোগ হয় নাই। এই সকল কারণে আমার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতিই হয়ত রহিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠক এই সকল ত্রুটি পরবর্তী সংস্করণে শুদ্ধ করিবার জন্য সাহায্য করিলে সুখী হইব ও কৃতজ্ঞ থাকিব।

উর্দু ভারতীয় ভাষা হইলেও, ইহা আরবী অক্ষর গ্রহণ করিয়াছে। তাই ভাষান্তরকালীন একটি বিশেষ অক্ষরান্তরীকরণ (transliteration) পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। উহা অন্যত্র দ্রষ্টব্য। তাহা হইলেও শব্দের সাধারণ উচ্চারণ ও সাধু-উচ্চারণে অনেক পার্থক্য থাকিয়া যায়। ইহার সমন্বয় সবসময় সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই। তাছাড়া এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা আরবী অক্ষর-পদ্ধতি ও উর্দু-উচ্চারণ অনুযায়ী লিখিলে

আপাত-দৃষ্টিতে ভুল মনে হইবে ; যেমন, নরায়ন (নারায়ণ), কিষণ চন্দর (কৃষ্ণচন্দ্র) বা ফূল (ফুল), কিন্তু এই সকল শব্দ উর্দূরীতি অনুযায়ী ভুল নহে।

আবার, 'শুদ্ধি-পত্র' দেওয়া অর্থই অঙ্গুলি-নির্দেশে নিজ ত্রুটিসমূহ পাঠক-বর্গের নিকট উপস্থিত করা। তা'সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ইহা এই গ্রন্থশেষে সংযোগ করিতে বাধ্য হইলাম। দৈব-বিপর্যয়ের ন্যায় যন্ত্রের ভৌতিক ছায়াপট-জনিত ত্রুতি-বিচ্যুতি বড়ই বেদনাদায়ক। অসাবধানতা নিবন্ধন এই সকল ও অন্যান্য দৃষ্টিকটু ভুলভ্রান্তির জন্য বিশেষ দুঃখিত। এবং এই কারণে পণ্ডিতমণ্ডলী ও সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে এই গ্রন্থ রচনাকালীন ও তাহার অব্যবহিতকাল পরে উর্দূ ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধ বিচ্ছিন্নভাবে নানা পত্রিকায় তথা শনিবারের চিঠি, ইতিহাস, উদ্বোধন ও ইমরোজ (ঢাকা)-এ প্রকাশিত হয়। আমার এই গ্রন্থে ইহাদের সংযোগকালীন উক্ত পত্রিকা-প্রকাশকদের অনুমতি যাচ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিকট আবার আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সর্বশেষ, এই গ্রন্থ প্রকাশনের খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপারে ও এই প্রকাশনের উন্নতিসাধনে অনুজপ্রতিম পরমপ্রীতিভাজন অধ্যাপক শ্রীঅজিত কুমার মুখার্জি ও শ্রদ্ধেয়, সহৃদয় সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীঅমিয়নাথ চক্রবর্তী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সহৃদয় প্রীতিবন্ধন আমি কখনই ভুলিতে পারিব না। ইতি—

কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া
দধি-সংক্রান্তি, ১৩৬৭ সাল
১৪ই জানুয়ারী, ১৯৬০

বিনীত
শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল

প্রসিদ্ধ উর্দু কবি ও সাহিত্যিকদের গ্রন্থাদি ছাড়া যে সকল উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থাদি হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাহা অতি কৃতজ্ঞতা সহকারে এখানে উল্লিখিত হইল :

১। ডক্টর মহীউদ্দীন কাদেরী-কৃত হিন্দুস্তানী লিসানিয়াৎ।

২। ইহ্‌তেশাম হুসেন-কৃত উর্দু লিসানিয়াৎ

৩। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-কৃত ইণ্ডো-এরিয়ান এণ্ড হিন্দী।

৪। ডঃ সুকুমার সেন-কৃত ভাষার ইতিবৃত্ত।

৫। সৈয়দ শমসুল্লাহ্-কৃত উর্দুয়ে-কদীম।

৬। মহম্মদ আজাদ-কৃত আবে-হয়াৎ।

৭। মির্জা মহম্মদ আস্করী-কৃত রামবাবু সক্‌সেনার হিষ্টরী অব উর্দু লিটারেচার-এর উর্দু অনুবাদ-গ্রন্থ (তারীখে-আদবে-উর্দু) : ইহা অনুবাদ হইলেও ইহাতে নিজস্ব স্বকীয়তার সহিত অনেক নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন করা হইয়াছে।

৮। বেগম ইক্রামুন্না-কৃত এ ক্রিটিকেল সারভে অব দি ডেভলপ্‌মেণ্ট অব দি উর্দু নভেল এণ্ড শর্ট ষ্টরী।

৯। ডক্টর ইজাজ হুসেন-কৃত মুখতসর তারীখে-উর্দু।

১০। উফা রাশিদী-কৃত বঙ্গাল মেঁ উর্দু।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ :

১। পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস
(প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা ও কলিকাতা)।

২। Bengali Grammar (with a Comparative study with Urdu) : E. Pakistan Governor's Prize-winner.

৩। Jalaluddin Rumi and his Tasawwuf (thesis for his Degree of Doctor of Literature).

AN APPRECIATION

Urdu Sahityer Itihas (A History of Urdu Literature) : By Prof. Dr. Harendra Chandra Paul, M. A., D. Litt. (Calcutta) ; pp. 390, published at D. M. Library, 42 Cornwallis Street, Calcutta-6.

This well-written book of nearly 400 pages, giving in simple Bengali a fairly detailed history of the literary development of Urdu, is a work of outstanding significance in the present set-up in India. We are now trying through various agencies to bring the various literatures and local cultures of India close to each other, and with this end in view a semi-government society like the Sahitya Academy of Delhi and other organisations are trying to encourage translations from one modern Indian language into another, compilation of dictionaries, bilingual or trilingual, in the various languages of India, as well as histories of literature. Among the 14 languages which are recognized as national languages of India in the 8th schedule of the Indian *Constitution*, Urdu is one. Although Hindi and Urdu are just different styles of the same language, owing to a number of circumstances they are looked upon as two different languages, and that is primarily because of the two different scripts which are used for these two different styles of the same language. In any case, although Hindi and Urdu are just two forms of the same Hindustani language, and although the writers of Hindi are eager to absorb Urdu as a branch of Hindi, Urdu-using Muslims and others are not at all inclined to merge Urdu into Hindi, and they are for its retaining a separate existence with its own Perso-Arabic script and its special preference for Persian and Arabic words over genuine Hindi and Sanskrit words (but this attitude is now undergoing a considerable amount of change in the present-day Urdu). Urdu literature has a history which is at least seven centuries long. From the time that Muslim speakers of Hindustani began to use by preference Arabic and

Persian words in their language, we may say that Urdu came into being : and that was roughly sometime round about 1300 A. D. In the Deccan, the North Indian Hindustani speech spread in various forms, and in the courts of the Muslim kings there, belonging both to the Bahmani dynasty and to the five dynasties which originated on the ruins of the Bahmani dynasty, North Indian Muslims who were settled in the Deccan created a great literature, and the Hindustani language as used by them came to be known as *Dakhni* or the Deccan speech. It showed its orientation towards modern Urdu by being written in the Perso-Arabic script and not in the Nagari. Quite an important literature developed in Dakhni in the various courts of the five Deccan states, particularly in Golconda (Hyderabad) and Bijapur. About the beginning of the 18th century, North Indian Muslims imitating the literature which had developed in Dakhni, and inspired by Deccan poets like Wali of Aurangabad, created a new literary language in Delhi, and this was *Dahlavi Urdu*. The origin of Urdu has a very interesting and intriguing history. In any case, by about 1800 it became established on the basis of the Delhi speech as a very important modern Indian language. In its colloquial form of Hindustani, this Urdu spread all over Northern India, and even extended its empire in the Deccan and South India, particularly in the big cities there. A rich literature, almost entirely on the Persian model, came into being from the second half of the 18th century ; and we have for two full centuries and more an astonishing development of literature of all sorts in this Urdu form of Hindustani. Hindi and Urdu are, as said before, two styles of the same language. But it has to be admitted that Urdu came into the field first, and Hindi, that is Khariboli Hindi, followed suit later. As a matter of fact, prior to the fourth quarter of the 19th century, Khariboli Hindi was no where in the literary world of India, and North Indian Hindustani of the area was represented primarily by Urdu. A galaxy of Urdu poets had come into being, and in their hands Urdu became, inspite of its being occasionally overlaid, (and overlaid quite unnecessarily) with Arabic and Persain words, a very racy speech in which the vigour and beauty of the colloquial Hindustani of Delhi and round about became fully established.

In the evolution of present-day Hindi, Urdu supplied some very basic things. Apart from that, Urdu literature has got its own character and its own beauty. This is not much known to Bengali

readers. Of course, in North India those who study Hindi properly have also to be familiar with what is found to be of permanent value in Urdu literature. But in Bengali we do not have this opportunity. Long ago a Bengali gentleman wrote a very fine Introduction to the Urdu Language called "Urdu Upadesh". But barring a little *Bazar Hindustani* the average Bengali person is not at all interested in Urdu, and has no idea of its great riches. Nevertheless it is a fact that a number of very prominent Urdu writers were really Bengali, both Muslim and Hindu. As the language of Amir Khusrau and Wajhi, of Wali and Nazir, of Ghalib and Hali, of Ratan Nath Sarshar and Mirza Ruswa, of Maulana Abul Kalam Azad and Sir Muhammad Iqbal, of Chakbast and Akbar Ilahabadi, and of a whole host of other distinguished writers, both in prose and verse, Urdu literature has its own unique place in the literatures of modern India. Now-a-days of course an attempt is being made to bring the riches of Urdu literature in an easily accessible form before the Indian body-politic familiar with the Nagari script. This is "Nagari Prachar" in the truest sense of the term—those who can read Hindi and are familiar with a little Urdu, now can without any difficulty have full access to the treasures of Urdu literature in Nagari editions.

In Bengal we never have had much occasion to read Urdu except to a very limited extent. Prof. Dr. Harendra Chandra Pal has done very great service to the cause of Urdu literature as well as that of cultural integration in India by opening up the treasures of Urdu literature to the Bengali-reading public through his book. It is a very clear and detailed account of the History of Urdu language and its literature, and the like of it never appeared in Bengali ; and it would also be difficult to find a similar book in other Indian languages, excepting of course Urdu itself. Prof. Dr. Pal is an M. A. in Persian, who took his degree from fhe Dacca University long ago, and in addition he is an M. A. in Bengali and in Comparative Philology. He has already made his name by his Studies of Persian Literature in Bengali. A short while ago he received the Doctorate of Literature—the higher Doctorate of the University of Calcutta on his thesis on the great Sufi Poet and Mystic of Iran—Maulana Rumi, and among his examiners he had the distinction of having the eminent Iranologist of modern Europe, Prof. Arberry of Cambridge. He has, besides, written a History of Persian Literature in Bengali. This book on Urdu forms a worthy successor to his book on Persian Literature. There

is a detailed survey of the various trends and movements in literature during the successive periods of its history, a history which was not confined to any particular area of India but had quite an extensive terrain—not only Delhi and Lucknow, but also Lahore and Patna, Murshidabad and Hyderabad and other towns in different parts of India where there were centres of Urdu literature. Muslim as well as Hindu, occasionally European writers helped to enrich Urdu literature. Prof. Pal has given plenty of quotations from both verse and prose to give some idea of the beauty and quality of this literature, and these quotations he has given not only in the original Perso-Arabic script of Urdu, but also with accompanying transliterations in the Bengali script, also accompanied by Bengali translations. This transliteration in Bengali script will be a great boon to Bengali readers who do not read the Perso-Arabic script. The accounts of the writer are quite full and detailed, and their significance and proper place in the history of Urdu literature have been sought to be clearly indicated. The result is that we have a very fine book before us which has opened up the treasure of Urdu literature to Bengali readers in a convincing manner, and this thing has happened for the first time in his book. The various types of literature have each been discussed, and there is in an Appendix a study of Urdu literature as it developed in Bengal both among sojourners from outside as well as among Bengali speakers. These 400 pages are crammed with a vast amount of material, and we are very grateful to Prof. Pal for giving us this book in our mother-tongue.

I only hope that the various State and other organisations which encourage work of this kind will take note of Dr. Pal's fine performance, and will give him proper encouragement, and in this way enable him to continue his literary efforts in this line.

Suniti Kumar Chatterji

Emeritus Professor of Comparative Philology,
University of Calcutta, and Chairman, West
Bengal Legislative Council.

আশীর্বাণী

Dr. Muhammad Shahidullah
M. A., B. L. (Cal.), Dipl. Phon. (Paris),
Docteur de l' Universite' de Paris

Bengali Academy
Burdwan House,
Dacca (E. P.),

পরম প্রীতিভাজন ডক্টর পাল,

…ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র তুমি যে এখনও মাতৃসমা বিদ্যা-দায়িনীকে স্মরণ কর, ইহা যারপরনাই আনন্দের বিষয়। তুমি পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছ; এক্ষণে উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়া কৃতিত্বকে প্রোজ্জ্বল করিলে। এজন্য তোমাকে মোবারকবাদ জানাই।… সালুন চাখার মত যতটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তোমার পুস্তকের উপাদেয়তা অনুভব করিয়াছি। পুস্তকখানি পূর্ব পাকিস্তানে নিশ্চয়ই সমাদৃত হইবে।…তোমার দীর্ঘজীবন ও সাফল্য কামনা করি।……

ইতি

দু'আ-গো

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

(ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ঢাকা ও রাজশাহী
বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব পাকিস্তান)

সূচীপত্র

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস

উপক্রমণিকা

বাহ্যিক দৃষ্টিতে উর্দুকে বিদেশীয় ভাষা মনে হইলেও, ইহা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় আর্য ভাষা-সম্ভূত এবং হিন্দী তথা পশ্চিমা-হিন্দীর সহোদরা-স্থানীয়া। সমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহা একবাক্যে স্বীকৃত হইবে যে, আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহের মধ্যে বাঙলার পরেই উর্দুর স্থান। হালে হিন্দী সারা-ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভ করিলেও, হিন্দী কোন কালেই ভারতের সর্বজনবিদিত ভাষা ছিল না—সেই দাবী যদি কেহ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহা হিন্দী নহে, উর্দু তথা হিন্দুস্তানী ভাষা। আর্যভাষা তাহার মধ্যযুগ তথা পালি-প্রাকৃতের যুগ পশ্চাতে ফেলিয়া খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে যখন তাহার আধুনিক যুগের প্রথম স্তরে পদক্ষেপ আরম্ভ করিল, তখন হইতেই মুসলিম আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামীয় সংস্কৃতিও ভারত-ভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার সুযোগ পায়। হিন্দীকে ভিত্তি করিয়াই উর্দু প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও, সেই হিন্দুস্তানী-ভাষা মূল হইতে যেমন পুরাপুরি রস নিঃসৃত করিয়াছে, তেমনি সাংস্কৃতিক আলো-হাওয়াও ইহাকে সাহায্য করিয়াছে। হিন্দীর ন্যায় উর্দুও মূল আর্যভাষা তথা বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষাকে ভিত্তি করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু আরবী-ফারসীর শব্দ-ভাণ্ডার হইতে যে সাংস্কৃতিক আলো ও বাতাসে ইহা পুষ্ট হইয়াছে, তাহাই উর্দুকে পূর্ণাঙ্গ-রূপ দান করিয়াছে। সেই সুযোগ মূল হইতে সরাসরি উত্থিত হইয়াও হিন্দী লাভ করিতে পারে নাই। এই সুযোগের ফলেই প্রাচীন হিন্দী-সাহিত্য তুলনায় সমৃদ্ধ হইলেও, পরবর্তী যুগের উর্দু-সাহিত্য হিন্দীকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

দিল্লীর মুসলিম রাজ-দরবারে ফারসীই সরকারী ভাষা হইলেও, দাক্ষিণাত্যে প্রথম হইতেই 'উর্দু' ছিল 'দরবারী' ভাষা। দাক্ষিণাত্যের

ভাষা প্রধানতঃ অনার্য তথা দ্রাবিড়-সম্ভূত তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষা হইলেও, উর্দু ও সেই যুগে তথায় কম প্রতিপত্তি লাভ করে নাই। তাহারই ফলে আমরা দেখিতে পাই, উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হায়দরাবাদের উস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উর্দু' হয় শিক্ষার বাহন এবং উচ্চতর শিক্ষা, এমন কি সর্বোচ্চ গবেষণামূলক শিক্ষাও এই উর্দুর মাধ্যমে চালু হয়। উর্দুর পক্ষে ইহা বস্তুতঃই গৌরবের কথা। তা'ছাড়া যে ফারসী উত্তরভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল, তাহারই পোষ্য দুহিতা উর্দু-ভাষা। আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ফারসী তথা ঈরানী ভাষাও প্রাচীন আর্যভাষা-সম্ভূত। সেই ঈরানীয় স্তন্য পাইয়া উর্দু আরো বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। পরবর্তী মুঘল-যুগে ও ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগে সারা ভারতের যোগ-সূত্র ছিল উর্দু-ভাষা এবং দরবারে তখনও ফারসীতেই কাজ চলিলেও উর্দুই ছিল সর্বজনবিদিত ভাষা, হিন্দী নহে।

হিন্দী হিন্দুর ভাষা, কিন্তু উর্দু তথা হিন্দুস্তানী হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভাষা। যেমন রাষ্ট্রে, তেমনি সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই সমানভাবে ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। পরবর্তী যুগে ইংরেজগণও উর্দুকেই সর্বাধিক পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়াছেন। উর্দু তথা তাঁবুর ভাষা ইংরেজ আমলের সৈন্যবিভাগেও ছিল একচেটিয়া ভাষা।

বিদেশী সংস্কৃতির আবহাওয়ায় পুষ্ট হইয়াও, উর্দু যে এইরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে—ইহার প্রধান কারণ শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা। এই দিকটা আমাদের দেশীয় শাসকবর্গেরও লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহারা যদি নিজেদের রাষ্ট্রীয়ভাষা বা প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে সমৃদ্ধ করিতে চাহেন তাহা হইলে উদারভাবে এই সকলের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে হইবে। অনুবাদ-সাহিত্য উর্দু-ভাষার এক মস্ত সম্পদ্। ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে উর্দু ভাষায় যত অনুবাদ-সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছে, এইরূপ আর কোন ভারতীয় ভাষায়ই হয় নাই। দেশী-বিদেশী সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থেরই উর্দু-অনুবাদ হইয়াছে। বস্তুতঃ সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে পরস্পরকে জানা শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক প্রধান অবলম্বন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান পরিপোষক সেই ভাষায় কোন শ্রেষ্ঠ মণীষীর আবির্ভাব। বাঙলা ভাষায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যে অবদান, এবং যাঁহার জন্য আমাদের ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা সমূহের মধ্যে আসন পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহা শত পৃষ্ঠপোষকতায়ও

কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। পৃষ্ঠপোষকতা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ন্যায় সাহায্য করে মাত্র।

উর্দু-ভাষাও এইরূপ শ্রেষ্ঠ মণীষীদের অবদান দ্বারা সমৃদ্ধ হইবার সুযোগলাভ করিয়াছে। কবি ঘালিব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অন্যতম। অন্যান্য কবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ফারসী কবি আমীর খসরু, সৌদা, মীর, আনীস ও আধুনিক যুগের ইক্‌বাল উল্লেখযোগ্য। গদ্যকারদের মধ্যে সাহিত্য-সমালোচক আজাদ, শিব্‌লী, ঔপন্যাসিক সরূশার, শরর, রুস্‌য়া, রশীদুল-খয়রী ও ছোটগল্প লেখক প্রেম-চন্দ্‌ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত।

প্রথম অধ্যায়

উর্দু-ভাষার ইতিহাস

(ক) জন্মকথা

বাহ্যদৃষ্টিতে উর্দু-ভাষা আরবী-ভাষার সংস্পৃষ্ট সেমিটিক (সেমীয় বা সেম বংশ-উদ্ভূত ভাষাভাষীদের) ভাষা মনে হইলেও, ইহা প্রকৃতপক্ষে আর্য-ভাষার অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার জন্মস্থান ভারতেরই কোন প্রান্তে। উর্দু-ভাষা ভারতীয় আধুনিক আর্য-ভাষা-সমূহের অন্যতম হিন্দি-ভাষারই একটি বিশিষ্ট রূপ। লেখার প্রণালী বিষয়ে আরবী বর্ণমালাকে অনুসরণ করিয়াছে বলিয়াই উর্দুকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আরবী ভাষাসম্ভূত মনে করা হয় এবং এই প্রণালীর প্রাধান্য বশতঃই অনেক আরবী ও ফারসী শব্দ ইহার সহিত জড়িত হইবার সুযোগ পাইয়াছে।

মুঘল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের সময় হইতেই 'উর্দু' শব্দের ব্যবহার ভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত হইতে দেখা যায়। বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারত-সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার বাবরনামায় (বাবুর-নামহ্ বা বাবর-চরিত) উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি দিল্লী ও আগ্রায় জয়লাভ করিয়া তাহার বিজয়-বার্তা যখন চারিদিকে প্রেরণ করেন, সেই ফতেহনামা (ফতঃহ্ নামহ্ বা বিজয়-প্রচারপত্র)-তে বাবর তাঁহার বিজয়ী সৈন্যগণকে উর্দুয়ে মুসরৎ শয়ার (উর্দু-ই-মুস্‌র্‌রৎ-শ'আর্) আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। আবার মুঘল ঐতিহাসিকগণ যথাক্রমে তবকাতে-আকবরী (ত্ববকাৎ-ই-আকবরী) ও ইকবালনামায়ে-জহাঙ্গিরী (ইক্‌বাল্-নাম-ই-জহান্‌গীরী)-তে উর্দু অর্থে রাজ-সৈন্য (শাহী-লস্কর) বা রাজার সাময়িক আবাস-স্থান (শাহী ফরূদ্-গাহ) বাক্যাংশ ব্যবহার করিয়াছেন। মুঘল সম্রাট্‌দের মুদ্রালিপিতেও উর্দু শব্দ সম্রাটের সামরিক আবাস স্থান বা সেনা-নিবাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সম্রাট্ আকবর ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আজমীর ও ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব ভ্রমণপথে যে সমস্ত মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছেন,

সেই সকল মুদ্রায় টাকশালের নাম হিসাবে লিখিত হইয়াছে উর্দ্দূয়ে-জফরকরীন (উর্দ্দূ-ই-জফর্‌করীন্ বা বিজয়ী সেনার নিবাসস্থান)। আবার, আকবর-পুত্র সম্রাট্ জহাঙ্গীর তাঁহার সিংহাসন আরোহণের প্রায় এগার বৎসর পরে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে মালোয়া ভ্রমণপথে যে সব মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন তাহাতে নিম্নলিখিত বয়েৎটি (বয়ৎ বা দ্বিপঙ্‌ক্তি) খোদাই রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়—ব-উর্দ্দূ সিক্‌কা জদ্ দর রাহে-দেকন্ শাহে-বহর ও বর ; শাহানশাহে-জমান শাহে-জহাঙ্গীর্ ইবনে-শাহ আকবর (দাক্ষিণাত্য ভ্রমণপথে জল-স্থলের অধিপতি সম্রাট্ আকবরের পুত্র জহাঙ্গীর শাহ সামরিক আবাসস্থলে এই মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন)।

به اردو سکه زد در راه دکن شاه بحر و بر —
شهنشاه زمان شاه جهانگیر ابن شاه اکبر

এবং পঞ্জাব মিউজিয়মের মুদ্রালিপি-বিবরণীতে এই সকল মুদ্রায় মুদ্রাঙ্কন স্থান দাক্ষিণাত্যপথে রাজার সামরিক আবাসস্থল دار الضرب اردو در راه دکن (দারুল্‌-জর্ব্ উর্দ্দূ দর রাহে-দেকন) মুদ্রিত রহিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আলাউদ্দীন জোয়েনি ('অলা-উদ্দীন্ জুয়িনী) লিখিত তারিখে-জাহানগুশায়ি (তারীখ-ই-জহান্‌গুশায়ি বা পৃথিবী-বিজেতার ইতিবৃত্ত) ও রশিদুদ্দীন ফজলুল্লা (রশীদু-দ্দীন্ ফদ্‌লুল্লাহ) লিখিত জামেয়ুৎ-তাওয়ারিখ (জামি'-উৎ-তৱারীখ্)-এ উল্লিখিত হইয়াছে যে চেঙ্গিজ খান্ (চন্‌গীজ্ খান্) ও তাঁহার পুত্রদের সময় হইতেই মুঘলসম্রাট্‌দের আবাসস্থান বা তাঁহাদের সৈন্যদের বসতিস্থানকে 'উর্দ্দূ' বলা হইত, এমন কি তাঁহাদের রাজধানীকেও সময় সময় 'উর্দ্দূ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। চেঙ্গিজ খানের পরে অনেকবারই মুঘলদের কর্ত্তৃক ভারত আক্রান্ত হইয়াছে—এবং এই সুযোগেই 'উর্দ্দূ' নাম প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

বস্তুতঃ উর্দ্দূ Altaic (বা পার্ব্বত্য-আলতাই দেশীয়) শব্দ এবং তুরস্কের উপভাষা-সমূহে এই শব্দটির ওর্দ্দূ, উর্দ্দূ ও যুর্ৎ প্রভৃতি রূপে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তুর্কী-ভাষায় ইহা তাঁবু, বাসস্থান বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাসস্থান ও সেনানিবাস বা কোন সেনানায়কের সামরিক বাসস্থান প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। তুর্কীদের ভারত-আগমনের পর হইতেই এই উর্দ্দূ শব্দটি তাহার পরিবর্ত্তিত ফারসী উর্দ্দূ-রূপ গ্রহণ করিয়া সেনানিবাস, রাজার সামরিক বাসস্থান বা সৈন্যবর্গ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। আবার,

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে ও তাহার পরবর্তী সময়ে উর্দূয়ে-মুয়াল্লা (উর্দূ-ই-মু'অল্লা) বা বাজারে-উর্দূ (বাজ.ার্-ই-উর্দূ) ইত্যাদি বাক্যাংশে উর্দূ অর্থে শক্তিশালী মুঘল সৈন্যদের সেনানিবাস বা মুঘল সৈন্যবর্গ এই অর্থ ব্যক্ত হইতেছে, দেখিতে পাই। এইরূপ অর্থযুক্ত উর্দূ শব্দের সাহায্যে গঠিত জবানে-আহলে-উর্দূ (জ.বান্-ই-অহল্-ই-উর্দূ বা সেনানিবাসের অন্তঃপাতী লোকদের ভাষা) ১৬ এবং ১৭শ শতাব্দীতে বিশেষ প্রচলিত হইয়া যায় এবং ক্রমে কেবল উর্দূ শব্দই উর্দূ-ভাষা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। এই উর্দূ-ভাষা বলিতে ১৬ এবং ১৭শ শতাব্দীতে ও তাহার পরবর্তী সময়ে দিল্লীতে প্রচলিত মুঘল সৈন্যগণ বা সাধারণভাবে দিল্লীর অধিবাসী মুসলমান জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত ভাষা বুঝাইলেও, ইহার ভিত্তি অনেক পূর্বেই স্থাপিত হয়। এই ভাষার সূচনা তুর্কী মুসলমানদের ভারত-আগমনের আরম্ভ হইতেই হয় এবং ক্রমে ক্রমে আধুনিক আর্যভাষাগুলির প্রস্তুতির সুযোগ সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিয়া ১১ ও ১২শ শতাব্দীতে হিন্দী, বাঙ্লা ও অন্যান্য আধুনিক আর্যভাষার ন্যায় উর্দূভাষাও ইহার স্বরূপ প্রকাশ করে।

খলিফা উমর ফারুক্ (খলীফহ 'উমর্ ফারুক্ ৬৩৪-৬৫৪ খৃষ্টাব্দ)-এর রাজত্বকাল হইতেই মুসলমানদের ভারত-আক্রমণের সূচনা হয়। ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে উম্মান ও বাহ্‌রেইনের অধিপতি ফারুক-সামন্ত সিন্ধু-সীমান্ত আক্রমণ করেন ও তাঁহার যুদ্ধ-জাহাজ বোম্বাই প্রদেশের সমুদ্র-উপকূলস্থিত তানা নামক স্থানে লঙ্গরও স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু সেই আক্রমণ সফল হয় নাই। তারপর, ৬৪২ খৃষ্টাব্দে ঈরান মুসলিম অধিকৃত হইলে, হজরৎ উসমান (হদ্‌রৎ 'উস্.মান্) ৬৪৩ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ক্রমে ক্রমে মকরান, সীস্তান ও জাবালিস্তান অধিকার করেন। ইহার পর হইতেই মুসলমানদের ভারত আক্রমণ ও ক্রম-অধিকারের বিশেষ সুযোগ হয়। ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে আমির মুহলিব বিন আবু সফর (আমির্ মুহ্‌লিব্ বিন্ অবী স্বফর্) কাবুল-পথে ভারত আক্রমণ করিয়া লাহোর পর্যন্ত তাঁহার সৈন্যসমাবেশ করেন এবং এই যুদ্ধাভিযানে মুলতান হইতে কাবুল পর্যন্ত মুসলিম অধিকারে আসে। ইহার পর ক্রমান্বয়ে বিশ বৎসর সিন্ধু প্রদেশ মুসলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইতে থাকে। খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান (খলীফহ 'অব্দুল্-মালিক্ বিন্ মর্‌বান্)-এর রাজত্বকালে যখন হজ্জাজ বিন ইউসুফ ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন কয়েকবারই তিনি সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। অবশেষে ৭০৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে সিন্ধুদেশ মুসলমানদের অধিকারে আসে। এই

যুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন মহম্মদ বিন কাসিম (মুঃহম্মদ্ বিন্ কাসিম্)। তিনি ক্রমে আরো মুসলিম-রাজ্য প্রসারে মনোনিবেশ করিলেন ও রাজ্যবিস্তারে সক্ষমও হইলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার পদচ্যুতি হয়।

খলিফা আল-ওয়াসিকের (অল্-বাসিক্ ৮৩৪—৮৪২ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকাল পর্যন্ত সিন্ধুদেশ বাঘদাদের খলিফাদের অধীনেই ছিল। তাহার পর হইতে খলিফাদের অধীনতা নামেই মাত্র ছিল, এবং ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান শাসনকর্তা অনেকটা স্বাধীনভাবেই সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিতে থাকেন। বস্তুতঃ হিন্দুকুশের উত্তর দিকস্থ স্থানসমূহ অষ্টম শতাব্দীতেই মুসলিম-অধীনে আসিয়াছিল, কিন্তু ১২ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মুসলিমগণ হিন্দুকুশের দক্ষিণে তাঁহাদের রাজ্যবিস্তারের বিশেষ সুযোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সামানী বংশীয় পারস্য সম্রাট্দের এক জন তুর্কী ঘুলাম আলপ্তগীন্ সর্বপ্রথম ভারত ও খুরাসানের মধ্যবর্তী ঘজনী নামক স্থানে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুরাজা জয়পাল তখন পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। আলপ্তগীনেরই আশ্রিত সবুক্তগীন (৯৭৬-৯৯৭ খৃষ্টাব্দ) রাজা জয়পালকে দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ঘজনী সাম্রাজ্য আরো প্রসারিত করিতে সক্ষম হন। সবুক্তগীনের পর সুলতান মামুদ (সুল্ত্বান মঃহমূদ্) ঘজনী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন এবং এই সকল আক্রমণের ফলে ঘজনী সাম্রাজ্য ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত কালঞ্জর হইতে পশ্চিম প্রান্তে সোমনাথ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে মামুদ অধিকৃত কতক রাজ্য হস্তচ্যুত হইলেও, পঞ্জাব অধিকার তাঁহাদের কায়েমই থাকিয়া যায়।

সুলতান মামুদের মৃত্যুর পরেই আর একটি শক্তিশালী মুসলিম বংশের অভ্যুত্থান হয়। বহরাম শাহ্-র রাজত্বকালেই (১১১৮-৫২ খৃষ্টাব্দ) এই বংশীয়গণ ঘজনী তাঁহাদের অধিকারে আনয়ন করিতে সক্ষম হন। সবুক্তগীনবংশীয়দের হাতে তখন কেবল মাত্র পঞ্জাব রহিয়া যায় এবং তাঁহাদের শেষ সুলতান খসরু মালিক ১১৬০ হইতে ১১৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। আমরা আরো দেখিতে পাই যে এই নূতন শক্তিশালী সাম্রাজ্যের শিহাবুদ্দীন ঘোরী নামে প্রসিদ্ধ মহম্মদ্ বিন্ সাম্ সবুক্তগীনের শেষ বংশধরকে পরাস্ত করিয়া লাহোরের সিংহাসনও অধিকার করেন। পঞ্জাব অধিকার করিয়া ঘোর-রাজ আবার ভারত বিজয়ে উৎসাহী হইলেন। সেই সময়ে উত্তর ভারতে তিনটি হিন্দু

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ছিল—চৌহান সাম্রাজ্য দিল্লী ও আজমীরে, রাঠোর কনৌজে, আর বাঘিলা গুজরাতে। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন সাম চৌহান রাজ পিথোরাকে থানেশ্বরের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিল্লী ও আজমীর অধিকার করেন। তারপর ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে কনৌজ মুসলিম অধিকারে আসে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অযোধ্যা এবং বিহারও শিহাবুদ্দীনের হস্তগত হয়। মোটকথা, সেই সময়ে সিন্ধু হইতে বাঙলা পর্যন্ত সারা উত্তর-ভারত ঘোর-রাজ্যের হস্তগত হয়। কিন্তু শীঘ্রই শিহাবুদ্দীন ইসমাইলিয় (ইস্‌ম'ঈলী) সম্প্রদায়ভুক্ত এক আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

শিহাবুদ্দীনের মৃত্যুর পর এই বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার কতিপয় ভৃত্যের মধ্যে বিভক্ত হয়। তাজুদ্দীন ইয়লদুজ ঘজনীর, নাসিরুদ্দীন কবাচা (নাসিরুদ্দীন্ ক্বাচহ) সিন্ধুর, কুতুবুদ্দীন আইবক (কুত্‌বুদ্দীন্ অঈবক) দিল্লীর এবং বহাউদ্দীন তুঘরিল বিয়ানার অধিকার লাভ করেন। তুঘরিলের মৃত্যুর পর বিয়ানাও দিল্লী-সুলতানের অধিকারে আসে। এই সময়ে ইখতিয়ারুদ্দীন খিলজীর সহায়তায় বাঙলাও দিল্লী-সম্রাটের অধিকারভুক্ত হয়। ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে তাজুদ্দীন ও নাসিরুদ্দীন কবাচার রাজ্যসমূহও দিল্লী-সম্রাটের অধিকারে আসে। ইলতুৎমিশ ও তাঁহার বংশধরগণ রাজ্য বিস্তারের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের পরবর্তী খিলজী বংশীয়দের রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের আরো প্রসার হয়। সুলতান আলাউদ্দীন মহম্মদ খিলজী (১২৯৫—১৩১৫) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার পর ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে বিজয়-অভিযানে বহির্গত হন এবং শীঘ্রই দেওগড়, উয়রঙ্গল এবং কর্নাট অধিকার করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করিয়া রামেশ্বরম্ পর্যন্ত পৌছায়। কথিত আছে, আলাউদ্দীনের অনুমত্যনুসারে তথায় একটি মসজিদও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সম্রাট্ জহাঙ্গীরের রাজত্বকাল পর্যন্ত তথায় ইহা সুরক্ষিত ছিল। আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালের পরেও প্রায় চল্লিশ বৎসর দাক্ষিণাত্য দিল্লী-সুলতানদের অধিকারে ছিল। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে (১৩২৫—১৩৫১) দাক্ষিণাত্যের আমীর-ওমরাগণ দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ইহার ফলে বহমনী (১৩৪৫—১৫১৬ খৃষ্টাব্দ) নামে এক নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রায় এক শত বৎসর রাজত্ব করার পর এই শক্তিশালী সাম্রাজ্য খণ্ডিত হইয়া ৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া যায়।

উপরি উল্লিখিত রাষ্ট্র সংস্থাপনার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে সিন্ধু-বিজয়ী মুসলমানগণ ছিলেন আরব দেশীয়, এবং তাঁহারা যখন ভারতে বসতি স্থাপন করেন, তাঁহাদের আরবী ভাষা, আরবীয় কৃষ্টি এবং সভ্যতাও তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। এবং রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কৃষ্টি ও সভ্যতা এমনিভাবে প্রসার করিতে চেষ্টা করেন যে সিন্ধুদেশও অল্পদিনের মধ্যেই শিরিয়া ও ইরাকের রূপ পরিগ্রহ করে। এই মুসলিমগণ তথায় একাদিক্রমে ৫ শত বৎসর রাজত্ব করেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ইরাক ও আরব শাসকবর্গের সহিত তাঁহাদের দেশীয় অনেক ধর্ম-সম্প্রদায় ও অধিবাসী সিন্ধুদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভারতীয়দের সহিত সামাজিক জীবনেও এমনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গেলেন যে কোন বিদেশীয়ের পক্ষে এই দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সাধারণ জীবনে কোন পার্থক্য খুঁজিয়া বাহির করাই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। ৯ম শতাব্দীর কোন আরব ঐতিহাসিকের (ইবন্-ঃহরসিল্) মতে সেই সময়ে সিন্ধুদেশে আরবী-মিশ্রিত হিন্দী (অর্থাৎ উর্দু) এবং মুলতানে মুলতানী ও ফারসী ভাষার প্রচলন ছিল।

ঘজনীয় ও ঘোর সম্রাট্দের রাজত্বকালে যে সকল মুসলমান ভারতে আসিয়াছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই তুর্কী, মুঘল্ বা আফ্ঘান ছিল। তাহাদের ভারতীয় কেন্দ্রস্থল প্রথমভাগে লাহোরেই অবস্থিত ছিল। আবুল হসন আলী বিন উসমান আল-হুজুরী (অবুল্-ঃহসন্ 'অলী বিন্ 'উস্‌মান্ অল্-হুজূরী) ও শেখ ফখরুদ্দীন জিন্‌জানী নামে প্রসিদ্ধ সুফী ও ধর্ম-প্রচারক এই সময়েই লাহোরে বসতি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মাসুদ সাদ সলমান (মস্-'উদ্ স'অদ্ সলমান্), আবুল ফরজ রুনী, আবু আব্দুল্লাহ অন্-নকৃতী ও হামিদুদ্দীন মাসুদ (ঃহমীদুদ্দীন্ মস্' উদ্) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ফারসী কবি এই সময়েই লাহোরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তা'ছাড়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর আবু নসর ফারসী (অবু নস্বর্ ফারসী) ভারতে অবস্থান পূর্বক এই সময়েই লাহোরে একটি কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তথায় ইসলামীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হইত। ঘোর-বংশীয়দের রাজত্বকালেই বিশেষ করিয়া মুসলিম-কৃষ্টি তাঁহাদের দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সারা ভারতেই ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। এইরূপ কথিত আছে যে প্রসিদ্ধ চীন-পর্যটক ইবনে-বতুতা (ইব্‌নি-বত্তুত্‌হ) ভারত পর্যটনকালে তথায় মুসলিম রাষ্ট্রীয় শাসনের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারত জুড়িয়া ইসলামীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রভাবও যথেষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ইসলাম কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রভাবের অন্যতম কারণ ভারতে সূফী-প্রবর্তকদের আবির্ভাব ও তাঁহাদের সার্বজনীন প্রেমধর্মের প্রসারণ। বাঙলাদেশের বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের মূলে সূফীসাধনার প্রভাব যথেষ্টই রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই বিষয়ে আমার 'পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস' ও 'জলালুদ্দীন রূমী ও তাঁহার সূফীধর্ম' (*Jalaluddin Rumi and his Islamic Mysticism*) নামক গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবও তাঁহার 'বঙ্গে সূফী প্রভাব' নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। একাদশ শতাব্দীতেই যে ভারতের দূর দেশান্তরে সূফী প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামীয় কৃষ্টি ছড়াইয়া পড়িতেছিল তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। শাহ সুলতান রূমী নামে এক সূফী তাঁহার পীর-সহ ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। অধুনা পূর্ব-পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত মদনপুর নামক স্থানে তাঁহার কবর ও দরগাহ এখনো বিদ্যমান আছে। কথিত আছে, এই অঞ্চলের তদানীন্তন কোচ-রাজা এই দরবেশের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও সমস্ত গ্রাম দরবেশের নামে পীরোত্তর-স্বরূপ দান করেন।[১] আনুমানিক খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতেই ভারতের নানাস্থানে ভ্রাম্যমাণ মুসলমান সাধকগণ আগমন করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামীয় কৃষ্টি যেমন চারিদিকে বিস্তারলাভ করে, তেমনি তাঁহাদের কথ্য-ভাষা উর্দুও সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে।

মুসলিম বিজয়ী ও ইসলামধর্মাবলম্বিগণ যদ্যপি ভারতেও তাঁহাদের ভাষা ও কৃষ্টি সঙ্গে করিয়াই লইয়া আসিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের ভাষা ও কৃষ্টির প্রভাব মিশর বা ঈরানের উপর যেরূপ কার্যকরী হইয়াছিল, তেমনটি ভারতে হয় নাই। আরবী ভাষা ও আরবীয় সভ্যতায় প্রভাবান্বিত হইয়া ঈরানী ও মিশরবাসী তাঁহাদের নিজস্ব প্রাচীন ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি ও নিজ নিজ ভাষা পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে তৎপরিবর্তে আর্য-সভ্যতা ও কৃষ্টি ইসলামীয় সভ্যতাকে প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলিয়াছে। তৎসত্ত্বেও ইসলামীয় কৃষ্টির প্রভাব কিছুটা ভারতে থাকিয়াই যায়,—তাহারই ফলে তৎকালীন (শিষ্ট-) হিন্দী ভাষা ইসলাম প্রভাবান্বিত হইয়া উর্দু ভাষায় রূপান্তর লাভ করে।

সুলতান মামুদের রাজত্বকালে তাঁহার বিজয়-পতাকা সমগ্র এশিয়ার

১। Bengal District Gazetteers—Mymensing, 1917. p. 152.

দূরদূরান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মাওরান্ নহর, খ্বারজম, খুরাসান ও ফারসের অন্তর্ভুক্ত অনেক বিস্তৃত ভূমি তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র মাস্থদের রাজত্বকালে (১০৩০-৪০ খৃষ্টাব্দ) ক্রমে ক্রমে সকল প্রসিদ্ধ রাজ্যই পারস্য-সম্রাট্ সলজুক-রাজ অধিকার করেন। মস্থদ-পুত্র মৌদূদ্ (১০৪০-৮) যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, সবুক্তগীন-বংশীয়দের মাত্র আফগানিস্তান ও ভারতের কতিপয় অংশ অধিকারে ছিল। মাস্থদের বংশধরগণ এই সময়ে সলজুক্ রাজ কর্তৃক বিশেষভাবে অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন ও তাঁহারা এশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতেই কেবল তাঁহাদের রাজ্য কায়েম রাখিতে সক্ষম হন ও তথায় স্বাধীনভাবে রাজ্য চালনা করিতে থাকেন।

এই নূতন অবস্থা-বিপর্যয়ে সবুক্তগীন-বংশীয় রাজন্যবর্গ, তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন ও দেশীয় অধিবাসিগণ ভারতীয়দের সহিত বিশেষ অন্তরঙ্গভাবে মিশিতে চেষ্টা করিলেন এবং ভারতীয়-ভাষা এমনভাবে আয়ত্ত করিলেন যে ভারতীয় হিন্দী ভাষাই যেন তাঁহাদের নিজস্ব ভাষারূপে পরিগণিত হইল। আমরা দেখিতে পাই, স্থলতান ইব্রাহীমের রাজত্বকালে (১০৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে) প্রসিদ্ধ ফারসী কবি মাস্থদ সাদ সলমান ও আবু আব্দুল্লা আন-নকৃতী হিন্দী কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন ও তাঁহাদের হিন্দী দোহা-গান ঐ সময়কার ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত রহিয়াছে। স্থলতান মামুদের রাজত্বকাল হইতেই অনেক দায়িত্বপূর্ণ কার্যে হিন্দু নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। মাস্থদের সময়ে এক হিন্দু সেনাবাহিনী পর্যন্ত গঠিত হইয়াছিল এবং ইহার অধিনায়কত্বে নাথ ও তিলক নামে দুই সৈন্যাধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। কথিত আছে, মুসলিম বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এই হিন্দু সেনাবাহিনী সবুক্তগীন-সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

এই সকল ঘটনা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে সবুক্তগীনের বংশীয়দের সময় হইতেই হিন্দু-মুসলমানের একত্র বসবাসের স্থযোগ হয়। তাহার ফলে সেই সময়কার হিন্দীভাষার কতকটা পরিবর্তন দৃষ্ট হইতে থাকে। এই নূতন ভাষাকে আরবী, ফারসী ও তুর্কী শব্দের বিস্তর প্রয়োগসহ স্থানীয় মুসলমানগণ ব্যবহার করিতে থাকেন—কিন্তু ভাষার গঠন হিন্দীই থাকিয়া যায়। স্থলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে (১৩২৫-৫১) এই নূতন পরিবর্তিত হিন্দী-ভাষা জনসাধারণের মধ্যেও যোগসূত্র স্থাপন করে; তবে বিশেষ করিয়া ভারতে জন্মগ্রহণকারী মুসলমানগণই এই নূতন ভাষা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত

হন। যে সকল মুসলমান বিদেশ হইতে আমদানী হইতে লাগিলেন, তাঁহারাও এই নূতন ভাষার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন এবং ক্রমে এই ভাষায় পারদর্শী হইয়া ভারতীয় জনসাধারণের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিলেন। যদিও আধুনিক আর্যভাষার অভ্যুত্থান-সময়ে এই নূতন পরিবর্তিত হিন্দী (বা উর্দু) ভাষার কোন নিদর্শন সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচরে নাই, তবু বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে ১২ বা ১৩শ শতাব্দীতে আরবী-ফারসীতে লিখিত যে সকল ইতিহাস বা জীবনী-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতে উর্দু ভাষায় কথিত অনেক বাক্যালাপ সংরক্ষিত আছে। এই সকল গ্রন্থ আলোচনা করিয়াই আমরা উর্দুভাষার আদিরূপ কতকটা জানিতে পারি। তা'ছাড়া প্রসিদ্ধ ফারসী কবি আমীর খসরূও (জন্ম ১২৩৫ খৃষ্টাব্দ) অনেক উর্দু কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন—যদিও ইহার অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ আমীর খসরূই উর্দু-সাহিত্যের প্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

(খ) বংশ-পরিচয়

বস্তুতঃ হিন্দী ও উর্দুর মধ্যে আমরা এইটুকু পার্থক্য দেখিতে পাই যে, যদিও ইহার জন্মস্থান ভারতেই, উর্দু আরবী তথা ফারসী বর্ণমালাকে অনুকরণ করিয়াছে এবং ইহার শিষ্ট বা সাহিত্যিক ভাষায় অনেক ফারসী, আরবী ও তুর্কী শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে। আর হিন্দী তাহার নিজস্ব বর্ণমালা নাগরী বা দেবনাগরীকে আঁকড়াইয়া আছে, এবং ইহার শিষ্ট বা সাহিত্যিক ভাষায় অনেক সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। আমরা লক্ষ্য করিলে ইহাও জানিতে পারি যে, এই উর্দু বা হিন্দী ভাষা কখনও কোন স্থানেরই মাতৃ-ভাষা ছিল না। যদিও সকল সময়েই হিন্দী বা উর্দু কথ্য-ভাষা হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে, তথাপি ইহা বস্তুতঃ সাহিত্যিক কথ্য-ভাষা। আর ইহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ 'নাগরী' নামকরণের মধ্যেই রহিয়াছে। এই হিন্দী (বা ভারতীয়) ভাষার পূর্ব-নাম ছিল নাগরী-ভাষা, অর্থাৎ নগরের (শিষ্ট কথ্য) ভাষা। সকল ভারতবাসীর জন্যই এই ভাষা—তাই ইহার নাম হিন্দী ভাষা। আবার, এই হিন্দী ও উর্দুর একত্রে নামকরণ হইয়াছে 'হিন্দুস্থানী' (বা নাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভাষা) বা 'হিন্দুস্তানী' (বা আরবী অক্ষরে লিখিত উর্দু ভাষা)। এই 'শিষ্ট কথ্য' ভাষার উদাহরণ বাঙলায়ও রহিয়াছে। বাঙলার 'সাহিত্যিক-কথ্য' ভাষা কোন বিশেষ স্থানের মাতৃভাষা নয়, যদিও পশ্চিম-বাঙলা তথা বাঙলার রাজধানী কলিকাতাবাসীদের মাতৃভাষার প্রভাবই এই শিষ্ট কথ্য ভাষাকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তেমনি হিন্দুস্তানীতে দিল্লীবাসীদের মাতৃভাষার যথেষ্ট প্রভাব আছে। এই বাঙলা সাহিত্যিক কথ্য-ভাষা কোন বিশেষ স্থানের মাতৃভাষা না হইলেও, সকল বাঙ্গালীর বা বাঙলা ভাষাভিজ্ঞ বিদেশীয়দের শিষ্ট (বা নাগরিক) কথ্য বা লিখিত ভাষা। বাঙলার ন্যায় হিন্দুস্থানী বা হিন্দুস্তানীর দুই রূপ প্রায়শঃ হিন্দু ও মুসলমান যথাক্রমে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর অধুনা ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় হিন্দুস্থানে হিন্দুস্থানী বা হিন্দীর ব্যবহার প্রবর্তিত হইয়াছে, এবং পাকিস্তানে অর্থাৎ

(মুসলমানদের আবাসভূমি) পবিত্রস্থানে হিন্দুস্তানী, তথা নূতন নামকরণ অনুযায়ী পাকিস্তানী বা উর্দু ভাষার প্রবর্তনের চেষ্টা দৃষ্ট হয়।

ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্ভুক্ত উর্দু ভাষার বংশ-পরিচয় বর্ণনাকালে ডক্টর মহিউদ্দীন কাদেরী (মঃহীউদ্দীন্ কাদিরী) তাঁহার 'হিন্দুস্তানী লিসানিয়াৎ'- (অর্থাৎ উর্দু ভাষাতত্ত্ব)-এ বস্তুতঃ ভারতীয় আধুনিক আর্যভাষারই বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। কাদেরী সাহেব ভারতীয় আর্যভাষাকে ৫টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করিয়াছেন:—(১) উত্তর-পশ্চিমা; (২) দক্ষিণ-পশ্চিমা; (৩) মধ্যদেশীয়; (৪) পূর্বদেশীয়; এবং (৫) দক্ষিণা বা দক্ষিণ-দেশীয়।

(১) উত্তর-পশ্চিমা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে:—(ক) পঞ্জাবী; (খ) জিপ্সী; ও (গ) সিন্ধী ভাষা।

(২) দক্ষিণ-পশ্চিমা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত:—(ক) রাজস্তানী; ও (খ) পাহাড়ী।

(৩) মধ্যদেশীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত:—(ক) হিন্দুস্তানী বা পশ্চিমা-হিন্দী; (খ) বাঙ্গরু; (গ) ব্রজভাষা, (ঘ) কনৌজী, ও (ঙ) বুন্দেলী।

এই হিন্দুস্তানীকে আবার দুই প্রধান অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে—নাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভাষা ও ফারসী অক্ষরে লিখিত উর্দু ভাষা। এই নাগরী হিন্দী ভাষাই ভারতীয় শিষ্ট কথ্য ভাষা। ইহাকে সময় সময় পূর্বদেশীয় গোষ্ঠীর পূর্বী-হিন্দীর সহিত পার্থক্য প্রদর্শনার্থে পশ্চিমা-হিন্দীও বলা হয়। ফারসী অক্ষরে লিখিত উর্দু ভাষাকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—শিষ্ট কথ্য উর্দু ভাষা, দিকনী এবং গুজরাতী।

(৪) পূর্ব-দেশীয় গোষ্ঠীকে প্রথমতঃ দুই প্রধান অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে (ক) মগধী ও (খ) অর্ধ-মগধী।

(ক) পূর্বী ও পশ্চিমা মগধীভেদে আসামী, বাঙলা ও উড়িয়া; এবং মৈথালী, মগহী ও ভোজপুরী যথাক্রমে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আর (খ) অর্ধ-মগধীর প্রধান রূপ পূর্বী-হিন্দী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—অউধী, বাঘেলী ও ছত্তিশগড়ী।

(৫) দক্ষিণা গোষ্ঠীর প্রধান বংশ-পরিচয় হিসাবে রহিয়াছে মারাঠি ভাষা।

কিন্তু উর্দুর বংশ-পরিচয় লিখিতে হইলে আধুনিক আর্য ভাষার বর্ণনা করিয়া নিবৃত্ত হইলেই কি করিয়া চলিবে? হিন্দীর সহিত সংশ্লিষ্ট উর্দু

বস্তুতঃ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা-গোষ্ঠী—ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠী দুই প্রধান অংশে বিভক্ত—আর্যভাষা ও ইউরোপীয় ভাষা। প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষা-অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন গ্রীক ও লেটিন ভাষার অন্তর্ভুক্তই হইয়াছে আধুনিক ইংরেজী, জার্মান ও ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষাসমূহ।

আর্য ভাষার দুই প্রধান শাখা—ভারতীয় আর্য ও ঈরানীয় আর্য ভাষা। ঈরানীয় ভাষা প্রাচীন পারসিক বা আবেস্তা, মধ্য পারসিক বা পহলবী ভাষা যুগ অতিক্রম করিয়া আধুনিক যুগে ফারসী, পস্ত বা বেলুচী ভাষা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ বৈদিকভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীরও অতি প্রাচীন নিদর্শন। সাধারণভাবে বৈদিকভাষা ও সংস্কৃতকে যদিও আমরা অনেকটা একই প্রকার ধারণা করিয়া থাকি, প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গ্রীক বা আবেস্তার প্রাচীন রূপ গাথ ভাষার সহিত বৈদিক ভাষার যেমন সাদৃশ্য আছে, সেইরূপ সাদৃশ্য বৈদিক ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষারও নাই, বিশেষ করিয়া ব্যাকরণের খুঁটিনাটি ব্যাপারে।

এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষান্তর্ভুক্ত বৈদিক, প্রাচীন পারসিক ও আবেস্তা, প্রাচীন গ্রীক বা হেল্লেনীয়, প্রাচীন ইতালীয় বা লেটিন ও প্রাচীন জার্মানীয় বা টিউটনিক প্রভৃতি ভাষাভাষী লোকদের আদিম বাসস্থান সম্ভবতঃ পূর্ব ইউরোপের কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। সেই সময়কার তুলনায় সুশিক্ষিত অর্ধ-যাযাবর ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর একদল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ২০০০ বৎসরের কাছাকাছি কোন সময়ে মধ্যএশিয়ায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া এশিয়া মাইনর ও মেসোপটমিয়ার দিকে ধাবিত হন। এই সকল স্থানে কিছুকাল অবস্থান করার পর সেখান হইতে ইন্দো-ঈরানীয় বা আর্যগোষ্ঠী নামীয় একদল ঈরানের দিকে অগ্রসর হন। ঈরানে এই ইন্দো-ঈরানীয় ভাষাভাষী দল দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় এক বিরাট কৃষ্টি ও সভ্যতার অভ্যুত্থান হয়। এই কৃষ্টির অভ্যুত্থান সময়েই এই ইন্দো-ঈরানীয় ভাষাভাবিগণ ক্রমশঃ ভারতের সিন্ধু ও পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ভারতে যাত্রাপথের কিছুকাল পরেই এই সম্মিলিত শক্তির ভাঙ্গন সুরু হয়। আমরা দেখিতে পাই, এই সম্মিলিত কৃষ্টির অক্ষয় কীর্তি ধর্মের মধ্যে প্রথমে ঈরানীয় ও ভারতীয়-নির্দিষ্ট একই দেবতা উভয় জাতির নিকটেই শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছেন, যেমন মিত্র, অর্যমা বা সোম। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁহাদের মধ্যে ধর্মবিরোধের ফলে একদলের দেবতা অন্যদলের

অপদেবতা রূপে পরিচিত হইতে লাগিলেন, যেমন নাসত্য বা ইন্দ্র। তা'ছাড়া এই উভয় জাতির প্রাচীন গ্রন্থসমূহে বিপরীত অর্থ সূচক 'দেব' ও 'অসুরের' ব্যবহার লক্ষ্য করিলেই তাহা সহজেই অনুমিত হইবে।

"আবেস্তায় 'দেব' (বাঙ্‌লায় দেও বা 'দেওয়া, শব্দও লক্ষণীয়) শব্দের যেমন অর্থাবনতি ঘটিয়াছে' আশ্চর্যের বিষয় এই যে সংস্কৃত সাহিত্যেও ঠিক অনুরূপভাবে 'অসুর' শব্দের অর্থ-বিপর্যয় হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে আমরা 'অসুর' শব্দ পাইতেছি বরুণ প্রভৃতি প্রধান দেবতার বিশেষণ হিসাবে। আবেস্তায়ও দেখি ঈশ্বরের নাম হইতেছে অহুর মজদা (মজ্‌দা) অর্থাৎ অসুর মেধাঃ ('মহৎ জ্ঞান স্বরূপ')। কিন্তু অর্বাচীন বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে 'অসুর' শব্দের অর্থ হইল 'দেব বিরোধী, ব্রাহ্মণ্যদ্বেষী'। সম্ভবতঃ 'দেব' এবং 'অসুর' শব্দের এই অর্থ বিপর্যয়ের মধ্যে ঈরানীয় এবং ভারতীয় আর্যদের মধ্যে প্রচণ্ড ধর্ম-বিরোধের ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে।"[১]

'অসুর' এবং 'দেব' শব্দ যেমন এই দুই জাতির ধর্ম-বিরোধের সাক্ষ্য দান করিতেছে, তেমনি 'দস্যু', 'দাস' বা 'দহ'[২] আবার তাঁহাদের সম্মিলিত বিজয়-অভিযানের কতকটা স্বরূপ প্রকাশ করে। ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ইন্দো-ঈরানীয় দলের ভারতে আগমনের পূর্বে পূর্ব-ঈরানী, এবং সিন্ধু ও পঞ্জাবে যে সকল অধিবাসী অবস্থান করিত, তাহাদের পূর্বে 'দাস' বা 'দস্যু' বলিয়া অভিহিত করা হইত। ঋগ্‌-বেদে যে সকল অনার্যকে আর্যগণ সর্বপ্রথম বশীভূত করিয়াছিলেন, তাহাদের 'দাস' বা 'দস্যু' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। আর এই দাস বা দস্যুর প্রতি-শব্দ আবেস্তার ভাষায় হইবে–(দাহ বা) দহ্যু (dahyu)। আবার, গ্রীক গ্রন্থে রহিয়াছে, প্রাচীন পূর্ব-ঈরানের অধিবাসিগণকে বলা হইত 'দহাই'। কিন্তু প্রাচীন-পারসীক ভাষায় 'দহ্যু' অর্থে পাইতেছি 'দেশ'; আর, ইহারই প্রতি-শব্দ আধুনিক ফারসী হইয়াছে 'দিহ'। মনে হয়, 'দহ্যু' অর্থে ব্যবহৃত প্রাচীন ঈরানীয় ও সিন্ধু বা পঞ্জাবে অবস্থিত প্রাচীন অধিবাসীই, পরে প্রাচীন-পারসীকে 'দেশ' অর্থে রূপ গ্রহণ করিয়া পরবর্তী কালে গ্রাম অর্থে দাঁড়াইয়াছে। আর, এই 'দস্যু' বা দাস অর্থে আর্যভাষায় যদিও প্রথম যুগে

১। শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল, পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১২-১৩

২। ফারসী 'দিহ' (গ্রাম) হইতে উর্দুতেও এই 'দহ'-র ব্যবহার পাওয়া যায়। আবার, বাঙ্‌লায় অনেক স্থানের নামের শেষে যুক্ত 'দহ', ফারসী 'দিহ' হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাহারো কাহারো মতে বাঙ্‌লা দহ, সংস্কৃত হ্রদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

সিন্ধু বা পঞ্জাবদেশীয় প্রাচীন অধিবাসীদিগকেই বুঝাইতেছে ; কিন্তু পরে ইহার অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যে কোন অনার্য, আর্য-শত্রু, আর্য-বশীভূত ব্যক্তি বা কোন লুণ্ঠনকারী আখ্যা লাভ করিয়াছে।[১]

ইন্দো-ঈরানীয় গোষ্ঠীর এক প্রধান দল যখন ভারতের দিকে অগ্রসর হইয়া স্থানীয় অনার্যদের বশীভূত বা ভারতের অন্যান্য অংশে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাদের বসতি স্থাপন ও ক্রমশঃ নিজেদের অন্যান্য অংশে বিস্তৃত করিতে লাগিলেন, তখন হইতেই প্রাচীন আর্যভাষা, তথা বৈদিক যুগের সূচনা হয়। এবং এই প্রাচীন আর্যগণ ক্রমশঃ তাঁহাদের রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খৃঃ পূঃ ৬০০-র মধ্যে মগধ বা প্রাচীন বিহার পর্যন্ত তাঁহাদের কৃষ্টি-অভিযান প্রেরণ করিতে সক্ষম হন। এই যুগ-কাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৫০০ হইতে ৬০০ পর্যন্ত। বৈদিক যুগের অতি প্রাচীন গ্রন্থের নিদর্শন স্বরূপ পাই ঋগ্‌বেদ—প্রাচীন ঋগ্‌বেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্। আধুনিক আর্য ভাষাগুলির ন্যায় বৈদিক ভাষারও দুইটি রূপ ছিল—শিষ্ট লিখিত ভাষা ও কথ্য ভাষা। বৈদিক কথ্য-ভাষার তিনটি রূপ বিদ্যমান—(১) উদীচ্য (উত্তর দেশীয় বা উত্তর-পশ্চিমা), (২) মধ্যদেশীয়, ও (৩) প্রাচ্য বা পূর্ব দেশীয়। ইহাদের মধ্যে উদীচ্য কথ্য ভাষার প্রভাবই বিশেষ করিয়া শিষ্ট সাহিত্যিক রূপকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

সাধারণভাবে এই বৈদিক যুগকে সংস্কৃত যুগ বলা হইলেও, প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত যুগ বলিয়া কোন যুগ নাই। বৈদিক যুগেরই শেষ দিকে যখন বৈদিক ভাষার শিষ্টরূপকে বিস্তৃত ভূভাগের উপভাষা সমূহ বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, তখন পণ্ডিতগণ একত্রিত হইয়া অর্বাচীন বৈদিক ভাষার মধ্যে একটি সুসংবদ্ধ শিষ্ট বা সাহিত্যিক রূপ আনয়ন করিবার জন্য বিভিন্ন উপভাষার সংস্কার সাধন করিয়া একটি ‘সংস্কৃত’ রূপের ব্যবস্থা করেন এবং সেই সংস্কৃত রূপের নামকরণ হয় ‘সংস্কৃত’ ভাষা। এই পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনি। পঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশীলাবাসী এই ব্রাহ্মণের জন্ম হয় আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কিছুকাল পূর্বে। পাণিনির ব্যাকরণে নিবদ্ধ বিভিন্ন কথ্যভাষার বিবরণ ব্যতীত সেই সময়কার কথ্যভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তীকালে লিখিত রামায়ণ-মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণাদিতে লিখিত ভাষার রূপ অনেকটা স্থানীয় কথ্য-ভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত যুগ বলিয়া যদি কোন কালকে

১। Indo-Aryan and Hindi. পৃঃ ১৭

অভিহিত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে পাণিনির পরবর্তী সময় হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টির যুগ। কিন্তু ইহা মাত্র একটি সাহিত্যিক ভাষার বিশিষ্টরূপের যুগ—ইহা কোন সজীব কথ্যভাষার যুগ নহে ; তাই নিশ্চল এবং সেই কারণেই কোন ঐতিহাসিক আলোচনার অপেক্ষা করে না। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে এই সাহিত্যিক সংস্কৃত যুগের প্রভাবেই 'তৎসম' শব্দ বিভিন্ন আধুনিক আর্যভাষায় প্রবেশ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে—কেবল উর্দুভাষাই ইহা হইতে অনেকটা ব্যতিক্রম। কারণ, উর্দু-ভাষাভাষিগণ সংস্কৃত তথা ভারতীয় 'দেবভাষা'-র প্রতি কখনই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। উর্দুতে 'তৎসম' শব্দের বিশেষ কোন প্রভাব না থাকিলেও, হিন্দীর প্রভাবে 'অর্ধ-তৎসম' শব্দের প্রভাব কিছুটা আসিয়াছে। আর 'তদ্ভব' শব্দ তো সকল আধুনিক ভাষারই নিজস্ব জিনিষ। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই বিভিন্ন আধুনিক আর্যভাষা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং উর্দুও ইহা হইতে বাদ যায় নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, 'তদ্ভব' শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই উর্দু ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্ভুক্ত—এই গৌরব অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

মধ্য-ভারতীয় আর্য যুগ আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৬০০ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই যুগকে আবার পালী, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভেদে তিন স্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই তিন স্তরকে একত্রে প্রাকৃত যুগও বলা হয় এবং এই তিন স্তরকে যথাক্রমে প্রাচীন, মধ্য ও অর্বাচীন প্রাকৃত যুগ বলা যাইতে পারে। পালী বা প্রাচীন প্রাকৃত যুগ আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৬০০ হইতে ১ম শতাব্দী পর্যন্ত। পালীরও আবার তিনটি উপভাষা লক্ষণীয়—উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্বী-উপভাষা। অশোকের বিভিন্ন অনুশাসনে স্থানভেদে এই তিনটি রূপই প্রকাশিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ ধারক মহারাজ অশোক চাহিয়াছিলেন যে, আপামর সকলের জ্ঞানলাভার্থে বৌদ্ধধর্মের মূল-নীতি স্থানীয় কথ্যভাষায়ই প্রচারিত হউক—তাহারই ফলে পালি বা পালী ভাষার সৃষ্টি হয়। এই পালি ভাষার তিনটি রূপই অশোকের বিভিন্ন অনুশাসন ও হীনযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধদিগের পালি শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলিতে রূপান্তর লাভ করিয়াছে, কিন্তু পরবর্তীকালে এই পালি ভাষায়ও কথ্যভাষার স্বাভাবিক গতিশীলতা ও সজীবতা রক্ষা করা হয় নাই। অশোকের রাজধানী মগধের উপভাষা বা পূর্বী-মারাঠি উপভাষায় প্রভাবান্বিত হইয়া পরবর্তী

পালি গ্রন্থাদি ও অনেকটা সংস্কৃতের ন্যায় একটি নিশ্চল শিষ্ট-কথ্যরূপ গ্রহণ করে ; এবং পালিভাষা বলিতে আমরা সাধারণভাবে সেই শিষ্ট সাহিত্যিক কথ্যরূপকেই মনে করিয়া থাকি।

প্রাকৃত যুগ তথা মধ্য প্রাকৃত যুগ খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী হইতে ৬ শতাব্দী। প্রাকৃতে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও অর্ধ-মাগধী এই চারিটি উপভাষা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। "ব্যাপক অর্থে 'প্রাকৃত' শব্দ তাবৎ মধ্য-ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলিকে বুঝাইবার জন্য অনেক সময় ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু শব্দটি যথার্থপক্ষে কেবল সাহিত্যে ব্যবহৃত মধ্যস্তরের মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষাগুলিকেই বুঝায়। সংস্কৃত নাটকে নারী অথবা নিম্নশ্রেণীর পুরুষ চরিত্রের মুখে যে ভাষা দেওয়া হইয়াছে, গাথা সপ্তশতী প্রভৃতি কাব্যে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং জৈনেরা তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থ যে ভাষায় রচনা করিয়াছেন, তাহাই প্রাকৃত নামে পরিচিত। এই যে সাহিত্যের ভাষা, বররুচি প্রভৃতি বৈয়াকরণেরা ইহারই ব্যাকরণ রচনা করিয়া গিয়াছেন সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে। সত্যকথা বলিতে কি, এই প্রাকৃত ঠিক কথ্যভাষা কখনই ছিল না ; ইহাকে বলা যায় কথ্যভাষাকে আশ্রয় করিয়া সংস্কৃতের আদর্শে গঠিত একপ্রকার সাধু-ভাষা। এই ভাষা মোটামুটি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী বা তাহার কিছু পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সকল সংস্কৃত নাটক রচয়িতা প্রায় একই ভাবে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। অথচ এই বারশত বছরের মধ্যে কথ্যভাষায় একাধিক প্রবল পরিবর্তনের বন্যা বহিয়া গিয়াছে ; ভাষা মধ্য স্তর হইতে নামিয়া নব্য স্তরে দুই তিন ধাপ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।"[১]

মহারাষ্ট্রী-প্রাকৃত আধুনিক মারাঠী ভাষারই পূর্ব-পুরুষ। মহারাষ্ট্রী অনেকটা বৈদিক ভাষার অনুগত। প্রাকৃত-ব্যাকরণ রচয়িতারা মহারাষ্ট্রীকেই মূল প্রাকৃত ধরিয়া তাহার আদর্শে অন্যান্য প্রাকৃতের লক্ষণ বিচার করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকে যে সকল প্রাকৃত শ্লোক দেখা যায়, তাহা প্রায় সবই মহারাষ্ট্রীতে। গাথাসপ্তশতী, সেতুবন্ধ (বা রাবণবধ), গৌড়বধ প্রভৃতি মহারাষ্ট্রী-প্রাকৃতে লিখিত।

শৌরসেনী আদিতে শূরসেন (অর্থাৎ মথুরা) অঞ্চলের ভাষা ছিল। মহারাষ্ট্রী যেমন অনেকটা বৈদিক ভাষার অনুগত, শৌরসেনী তেমনি সংস্কৃত অনুগামী ছিল। শৌরসেনীই প্রাকৃত ভাষা সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী

১। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯৪

প্রসিদ্ধ। আর ইহাই হিন্দুস্থানী (হিন্দুস্তানী) বা পশ্চিমা-হিন্দীর পূর্ব-পুরুষ। হিন্দুস্তানীরই সগোত্র মথুরা অঞ্চলের ব্রজভাষা বা ব্রজভাখা। সংস্কৃত নাটকে উচ্চবংশীয় স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ শৌরসেনী প্রাকৃতে কথা বলিতেছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।

মাগধী-প্রাকৃত মগধ অঞ্চলের ভাষা। সংস্কৃত নাটকে মাগধী-প্রাকৃত নিতান্ত ছোটলোকের ভাষা। আর শৌরসেনী ও মাগধী উভয়ের প্রভাবে অর্ধ-মাগধী-প্রাকৃতের উদ্ভব হয়। অর্ধ-মাগধী শুধু জৈন শাস্ত্রগ্রন্থেই পাওয়া যায়। আবার, কোন কোন জৈন-সম্প্রদায় মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী প্রাকৃতেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে অর্ধ-মাগধীর প্রভাব এত বেশী যে ইহাদের শুধু শৌরসেনী বা শুদ্ধ মহারাষ্ট্রী না বলিয়া জৈন শৌরসেনী বা জৈন মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতও অভিহিত করা যাইতে পারে।

মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার অর্বাচীন রূপের নাম অপভ্রংশ। সকল প্রাদেশিক প্রাকৃতেরই নিশ্চয়ই অপভ্রংশ স্তরও ছিল, কিন্তু শৌরসেনী ছাড়া আর কোন অপভ্রংশেরই নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ শৌরসেনী অপভ্রংশের একটা বিশেষ সাহিত্যিক মর্যাদা ছিল বলিয়াই ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'অদ্দহমান' (অর্থাৎ আব্দুর-রহমান) নামে পরিচিত পশ্চিম ভারতের একজন মুসলমান কবি 'সংনেহয়-রাসয়' (সংস্নেহক বা সংদেশক-রাসক) নামে একটি কাব্য এই অপভ্রংশ ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেও শৌরসেনী অপভ্রংশের লোকপ্রিয়তার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই মর্যাদার উপর নির্ভর করিয়াই অপভ্রংশ-যুগের বহুকাল পরেও ইহার একটা বিকৃত রূপ, যথা 'অবহট্‌ঠ' (অর্থাৎ অপভ্রষ্ঠ) সমগ্র উত্তর-পথের একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক রূপে প্রচলিত ছিল। আমাদের মৈথিল কবি বিদ্যাপতি, পদাবলী ছাড়াও তাঁহার দুইখানি বই—কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা—এই 'অবহট্‌ঠ' ভাষায়ই লিখিয়াছিলেন। এই বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ কবি।

ইন্দো-ইউরোপীয় যুগ হইতে আধুনিক আর্যযুগ পর্যন্ত ধারাবাহিক বিবর্তনের বিশিষ্ট ক্রম নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রাচীন ভাষা সমূহের মধ্যে পরস্পর যে শব্দ-সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহাই নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বৈদিক ও সংস্কৃত, পিতৃ; প্রাচীন পারসিক, পিতর্ (তুলনীয় ফারসী পিদর্—উর্দুতেও ইহার ব্যবহার আছে।); গ্রীক ও লাতীন্, পাতের্

(pater); টিউটনিক বা জারমনীয়, ফদর্ (তুলনীয় ইংরেজী ফাদার্ father)। সং, দশ ; আবেস্তীয়, দস (ফারসী ও উর্দু, দহ্ ; হিন্দী ও উর্দু, দস্ ; বাঙ্‌লা দশ্) ; গ্রীক, দেকা (deka) ; লাতীন্, দেকেম্ (decem) ; লিথুয়ানিয়া, দেশিম্‌ৎ (deszimt) ; গথিক (টিউটনিক), তেখুন (t..ihun)—তুলনীয় ইং, টেন্ (ten)।

সং, অস্মি ; পারসীক, অহমি (তুলনীয় ফারসী, অম্ বা হস্তম্), বাং হই, আর উর্দু বা হিন্দী হুঁ ; গ্রীক, এম্মি (emmi) ; লাতীন্, সুম্ (sum) ; আর্মেনিয়ান্, এম্ (em) ; লিথ্, এস্‌মি (esmi) ; শ্লাভ, ইয়েস্‌মি ; গথ, ইম্ (তুলনীয় ইং এম্ বা অ্যাম্ (am) ।

আর্যভাষার নিজস্ব বিভিন্ন স্তরের শব্দ-সাদৃশ্যও নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রাচীন, নৃত্য ; মধ্য, নচ্চ ; আধুনিক , নাচ্। প্রাঃ মধ্য, ম মজ্‌ঝ, আঃ মাঝ্ ; প্রা অন্ত, ম অজ্জ, আধুনিক, সিন্ধী অজু, পঞ্জাবী অজ্জ্ ও অন্যত্র আজ্ ; প্রা দধি (ক্লীব)[১], আ—পঞ্জাবী দহী বা দহীঁ (স্ত্রী), সিন্ধী ডহী (স্ত্রী), হিন্দী বা উর্দু দহী (পুং), মারাঠী ও গুজরাটী দহীঁ (ক্লী)।

ক্রিয়ারূপেও সংস্কৃত ও আধুনিক আর্যভাষার মধ্যে তুলনামূলক সামঞ্জস্য অনুধাবনযোগ্য।

সংস্কৃত কর্য্যতে (=ক্রিয়তে), আধুনিক—প্রাঃ বাঙ্‌লা বা হিন্দী করিঅই >করিয়ে, প্রাঃ মারাঠী করিজে. সিন্ধী করীজে।

সংস্কৃত গত+অস্, ভূ, স্থা ; আধুনিক—হিন্দী ও উর্দু গিয়া হৈ, গয়া থা ; বাঙ্‌লা গিয়াছে, গিয়াছিল।

সংস্কৃত জানন্ত+অস্, ভূ, স্থা ; হিন্দী বা উর্দু জান্‌তা হৈ, জান্‌তা থা ; পঞ্জাবী জান্‌তা হৈ, জান্‌দা সী ; বাঙ্‌লা জানিতেছে, জানিতেছিল।

প্রাচীন অনুসর্গই সাধারণতঃ আধুনিক আর্যভাষাসমূহে বিভক্তি রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

১। আধুনিক আর্যভাষায় পদান্ত স্বরধ্বনির বিকার হওয়া বা লোপ পাওয়াতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত যুগের তিন লিঙ্গভেদ দূরীভূত হইয়াছে। আধুনিক ভাষার মধ্যে কেবল গুজরাটী ও মারাঠী ভাষায় প্রাচীন ক্লীবলিঙ্গের অস্তিত্ব এখনো কিছু বর্ত্তমান আছে। অন্যান্য ভাষার পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ভেদ কেবল দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাও ঠিক সংস্কৃতানুযায়ী নহে। ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে বা দৃষ্টিভঙ্গির বিপর্যয়ে সংস্কৃতের বহু পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আধুনিক ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর লাভ করিয়াছে। উর্দু ও হিন্দী ইহাদের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন বাঙ্‌লায়ও পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ভেদ কিছু কিছু ছিল, কিন্তু আধুনিক বাঙ্‌লায় তাহা বহুদিন লোপ পাইয়াছে।

সংস্কৃত কৃত, প্রাকৃত কঅ; আধুনিক—বাঙ্‌লা বা উড়িয়ার চতুর্থী ও ষষ্ঠী বিভক্তি কে ও ক; হিন্দী কো এবং কা, কী বা কে।

সংস্কৃত বিভক্তি ক্রমে লোপ পাইতে পাইতে আধুনিক আর্যভাষায় প্রায় স্থানেই একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে, তবুও কিছুটা প্রভাব স্থানে স্থানে রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্‌লা, উড়িয়া, হিন্দী (পূর্বী ও পশ্চিমা) প্রভৃতি কয়েকটি ভাষায় সংস্কৃত তৃতীয়া বিভক্তির পদ কর্তৃকারকের বহুবচন হিসাবে (বাঙ্‌লায় একবচন হিসাবেও) ব্যবহৃত হইতেছে। যেমন, বাঙ্‌লা, লোকে (<লোকেন, লোকৈর্ভিঃ); উড়িয়া, পুরুষে (<পুরুষেভিঃ); পূর্বী হিন্দী, ঘোড়রে (<ঘোটকেভিঃ); ও পশ্চিমা হিন্দী, ঘোড়ে (>ঘোড়হি <ঘোটেভিঃ)।

(গ) বিভিন্ন নাম-পরিচিতি ও ইহাদের প্রকার-ভেদ

ফারসী অক্ষরে লিখিত হিন্দী বা পশ্চিমা-হিন্দী সাধারণভাবে উর্দু বা হিন্দুস্থানী বলিয়া পরিচিত হইলেও, ইহা পূর্ব যুগে অন্যান্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উর্দুভাষার একটি নাম রিখ্‌তা (রীখ্‌তহ বা জবান্‌-ই-রীখ্‌তহ)। এই 'পাঁচমিশালি'-ভাষাকে 'রীখ্‌ত' নামে অভিহিত করিয়া উর্দুভাষার পিতৃসমতুল্য ওয়ালী (বলী – ১৬৬৮-১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ) বলিয়াছেন,

ইয়া রীখ্‌তা ওয়ালী কা যাকর উসে সুনা দো।
রাখ্‌তা হায় ফিকরে-রৌশন যো আনোয়ারী কে মানান্দ্‌॥

یہ ریختہ ولی کا جاکر اسے سنا دو—
رختا ہے فکر روشن جو انوری کے مانند

অর্থাৎ, ওয়ালীর এই রীখ্‌তা কবিতা তাঁহাকে শুনাইয়া দাও, যিনি (প্রসিদ্ধ ফারসী কবি) আনোয়ারীর ন্যায় দীপ্তিময় চিন্তাধারায় ভাবান্বিত।

প্রধানতঃ হিন্দী ও ফারসী এবং অন্যান্য বিদেশীয় ভাষার সহযোগে এই মিশ্রিত ভাষার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়াই বস্তুতঃ উর্দুর এইরূপ নামকরণ হয়।

আরবী অক্ষরে লিখিত ও আরবী-ফারসীর শব্দ-ভাণ্ডার দ্বারা সম্বর্ধিত উর্দুভাষা, বা নাগরী অক্ষরে লিখিত ও সংস্কৃত শব্দাধিক্য-যুক্ত হিন্দীভাষা বলিতে সাধারণতঃ আমরা শিষ্ট-উর্দু (বা হিন্দী) অথবা কথ্য-লিখিত উর্দু (বা হিন্দী) ভাষাই বুঝিয়া থাকি—যে বিশিষ্ট রূপটি সারা ভারতে (অধুনা খণ্ডিত হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে) সাধারণভাবে বোধগম্য। অন্যথা মাতৃভাষা-রূপে হিন্দী তথা পশ্চিমা-হিন্দী পশ্চিম যুক্ত প্রদেশ, রাজপুতনা ও পূর্ব-পঞ্জাবেই মাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শিষ্ট-হিন্দী বা উর্দুকে 'খড়ী-বোলী'ও বলা হইয়া থাকে। 'খড়ী-বোলী' (বাঙ্‌লা খাড়া অর্থাৎ দণ্ডায়মান) অর্থ চলতি-ভাষা, অর্থাৎ আপামর সকলের জন্য শিষ্ট-কথ্য ভাষা। আর ইহার বিপরীত 'পড়ী-বোলী' অর্থাৎ পড়ন্ত- বা অচল-ভাষা অর্থে স্থানীয় উপভাষান্তর্ভুক্ত: ব্রজভাষা বা আউধীকে গ্রহণ করা হয়। শিষ্ট-চলতি ভাষা অর্থে আমরা এই বুঝি যে, ইহা তাহার শাব্দিক ও ব্যাকরণিক ব্যবহারে খাঁটি 'তদ্ভব' হিন্দী শব্দ, ক্রিয়ারূপ ও বিভক্তি গ্রহণ করিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা কখনই হয় না।

উর্দু খড়ী-বোলীতে যেমন অনেক ফারসী শব্দ ও স্থানে স্থানে ফারসী প্রত্যয়াদির ব্যবহার হইয়াছে, তেমনি হিন্দী খড়ী-বোলীতে সংস্কৃত শব্দ ও প্রত্যয়াদির আগমন দেখিতে পাই। ঠিক 'খড়ী-বোলী'র অন্য একটি নাম হইয়াছে 'ঠেঠ্-হিন্দী'। যে সকল সংস্কৃত ও ফারসী শব্দ হিন্দী ও উর্দু উভয় ভাষায়ই বিশেষ প্রচলিত আছে, এইরূপ শব্দাদির প্রয়োগে হিন্দী বা উর্দু ভাষাকে অনেক সময় হিন্দুস্থানী (বা হিন্দুস্তানী) বলা হইয়া থাকে। ইহাদের নাগরী অক্ষরে লিখিত রূপকে 'হিন্দুস্থানী' ও ফারসী অক্ষর-বিশিষ্ট ভাষাকে 'হিন্দুস্তানী' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

মূলতঃ পশ্চিমা-হিন্দীকে আশ্রয় করিয়া গঠিত এই শিষ্ট হিন্দী বা উর্দুর একটি বিশিষ্ট ব্যাকরণ-পদ্ধতি আছে। কিন্তু এই ব্যাকরণ রীতিকেই যখন সারাভারত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে, তখন কেবল শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্যের পক্ষে সকল ব্যাকরণ-পদ্ধতিকে তাহাদের অজ্ঞানতাবশতঃ সম্পূর্ণ-ভাবে মানিয়া চলা সম্ভব হয় না। তবু তাহারা যখন এই শিষ্ট উর্দু বা হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে, তাহাদের কথ্য ভাষায় অনেক ব্যাকরণ-অশুদ্ধি থাকিয়া যায়। এই অশুদ্ধি-যুক্ত ভাষাকে সাধারণতঃ বলা হয় 'বাজার হিন্দী' বা 'বাজার হিন্দুস্তানী'। হিন্দুরা কখনও কখনও ইহাকে 'লঘু হিন্দী'ও বলিয়া থাকে।

আমরা দেখিতে পাই, উর্দু ভাষার অভ্যুত্থানে দ্রাবিড় ভাষাভাষী দাক্ষিণাত্যও কম সাহায্য করে নাই। ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলিম আধিপত্যে স্থাপিত বহমনী রাজ্য ও পরবর্তীকালে ইহার পাঁচটি খণ্ডিত রাষ্ট্র যথাক্রমে বেরার, বিদর, গোলকোণ্ডা, আহমদনগর ও বিজাপুর উত্তর-ভারতীয় মুসলিম কর্তৃক শাসিত হয়। আর বিশেষ করিয়া গোলকোণ্ডা ও বিজাপুরে উত্তর-ভারতীয় উর্দু ভাষাই শিষ্ট কথ্য ভাষারূপে গণ্য হয়। ১৭শ শতাব্দীতে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে যখন মুঘলসৈন্য দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করে, তখন তাহাদের ভাষা জবানে-উর্দুয়ে-মুয়াল্লা (বা শক্তিশালী রাজসৈন্যদের ভাষা) বা সংক্ষেপে উর্দু ভাষা বলিয়া ইতিপূর্বেই পরিচয় লাভ করিয়াছে। আর এই ভাষা হইতে পার্থক্য করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যের মুসলমানদের ভাষা 'দকনী' ভাষা বলিয়া পরিচিত হয়। 'দকনী-উর্দু'র সহিত পার্থক্য প্রদর্শনার্থে উত্তর-ভারতীয় ভাষাকে 'শিমালী (বা উত্তর-দেশীয়)-উর্দু' বা 'দেহলবী'-উর্দু'ও বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে উর্দু ভাষার উদ্ভব যদিও ১১-১২শ শতাব্দীতেই হইয়াছে,

তথাপি ইহা তাহার অভ্যুত্থানসময়ে উর্দু বলিয়া কথিত হয় নাই; এবং মুসলমানদের লিখিত আরবী-ফারসীযুক্ত ভাষাকেই সেই যুগে হিন্দী বা 'হিন্দুয়ী' ভাষা বলা হইত। ইহা অনেক পরবর্তীকালে উর্দুভাষারূপে পরিচয় লাভ করে।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে উর্দুভাষার পূর্ব-নাম ছিল রীখ্‌তা ও ওয়ালীকে 'বাবায়ে-রীখ্‌ত' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকালে ইহার রাজধানী দিল্লীর অধঃপাতিত যুগ-সন্ধিক্ষণে এই রীখ্‌তা-ভাষাও বিকৃত হইয়া যায়; এবং ইহাতে অনেক কুরুচিসম্পন্ন ভাবধারার আমদানী হয়। এই নূতন ভাবধারার ধারক হিসাবে উর্দুভাষার আর একটি নামকরণ হয় 'রীখ্‌তী'-ভাষা। এই রীখ্‌তী-ভাষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জুরাৎ, ইন্‌শা ও রঙ্গীন্। তাঁহারা তাঁহাদের কবিতায় মেয়েলী ছন্দে ও মেয়েলী ঢঙ্গে কবিতা লেখা পছন্দ করিতেন। তাই রীখ্‌তা যেন পুরুষের ভাষা, আর রীখ্‌তী স্ত্রীলোকের। তাঁহাদের পূর্বেও কেহ কেহ রীখ্‌তী ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন, যেমন ওয়ালীর সমসাময়িক হাশিমী বিজাপুরী ও মহম্মদ কাদিরী। কিন্তু সাদৎ ইয়ার্ খান্ রঙ্গীন্ ও তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ইন্‌শা-ই বস্তুতঃ এই ভাষাকে সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। রীখ্‌তী ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বোধ হয় ইয়ার আলী জান সাহেব। এই ধারা পরবর্তীযুগে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। বস্তুতঃ উর্দু কবিতার একটি বিশিষ্টরূপ ছাড়া এই রীখ্‌তী কবিতার সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নাই।

১৮শ শতাব্দীতে পূর্বী-হিন্দীর কেন্দ্রস্থল লক্ষ্ণৌ শহরে একটি নূতন মুসলিম-রাষ্ট্র স্থাপিত হয় এবং এই রাষ্ট্রে নূতন উদ্যমে উর্দুভাষার চর্চা হইতে থাকে। এই নূতন উর্দুভাষা পূর্বী-হিন্দীর কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হইলেও, দিল্লীর বা দেহলবী উর্দুর প্রভাবেই ইহা শক্তিশালী হইয়া গঠিত হয়। এই 'লখ্‌নবী'-উর্দু ক্রমে এতদূর প্রভাবশালী হইয়া উঠে যে 'হিন্দুস্তানী' বলিতে অনেকটা এই স্থানে নূতন ভাবে গঠিত ও বিকশিত উর্দুকেই বুঝাইয়া থাকে।

আবার, ১৯শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরাজগণ যখন ভারত শাসন আরম্ভ করিলেন, তাঁহারাও এই শিষ্ট-হিন্দী—বরং এই শিষ্ট-উর্দুকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিলেন। এবং ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে বিশেষ করিয়া এই নূতন উর্দুভাষা শিক্ষার প্রচলন করিয়া মুসলমানী-হিন্দীর প্রচার ও চর্চার সুবর্ণ সুযোগ করিয়া দিলেন।

১১-১২শ শতাব্দীতে পশ্চিমা-হিন্দী হইতে উদ্ভূত উর্দুভাষা, ১৩শ শতাব্দী

ও তাহার পরবর্তী কিছুকাল পর্য্যন্ত পঞ্জাবী ভাষা হইতে কতকটা প্রভাবান্বিত হইয়া, কিন্তু সগোত্র ব্রজ-ভাখা ও অন্যান্য নিকটবর্তী উপভাষাসমূহকে উপেক্ষা করিয়া ১৬-১৭শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে তাহার প্রভাব বিস্তার করে। এই 'দখিনী'-উর্দু আবার 'দেহলবী'-উর্দুর সগোত্র ব্রজভাখা ও অন্যান্য উপভাষা হইতে অনেকটা প্রভাবান্বিত হইয়া যায়। এই দিকে 'দেহলবী'-উর্দু লক্ষ্ণৌতে প্রভাব বিস্তার করে। বাঙলায়ও এই স্রোতই বহিয়া চলে। এইরূপে উর্দু তথা হিন্দুস্তানী ভাষা সারাভারতে ইহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এবং আমরা ইহার লিখন প্রণালীকে উপেক্ষা করিয়া বলিতে পারি যে ইহাই কেবল সারা ভারত, তথা হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের কথ্য শিষ্টভাষা হিসাবে স্থান পাইবার উপযুক্ত।

উর্দুভাষা পশ্চিমা হিন্দী হইতে উদ্ভূত হইলেও, ইহার পুষ্টি ও বিকাশ পঞ্জাব হইতেই সুরু হয়। কারণ প্রথম যুগে মুসলমান অধিবাসিগণ পঞ্জাবেই বিশেষ করিয়া বসবাস করিতেন। সেই কারণেই উর্দুভাষা পশ্চিমা হিন্দীর সগোত্র ব্রজভাখা ও অন্যান্য উপভাষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হইয়া, বরং পূর্ব-পঞ্জাবী উপভাষায় প্রভাবান্বিত হইয়াছে। কিন্তু উর্দুভাষার সম্পূর্ণ বিকাশ দো-আব, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে হয়। শ-দেড়শ বৎসর দিল্লীতে পুষ্টিলাভ করিয়া উর্দুভাষা-স্রোত গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য অভিমুখী প্রবাহিত হয়। কিন্তু এই দক্ষিণা-অভিমুখী শিমালী বা উত্তর দেশীয় স্রোত খড়ী-বোলীকে উপেক্ষা করিয়া পড়ী-বোলীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া যাত্রা সুরু করে। ইহার মূল কারণ 'খড়ী-বোলী' ছিল তখনকার রাজা বা রাজন্যবর্গের প্রভাবে পুষ্ট শিষ্ট কথ্য ভাষা। আর 'পড়ী-বোলী' হিন্দুদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত স্থানীয় উপভাষাসমূহ। সেই সময়ে দিল্লীর হিন্দুস্তানী ভাষা বিদেশ হইতে আগত মুসলমান কর্তৃক ব্যবহৃত হইত। তাঁহাদের পক্ষে স্থানীয় কথিত ভাষাকে আয়ত্ত করা কখনই ততটা সম্ভব ছিল না, যতটা হিন্দুস্তানী শিষ্ট কথ্য-ভাষাকে শিক্ষা করা সহজ ছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ভাষাবিদগণ যদিও উত্তর দেশীয় মুসলমান রাজন্যবর্গই ছিলেন, তাহা হইলেও তাঁহারা উত্তর-দেশেই জন্মগ্রহণ ও বসবাস করিয়া ইতিমধ্যে স্থানীয় উপভাষা-সমূহ কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তা'-ছাড়া আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতৃগণ নানাভাবে হিন্দুদের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন।

হিন্দুস্তানী ভাষা দিল্লী ও তদঞ্চলে যতটা পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা

হইতে অনেক বেশী সমৃদ্ধির সুযোগ দাক্ষিণাত্যে লাভ করিয়াছে। ডক্টর কাদেরী তাঁহার হিন্দুস্তানী লিসানিয়াতে ইহার নিম্নলিখিত কারণ দর্শাইয়াছেন। উত্তর-দেশে একই আর্যভাষার নানা উপভাষা কথিত হইত, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে আর্যভাষা দ্রাবিড়-ভাষাভাষীদের নিকট একেবারে অজানা ছিল। সেই কারণেই উত্তর ভারতে একটি বিশেষ শিষ্ট কথ্য ভাষা পুষ্টিলাভ করিবার যতটুকু সুযোগ পাইবে, তাহা হইতে অনেক বেশী যে দাক্ষিণাত্যে লাভ করিতে পারিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। দাক্ষিণাত্যে ফারসী, তুর্কী প্রভৃতি বিদেশী ভাষাভাষী লোক বিশেষ ছিল না—অধিকন্তু রাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপারে তাহাদের কোন হাতই ছিল না। কিন্তু উত্তর-ভারতে বিদেশীয়দের আক্রমণ একটির পর আর একটি ক্রমাগত চলিয়াই আসিতেছিল। কুতুবুদ্দীন আইবাক (কুত্‌ব্‌ বু দ্দীন্‌ অঈবক্‌) হইতে বাহাদুর শাহ জফর (বহাদুর্‌ শাহ্‌ জফর্‌)-এর রাজত্বকাল (১২০২-১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত একে একে বিদেশীয়গণই তথায় রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ভাষা ছিল জনসাধারণের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গ উত্তরদেশীয় শাসকবর্গের ন্যায় নূতন আগত তুর্কী বা ঈরানী ছিলেন না। সেইজন্য নিজেদের হিন্দুস্তানীর এক বিশিষ্ট কথ্য ভাষার চর্চা ও ইহাতে মনোনিবেশ করিতেই বিশেষ আনন্দানুভব করিতেন। বাহমণি (বহমনী) রাষ্ট্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হসন (ঃহসন্‌) একজন হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘুলাম[১] ছিলেন। তাঁহার হিন্দুস্তানী ভাষা না জানা যেমন অসম্ভব, তেমনি তৈমুরীয়দের হিন্দুস্তানী না জানাই বিশেষ সম্ভব।

বাহমণি রাজ্যের অধঃপতনের যুগে তথায় কয়েকটি পৃথক্‌ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়—ইহাদের প্রতিষ্ঠাতৃগণও হিন্দুস্তানী ভাষায় অজানা ছিলেন না। কারণ তাঁহারা ছোটবেলা হইতেই বহমনী রাষ্ট্রের অধীনেই পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছেন। আহমদনগর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা তো একজন খাঁটি ভারতীয় মুসলিম। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে তিনি কেনাড়ী ও হিন্দী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। আদিলশাহী বংশের প্রথম রাজ্ঞী মারাঠী শক্তিধর মুকুটরাও-এর কন্যা। তাঁহারই গর্ভজাত তিন কন্যা ও এক পুত্র। সেই একমাত্র পুত্র ইসমাইল আদিলশাহ (ইস্‌ম়্‌ঈল্‌ ’আদিল্‌ শাহ্‌) তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর বিজাপুর রাজ্যের বাদশাহ হন এবং তাঁহারই বংশধরগণ বিজাপুর রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে শাসন করিয়া গিয়াছেন।

১। মতান্তরে গঙ্গু নামক এক ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলেন।

মুকুটরাও-এর দৌহিত্রীগণও কোন না কোন দাক্ষিণাত্য রাষ্ট্রের সুলতানগণের সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা পুজীথানম্ ছাড়া আরো হিন্দুবংশীয় রাণী দাক্ষিণাত্য রাষ্ট্র-শাসনে প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন— তাঁহাদের মধ্যে রম্ভারাণী অন্যতম।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছাড়াও উত্তরভারতের সকল বাদশাই ফারসী বা অন্য কোন বিদেশীয় ভাষাভাষী ছিলেন। মহম্মদ্ তুঘলক (মুঃহম্মদ্ তুঘ্‌লক) হইতে আরম্ভ করিয়া মহম্মদ শাহ অবধি দিল্লীর কোন বাদশাহই হিন্দুস্তানীতে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। অন্যথা দক্ষিণ-ভারতের কয়েকজন বাদশাই, যথা কুতুবশাহী রাজগণের মধ্যে দ্বিতীয় ইব্রাহিম্, দ্বিতীয় আলী ও সিকন্দর প্রমুখ, এইরূপ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন যে তাঁহাদের অনেকেরই উর্দু সাহিত্য আজ পর্যন্তও সংরক্ষিত রহিয়াছে। আর উত্তর-ভারতে রাজন্যবর্গ কর্তৃক সাধারণতঃ ফারসী ভাষারই পৃষ্ঠপোষকতা হইয়াছে।

উত্তর-ভারতে ফারসী ভাষার প্রভাব ছিল বলিয়াই, প্রথম যুগে যদিও তথায় উর্দুর চর্চা বিশেষ হয় নাই, তাহা হইলেও পরবর্তী যুগে উর্দুভাষায় যে ফারসীর প্রভাব আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি, তাহার অন্যতম কারণ এই উত্তর-ভারতে ফারসীর বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা। মুসলিম যুগে ফারসী ছিল 'শাহী' বা 'দরবারী' ভাষা। রাজন্যবর্গ তথায় দেশী ভাষা অনেকটা উপেক্ষা করিয়াই চলিলেন। তাহার ফলে রাষ্ট্র-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণও (সাধারণভাবে সহরবাসী সকলেই) তাঁহাদের আলাপ-আলোচনায় ফারসী শব্দের প্রয়োগে বিশেষ আনন্দ বা গর্ব অনুভব করিতেন। ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে কবি চন্দ্ বর্দাঈ বিরচিত 'পৃথিরাজ রাসৌ' পর্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাইব তাহাতে ফারসী শব্দের কত আধিক্য রহিয়াছে। এইরূপে শাসিতদের সহিত শাসকবর্গ যতই পরিচিত হইতে লাগিলেন, ফারসী শব্দের ব্যবহারও দেশীয় ভাষায় ততই প্রাধান্য পাইতে লাগিল।

মুঘলযুগে সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে আবার আমরা দেখিতে পাই প্রধান রাজসচিব রাজা টোডরমল ঘোষণা করিলেন যে সকল হিন্দু রাজ-কর্মচারীকেই ফারসীভাষা ও মুসলমান রাজকর্মচারীদিগকে হিন্দীভাষা অবশ্যই শিক্ষালাভ করিতে হইবে। ইহার ফলে ফারসীভাষার প্রচলন ক্রমেই আরো বর্ধিত হয়। তা'ছাড়া সম্রাট্ আকবর নিজেও যে একজন হিন্দু-মুসলিম মিলিত রাষ্ট্র-সংগঠনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা ঐতিহাসিকগণই একবাক্যে

স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, সম্রাট আকবর নিজে ফারসীর সহিত উর্দু-কাব্যেরও চর্চা করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের ন্যায় গুজরাটেও দিল্লীর তুলনায় ফারসী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সেই কারণে 'দখ্নী'-উর্দু ও গুজরাটি উর্দুকে অনেকটা একরকম মনে করিলেও ইহাদের মধ্যে আবার কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে। যথা,

(১) আধুনিক আর্যভাষাদির ন্যায় প্রাচীন আর্যভাষায় কারকবাচী অনুসর্গের বিশেষ প্রয়োগ নাই ; কিন্তু গুজরাটে এই প্রাচীন বিশিষ্টতা এখনও অনেকটা বজায় আছে। উর্দু—লয়লা কে মুঁহ মেঁ বাৎ—স্থলে গুজরাটে ব্যবহৃত হইবে—লয়লা মুঁহ বাৎ (অর্থাৎ লায়লার মুখের বাক্য)।

(২) আবার, গুজরাটে এমন কয়েকটি কারকবাচী অনুসর্গ পাওয়া যায়, যাহার ব্যবহার 'দকন্'-ভাষায় একেবারেই নাই, অথবা কতকটা পৃথক-রূপে তথায় ব্যবহার হয়। যেমন, উর্দু মেঁ (অথবা ইহার প্রাচীন রূপ 'মনে') স্থলে, গুজরাটি উর্দুতে মহেঁ, মাহঁ।

(৩) গুজরাটি উর্দু ও 'দকনী' উভয় ভাষায়ই 'সে'-র প্রাচীন রূপ সুঁ, থীঁ, থে, স্তে প্রভৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু গুজরাটিতে ব্যবহৃত একটি বিশেষরূপ 'সুয়ে'-র প্রয়োগ দকনীতে নাই। যেমন, পহলে সে-র স্থলে গুজরাটিতে পহলুঁ সুয়ে (অর্থাৎ প্রথম হইতে)।

(৪) গুজরাটি হিন্দুস্তানীতে যে কোন শব্দের (এবং বিশেষ করিয়া ক্রিয়াবাচক শব্দের) শেষে একটি অনুনাসিক উচ্চারণ হয়, কিন্তু এইরূপ ব্যবহার উর্দুতে নাই। যথা, মেরা কহ্নান্ বা খূবীঁ, কিন্তু উর্দুতে এইরূপ স্থলে ব্যবহৃত হইবে—মেরা কহ্না বা খূবী (অর্থাৎ আমার কথা বা সুজনতা)।

(৫) কয়েকটি বিশেষ শব্দ পাওয়া যায়, যাহার একই রূপ 'শিমালী'-উর্দু বা 'দকনী'-তে দৃষ্ট হয়, কিন্তু গুজরাটি উর্দুতে ইহাদের রূপ ভিন্ন। যেমন, উর্দুতে কল, কিন্তু গুজরাটী কাল্ (অর্থাৎ কাল বা কলা) ; উর্দুতে থক্না, কিন্তু গুজরাটিতে থাক্না (অর্থাৎ ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত হওয়া) ; উর্দু কুত্তা, কিন্তু গুজরাটিতে কোত্তা (অর্থাৎ কুকুর)।

(৬) কয়েকটি উর্দু বা হিন্দী শব্দ গুজরাটিতে আশ্চর্যভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যেমন, সব্ স্থলে সওয়ে (বা সবে অর্থাৎ সব বা সকল) ; দুনোঁ স্থলে দোহোন্ (অর্থাৎ উভয়ই) ; আধা স্থলে আদ্ (অর্থাৎ অর্ধ বা

আধ); কুফ্‌ল্‌ স্থলে কুল্‌ফ (বাঙলায় কুলুপ বা তালা); এবং পলীদ্‌ স্থলে পলীৎ (অর্থাৎ নোংরা বা অপবিত্র)।

দকনী ও গুজরাটীতে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহা হইতে অনেক বেশী পার্থক্য দকনী ও শিমালী উর্দু'র মধ্যে রহিয়াছে। দ্রাবিড় ভাষাভাষী স্থান সমূহে 'দকনী' ভাষার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ইহা স্বাভাবিক যে দ্রাবিড় প্রভাব দকনী ভাষায় কিছুটা থাকিবেই। অনেক দ্রাবিড় শব্দ উর্দু-রূপ পরিগ্রহ করিয়া 'দকনী' ভাষায় এমনভাবে ঢুকিয়া রহিয়াছে যে বাহ্যতঃ অনেক সময় ইহাদের দ্রাবিড় শব্দ বলিয়াই মনে হয় না। তা'ছাড়া 'দকনী' ভাষায় এমন একটি বিশেষ স্বরবর্ণ পাওয়া যায়, যাহার অস্তিত্ব হিন্দী বা উর্দু-র মধ্যে কখনই ছিল না, কিন্তু দ্রাবিড় ভাষায় রহিয়াছে; যেমন, দকনী ভাষায় ব্যবহৃত পুট্টা (অর্থাৎ ছোকরা বা ছেলে), ঢুবা (অর্থাৎ মোটা), ডুপ্পা (অর্থাৎ টুপী) প্রভৃতির উ-কার বস্তুতঃ উর্দু-র হ্রস্ব-উকার (বা পেশ) বা দীর্ঘ-উকার (বা ওআউ-এ-ম' অরূফ্‌) নহে—ইহা দ্রাবিড় উচ্চারণ হইতে আগত উকার ও উকারের মধ্যবর্তী একটি উচ্চারণ, যাহার স্বরূপ হিন্দী বা উর্দুতে নাই।

দকনীতে আর একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, যদি কোন শব্দে দুইটি দীর্ঘ-স্বর ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে প্রথমটির উচ্চারণ হ্রস্ব হয়। যেমন, আদমী স্থলে অদমী, আস্‌মান্‌ স্থলে অস্‌মান সুঙ্‌ঘ্‌না স্থলে সুঙ্‌ঘ্‌না ইত্যাদি। আবার আরবী 'ক' ق দিল্লীবাসী মুসলিম পণ্ডিতদের মুখে অনেকটা যথাযথ উচ্চারিত হইলেও, ইহার উচ্চারণ সাধারণভাবে ভারতীয়দের সঠিক জানা নাই। তাই পঞ্জাবে ইহা অনেকটা 'ক'-র মত উচ্চারিত হয়। আর দকনীতে 'খ'-র ন্যায়।

উর্দু বা হিন্দীতে সাধারণতঃ দেখিতে পাই মূল শব্দের প্রথমে উচ্চারিত দন্ত্যবর্ণ ও মধ্যে মূর্ধন্যবর্ণ উভয়ই মূর্ধন্য উচ্চারিত হয়, কিন্তু দকনীতে সেই প্রথম দন্ত্য উচ্চারণটি কখনই মূর্ধন্য হয় না। যেমন, টাট, টুকড়া, টুট্‌না, ঠণ্ডা, ডাঁট্‌ প্রভৃতি দকনীতে যথাক্রমে তাট্‌, তুকড়া, তুট্‌না, থণ্ডা ও দাঁট্‌ রূপে উচ্চারিত হয়।

দকনী ভাষায় আর একটি প্রাচীন বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রাকৃতে যেখানে মধ্যবর্তী উচ্চারণে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-বাহুল্য রহিয়াছে, সেই সকল স্থানে হিন্দী ও অন্যান্য আধুনিক আর্যভাষায় দ্বিত্ব উচ্চারণটি এককে রূপান্তর লাভ করে; কিন্তু দকনীতে সেই দ্বিত্ব-উচ্চারণ এখনও বজায় আছে। যেমন, হিন্দী হাথী

(সং হস্তী >হত্থী), দক্‌নী হথ্‌তী ; হিন্দী চুণা (সং চূর্ণ >চুনন্‌), দক্‌নীতে চুন্‌না ইত্যাদি।

আবার, প্রাকৃতের খাঁটি ব্যঞ্জন 'ধ' দক্‌নীতে 'দ'-তে রূপান্তর লাভ করিয়াছে, যদিও উর্দু এবং হিন্দীতে প্রাকৃতানুযায়ী 'ধ'-ই ব্যবহৃত হয়। যেমন, দক্‌নী সম্‌দী, বান্দ্‌না ও সাদু, যথাক্রমে উর্দু সম্‌ধী (সম্বন্ধী হইতে), বান্ধ্‌না (বন্ধন) এবং সাধু-র স্থলে ব্যবহৃত হইতেছে।

এইরূপভাবে দক্‌নীতে ঢ় স্থলে ড়-র ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। যেমন, বড়াই>বঢ়াই এবং সীড়ী>সীঢ়ী ইত্যাদি।

শব্দের উচ্চারণ ছাড়া ক্রিয়ারূপেও কিছুটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যদিও আধুনিক শিষ্ট-দক্‌নী ব্যাকরণ-সংক্রান্ত ব্যাপারে সকল সময়েই উত্তর-দেশীয় উর্দুকেই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহা হইলেও দক্‌নী-উর্দুর উপভাষা-সমূহ পর্যবেক্ষণ করিলে ইহার কতকটা ব্যতিক্রম অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়। দক্‌নীতে ক্রিয়ারূপ কর্তানুযায়ী হয়, কিন্তু শিমালী-উর্দুতে কর্মানুযায়ী। যেমন, উর্দু লড়্‌কে নে রোটী খায়ী, কিন্তু দক্‌নীতে লড়কা রোটী খায়া (অর্থাৎ বালক রুটি খাইল)। অথবা, লড়কোঁ নে রোটী খায়ী, কিন্তু দক্‌নীতে লড়কে রোটী খায়ে (অর্থাৎ বালকেরা রুটি খাইয়াছিল)।

দক্‌নী-উর্দুতে একবচন বহুবচনে রূপান্তর করিতে হইলে পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে আন্‌ ব্যবহার হয়, কিন্তু শিমালী উর্দুতে এই স্থলে উভয় বচনে একই রূপ দৃষ্ট হয়। যেমন, ঢোল্‌ অচ্ছে হৈঁ, কিন্তু দক্‌নীতে ঢোলান্‌ অচ্ছে হৈঁ (অর্থাৎ ঢোলগুলি ভাল)। অথবা, কয়ী মর্দ থে কিন্তু দক্‌নীতে কয়ী মর্দান্‌ থে (অর্থাৎ কয়েকজন মানুষ ছিল)। আবার, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বহুবচনে উর্দুতে ঈন্‌ প্রত্যয় ব্যবহার হয়, কিন্তু দকনীতে পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ উভয়বাচক শব্দেই একই প্রত্যয় দৃষ্ট হয়। যেমন, কিন্‌ কী কিতাবীন্‌ হৈঁ, কিন্তু দক্‌নীতে কিন্‌ কী কিতাবান্‌ হৈঁ (অর্থাৎ বইগুলি কাহাদের)। দক্‌নীতে সম্বন্ধযুক্ত শব্দের বহুবচনেও আন্‌ প্রত্যয়ের ব্যতিক্রম হয় না, কিন্তু উর্দুতে এই স্থলে ওন্‌ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন, ফুলোন্‌ কে হার, কিন্তু দক্‌নীতে ফুলান্‌ কে হার (অর্থাৎ ফুলের মালা)।

শিমালী উর্দু ও 'লখ্‌নোয়ী' উর্দু-র পার্থক্যও এখানে কিছু বলা আবশ্যক। লখ্‌নোতে উর্দু-চর্চার কেন্দ্রস্থল সৃষ্টি হওয়ার সূচনায় তথাকার বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিক দিল্লী হইতেই আগমন করিয়াছিলেন ; সেইজন্য প্রথম প্রথম লখ্‌নোয়ী উর্দু দিহ্‌লবী উর্দুকেই অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু

পরবর্তীকালে আসফুদ্দৌলা-র যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরে তথায় অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা দিহলবী উর্দু-র অনুকরণ পছন্দ না করিয়া স্থানীয় উপভাষার প্রভাবে নিজেদের স্বকীয় ধারানুযায়ী কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ইহা বিশেষ লক্ষণীয় যে লখ্‌নোয়ী উর্দুতে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার আরো বাড়িয়াই চলিতে থাকে।

'লখ্‌নোয়ী' ও 'দিহলবী' উর্দু'র ব্যাকরণ রীতিতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

(১) লখ্‌নোয়ীতে ক্রিয়ারূপ প্রত্যয় -না সন্নিকটবর্তী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রভাবে কখনই পরিবর্তিত হয় না। যেমন, রোটী খানা পড়েগী, কিন্তু দিহলবীতে হইবে রোটী খানী পড়েগী (অর্থাৎ রুটি খাইতে হইবে)।

(২) লখ্‌নোয়ী উর্দুতে সর্বনামের পরে -হী প্রত্যয় হীঁ রূপ ধারণ করে। যেমন, তুম্‌হীঁ, কিন্তু দিহলবীতে হইবে তুম্‌হী (অর্থাৎ তুমিই)। আবার, দিহলবীতে কারকবাচী উপসর্গ হী-র পূর্বে বসে, কিন্তু লখ্‌নোয়ীতে পরে। যেমন, তুম্‌হীন্ সে, কিন্তু দিহলবীতে তুম্ সে হী (অর্থাৎ তোমার হইতেই)।

(৩) দিহলবীতে 'তুম্' এবং 'আপ্'-এর জন্য পৃথক ক্রিয়ারূপের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না, কিন্তু লখ্‌নোয়ীতে সেইজন্য পৃথক পৃথক ক্রিয়ারূপ রহিয়াছে। যেমন, লখ্‌নোয়ীতে তুম্ বঈঠো, কিন্তু দিহলবীতে তুম্ বঈঠো বা তুম্ বঈঠিয়ে (অর্থাৎ তুমি বস বা আপনি বসেন)।

(৪) দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ এ এইরূপ কতকগুলি শব্দ রহিয়াছে, যাহা এক স্থানের উপভাষায় পুংলিঙ্গ, কিন্তু অন্যস্থানের উপভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন, সাঁস্ এবং ফিকর্ লখ্‌নোয়ীতে স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু দিহলবীতে ইহারা পুংলিঙ্গ। আবার, তর্জ্ (ত্বর্জ.) এবং ইল্‌তিমাস্ লখ্‌নোয়ীতে পুংলিঙ্গ, কিন্তু দিহলবীতে স্ত্রীলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়।

এখানে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, লখ্‌নোয়ী ভাষার প্রভাব ক্রমে এত প্রসার লাভ করে যে, যে লখ্‌নোয়ী উপভাষা প্রথমে দিহলবীকে অনুসরণ করিয়াছে, সেই লখ্‌নোয়ীকেই পরবর্তী যুগে দিল্লীবাসী অনুকরণ করিতে থাকে।

সর্বশেষে, উর্দু ও হিন্দীর অন্যান্য যে সকল পার্থক্য রহিয়াছে, তাহাও আমাদের জানা উচিত। উর্দু লিখন প্রণালী ও শব্দের শিষ্ট প্রয়োগে আরবী

ফারসীর প্রভাব সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। শব্দ-প্রভাব ব্যতীত ফারসী ব্যাকরণ রীতিও উর্দুকে কতকটা প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ফারসী তথা আরবী বহুবচন, সম্বন্ধ পদে ফারসী ইজাফৎ (=ইদ্বাফৎ) এবং কয়েকটি ফারসী-আরবী উপসর্গের (যথা, অজ., দর্ এবং ফী) ব্যবহার উর্দুতে বিশেষ লক্ষণীয়। তা'ছাড়া, উর্দু ও হিন্দীর বাক্যরীতিতে একটি পার্থক্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দীতে প্রথমে কর্তা, তারপর কর্ম ও সর্বশেষে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উর্দুতে এই বাক্য-রীতি সকল সময়ে একই ভাবে প্রযুক্ত হয় না—সময় সময় ক্রিয়াকে কর্তার পূর্বে, বা কর্মকে কর্তার পূর্বে ব্যবহার করিতেও দেখা যায়।

আবার, হিন্দী ও উর্দু কবিতায় একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে উর্দু তাহার ছন্দ প্রণালী ফারসী হইতে গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, প্রথমে যে সকল কবি উর্দু কবিতার চর্চা করিয়াছেন, তাঁহারা ফারসীতেই বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহাদের কেহ কেহ বিখ্যাত ফারসী কবি ছিলেন। সেইজন্য গদ্যেও বাক্য-রীতি ও অলঙ্কার-প্রয়োগে ফারসীর প্রভাব যথেষ্টই আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উর্দু সাহিত্যের আদি-যুগ

(ক) আদি-কবি সমস্যা ও আমীর খসরু

অধ্যাপক এইচ্, সি, রায় (Professor H. C. Roy) তাঁহার 'Beginnings of Hindustani Poetry in India' (অর্থাৎ ভারতে হিন্দুস্তানী কবিতার সূচনা) নামক প্রবন্ধে[১] লিখিয়াছেন, মাসুদ বিন সাদ (মস্'উদ্ বিন্ স্'অদ্)-ই বোধ হয় সর্বপ্রথম বিদেশীয় মুসলমান হিসাবে 'হিন্দী'তে কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি সুলতান মামুদের পৌত্র ইব্রাহীমের রাজদরবারে বাস করিতেন, এবং খুব সম্ভবতঃ ১১২৫ হইতে ১১৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পূর্ব-পুরুষদের আদিম নিবাস হমদন্। তথা হইতে দেশান্তরিত হইয়া তাঁহারা ঈরানে আসিয়া তাঁহাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন। ঈরান হইতে মাসুদ ভারতে আসেন ; এবং তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আমীর খস্রু কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি আরবী, ফারসী ও 'হিন্দী' কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই সকল 'হিন্দী' কবিতা বস্তুতঃ কি প্রকৃতির ছিল, তাহার সঠিক ধারণা আমাদের নাই।

বাবা ফরীদ্ নামে প্রসিদ্ধ শেখ ফরীদুদ্দীন্ গঞ্জ্ শকর্ একজন বিখ্যাত সুফী ছিলেন। তিনি ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে ভারতেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার নামেও কতকগুলি 'হিন্দী' ও পঞ্জাবী কবিতার উল্লেখ আছে। এই সকল 'হিন্দী' কবিতা অধ্যাপক বলদেব সিংহ শিখদের 'আদি-গ্রন্থ' নামক পুস্তকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই সকল হিন্দী বস্তুতঃ ১৩শ শতাব্দীর বাবা ফরিদেরই লিখিত ছিল কি না, সেই সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে।[২] তবে এইটুকু অনুমান করা যাইতে পারে

১ Proceedings of the 8th All India Oriental Conference, Mysore, 1935.

২ Dr. Suniti Kumar Chatterjee, Indo-Aryan and Hindi, p, 179.

যে, সেই সময়ে অনেক মুসলিম দরবেশ ও সাধু তাঁহাদের ফারসী গ্রন্থাদিতে 'হিন্দী' শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, এবং বাবা ফরীদ তাঁহাদের অন্যতম।

বস্তুতঃ আমীর খস্রুর পূর্বে মুসলমান কর্তৃক রচিত আরবী-ফারসী শব্দাদি ব্যবহৃত কোন প্রামাণিক হিন্দী তথা উর্দু কবিতার উল্লেখ নাই। তাঁহার পূর্বেও পরবর্তী সময়েও অনেক মুসলিম সুফী তাঁহাদের কাব্যে 'হিন্দী' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। এই সকলকেই উর্দু সাহিত্যের 'অঙ্কুর-উদ্গম' বলা যাইতে পারে। সৈয়দ শমসুল্লা (শম্সুল্লাহ) তাঁহার উর্দু য়ে-কদীম (উর্দ্-ই-কদীম্) অর্থাৎ প্রাচীন উর্দু সাহিত্যে মুসলিম সুফীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত এইরূপ অনেক 'হিন্দী' তথা উর্দু শব্দের বিবরণ দিয়াছেন। সেখানে প্রথমেই রহিয়াছে পূর্বে উল্লিখিত শেখ ফরীদুদ্দীন গঞ্জ শকরের হিন্দী শব্দের ব্যবহারযুক্ত কথোপকথন।

বাবা ফরীদের প্রধান শিষ্য বদরুদ্দীন (বদ্রুদ্দীন্ অল্-ইস্হক্) তাঁহার মলফুজাত (=মল্ফুজাৎ) বা কথোপকথনে বর্ণনা করিয়াছেন, বাবা ফরীদ তাঁহার এক বন্ধুকে ভাইয়া (=ভঈআ) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি আরো লিখিয়াছেন, একদিন তাঁহার কোন শিষ্য বাবা ফরীদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেহে জ্ঞানের অবস্থান কোথায়'? বাবা ফরীদ উত্তর করিলেন, 'বীচ্ সর্কে' (অর্থাৎ মাথার মধ্যে)।

কথিত আছে বাঙ্লায় অবস্থানকারী শেখ সিরাজুদ্দীন্ উসমান সুফী সম্রাট্ (সুলত্বানুল্- মুশায়েখ্) নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মৃত্যুকালে (১৩২৪ খৃঃ) দিল্লীতে আগমন করেন, এবং তাঁহার মুর্শিদ্ নসীরুদ্দীন্ চরাঘের আদেশ অনুযায়ী নিজামুদ্দীন্ আউলিয়ার উত্তরাধিকার পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু দিল্লী হইতে আবার বাঙ্লায় প্রত্যাবর্তনে দেরী করিতে থাকায়, তাঁহার গুরু কর্তৃক সিরাজুদ্দীন শীঘ্রই আবার তথায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। সিরাজুদ্দীন তাহাতে উত্তর করিলেন, বাঙ্লায় তো শেখ আলাউদ্দীন কল ('অলা-উদ্দীন্ ক্ল্)-ই আছেন এবং তাঁহার উপরেই বাঙ্লার ধর্মসম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের ভার অর্পিত রহিয়াছে। এই কথা শুনিয়া চরাঘ সাহেব কেবল হিন্দীতে বলিলেন, 'তুম্ উপর ওয়ে তলে' (অর্থাৎ তুমি উপরে ও সে নীচে)। এইরূপ বাক্যে সিরাজুদ্দীন বিশেষ লজ্জিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বাঙ্লায় রওনা হইয়া গেলেন।

খাজা বান্দা নওয়াজ মহম্মদ গীসু দরাজ (খ্বাজহ বন্দহ নৱাজ্ মুঃহম্মদ্

গীসূ দবাজ.) দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ সুফী। তিনি ১৪২২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। আবদুল্লা বিন আবদুর রহমান ('অবদুল্লাহ বিন্ 'অবদুর্-র়ঃহমান্) নামে তাঁহার এক শিষ্য ইশ্ক্-নামা ('ইশ্ক্-নামহ) নামক একটি সুফীতত্ত্বমূলক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তাহার গুরুর একটি উর্দু-উপদেশ উল্লিখিত হইয়াছে,

ভূকোঁ মূয়ে স্যুঁ খুদা কুছ্ আপড়্তীয়া হৈ।
খুদা কোঁ আ পড়্নেকী ইস্ৎ'অদাদ হো রহে॥

অর্থাৎ অনাহারে থাকিলেই কি খুদা অবতীর্ণ হইবেন? —ভগবান্‌কে পাইতে হইলে তার জন্য উপযুক্ততা অর্জন কর।

শেখ মহম্মদ গায়ুস গোয়ালিয়ারী (ঘউস্. গৱালিয়ারী)-র উত্তরাধিকারী ও মুল্লা ইমাদুদ্দীন তারিকী ('ইমাদু-দ্দীন্ ত্বারিকী)-র শিষ্য শেখ ওয়াজী-উদ্দীন আলবী (ৱজীহ্ উদ্দীন্ 'অলৱী) গুজরাটের একজন প্রসিদ্ধ সুফী দরবেশ ছিলেন। তিনি ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। কোরান (কুর্-আন্), হাদিস (ঃহদীস্.), ফিকা (ফিক্), কলাম্ ও মুসলিম-দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে নানারূপ ব্যাখ্যাপূর্ণ গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন, এবং তাঁহার গ্রন্থাদির নাম মৌলানা আজাদ বিলগরামীকৃত সবহাতুল্-মর্জান্ (সবঃহতুল্-মর্জান্) নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। এই মহান্ পুরুষের হিন্দী তথা উর্দু (কথোপকথন ছলে) উপদেশাবলী তাঁহার শিষ্যবর্গ একত্রিত করিয়া নামকরণ করিয়াছেন বহরুল-হকায়েক (বঃহরুল্-ঃহকায়িক্)। এই বহরুল-হকায়েক হইতে কতকগুলি উর্দু উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১) কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, মিয়াঁ শেখ ফজলুল্লা (=ফদ্‌লুল্লাহ) উপদেশ দেওয়া ত্যাগ করিয়াছেন। তাহার উত্তরে ওয়াজীউদ্দীন বলিলেন, যব্ তরক্কী পকড়েঙ্গে তব্ আপেঁ দর্স্ কহেঙ্গে (অর্থাৎ উন্নতিলাভ হইলে নিজেই উপদেশ দিবেন)।

(২) কোন শিষ্য অতি নম্রভাবে তাঁহার উপদেশ শুনিতে প্রার্থনা করিলে ওয়াজীউদ্দীন হিন্দীতে বলিলেন, ইন্ সেঁ আউর্ কিয়া খুব্ হৈ, ইস্ দুনিয়া মেঁ কি দিল্ খুদা স্যুঁ মশ্‌ঘূল্ হোয়ে (অর্থাৎ ইহা হইতে আর কি অধিক ভাল হইতে পারে, যখন এই পৃথিবীতে মন ভগবৎ-চিন্তায় লিপ্ত থাকে)?

(৩) জ্ঞানী ব্যক্তি কাহাকে বলে? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আরিফ্ উসে কহুয়েঁ যো খুদা স্যুঁ ভরিয়া হোয়ে (অর্থাৎ তাঁহাকেই জ্ঞানী ব্যক্তি বলা যায়, যিনি ভগবৎ-চিন্তায় ভরপূর)।

উর্দু ভাষার অভ্যুত্থানের যুগে হিন্দুরাও কম সাহায্য করেন নাই। হিন্দী সাহিত্যের অতি প্রাচীন নিদর্শন স্বরূপ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে কবি চন্দ্ বর্দাঈ লিখিত রাজ-রাসৌ। কবি চন্দ আজমীর রাজ পৃথ্বীরাজের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহারা উভয়েই একই সময়ে (১১৯৩ খৃষ্টাব্দে) প্রাণত্যাগ করেন। রাজ-রাসৌ বা পিরথীরাজ-রাসৌ-এ পৃথ্বীরাজের জীবন-কাহিনী ব্রজভাষায় কাব্যাকারে লিখিত। তাহা হইলেও ইহাতে অনেক আরবী ও ফারসী শব্দ স্থান পাইয়াছে। তা'ছাড়া যদিও কবি 'রাসৌ' ব্রজভাষায়ই লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহার ভাষার উপর কতকগুলি ভিন্ন ভাষা এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, মনে হয় তখন হইতেই একটি নূতন ভাষার সৃজন অপেক্ষা করিতেছিল। সেই অপেক্ষিত ভাষাই শিষ্ট কথ্য হিন্দী বা উর্দু ভাষা।

কবীর শিখ-গুরু রামানন্দের একজন প্রধান শিষ্য। তাঁহার 'দোহা'-ও ব্রজভাষায় লিখিত (১৫শ শতাব্দী)। কিন্তু এই দোহার ভাষা সেই সময়কার চলিত ব্রজভাষায় লিখিত নহে, যে ভাষা তাঁহার পরবর্তী প্রসিদ্ধ কবি সুরদাস (১৬শ শতাব্দী) অনুসরণ করিয়াছেন। কবীর-দোহার ভাষা বস্তুতঃ মিশ্র ব্রজভাষা ও তখনকার চলিত শিষ্ট কথ্য (হিন্দী) ভাষা। এই কবীর-দোহার ভাষা ও মুসলিম প্রবর্তিত উর্দু ভাষার মধ্যে এই মাত্র তফাৎ যে এই ভাষার মধ্যে সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দের কিছুটা প্রাচুর্য, আর মুসলমানদের ভাষার মধ্যে আরবী ফারসী শব্দের বাহুল্য। তাঁহার দোহাবলী-র কয়েকটি পঙ্ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অঈসা কোই ন মিলা জা সূঁ রহিয়ে লাগ্ ;
সব্ জগ্ জল্তা দেখা আপ্নী আপ্নী আগ্।
সুখ্ মেঁ সমরণ না কিয়া দুখ্ মেঁ কিয়া ইয়াদ্ ;
কহেঁ কবীর্ তা দাস্ কী কৌন্ সুনে ফরিয়াদ্।
নয়নোঁ কী কর্ কোঠরী পুৎলী পলঙ্গ্ বিছায়ে ;
পল্কোঁ কী চিক্ ডাল্কে পিয়া কো লিয়া রিঝায়ে।

* * * *

গোহর্ মার্ সিন্ধ্ মেঁ মোতী লায়ে পৈঠ্ ;
বহ কিয়া মোতী পায়েঙ্গে যো রহে বৈঠ্।

অর্থাৎ, এমন কেহ দৃষ্ট হয় না, যে তাঁহার প্রতিই কেবল আকৃষ্ট ; সকল জগৎবাসী আপন আপন (চিন্তা) অগ্নিতেই জ্বলিতেছে, দেখা যায়। সুখের সময় তাঁহাকে স্মরণ করে না, (কেবল) দুঃখের সময় তাঁহাকে চিন্তা করে।

কবীর কহেন, কিন্তু দাসের কান্না কে শুনে? চোখের মণিকে পালঙ সাজাইয়া (তোমার) চক্ষুকে ঘরে (পরিণত) কর; (আর) চোখের পাঁতিদ্বারা পর্দা তৈরী করিয়া প্রিয়াকে আকৃষ্ট কর।...(প্রেম) সিন্ধুতে ডুব দিয়া মুক্তা সংগ্রহ কর; যে বসিয়া থাকে, সে কি করিয়া মুক্তা পাইবে?

এই সকল আলোচনা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে উর্দু ১৫শ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের প্রধান মুসলিম কেন্দ্রস্থল সমূহ দো-আব, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে একটি শিষ্ট কথ্য ভাষারূপে প্রচারিত হইয়া যায়। এবং ইহার পরবর্তী কাল হইতে উর্দু কবিতার উল্লেখ তো আছেই, তা'ছাড়া উর্দু ধর্মগ্রন্থ, জীবনী ও অন্যান্য নানা প্রকার সাহিত্যেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বস্তুতঃ এই যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রসিদ্ধ ফারসী কবি আমীর খসরুর উর্দু কবিতাসমূহ। আমীর খসরু (১২৫৪-১৩২৫ খৃষ্টাব্দ) নিজ-চক্ষে গিয়াসুদ্দীন বলবনের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে এগারজন বাদশার রাজত্বকাল পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। যদিও তিনি তাঁহার সমস্ত জীবনকাল রাজদরবারের কার্যে দিল্লীতেই প্রায় অবস্থান করিয়া কাটাইয়াছেন, তবু রাজকার্যে মুলতান ও বাঙলায় ভ্রমণ করিবার সুযোগও তাঁহার হইয়াছিল। তিনি অযোধ্যা ও আগ্রার মধ্যস্থিত 'অইটা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিখ্যাত সুফী নিজামুদ্দীন আউলিয়ার একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার মুর্শিদের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাত হওয়ার কয়েকদিন পরেই তাঁহারও মৃত্যু হয়। সম্রাট্ বলবন তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। আমীর খসরু একজন প্রসিদ্ধ গায়কও ছিলেন। তিনিই প্রথম উর্দু কবিতায় ফারসী ছন্দের ব্যবহার করেন এবং এই ধারাই পরবর্তী কালেও উর্দু কবিতায় চলিয়া আসিয়াছে।

তকী আউহদী (তকী অউঃহদী) তাঁহার তজকিরতে (=তধ্‌কিরহ বা জীবনী-গ্রন্থ—১৬১৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত) লিখিয়াছেন, খসরুর 'হিন্দী' কবিতা তাঁহার ফারসী কবিতা হইতেও উৎকৃষ্ট। কিন্তু আমরা জানি, খসরু ফারসী সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি এবং পারস্য-সাহিত্য-জগতে তিনি তুতিয়ে-হিন্দ (=তূত্বী-ই-হিন্দ্‌ বা ভারতের শুকপাখী) বলিয়া প্রসিদ্ধ। আউহদীর এই ধারণা আমাদের নিকট অবিশ্বাস্য হইলেও, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার আর উপায় নাই। কারণ তাঁহার এই সকল উৎকৃষ্ট উর্দু কবিতার অধিকাংশই সময়ের স্রোতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; আর যাহা এখনও ধ্বংসের হাত হইতে

রেহাই পাইয়া রহিয়াছে তাহাও কবে পর্যন্ত যে গবেষকদের চেষ্টায় ধ্বংসের হাত হইতে একেবারে মুক্ত হইয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহা বলা বিশেষ কঠিন।

আমীর খস্রুর ফারসী বাক্যাংশ-সম্বলিত উর্দু কবিতা অনেকটা দুষ্প্রাপ্য। এইরূপ একটির কিয়দংশ উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

খ্বার্ শুদম্ জ়ার্ শুদম্ লুট্ গয়া ;
দর্ ঘম্-ই-হজ্র্-ই-তু কমর্ টুটা হৈ।
ইয়ার নহীঁ দেখ্‌তা হৈ স্যুয়ে মন্ ;
বে-গুনহ হম্ সাথ্ 'অজব্ রূঠা হৈ।
রুয়ে-তু রৌনক্ শিকন্-ই-আফ্‌তাব্ ;
সরব্ ব-পেশ্-ই-কদ্দ্-ই-তূ বূটা হৈ।
গাহ জ়-খসরু তু ন গুফ্‌তহ কি বৈঠ ;
রহ চি কুনদ্ ভাগ্ মেরা ফুটা হৈ।

অর্থাৎ, হৃতসর্বস্ব হইয়া হতভাগ্য ও দুর্গত হইয়া পড়িয়াছি ; তোমার বিরহ দুঃখে (আমার) কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। (আমার) বন্ধু আর আমার দিকে তাকায় না ; নিরপরাধ আমার প্রতি ইহা অতি আশ্চর্য রূঢ় ব্যবহার। তোমার মুখ সূর্যের দীপ্তিকেও নিষ্প্রভ করে ; তোমার কান্তির সম্মুখে সর্ব্ বৃক্ষ মাটির ঢেলা মাত্র। তুমি খসরুকে কখনও বল না যে 'বস'- সে আর কি করিবে ?—আমারই ভাগ্য মন্দ।

ডক্টর স্প্রেঙ্গার (Sprenger) কর্তৃক সঙ্কলিত আমীর খসরুর চেৎ (বা কৌতুকপূর্ণ) কবিতার ২।১টি নিদর্শন নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

:হম্দ-ই-ইলাহি (বা ভগবৎ প্রশংসা)

সব্ কোয়ি উস্‌কো জানে হৈ ;
পর্ এক নহীঁ পহ্‌চানে হৈ।
আঠ্ দহড়ী মেঁ লেখা হৈ ;
ফিকর্ কিয়া অন্‌দেখা হৈ।

অর্থাৎ, সকলেই তাঁহাকে জানে, কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারে না। অষ্ট দ্বারেই (সে) লিখিত (বা প্রকাশিত) রহিয়াছে, (কিন্তু) মানুষ মনে করে যে সে দর্শনীয় নহে।

কাজল্

জল কর্ বনে জল্ মেঁ রহে ;

আঁখোঁ দেখা খস্রু কহে।

আমীর খসরুর যুগে ঈরান, তুরান প্রভৃতি স্থানে চঙ্গীজ খান ও তাঁহার অনুসরণকারীদের অত্যাচার স্থানীয় লোকদের একেবারে বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল। ঐ দেশীয় অনেক অধিবাসীই ভারতে আসিয়া তখন আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু ভারতীয় ভাষা না জানায় তাহাদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছিল। ভাষা সম্বন্ধীয় এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে আমীর খসরু দিল্লীর চতুষ্পার্শে যে সকল ভারতীয় শব্দ কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছিল, ঐ সকলকে একত্র করিয়া সহস্রাধিক পঙ্‌ক্তিযুক্ত কাব্যাকারে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই কাব্যের অধিকাংশই এখন কালের স্রোতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২ শতাধিক পঙ্‌ক্তিযুক্ত 'খালিক্-বারী' তাহারই ধ্বংসাবশেষমাত্র। এই খালেক-বারী অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহার মধ্যে তিন শতাধিক হিন্দী শব্দ পাওয়া যায়। তাছাড়া এখন পর্যন্ত ইহার প্রায় সকল শব্দই হিন্দীতে ব্যবহৃত হয়।

১৫শ শতাব্দীতে রচিত কয়েকটি ফারসী অভিধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের বিশেষত্ব এই যে আরবী-ফারসী শব্দাদির অর্থ ব্যাখ্যাকালীন এই সকল শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দও সংযোজনা করা হয়। ইহাদের মধ্যে সবচয়ে প্রাচীন আদাতুল-ফুজালা। ইহা কাজী খান মুল্লা নজর মহম্মদ দিহলবী (=কাদ্বী খান্ মুল্লা নধর্ মুহম্মদ্ দিহলবী) ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলন করেন। ইহার প্রায় ৩০ বৎসর পরে কাওয়ামুদ্দীন ইব্রাহীম ফারুকী (=ক্বামুদ্দীন ইব্রাহীম্ ফারূকী) তাঁহার মুর্শিদ (শিক্ষক বা গুরু) শেখ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়হিয় মনীরীর নামানুসারে 'শরফ-নামা' নামক একটি অভিধান রচনা করেন। ইহা বাঙলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ বিন নাসিরুদ্দীন মামুদের রাজত্বকালে (১৪৫৭-৭৪ খৃষ্টাব্দে) সঙ্কলিত হয়। তারপর শেখ লাদ্ দিহলবী (মৃত্যু ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ) সুলতান ইব্রাহীম লোদীর রাজত্বকালে মুয়িদুল-ফুজালা নামক আর একটি অভিধানের সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

(খ) বাহমনী সাম্রাজ্য (১৩৪৭-১৫২৫)

সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর অধীনে পঞ্জাব ও মুলতানের গভর্নর জফর খানের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আলী শাহ ও হসন বহমনী সুলতান মহম্মদ তুঘলকের অধীনে সেনানায়ক ছিলেন এবং তাঁহাদের উভয়কে সুলতান তাঁহার উস্তাদ কৎলঘ খানের অধীনে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। তথায় রাজকীয় কর সংগ্রহার্থে আলী শাহ গুলবর্গে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তথায় রাজ-শাসনে বিশৃঙ্খলা দৃষ্টে তিনি নিজেই লুটপাটে ব্যাপৃত হইয়া গেলেন। শীঘ্রই কৎলঘ খান বীদরের যুদ্ধে তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লী প্রেরণ করেন। আলী শাহ বিদ্রোহের কিছুকাল পরেই দাক্ষিণাত্যবাসিগণ দুই হাজার সৈন্যের সেনাধ্যক্ষ (দূ হজ়ারী) ইসমাইল মঘকে নাসিরুদ্দীন উপাধি প্রদান পূর্বক তাঁহাকে তাহাদের স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাজ-অমাত্যবর্গ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সুযোগে হসন বহমনী গুলবর্গা ও অন্য কয়েকটি রাজ্য দখল করিয়া বসিলেন। এই বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য অবশেষে রাজ-সৈন্য প্রেরিত হইল, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। দুই বৎসর ক্রমান্বয়ে হত্যাকাণ্ডের পর বিদ্রোহী-শক্তিই জয়লাভ করে এবং সর্বসম্মতিক্রমে হসন বহমনী দাক্ষিণাত্যের সুলতান স্বীকৃত হইলেন। সুলতান পদে উন্নীত হসন বহমনী সুলতান আলাউদ্দীন বহমন শাহ নাম গ্রহণ করিয়া গুলবর্গায় তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং এই নূতন রাজধানীর নামকরণ হয় হসনাবাদ। এই নূতন সাম্রাজ্য বেরার হইতে তলঙ্গনা এবং কৃষ্ণা হইতে সমুদ্র-সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে। ক্রমে ক্রমে বহমনী রাজগণ অন্যান্য ক্ষুদ্র শক্তিকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের রাজধানী আরো বিস্তৃত করিলেন। আর বিশাল শক্তিশালী বিজয়নগর রাজ্য তাঁহাদের মস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায় এবং এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ ও লড়াই লাগিয়াই ছিল।

বহমনী সাম্রাজ্যের অধিকাংশ সুলতানই বিশেষ বিদ্যোৎসাহী এবং তাঁহাদের অনেকেই আবার পণ্ডিত ও সাহিত্যিক ছিলেন। দ্বিতীয় মহম্মদ

শাহ্ (১৩৮৮-৯৬) নিজেই একজন কবি এবং আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্যও ছিল। উল্লামা সাদুদ্দীন্ তফ্‌তাজানীর শিষ্য মীর ফয়জুল্লা ইন্‌জু তাঁহারই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আর এই মহম্মদ শার রাজত্ব-কালেই শীরাজের প্রসিদ্ধ ফারসী কবি হাফিজ তাঁহার দরবারে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং পাথেয় হিসাবে ১০০০৲ মুদ্রা কবিবরের নিকট প্রেরিতও হইয়াছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁহার দাক্ষিণাত্যে আসা ঘটিয়া উঠে নাই।

তাজুদ্দীন ফিরোজ শাহ্ (১৩৯৭-১৪২২)-ও একজন বিশেষ পণ্ডিত ও সাহিত্যিক ব্যক্তি। তাঁহার কবি-উপাধি বা তখল্লুস্ ছিল আরূহী ও ফীরূজী। কোরান-বিশ্লেষণ, পদার্থ-বিদ্যা ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার আদেশেই দৌলতাবাদ রাজ্যে একটি গ্রহনক্ষত্র-পর্যবেক্ষণিকা স্থাপিত হয় এবং গ্রহণক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণের জন্য মামুদ গাজরূনী এবং হসন গীলাফী প্রভৃতি কয়েকজন জ্যোতির্বিদও তাঁহার রাজ্যে সমবেত হইয়াছিলেন। আর তাঁহারই রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ সুফী বন্দা মুয়াজ সৈয়দ মহম্মদ গীসু দরাজ গুলবর্গায় আসিয়া পদার্পণ করিয়াছিলেন।

শীহাবুদ্দীর আহমদ শা (১৪২২-৩৪)-র রাজত্বকালে অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার দরবারে সমবেত হইয়াছিলেন। পারস্যাধিপতি শাহ্ রূখের মালিকুশ্-শুয়ারা (=মলিকুশ্-শু'অরা বা রাজকবি) শেখ আউজী মক্কা পরিদর্শন করিয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হন এবং তথায় অনেকদিন বসবাস করিয়াছিলেন। এই সময়েই সুলতান আহমদ শার আদেশানুযায়ী তিনি বহমন-নামা নামে বহমনী-বংশীয়দের জীবন-ইতিহাস কাব্যাকারে রচনা করেন। এবং তাঁহার নিজদেশে প্রত্যাবর্তনকালে সুলতান পাথেয় হিসাবে ৬০ হাজার মুদ্রা প্রদান পূর্বক তাঁহাকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন।

প্রসিদ্ধ মামুদ গাওয়ান তৃতীয় মহম্মদ শা (১৪৬২-৮২)-রই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আর প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক সলামৎ উল্লা আউহদী, শমসুদ্দীন সামী, আবদুল করীম হমদনী ও মুল্লা নজীরী তাঁহারই রাজবয়স্য ছিলেন। প্রসিদ্ধ ফারসী কবি মুল্লা আবদুর-রহমান জামী তাঁহারই সময়ে দাক্ষিণাত্যে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। হাফিজের ন্যায় জামীও আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না পারিয়া, তাঁহার নামে একটি প্রশংসাসূচক কবিতা প্রেরণপূর্বক তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন।

প্রায় দেড়শত বৎসর বিশেষ কৃতকার্যতার সহিত রাজত্ব করার পর বহমনী রাজ্যের ধ্বংস সূচিত হয়। মামুদ শার রাজত্বকাল (১৪৮২-১৫১৭)

হইতেই রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে এই বৃহৎ সাম্রাজ্য খণ্ডিত হইয়া যথাক্রমে বেরারে ইমাদশাহী, আহমদনগরে নিজামশাহী, বীদরে বরীদশাহী, বীজাপুরে আদিল্‌শাহী ও গুলকণ্ডাতে কুতুব্‌শাহী সাম্রাজ্য নামক ৫টি নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভারতে উর্দু ভাষা প্রতিষ্ঠালাভ করার পরও ইহার প্রথম যুগে দিল্লী ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে সাধারণতঃ উর্দুভাষাভাষিগণ ইহাকে নিজেদের কথ্যভাষা হিসাবেই ব্যবহার করিয়াছেন—ইহার সাহায্যে কোন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে সযত্ন হন নাই। অন্যথা, দাক্ষিণাত্যে উর্দুভাষা প্রতিষ্ঠালাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতেও মনো-নিবেশ করা হয়। তাই ১৪শ শতাব্দী হইতেই তথায় উর্দু ভাষায় সাহিত্য-প্রস্তুতি যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগের প্রথম প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক খুব সম্ভবতঃ শেখ আইনুদ্দীন গঞ্জুল্‌-ইল্‌ম্‌।

গঞ্জুল্‌-ইল্‌ম্‌ ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে নয়াদিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লী হইতে রওনা হইয়া গুজরাট ও অন্যান্য স্থানে শিক্ষালাভ করার পর তিনি দৌলতা-বাদে উপস্থিত হন। তখন দৌলতাবাদ দিল্লীসম্রাট সুলতান মহম্মদ তুঘলকের রাজধানী। এই সময়ে তথায় আরো অনেক মুসলিম সাহিত্যিক ও সুফী দরবেশ সমবেত হইয়াছিলেন। তথায় নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করার পর ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আইনাবাদ পদার্পন করেন এবং তথায় সুদীর্ঘকাল অবস্থানের পর ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে বীজাপুর আসেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে বহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হসন বহমনী ও তাঁহার চারিজন উত্তরাধিকারীর রাজ-শাসন নিজচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। অবশেষে দ্বিতীয় মহম্মদ শার রাজত্ব-কালে তাঁহার ৮৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

রৌজাতুল্‌-আউলিয়ায়-বীজাপুর নামক গ্রন্থে গঞ্জুল্‌-ইল্‌মের ১৭২টি বইয়ের উল্লেখ আছে। তিনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিনহাজুদ্দীন লিখিত তবকাতে-নাসিরীর শেষাংশের পূর্ণরূপ দান করেন। আর ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তা তাঁহার তারীখে-ফিরিশ্‌তা-র মাল-মসলা গ্রহণকালে ঐ গ্রন্থের নাম মুল্‌হকাতে-তবকাতে-নাসিরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার আতুয়ারুল্‌-আব্‌রার্‌ নামক অন্য একটি গ্রন্থেরও প্রসিদ্ধি আছে। ইহা একটি সুফী-জীবন-সংগ্রহ। এই সকল ফারসী গ্রন্থ ছাড়া তাঁহার কয়েকটি দিকনী-উর্দু গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে।

খাজা বন্দা নওয়াজ হজরৎ সৈয়দ মহম্মদ গীসু দরাজ নসীরুদ্দীন

চরাঘ্ দিহলবীর একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি ১৪১২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে আসেন এবং তথায় প্রায় ১০ বৎসর কাল অবস্থান করার পর প্রাণত্যাগ করেন। সুফীতত্ত্ব বিষয়ক তাঁহার প্রায় ৩০ খানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। মুল্তিকৎ ও কিতাবুল-আস্‌রার ইহাদের মধ্যে অন্যতম। তা'ছাড়া তাঁহার পূর্বগামী প্রসিদ্ধ সুফীদের তত্ত্বমূলক গ্রন্থাদির বিশ্লেষণ করিয়া কয়েকটি গ্রন্থও তিনি লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার আরবী-ফারসীতে তো বিশেষ দখল ছিলই; অধিকন্তু সাধারণের বুঝিবার সুবিধার্থে দিকনী উর্দুতেও এই সকল গ্রন্থের কতকটা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মিরাজুল্-আশিকান্ ও হিদায়ৎ-নামা বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহারই এক প্রিয় শিষ্য তাঁহার উর্দুতে লিখিত সাতটি গ্রন্থের ব্যাখ্যামূলক এক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন—ইহার নাম হফ্‌ৎ-আস্‌রার।

বন্দা নোয়াজেরই এক পৌত্র সৈয়দ মহম্মদ আব্দুল্লা হুসেনী সুলতান দ্বিতীয় আহমদ শাহ-র রাজত্বকালে আব্দুল-কাদের জীলানীর প্রসিদ্ধ সুফীতত্ত্ব বিষয়ক নিশাতুল-ইশ্‌কের দিকনী তর্জমা করিয়া গিয়াছেন। ইহারই কাব্যাকারে লিখিত অন্য একটি গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে।

(গ) কুতুবশাহী সাম্রাজ্য ও গুলকণ্ডা দরবার

পনর শতাব্দীর প্রথম ভাগেই আরমেনিয়ার নিকটবর্তী স্থানসমূহে তুর্কজাতীয় দুইটি দলের অভ্যুত্থান হয়। ইহাদের এক দলের নেতা সুলতান ইয়াকুব বেগ ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে যখন রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন, তখন হইতেই অন্য দলটি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই অবস্থা দৃষ্টে ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু দলের নেতা হমদন অধিপতি উবায়িস কুলী (উব্বায়িস্ ক্কুলী) তাঁহার পুত্র সুলতান কুলীকে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে হিন্দুস্তানে পাঠাইয়া দেন। আল্লা কুলী তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র সুলতান কুলী-সহ দাক্ষিণাত্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। মামুদ শা বহমনী (১৪৮২-১৫১৭) তাঁহাদের প্রতি সহৃদয় ও বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কিছুকাল পরে আল্লা কুলী ঈরানে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু সুলতান কুলীকে নিজদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে না দিয়া বহমনী-রাজ তাঁহাকে কুতুবুল-মালিক (ক্কুত্ব্বুল্-মলীক্) উপাধিতে ভূষিত করিয়া তলঙ্গনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। প্রায় ১৬ বৎসর মামুদ শা-র অধীনে তথায় শাসন করার পর যখন বহমনী-রাজের মৃত্যু হয়, সুলতান কুলী বহমনী রাজ্যের পতনাবস্থা দৃষ্টে তিনিও অন্যান্য অমাত্যদের ন্যায় নিজেকে একজন স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি স্বাধীন রাজা হইয়া নূতন নাম গ্রহণ করিলেন কুতুব শাহ, এবং তাঁহার নামানুসারে নূতন রাষ্ট্রের নামকরণ হইল কুতুবশাহী সাম্রাজ্য— আর গুলকণ্ডা হয় তাঁহাদের নূতন রাজধানী।

সুলতান কুলী কুতুব শা-র পুত্র জমশেদ কুলী কুতুব শা (১৫৪৩-৫০)-র কাব্য ও সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্যিক তাঁহার দরবারে সমবেত হয়। ইরাকবাসী খুরশা বিন কবাদ আল-হুসয়নী তাঁহারই একজন প্রিয় বয়স্য ছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে আল-হুসয়নী সৃষ্টির সূচনা হইতে তাঁহার যুগ পর্যন্ত কালের এক ইতিহাস লিখেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তা এই গ্রন্থের উল্লেখ তাঁহার 'তারীখে' করিয়া গিয়াছেন।

মহম্মদ কুলী কুতুব শা (১৫৮০-১৬১১) তাঁহার পিতা ইব্রাহিম কুলীর ন্যায় সাহিত্যানুরাগী ও সঙ্গে সঙ্গে একজন সাহিত্যিক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এই মহম্মদ কুলী কুতুব শা-ই তাঁহার স্ত্রী ভাগমতী (বা ভাগ্যমতী)-র নামানুসারে গুলকণ্ডার নিকটে ভাগ্-নগরের পত্তন করেন। আবার, কিছুকাল পরে তাঁহার সম্রাজ্ঞীর নাম হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া এই নগরের নূতন নামকরণ হয় 'হয়দরাবাদ'। গোলবর্গায় অবস্থিত 'খুদাদাদ্ মহল' এবং 'বারগাহে-খসরুয়ি' নামক দুইটি প্রসিদ্ধ প্রাসাদ তাঁহার আদেশেই নির্মিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে আরব ও পারস্য হইতে আগত অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের তথায় সমাবেশ হয়।

প্রসিদ্ধ ফখরুদ্দীন সমাকীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও স্বফাবী সম্রাট তহমাস্পের রাজদরবারের একজন বিশেষ বয়স্য মীর মহম্মদ মৌমিন আস্তরাবাদী মহম্মদ কুলী কুতুব শা-র রাজত্বকালেই গুলকণ্ডায় আগমন করেন এবং সম্রাট তাঁহাকে একটি রাজকীয় সম্রান্ত পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার কিতাবুল-রিজয়ৎ (কিতাব্-অল্-রিজ্'অৎ) ও কিতাবুল্-মুকাদিরান বিশেষ প্রসিদ্ধ। তা'ছাড়া তিনি একজন কবিও ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মীর্জা মহম্মদ আমীর শহরস্তানীও একজন বিখ্যাত কবি ও তাঁহার কবি-নাম রহুল্-আমীন্। তাঁহার ঘজল ও কসীদা (ক্বস্বীদ) সম্বলিত দেওয়ানের (দীৱান্) নাম 'গুলিস্তানে-নাজ'। রাজাদেশে প্রসিদ্ধ কবি নিজামীর খমসা-র অনুকরণে তিনি চারিটি মসনবী কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের নাম যথাক্রমে শীরীন্-খসরু, লয়লা-মজনূঁ, ফলকুল্-বুরূজ ও মৎমাউল্-অন্‌ওয়ার। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মীরজুমলা তাঁহার রাজত্বকালেই তথায় বসবাস করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, সম্রাটের সুন্দর হস্তাক্ষরের প্রতিও বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং আরব ও পারস্য হইতে অনেক সুন্দর সুন্দর হস্তলিপি তিনি সংরক্ষিত করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার পরবর্তী মহম্মদ কুতুব শা (১৬১১-২৫) নিজেই একজন প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। কবি হিসাবে তিনি ঘজল ছাড়া কসীদা ও মনাকিব কবিতা লিখিয়াছেন। তিনি কুতুবশাহী রাজগণের এক বিস্তৃত ইতিহাসও লিখিয়াছেন এবং ইহার শেষাংশে নিজ জীবনও সম্বলিত হইয়াছে। শৌধ-শিল্পের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁহারই সময়ে গুলকণ্ডায় ইলাহীমহল, জামে-মসাজিদ (জামি'-মস্‌জিদ,— মক্কা মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ) ও মহম্মদী মহল প্রভৃতি কারুশিল্পময় প্রাসাদ নির্মিত হয়।

সাহিত্যানুরাগী আব্দুল্লা কুতুব শা (১৬২৫-৭২)-র দরবারেও অনেক কবি ও সাহিত্যিকের সমাবেশ হইয়াছিল। ইব্‌নে-খাতুন নামে প্রসিদ্ধ শম্‌সুদ্দীন্ মহম্মদ তাঁহার সময়েই একটি বিশিষ্ট রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন।

কিতাবুল-ইর্শাদ ও জামে-আববাসী (=জামি'-'অব্বাসী)-র তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টিকা লিখিয়াছেন, আর তাঁহার আববায়িনের (আববা'ঈন্) অনুবাদও বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই সুলতান আব্দুল্লার আদেশানুযায়ীই মুল্লা জলালুদ্দীন 'কিতাবুল্ মিস্বাহা' (কিতাবুল্-মিস্ব্বাঃহ্)-র ও মুল্লা আলী বিন তৈফুর 'কিতাব আইয়ুন আখ্বার্ রিজা'-র ফারসী অনুবাদ করেন। প্রসিদ্ধ ফারসী অভিধান বুরহান-কাতে (বুর্হান্-কাত্বি') এই বাদশার রাজত্বকালেই সম্পাদিত হয়। আর তাঁহারই উৎসাহে ফতেহ উল্লা সমনানী ইমাম্ ইয়াফিয়ি লিখিত রৌজুল্-রিয়াহীন্-এর ফারসী অনুবাদ করেন। ফারসীতে লিখিত প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ হদীকতুস্ সলাতীন্-ও এই সময়েই মুল্লা নিজামুদ্দীন আহমদ গুলকণ্ডায় সমাপ্ত করেন।

এই কুতুবশাহী রাজগণ প্রায় দুইশত বৎসর তথায় রাজত্ব করার পর ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে আউরঙ্গজেব কর্তৃক গুলকণ্ডা অধিকৃত হয় এবং তৎসঙ্গে এই বংশের সমাপ্তি ঘটে।

গুলকণ্ডায় অবস্থিত কুতুবশাহী রাজগণের মধ্যে মহম্মদ কুলী, সুলতান মহম্মদ ও সুলতান আব্দুল্লা উর্দু সাহিত্যেও বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন। মহম্মদ কুলী ফারসী ও উর্দু উভয় প্রকার কবিতাই লিখিয়াছেন। টিপু সুলতানের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত মহম্মদ কুলীর দেওয়ানের প্রায় অর্ধাংশ উর্দু কবিতা, আর বাকী অংশ ফারসী কবিতা। তাঁহার ফারসী কবিতায় কবি-নাম ছিল কুতুব-শা (কুত্ব্-শাহ), আর দিক্নী-উর্দু কবিতায় মানী (ম'আনী)। তাঁহার ঘজল কবিতা সুফীতত্ত্বপূর্ণ; আর তাঁহার মসনবীতে সাধারণ ভারতীয় চিত্র-চরিত্র বা ঘটনাসমূহের বিন্যাস দৃষ্ট হয়। ধর্ম-সম্পর্কিত মসনবী-কাব্যেরও দৃষ্টান্ত কিছু পাওয়া যায়। তাঁহার মরসিয়া বা শোক-কবিতায় কারবালার বিষাদপূর্ণ ঘটনাসমূহের বর্ণনা রহিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি সিয়া ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং ইহারই ফলে তাঁহার সময়ে মরাসী কবিতার যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতাও হইয়াছে।

মহম্মদ কুলীর দেওয়ানের অন্য একটি পুঁথি হয়দরাবাদের আসফিয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ কুতুব-শা কর্তৃক লিখিত। সুলতান মহম্মদ তাঁহার পিতৃব্যের পুঁথি সম্পাদনাকালে কাব্যাকারে ইহার যে উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে অনুমিত হয় মহম্মদ কুলী আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষা ব্যতীত তেলেগু ভাষায়ও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সুলতান মহম্মদের উপক্রমণিকা সম্বলিত মহম্মদ কুলীর

দেওয়ানের সম্পাদনা করিয়াছেন মৌলবী আবদুল হক্। এই সম্পাদিত গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিত হইয়াছে যে মূল কাব্য ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। মৌলবী সাহেব তাঁহার উপক্রমণিকায় মহম্মদ কুলীর উর্দু সাহিত্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। এবং ইহার অন্যতম কারণ মহম্মদ কুলীর নিজস্ব মৌলিক চিন্তাধারা ও প্রকাশভঙ্গীর সহজ ও স্বাভাবিক নিপুণতা। কাহারো কাহারো মতে মহম্মদ কুলী কুতুব শা-ই বরং 'বাবায়ে-রীখ্তা' উপাধিতে ভূষিত হওয়া উচিত। বস্তুতঃ তিনি একাধারে উর্দু সাহিত্যের সকল প্রসিদ্ধ কবি মীর, সৌদা, আনীস, দবীর, জৌক ও খালিবের সর্বপ্রথম উপযুক্ত পথপ্রদর্শক। তাঁহার একটি কবিতার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল .

دل نانگ خدا کن کہ خدا کام دوے گا —
تمذن کی مرادن کے بہوے جام دوے گا
کرتے ہیں دعوی شعر کا سب اپنی طبع سون —
بخشا فضیح شعر معانی کے تئین خدا

দিলে-নাঙ্ খুদাকিন্ কি খুদা কাম্ দুয়ে গা,
তুমনিন্ কী মরাদিন্ কে ভরে জাম্ দুয়ে গা।
কর্তে হৈঁ দাবী শার্ কা সব্ আপনী তবা সোঁ;
বখ্শা ফজীহে-শার্ মানী কে তয়িন্ খুদা।

অর্থাৎ, ভগবানের নিকট সকাতর প্রার্থনা যে তিনি তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করিয়া পেয়ালা উপস্থাপিত করিবেন। সকলেই তাহার স্বভাবানুযায়ী কাব্যের পরিস্ফুরণ কামনা করে— (কিন্তু) মানীর কাব্যের নীরসতা ভগবানই পূর্ণ করিবেন।

সুলতান মহম্মদ ও সুলতান আব্দুল্লাও ফারসী ও উর্দু উভয় ভাষায়ই কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। মহম্মদের কবি-নাম 'জিল্লুল্লা' ও আব্দুল্লার কবি-নাম 'আব্দুল্লা-ই ছিল। তাঁহাদের ফারসী কবিতা তারীখে-কুতুবশাহী ও হদীকতুস্-সলাতীন্ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। আর তাঁহাদের উর্দু কবিতা ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে অর্দস্তানী হয়দরাবাদে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ইহার একটি পুঁথি এখনো ইণ্ডিয়া অফিসের পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত রহিয়াছে। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে মহম্মদের উর্দু কবিতায় কবি-নাম ছিল কুতুব-শা।

তানা শা নামে প্রসিদ্ধ গুলকণ্ডার কুতুবশাহী সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট

আবুল হসন কুতুব শা (১৬৭২-৮৮) বিশেষ আলস্যপ্রিয় ও বিলাসী সুলতান। তাহা হইলেও তিনি বিশেষ পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আবদুল্লা কুতুব শা-র জামাতা ও তাঁহারই উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন লাভ করেন। প্রায় সাত মাস গুলকণ্ডা অবরোধের পর ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ইহা মুঘল অধিকারভুক্ত হইলে, হতভাগ্য গুলকণ্ডাধিপতি তাঁহার বাকী জীবন কারাগারেই অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলেন।

গুলকণ্ডার কুতুবশাহীদের রাজত্বকালে যে অনেক কবি ও সাহিত্যিকই উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কারণ যে স্থানে শাসকগণই এইরূপ সাহিত্যানুরাগী সেখানে শাসিতদের মধ্যেও যে যথেষ্ট সাহিত্যিক থাকিবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই যুগের গ্রন্থাদি কালস্রোতের ধ্বংস-কবল হইতে বিশেষ রক্ষা পায় নাই। তবু যে সকল কবি ও সাহিত্যিক ও তাঁহাদের কাব্যাদির বর্ণনা অন্যান্য জীবনী-কারদের গ্রন্থাদির মাধ্যমে এখন পর্যন্ত রক্ষিত আছে, উঁহোদেরই পরিচয় এখানে সংক্ষিপ্তরূপে বিবৃত হইল।

মুল্লা ঘউয়াসী আবদুল্লা কুতুব শা-র সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়—ফসানয়ে-সয়ফুল্-মুলুক ব বদীয়ুজ্-জমাল্ এবং তুতীনামা। প্রথমটি প্রসিদ্ধ আলিফ্-লয়লার ফারসী অনুবাদের উর্দু সংস্করণ। ঘউয়াসী ইহাকে ফারসী গদ্য হইতে উর্দু কাব্যাকারে রূপায়িত করিয়াছেন। এই কাব্যের বক্তব্য বিষয় মিশরের যুবরাজ সয়ফুল্-মুলুক ও চীনের শাজাদী বদীয়ুজ্-জমালের প্রেমকাহিনী। এই মস্‌নবী-কাব্য ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ ১০৩৫ হিজরী) রচিত হয় এবং ইহার সমাপ্তি কাল কবিবর নিম্নলিখিত কবিতার মাধ্যমে বিবৃত করিয়াছেন।

বরস্ এক্ হজ়ার্ হবর্ পঞ্জ্ তীস্ মেঁ ;
কিয়া খতম্ ইয়ু নজম্ দিন তীস্ মেঁ।

তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ তুতীনামা জিয়াউদ্দীন্ বখ্শীর ফারসী তুতীনামা (তূতী-নামহ)-র উর্দু অনুবাদ মাত্র। ইহার মূল কাহিনী সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহা ১০৪৯ হিজরী (বা ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয় এবং ইহার রচনাকাল ঘৌয়াসী নিম্নলিখিত কবিতাদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

বরস্ এক হজ়ার হবর্ চালীস্ পহ্ নৌ ;
হোয়ে খে ইয়ু মোতিয়াঁ পুরুআ হোঁ তু।

তহসীনুদ্দীন্ নামে বা তহসীন উপাধিধারী একজন কবি কামরূপ-কলা

নামক এক মসনবী-কাব্য লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কাহিনীর নায়ক কামরূপ অযোধ্যার রাজপুত্র এবং নায়িকা কলা লঙ্কা রাজপুত্রী। আলিফ্-লয়লার কাহিনীর ন্যায় ইহাতেও নায়ক-নায়িকা উভয়েই স্বপ্নে পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হন। কামরূপ স্বপ্নে দৃষ্ট তাহার প্রেমিকার প্রতি আসক্ত হইয়া, তাহার অন্বেষণে নানাদেশ ঘুরিয়া বেড়ায় ও নানাপ্রকার আশ্চর্য্য ঘটনাবলীর সম্মুখীন হয়। অবশেষে তাহার ইপ্সিত কলার সহিতই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এখানে লক্ষণীয় যে কাব্যকার মুসলমান হইলেও, হিন্দু সামাজিক কাহিনীর একটি প্রেমঘটিত ব্যাপার তিনি বেশ নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে গার্সন্ ডি টাসী কর্তৃক সম্পাদিত হয়। ইহার কাব্যমাধুর্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে কথিত আছে প্রসিদ্ধ জার্মন কবি গেটে ইহার অনূদিত গ্রন্থের রস সম্ভোগ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

কুতুব-শাহী যুগের আর একজন প্রসিদ্ধ কবি মুল্লা কুৎবী ১০৪৬ হিজরী (বা ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ)-তে তুহফতুন-নসায়হ-র উর্দু অনুবাদ করেন। মূলগ্রন্থ শেখ ইউসুফ দিহলবী তাঁহার পুত্রকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে ফারসীতে রচনা করিয়াছিলেন। ৭৮৬ পঙ্ক্তি বিশিষ্ট তুহফতুন্-নসায়হ ফারসীতে যে ছন্দে লিখিত হইয়াছে, কুৎবীও সেই ছন্দই উর্দু কবিতায় অনুকরণ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা উভয় গ্রন্থেরই কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। উভয় কাব্যের প্রথম দুই পঙক্তি নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ইহার ফারসী গ্রন্থে রহিয়াছে:—

> ঃহম্দ্ বগোয়িম বে-'অদদ্ ;
> মর্ খালিক-ই-জিন্ র বশর্।
> কর্দ্ মু'অল্লক আসমান্ ;
> হম্ আখ্তরান্ শম্স্ র কমর্।

আর ইহার উর্দু সংস্করণে পাই,

> বোলোঁ স্বিফৎ মেঁ বে-গিনৎ,
> ইস্ খালিক-ই-জিন্ র বশর।
> নির্ধার্ কর্ আস্মান্ রখিয়া ;
> সুরজ সতারে হরর্ চন্দর্।

ইবনে-নশাতী গুলকণ্ডার অধিবাসী ও আব্দুল্লা কুতুবশার রাজকবি। তাঁহার দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং এই উভয় গ্রন্থই তিনি সুলতান

আব্দুল্লাকে উৎসর্গ করেন। তাঁহার প্রথম কাব্য ফুল্‌বন্ ফারসী বসাতীন নামক কাব্যের উর্দু কাব্যানুবাদ। মূল গ্রন্থ মুল্লা আহমদ জুবয়রী মহম্মদ তুখলকের রাজত্বকালে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ তুতী-নামা ফারসী হইতে উর্দুতে অনূদিত দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যাইতে পারে। মুল্লা ঘোয়াসী কর্তৃক অনূদিত প্রথম সংস্করণের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

শেখ্ আহমদ জুনয়দী সুলতান আবদুল্লার রাজত্বকালেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন ও 'মাহ-পয়কর্' নামক একটি মসনবী-কাব্য রচনা করেন। ইহার রচনাকাল (১০৬৪ হিজরী, অর্থাৎ ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দ) জুনয়দী নিম্নলিখিত কবিতাংশের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন,

নবী কী সূ হিজরৎ কা ইয়ু থা করার ;
চহার্ সাল্ তীন্ বীস্ ভী এক হজার্।

তবয়ী গুলকণ্ডার অধিবাসী ও সুলতান আবদুল্লা কুতুবশার সমসাময়িক। তিনি ফারসী কবি নিজামীর হফ্‌ৎ-পয়কর্ ও হাতিফীর হফ্‌ৎ-মনজরের অনুকরণে বহরাম ও গুলআন্দাম নামে একটি সরস মসনবী-কাব্য লিখিয়াছেন। ইহাতে সাসানীয় সম্রাট বহরাম ও তাঁহার সাত রাণীর প্রেমকাহিনী বর্ণনা রহিয়াছে। ফারসী কবিদের অনুকরণে তবয়ীও তাঁহার কাব্যের সূচনায় লিখিয়াছেন,

ইলহী বচন্ কা মুঝে তাব্ দে ;
মেরী জেব্-কী তেঘ্ কোঁ আব্ দে।

কবি ফায়িজ গুলকণ্ডারই অধিবাসী ও সুলতান আবুল হসন তানা শা-র সমসাময়িক। তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গের ইচ্ছানুসারে কিস্‌সয়ে-রিজ্‌বান শা ও রূহে-আফ্‌জা নামক একটি ফারসী গল্পকাহিনীকে দিক্‌নী-উর্দুতে কাব্যাকারে অনুবাদ করেন। ফায়িজের কাহিনী এইরূপে সূচিত হইয়াছে।

আব্বল্ নাম্-ই-হক্ কা লে বোলোঁ সুখুন্ ;
বন্দোঁ উস্‌কী তৌহীদ্ খোলোঁ দহন্।

সৈয়দ শুজাউদ্দীন নূরী একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় গুজরাট অধিবাসী। তিনি সুলতান তানাশার মন্ত্রীপুত্রের গৃহশিক্ষক ছিলেন। কেহ কেহ আমাদের উর্দু কবি নূরীকেই প্রসিদ্ধ ফৈজীর বন্ধু মুল্লা নূরী বলিয়া ভুল করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা বস্তুতঃ এক ব্যক্তি নহেন।

আবুল কাসিম মির্জা সুলতান তানা শার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। আউরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য অধিকার করার পর তিনি ফকীরের বেশে

আবদুল্লা-গঞ্জ নামক স্থানে কতককাল অবস্থান করিয়া তথায়ই প্রাণত্যাগ করেন। দিল্লীর প্রসিদ্ধ উর্দু কবি মীর হসন তাঁহার তজকিরাতে মির্জার দুইটি বয়ৎ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আরিজ নহীঁ চন্দর কা তরে গাল সোঁ আচ্ছা ;
সমঝেঁ হমন্ কলফ কো ন তুঝ্ খাল্ সোঁ আচ্ছা।
মির্জা উয়হ নৌ নিহাল কিধর মিট গিয়ে চমন ;
লগ্‌তা থা জিন্ কে হাথ্ প গুল ডাল্ সোঁ আচ্ছা।

عارض نہیں چندر کا ترے سوں اچہا —
سمجہے ہمن کالف کو نہ تجہہ خال سوں اچہا
مرزا وہ نو نہال کدہر مٹ گئے چمن —
لگتا تہا جن کے ہاتہ پہ گل ڈال سوں اچہا

(ঘ) আদিলশাহী সাম্রাজ্য

আদিলশাহী রাজগণ রোমের উসমানীয় সম্রাটদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ঐতিহাসিকদের মতে রোম বা পূর্বদেশীয় তুরস্ক-সম্রাট মুরাদ (১৪২১-৫১)-এর দুই পুত্র ছিল। মুরাদের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন। মহম্মদ সম্রাট হইয়া তাঁহার ভ্রাতা ইয়ুসুফ্‌কে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। ইয়ুসুফ্ তুরস্ক হইতে পলায়নপূর্বক ঈরান হইয়া দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া অচিরেই মহম্মদ শা বহমনী ইয়ুসুফকে একজন সুহৃদ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বীজাপুরের সেনাধ্যক্ষপদে উন্নীত হইলেন। আর মামুদ শা বহমনীর রাজত্বকালে যখন বহমনী সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে আহমদ নিজামুল্-মুল্কের পরামর্শানুযায়ী ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে ইয়ুসুফ আদিল শা উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজেকে একজন স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং বীজাপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিলেন। বীজাপুরে ক্রমান্বয়ে ৮ জন আদিলশাহী সুলতান প্রায় দুইশত বৎসর (১৪৮৯—১৬৮৫ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

ইয়ুসুফ্ আদিল শাহ ও তাঁহার পুত্র ইস্‌মাইল আদিল শা (১৫১০-৩৪) উভয়েই নিপুণ ফারসী কবি ছিলেন। ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তা তাঁহাদের উভয়ের কবিতাই তাঁহার 'তারীখ'-এ উল্লেখ করিয়াছেন এবং সুলতান ইসমাইল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তাঁহার সরল ও নিপুণ কাব্যের সহিত আর কোন দিকন-সম্রাটের কাব্যের তুলনা হয় না। পরবর্তী সুলতান ইব্রাহীম আদিল শা (১৫৩৪-৫৭) ও আলী আদিল শা (১৫৫৭-৮০) উভয়েই বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী সম্রাট ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে ইরাক ও পারস্য হইতে অনেক পণ্ডিত ও সাহিত্যিক বীজাপুর আসিয়া বসবাস করিয়াছেন। আলী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মুল্লা ফতেহআল্লা শীরাজীকে পারস্য হইতে তাঁহার রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। আবার তাঁহারই মন্ত্রী আফজল খান বিশেষ পণ্ডিত ও উদার হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলিম-ইতিহাসে

বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের সহযোগে রাজদরবারে প্রত্যহ সাহিত্য-চক্রের ব্যবস্থা হইত এবং সুলতানও এই সাহিত্য-চর্চায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাহা হইলেও এই আলীর রাজত্বকালেই মারাঠা-সর্দার শীবাজী কর্তৃক আদিল শাহী রাজ্য বিশেষভাবে আক্রান্ত হইতে থাকে এবং ইহার ফলে রাজদরবারে উর্দু চর্চার প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়।

পরবর্তী সম্রাট দ্বিতীয় ইব্রাহীম (১৫৮০-১৬২৭)-ও বিশেষ বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন। গুলকণ্ডা-রাজ মহম্মদ কুলী কুতুব শা-র সহিত ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এই দ্বিতীয় ইব্রাহীম আদিলশা-ই গুলকণ্ডা-রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি মুসলিম-কৃষ্টি ও সাহিত্য প্রচারে যেরূপ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ইসলামীয় ইতিহাসে বিরল। বস্তুতঃ তাঁহার বিদ্যোৎসাহ ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ ভারতীয় মুসলিম সম্রাটদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাঁহার সময়ে পৃথিবী বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্যিক তাঁহার দরবারে একত্রিত হইয়াছিলেন। জুহুরী নামে বিখ্যাত ফারসী কবি নূরুদ্দীন জুহুরী দ্বিতীয় ইব্রাহীমের রাজত্বেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার দুইটি প্রসিদ্ধ ফারসী কাব্যগ্রন্থ খ্বানে-খলীল ও গুলজারে-ইব্রাহীম এই আদিলশাহী সম্রাটের আদেশানুযায়ীই লিখিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ফারসী কবি মীর সঞ্জর ও মালিক কুমী তাঁহারই দরবারভুক্ত ছিলেন। আবার, পৃথিবী বিখ্যাত ঐতিহাসিক হাকিম মহম্মদ কাসিম ফিরিশ্‌তা এই দ্বিতীয় ইব্রাহীমের আদেশানুযায়ীই ভারতের ইতিহাস তারীখে-ফিরিশ্‌তা লিখিয়াছিলেন।

মহম্মদ আদিল শা (১৬২৭-৫৬) ও তাঁহার পরবর্তী সুলতান দ্বিতীয় আলী আদিল শা (১৬৫৬-৭২)-ও তাঁহাদের পিতৃপুরুষদের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যানুরাগী সম্রাট ছিলেন। প্রসিদ্ধ ফারসী কবি হকীম আতশী সুলতান মহম্মদের আদেশেই প্রসিদ্ধ নিজামীর 'খমসহ'-র অনুকরণে তাঁহার দিওয়ান লিখিয়া গিয়াছেন। মুল্লা রফীউদ্দীন তাঁহার তজকিরাতুল্-মুল্কে আদিলশাহী সুলতানদের ইতিহাস (দ্বিতীয় ইব্রাহীম পর্যন্ত) লিখিয়াছিলেন। আর এই সুলতান মহম্মদের আদেশানুযায়ীই মুল্লা মহম্মদ হসন এই আদিলশাহী ইতিহাসকে তদানিন্তন কাল পর্যন্ত পূর্ণরূপ দান করেন।

আদিলশাহী সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্ব হইতেই বীজাপুরে উর্দু কথোপকথন স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল এবং বহমনী রাজত্বকালে রাজকীয় ভাষাও উর্দু ছিল। কিন্তু আদিলশাহী সাম্রাজ্যের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইয়ুসুফ আদিল শা উর্দুভাষার

পরিবর্তে ফারসীভাষা রাজকীয় ভাষারূপে গ্রহণ করেন। প্রায় ৪৫ বৎসর রাজকীয় কার্য ফারসী ভাষায়ই চলিতে থাকে। তৎপর ইব্রাহীম আদিল শা আবার দরবারী ভাষা ফারসী হইতে উর্দুতে পরিবর্তন করেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী স্থলতান আলী তাঁহার রাজত্বকালে আবার ফারসী ভাষার পত্তন করেন। পুনরায় দ্বিতীয় ইব্রাহীম রাজকীয় কার্যে উর্দুভাষাই প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পরবর্তীকালে এই উর্দুভাষাই আদিলশাহী সাম্রাজ্যের ধ্বংস পর্যন্ত রাজকীয় ভাষা ছিল।

ইব্রাহীম আদিল শা একজন উর্দু বিশেষজ্ঞ ও সাহিত্যিক ব্যক্তি। তিনি হিন্দী গানেও একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এবং হিন্দী স্থরের নিয়ম ও পর্যায় সম্বন্ধে দিকনী ভাষার 'নও-রস' নামে তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থের উল্লেখ আছে। আর ফারসী কবি জুহুরী ইহার একটি ফারসী ভূমিকা লিখিয়া গিয়াছেন—ইহা আজ পর্যন্তও 'সি নসরে-জুহুরী' বলিয়া প্রসিদ্ধ। গুলে-রনা প্রণেতা লিখিয়াছেন, ইব্রাহীম আদিল শা-র রাজত্বকালে হিন্দী-গানের চর্চার জন্য বীজাপুর বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে বীজাপুরের নিকটেই 'নৌরস্‌পুর্' নামে একটি শহরের আবাদ হয়। তথায় ভারতের সকল স্থান হইতে রসগ্রাহিগণ আসিয়া গুরু আদিল শাহের নিকট হইতে হিন্দীগান শিক্ষা দ্বারা কৃতার্থ হইতেন। ইব্রাহীমের 'জগৎ-গুরু' নাম এখনো তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দ্বিতীয় আলী আদিল শা-ও উর্দুভাষায় অভিজ্ঞ ও রসিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি উর্দু সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি উর্দুভাষার উন্নতি সাধনে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সময়েই বিশেষ করিয়া অনেক আরবী ও ফারসী গ্রন্থ উর্দুভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক খাফী খাঁ তাঁহার উর্দুভাষার অনুরাগের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন এবং তিনি যে একজন উর্দু কবি ছিলেন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। আদিলশাহী যুগে বীজাপুরে যে সকল উর্দু কবি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কমাল খান রসমী বীজাপুর রাজদরবারে দারুল্-ইন্‌শা বা লিখন বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। রস্‌মী স্থলতান মহম্মদ কুতুব শা-র কন্যা ও মহম্মদ আদিল শা-র স্ত্রী খদীজা স্থলতানা শহরবানু বেগমের আদেশানুযায়ী ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ফারসী খাওর-নামা কাব্যের উর্দু অনুবাদ করেন। ইহাও কাব্যাকারে দিকনী উর্দুতে রচিত। খাওর-নামা ফিরদৌসীর শাহনামার

অনুকরণে লিখিত এবং ইহাতে চতুর্থ খলীফা হজরৎ আলীর যুদ্ধ-বিগ্রহ সমূহ বিবৃত হইয়াছে। মূল-ফারসী কাব্য ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন হুসামুদ্দীন্ অল্-খওআফী রচনা করিয়াছিলেন।

শাহ আমীন নামে প্রসিদ্ধ শেখ আমীনুদ্দীন আলী একজন সুফী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। কথিত আছে, তিনি সকল সময় ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন এবং ইহারই মধ্যে ভাবাবেশে কবিতা বলিয়া যাইতেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ এই সকল ভগবৎ-পূর্ণ চিন্তাদির একত্রিকরণে নাম করিয়াছেন 'জওয়াহিরুল-আসরার। তাঁহার আরো দুইটি গদ্য গ্রন্থের উল্লেখ আছে —রসালয়ে-কবীয় ও রসালয়ে-ওজূদিয়।

নসরতী নামে প্রসিদ্ধ শেখ নসরৎ বীজাপুরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার পূর্ব-পুরুষগণ পুরুষানুক্রমে বীজাপুর রাজসৈন্য বিভাগে কাজ করিয়াছেন। আর তাঁহার পিতা অশ্বারোহী সৈন্যবিভাগের একজন পরিচারক ছিলেন। নসরতীর ভ্রাতা শেখ মনসুর একজন পরম ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার কবর-স্থান বীজাপুরের নগীন-বাগ-এ অবস্থিত সৈয়দ আবদুর-রহমান রজাক কাদিরীর কবরের পাশে আজ পর্যন্ত ও দৃষ্ট হয়। নসরতী তাঁহার গুলশনে-ইশকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে তিনি মহম্মদ আদিল শা-র রাজত্ব-কালেই রাজদরবারে স্থানলাভ করিবার সুযোগ পান এবং ক্রমে ক্রমে কাব্যে ও সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়া আলী আদিল শা-র রাজত্বকালে মলিকুশ্-শুঅরা বা কবিশ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করেন।

নসরতীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিনটী মস্নবী-কাব্য, একটি কসীদা-কবিতা সংগ্রহ ও একটি ঘজল-কবিতা সংগ্রহ। মসনবী-কাব্যসমূহের নাম যথাক্রমে আলী-নামা, গুলসনে-ইশ্‌ক্ ও গুলদস্তয়ে-ইশ্‌ক। আলী-নামা একটি ঐতিহাসিক কাব্য। ইহাতে আলী আদিল শার যুদ্ধ বিগ্রহ, বীরত্বকাহিনী ও চরিত কথা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে কোন কোন জীবনীকার তারীখে-আলী আদিলশা বলিয়া উল্লেখ করিলেও, কবি নিজে ইহাকে 'শাহনামায়ে-দিকন্' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

গুলশনে-ইশ্‌ক একটি প্রেমকাব্য। ইহাতে মনোহর ও মদ-মালতীর প্রেমকাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা প্রায় চারি হাজার বয়েতের সমষ্টি ও ইহা রচিত হয় ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা আকেল্ খান রাজী রচিত সমা ও পরওয়ানা নামক ফারসী কাব্যের উর্দু অনুবাদ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আকেল খান রাজী-ও মনোহর

ও মদ-মালতীর প্রেমকাহিনী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা রচিত হয় গুলশনে-ইশ্‌ক রচিত হইবার প্রায় ১ বৎসর পরে।

নসরতী ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন এবং তাঁহার মৃতদেহও সৈয়দ আবদুর রজ্জাক কাদিরীর কবরের পাশে রক্ষিত হয়। ইব্রাহীম জুবয়রী তাঁহার কবিতার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন এবং তাহার কাব্যকে প্রসিদ্ধ ফারসী কবি খাকানীর কবিতার সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন।

কবি শাহ মলিক বীজাপুরের অধিবাসী ও সুলতান দ্বিতীয় আলী আদিল শার সমসাময়িক। তিনি আহকামুস্‌-সলওয়াৎ নামে দকনী ভাষায় একটি গ্রন্থ কাব্যাকারে রচনা করেন। ইহাতে নমাজ বা প্রার্থনার নিয়ম কানুন ও ইহার উপকারিতা বিবৃত হইয়াছে। ইহাও বস্তুতঃ একটি ফারসী গ্রন্থের অনুবাদমাত্র এবং অনূদিত হয় ১৬৬৬ (বা ১০৭৭ হিজরী) খৃষ্টাব্দে। কবিও তাঁহার কাব্যের উপসংহারে এই মর্মে লিখিয়াছেন,

ইয়্‌ মসলিয়ান্[1] কো দখ্‌নী কিয়া ইস্‌ সবব্‌;
ফহম্‌ করকে দিল্‌ মেঁ করে ইয়াদ্‌ সব্‌।
সো ইয়্‌ শীন্‌ আলিফ্‌ হে ব মীম্‌ লাম্‌ কাফ্‌[2];
ফরস্‌ কোঁ দখ্‌নী মেঁ বোলিয়া হৈ স্বাফ্‌।
সন্‌ য়ক্‌ হজার্‌ সো সত্তর পো সাং;
কিয়া থা ইসি সাল্‌ মেঁ ইয়্‌ মুকাং।

কবি সীবা (সীব্রা)-র আদি নিবাস গুলবর্গা হইলেও, বীজাপুরেই তিনি তাঁহার অধিকাংশ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রসিদ্ধ রৌজতুস্‌-শুহদা দকনী ভাষায় কাব্যাকারে অনুবাদ করেন। আনোয়ারে-সুহয়লী ও আখ্‌লাকে-মহসনী প্রভৃতি ফারসী গ্রন্থের প্রণেতা মৌলানা কমালুদ্দীন্‌ হুসেন্নুল্‌-ওয়াজ রৌজতুস্‌-শুহদার মূল গ্রন্থকার। ইহাতে কারবালায় ঘটিত বিষাদ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এবং এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালেও আরো দকনী গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বাঙ্‌লা সাহিত্যে বিখ্যাত 'বিষাদ-সিন্ধু'ও এই কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই রচিত।

সৈয়দ মীরান তাঁহার মুর্শিদ শা হাশিম আলবীর নামানুসারে তাঁহার কবি-নাম হাশিমী গ্রহণ করেন। শা হাশিম বীজাপুরেরই একজন প্রসিদ্ধ সুফী এবং শা ওয়জীউদ্দীন গুজরাতীর ভ্রাতুষ্পুত্র। হাশিমী তাঁহার পীর বা

১। অর্থাৎ উপদেশাবলী।

২। অর্থাৎ شاہ ملک (বা শাহ মলিক্‌) কবির নাম।

গুরুদেবের আদেশানুযায়ী প্রসিদ্ধ ফারসী কাব্য ইয়ুসুফ জুলয়খা দকনী-ভাষায় কাব্যাকারে অনুবাদ করেন। তৎকালীন সকল ঐতিহাসিক ও জীবনী-সংগ্রাহক একবাক্যে এই উর্দু-কাব্যের সুখ্যাতি করিয়াছেন। ইহা ১৬৮৭ (১০৯৯ হিজরী) খৃষ্টাব্দে রচিত হয় এবং কবি নিজেই লিখিয়াছেন,

মুরত্তব্ কিয়া মৈঁ কিস্‌স্ হ্ কো তো ;
হজ়ার্ য়ক্ বরস পর্ থে নোদ্ পো নো।

এই কাব্য ছয় হাজার বয়ৎ-যুক্ত এবং নিম্নলিখিত দ্বি-পঙ্‌ক্তি দ্বারা সূচিত হইয়াছে,

সুনা হম্‌দে-ইস্ কৌন্ সজাওয়ার হৈ ;
সগল্-ইশ্‌ক্ জিস্‌কা ইয়ু সত্তার হৈ।

سنا حمد اس کون سزاوار ہے — سگل عشق جسکا یو سنار ہے

এই কাব্য ছাড়া হাশিমীর একটি দেওয়ান (দীবান্ বা কাব্য-সংগ্রহ) -এরও উল্লেখ আছে। কসীদা ও ঘজল ব্যতীত মর্সীয়, কিতা, রুবায়ী প্রভৃতি নানাপ্রকার কবিতারই সমাবেশ ইহাতে রহিয়াছে। তাছাড়া ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে তাঁহার ঘজলের অধিকাংশকেই রীখ্‌তা না বলিয়া বরং রীখ্‌তী বলা যাইতে পারে। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও অনুমিত হয় যে তিনি ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৬) মুঘল যুগ ও দিকনী কবি

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সর্ব প্রথম সম্রাট আকবর (১৫৫৫-১৬০৫) ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন। ইহার পর হইতেই মুঘলরাজগণ কর্তৃক ক্রমান্বয়ে দাক্ষিণাত্য অভিযান সুরু হয়। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে শাজাহান দাক্ষিণাত্যে সৈন্যাভিযান প্রেরণ করেন এবং কয়েকবার আক্রমণ ও লড়াইয়ের ফলে আহমদনগর মুঘলাধিকৃত হয়। আওরঙ্গজেব-ও তাঁহার রাজত্বকালে প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধাভিযানের পর ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে আদিল-শাহী সুলতানকে পরাজিত করিয়া বীজাপুর দখল করেন। ইহার পর আবার প্রায় ৯ মাস ক্রমান্বয়ে যুদ্ধাভিযানের ফলে কুতুবশাহী সুলতানকে পরাস্ত করিয়া ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি গুলকণ্ডা অধিকার করেন।

গুলকণ্ডা ও বীজাপুরে মুসলিম সম্রাটগণ উর্দু সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য যে অদম্য উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। কথিত আছে, তাঁহারা প্রত্যেক রচনার জন্য অন্ততঃ এক হাজার টাকা পারিতোষিক দান করিতেন। এইরূপে দাক্ষিণাত্য তথা বীজাপুর ও গুলকণ্ডায় উর্দু সাহিত্যের যে একদা কেন্দ্রস্থল স্থাপিত হইয়াছিল, দাক্ষিণাত্য সম্রাটগণের বিলুপ্তির পরেই যে তাহা অচিরেই সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে—ইহা কখনই অনুমান করা যায় না। বস্তুতঃ পরবর্তী যুগে স্বভাবের বশবর্তী হইয়াই সাহিত্যিকগণ উর্দু চর্চায় আরো বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং এইভাবে উর্দু ভাষা তথায় সাধারণের কথ্য ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মুঘলযুগে দাক্ষিণাত্যে যে সকল কবি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল।

মহম্মদ আলী আজিজ বস্তুতঃ কোথাকার অধিবাসী ছিলেন, তাহা সঠিক জানা না গেলেও আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য জয়ের সময় তিনি যে দাক্ষিণাত্যেই বসবাস করিতেন এই সম্বন্ধে মতানৈক্য নাই। তাঁহার নিম্ন লিখিত গ্রন্থসমূহ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

(১) কিস্বায়ে-ফীরূজশা — ইহা ফারসী মহবুবুল্-কুলুব্-অন্তর্ভুক্ত ফীরূজ্শাহ নামক কাহিনীর উর্দু কাব্য-রূপ।

(২) কিস্সয়ে-মলিকে-মিস্বর — ইহাও একটি ফারসী গদ্য গ্রন্থের উর্দু কাব্যানুবাদ।

(৩) কিস্সায়ে-লাল ও গৌহর একটি মৌলিক গ্রন্থ ও রসাত্মক কাব্য। বাঙলার জমরুর্দশাহের পুত্র লাল ও নগীনার জওয়াহরশাহের কন্যা গৌহর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। তাহাদের প্রেমকাহিনী এই ক্ষুদ্র কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হসন আলী ইজ্জৎ ইহার একটি ফারসী অনুবাদ-কাব্য রচনা করেন। উর্দু সাহিত্যের ঐতিহাসিক ফরাসী পণ্ডিতপ্রবর টাসী সাহেব ইহাকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি কবি আজিজের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁহার উর্দু-ইতিহাসে এই কাব্য-কাহিনী সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃতও করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রথম পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইলহী দে মুঝে রঙ্গীন বয়ানী ;
আতা কর মুজ্‌কোঁ ইয়াকুতে মানী।

الہی دے مجھے رنگین بیانی — عطا کر مجکوں یاقوت معانی

অর্থাৎ, হে ভগবান, আমাকে সুষমামণ্ডিত বর্ণনাশক্তি, (এবং) ইহার জ্যোতির্ময় অর্থ প্রদান কর।

বহরুদ্দীনের পুত্র কাজী মামুদ বহরী একজন সুফী ব্যক্তি ছিলেন। কাজীয়ে-দরিয়া নামেও তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে। নসরতাবাদের নিকটবর্তী গোগী তাঁহার জন্মভূমি। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বীজাপুর আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। শীঘ্রই তথায় সুলতান সিকন্দর আদিল শা-র সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাজদরবারে দুই বৎসর অতিবাহিত করার পর আদিলশাহী সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ায় তিনি তথা হইতে হায়দরাবাদ আসেন। তিনি ফারসী ও দিকনী ভাষায় নানাবিধ কবিতা যথা, গজল, কাসীদা ও রুবায়ী লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতা বা বয়েৎ সমষ্টি ন্যূনাধিক ৫০ হাজার ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কথিত আছে, বীজাপুর হইতে হায়দরাবাদ আগমন কালে রাহজনী হওয়ার ফলে তাঁহার সকল কাগজপত্রও হস্তান্তর হয়। তিনি নিজেই এই ঘটনার উল্লেখ পরবর্তী কালে লিখিত তাঁহার আরুসে-উর্ফান নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বহরী দিকনী ভাষায় 'মন-লগন' নামক একটি সুফীতত্ত্ব বিষয়ক কাব্য লিখিয়াছেন। ইহার রচনাকাল ১৭০০ খৃষ্টাব্দ। তাঁহার শিষ্যবর্গের অনুরোধে

তিনি তাঁহার 'মন-লগন'-এর ফারসী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থেরই নাম পূর্ব উল্লিখিত আরূসে-উর্ফান।

আমীন নামে প্রসিদ্ধ শেখ মহম্মদ আমীন বিখ্যাত ফারসী কাব্য ইউসুফ-জুলেখার উর্দু কাব্যানুবাদ করেন। ইহা ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। বস্তুতঃ উর্দু কাব্যটিও মূল ফারসী হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। মূল-কাব্যের ন্যায় তাঁহার অনূদিত কাব্যটিও নিম্নলিখিত রয়েৎ দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

আওয়াল তারীফ সুন্ খালেক্ কী আয়ে ইয়ার্ ;
কি ওয়ে দুনোঁ জহান্ কা হায় করনহার্।

اول تعریف سن خالق کی ای یار — کہ وے دونوں جہان کا ہے کرنہار

অর্থাৎ, হে বন্ধু, সর্বপ্রথম সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা শুন — তিনি উভয় পৃথিবীর কর্মকর্তা।

ওয়ালী (বলী) দখ্নী আমাদের প্রসিদ্ধ উর্দু কবি ওয়ালী আওরঙ্গাবাদী নহেন। মরাতুল-জন্নাতের গ্রন্থকার মুল্লা মহম্মদ বাকীর আগাহর মতে ওয়ালী দখ্নী ওয়্লি্‌ওয়ারান (=বয়িলবরান্)-এর অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমির নামানুসারে আমাদের কবিবর তাঁহার কবি-নাম 'ওয়ালী' গ্রহণ করেন। তাঁহার আসল নাম সৈয়দ মহম্মদ ফৈয়াজ। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তিনি দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন ও তথায় প্রসিদ্ধ সাত-গড় নামক স্থানে অবস্থান করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি 'কড়পা' নামক স্থানে আসেন এবং শীঘ্রই তথাকার শাসনকর্তা আবদুল মজিদ খানের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি তাঁহাকে একটি চাকরীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কার্যব্যপদেশে সিরহুট প্রেরণ করেন। কবি নিজেই তাঁহার কিস্বায়ে-রতন ও পিদম নামক কাব্যে এই সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নিম্নলিখিত কাব্যসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) কিস্বায়ে-রতন ও পিদম তাঁহার সিরহুট স্থানে অবস্থিতিকালে রচিত হয়। এই কাব্যের অনেক স্থানেই কবিবর তাঁহার কবিনাম ওয়ালী উল্লেখ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,

ওয়ালী তেরে করম কী হায় মুঝে আস্ ;
নকর উস্ আস্ সোঁ হরগিজ তু নিরাস্।

ولی تیرے کرم کی ہے مجھے آس —
نکر اُس آس سوں ہرگز تو نراس

অর্থাৎ, হে ওয়ালী, তোমার দয়াই আমার আশাভরসা ; এই আশা হইতে আমাকে কখনই নিরাশ করিও না।

অথবা,

রলী হৈ ইয়ূ সবব্ খালী বহানা ;
উসী কা কাম্ হৈ দেনা দিলানা।

(২) রৌজতুস্-শুহদা—ইহাতে কারবালার বিষাদময় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচনাকাল ১৭০৭ (বা ১১১৯ হিজরী) খৃষ্টাব্দ। কবি নিজেই তাঁহার কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

কিয়া হূঁ যব্ খতম্ ইয়ূ দর্দ কা ঃহাল ;
অগিয়ারহ নো পো থা উনিসোয়ান্ সাল্।

(৩) এই সকল কাব্য ছাড়া কবির একটি মুনাজাৎ বা প্রার্থনাসমষ্টিরও উল্লেখ আছে। ইহাতে চারি পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট ২৫টি 'বন্দ্' রহিয়াছে। নিম্নে ইহা হইতে একটি বন্দ্ উদ্ধৃত হইল।

ইয়া ইলহী তোঁ বহক্ মুসতফা হোর্ মুর্তজা ;
ফাতিমা খাতুনে-জিন্নৎ হোর্ শাহে-কর্বলা ;
আকিবৎ তোঁ খয়ের করনা আরজ হায় মেরী সদা ;
ইয়া সাহেবে-আরশে-বরীন্ মুঁঝ্ হাল পর ইহসান্ করো।

یا الہی توں بحق مصطفٰ ہور مرتضا —
فاطمہ خاتون جنت ہور شاہ کربلا
عاقبت توں خیر کرنا عرض ہے میری سدا —
یا صاحب عرش بریں منجہ حال پر احسان کرو

অর্থাৎ, হে ভগবান, তুমিই বস্তুতঃ মনোনীত ও নির্বাচিত (পয়ঘম্বর হজরৎ মহম্মদ) (এবং) স্বর্গরাজ্যের (সংযম-প্রসূতা) পবিত্রা ফাতিমা ও কারবালা যুদ্ধক্ষেত্রের) সম্রাট (আলী)। হে পবিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের অধিপতি, আমার অবস্থার প্রতি সদয় হও -- অন্তিমে এই শুভ ইচ্ছাই সদাসর্বদার জন্য কাতর প্রার্থনা।

কর্ণৌলের অধিবাসী ওয়জদী নামে প্রসিদ্ধ শেখ্ বজীহ্ উদ্দীন্ দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে নিম্নলিখিত কাব্যসমূহ রচনা করেন।

(১) বাঘে-জান্‌ফজা একটি সুফীতত্ত্বপূর্ণ মসনবী কাব্যগ্রন্থ। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ইহা রচিত হয় এবং এই কাব্য রচনার কারণ সম্পর্কে কবি নিজেই তাঁহার কাব্যের দীবাচা বা উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, কবিবর কোন এক

সময়ে তাঁহার নিজ জন্মভূমি হইতে ফতেহাবাদ ধারওয়ার-এ পদার্পণ করেন এবং তথায় তাঁহার বন্ধু আবদুল-কুদ্দুসের সহিত বসবাস করিতে থাকেন। বন্ধুবর আবদুল-কুদ্দুসও একজন সুফী ব্যক্তি। সেই সময়ে তাঁহার মুর্শিদ শাহ সাদিকও তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। শাহ সাহেব ঘটনাক্রমে তাঁহাদের আলাপ আলোচনা কালে একটি মনোরম কাহিনীর বর্ণনা করেন। এবং ফারসীতে লিখিত সেই কাহিনীটির উর্দু অনুবাদ করিতে ওজদীতে আদেশ করেন। পরে ধারওয়ার হইতে আওরঙ্গাবাদ পৌছিয়া শাহ সাহেব সেই মনোরম কাহিনী সম্বলিত ফারসী গ্রন্থটি ওয়জদীর নিকট প্রেরণ করেন। আমাদের আলোচিত গ্রন্থটী সেই ফারসী গ্রন্থেরই অনুবাদ কাব্যমাত্র। ওয়জদী আরো লিখিয়াছেন যে মূল গ্রন্থটিতে বইয়ের নাম বা ইহার গ্রন্থকারের কোন উল্লেখ ছিল না।

(২) পঞ্ছী বাছা (বা বাছাই পক্ষী) প্রসিদ্ধ ফারসী কবি ফরিদুদ্দীন্ আত্তারের বিখ্যাত সুফীকাব্য মনতিকুৎ-তয়রের দিকনী কাব্যানুবাদ। কবি নিজেই এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

আস্‌ল্ মেঁ ইয়্ থা কলাম্-ই-ফারসী ;
আহল্-ই-ম'অনী কো মসাল্-ই-আর্সী।
খুশ্‌তরীন্-তস্‌নীফ্-ই-শেখ্-ই-নামদার্
পেশূয়া-ই-'আরিফান্ ই-রোজ্‌গার্।
শেখ্-ই-স্বাঃহিব্ দিল্ ফরীদ্-ই-নামরার্,
খাস্‌ জিন্‌কা হৈ লক্কব্ 'অত্তার্ কর্।

(৩) তুহফয়ে-আশিকান্-ও একটি মসনবী অনুবাদ-কাব্য। ইহা ফরীদুদ্দীনের অন্য একটি সুফীতত্ত্বপূর্ণ কাব্য খসরুনামা বা গুলে-হরমুজের দিকনী অনুবাদ। ইহার কাব্যানুবাদ সম্পর্কে কবিবর নিজেই লিখিয়াছেন,

কজারা দিয়া মুজকোঁ এক বারকা ;
গুলে-হর্মুজ উস শেখ আত্তার কা।
হোয়া শৌক পয়দা মুঝে বাদ্ আজাঁ ;
কি দিকনী জবান্ সোঁ করোঁ তর্জুমাঁ।

قضارا دیا مجکوں یک بار کا — گل ہرمز اُس شیخ عطار کا
ھوا شوق پیدا منجہے ازاں — کہ دکنی زبان سوں کروں ترجماں

ইহা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

(চ) আওরঙ্গাবাদ ও কবি ওয়ালী

আওরঙ্গাবাদের পূর্বনাম ছিল খর্কী। ইহা দাক্ষিণাত্যের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত। মুঘল সম্রাট শাজাহান যখন দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন, অম্বর-রাজের রাজকীয় কেন্দ্রস্থল ছিল এই খর্কী শহর। তখন হইতেই ইহার সমৃদ্ধি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। তৎপর আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য অধিকার করিলে, আওরঙ্গাবাদে দাক্ষিণাত্যের মুঘল-রাজধানী স্থাপিত হয় ও ইহার নামকরণ হয় আওরঙ্গাবাদ। নূতন-রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লোকের সহিত অনেক কবি ও সাহিত্যিকও তথায় যাইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যে সকল গুণী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আবে-হায়াৎ প্রণেতা আজাদ সাহেব ওয়ালী (=বলী) বা ওয়ালী আওরঙ্গাবাদী-কে উর্দু সাহিত্যের বাবায়ে-রীখ্‌তা অর্থাৎ সর্বপ্রথম উর্দু কবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনিই প্রাচীন উর্দু কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাম বা জন্মভূমি সম্বন্ধে জীবনী-কারদের মধ্যে বিশেষ মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। মীর হসন দিহলবী, মির্জা আলী লুৎফ্‌ এবং আব্দল-গফুর খান নস্‌সাখ্‌ ওয়ালীর নাম ওয়ালীউল্লা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার, নবাব আলী ইব্রাহীম খান এবং ইয়ুসুফ আলী মুর্শিদাবাদী-র জীবনী-সংগ্রহে তাঁহার নাম শম্‌স্‌ ওয়ালীউল্লা অভিহিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতানুযায়ী আজাদ সাহেবও তাঁহার নাম শম্‌স্‌ ওয়ালী-উল্লা-ই লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার নাম ছিল মহম্মদ ওয়ালী এবং বিশেষ করিয়া লছমী নারায়ণ শফীক ও ফতেহ আলী গর্দীজী এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। নবাব আলী ইব্রাহীম খান, ইয়ুসুফ আলী, নবাব মুস্তফা খান শেফ্‌তা, ফতেহ আলী গর্দীজী এবং কিয়ামুদ্দীন কিয়াম ওয়ালীর বাসস্থান দিকন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার, কুদরৎ উল্লা খান কাসিম, আব্দুল গফুর খান নস্‌সাখ এবং মৌলানা আজাদ তাঁহার জন্মভূমি গুজরাট—এইমত

পোষণ করেন। আর উল্লিখিত জীবন সংগ্রহকারীদের মতের প্রামাণ্যরূপে ইব্রাহীম শায়ানী ওয়ালীর নিম্নলিখিত কবিতাংশটি উল্লেখ করিয়াছেন,

ওয়ালী ঈরান ও তুরান মেঁ হায় মশ্‌হূর ;
ওয়াতন গো উস্কা গুজরাৎ ও দিকন হায়।

ولی ایران و توران میں ہے مشہور —
وطن گو اسکا گجرات و دکن ہے

বস্তুতঃ উল্লিখিত কবিতাংশটিতে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির খাঁটিরূপ সম্ভবতঃ এইরূপ হইবে—অগরচিহ শা'ইর্-ই মুল্‌ক্-ই-দিকন্ হৈ।

লছমী নারায়ন শফীক ও মীর তকী মীর—ওয়ালীর জন্মভূমি আওরঙ্গাবাদ ছিল—এই মতের পোষণকারী। আর শফীক ওয়ালীর গুজরাট নিবাস সম্বন্ধে বিশেষভাবে আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহার মতে —মর্দান নসবতে-উ ব-গুজরাৎ দাদন্দ্; ঘলতে-মহজ্ অস্ত্—

[مردان نسبت او بگجرات دادند ـ غلط محض است ـ]

হাকিম কুদরতুল্লা খান কাসিম, আব্দুল গফুর খান নস্সাথ্ এবং মৌলানা আজাদের মতে ওয়ালী শেখ ওয়াজী-উদ্দীন গুজরাতীর বংশসম্ভূত। কিন্তু লছমী নারায়ণ শফীকের মতে ওয়ালী গুজরাট পৌছিয়া তাঁহার দরগা বা আস্তানায় শিক্ষালাভে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবং তথা হইতে সুরাট হইয়া 'বয়তুল্লা' অর্থাৎ মক্কা পরিদর্শনার্থে গমন করেন। তারপর মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আহমদাবাদে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে আহমদাবাদী বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার জন্মভূমি আহমদাবাদ নয়। তিনি তাঁহার জন্মভূমি আওরঙ্গাবাদ হইতে শিক্ষালাভার্থে তখনকার প্রসিদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রস্থল আহমদাবাদে গমন করিয়াছিলেন ও তথায় দীর্ঘকাল অবস্থানও করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে আহমদাবাদেই অবস্থিত দরিয়াখানের কবরের নিকটবর্তী নীলী গুম্বদে সমাধিস্থ করা হয়।

অধিকাংশ জীবনী-সংগ্রাহকদের মতে ওয়ালী দিল্লীও আগমন করিয়াছিলেন এবং তথায় অনেকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দিল্লী অবস্থানের কাল সম্বন্ধে মতানৈক্য রহিয়াছে। মৌলানা আজাদ ও গুলে-রনা-প্রণেতার মতে ওয়ালী মুঘল সম্রাট মহম্মদ শা (১৭১৯-১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ)-র রাজত্বকালে দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উক্তির

প্রামাণ্যস্বরূপ তাঁহারা কিছুই উল্লেখ করেন নাই। অধিকাংশ জীবনীকার তথা মীর হসন দিহলবী, মীর তকী মীর, নবাব আলী ইব্রাহীম খান, ইয়ুসুফ আলী মুর্শিদাবাদী, মির্জা আলী লুৎফ্ ও আব্দুল গফুর খান নস্‌সাখের মতে ওয়ালী সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের এই উক্তি অনেক প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত করিতে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। তকী মীর বলেন, ওয়ালী শাজহানাবাদ তথা দিল্লীতেও আগমন করিয়াছিলেন এবং তথায় প্রসিদ্ধ সুফী মিঞা গুলশনের সাক্ষাৎলাভ করেন। তিনি মিঞা সাহেবকে তাঁহার কবিতা হইতে কতকাংশ আবৃত্তি করিয়া শুনাইলে পর, তিনি ওয়ালীকে ফারসী রচনা পরিত্যাগ করিয়া রীখ্‌তার সাহায্যে কবিতা লিখিতে অনুপ্রাণিত করিলেন। কারণ, ইহাতেই ওয়ালীর বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিবার সুযোগ রহিয়াছে।[১] ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে মিঞা গুলশনের দিল্লী অবস্থানকালেই ওয়ালী তথায় আগমন করিয়াছিলেন। জীবনীকার সরখোশের মতে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে তিনি দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ওয়ালী নিশ্চয়ই তাহার পরবর্তী কোন সময়ে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ওয়ালী বস্তুতঃ দুইবার দিল্লীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। প্রথম ১৭০০ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে। এই সময়ে সাদুল্লা গুলশনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। যদিও তাঁহার শিষ্যত্ব আমাদের কবিবর গ্রহণ করেন নাই, তাহা হইলেও তাঁহাকে রীখ্‌তাতে কবিতা লিখার উপদেশ ছাড়াও তিনি যে মিঞাসাহেবের নিকট হইতে সুফীতত্ত্ব বিষয়ে নানারূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমিত হয়। দ্বিতীয়বার ওয়ালী আসেন ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শা-র রাজত্বকালে। এই সময়ে তিনি সৈয়দ আবুল-মালীকে সঙ্গে করিয়া দিল্লী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং কথিত আছে দিল্লী ও সিরহিন্দের প্রসিদ্ধ কবরস্থান সমূহ এই সময়েই তিনি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সৈয়দ আবুল মালীও একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এবং ওয়ালীর

১। در شاهجهان آباد دهلی نیز امده بود و بخدمت میان گلشن رفت و از اشعار خود پارهٔ خواند — میان صاحب فرمودند این همه مضامین فارسی که بیکار افتاده اند در ریختهٔ بکار ببر از تو که محاسبه خواهد گرفت —

সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এই যাত্রায় তাঁহার রীখ্‌ত-দীয়ান্‌ও ওয়ালীর সঙ্গে ছিল এবং আপামর সকলেই তাঁহার উর্দু কবিতায় মুগ্ধ হন। তখন হইতেই দিল্লী তথা উত্তর-ভারতে উর্দু কবিতার চর্চা বিশেষভাবে স্থুরু হয় এবং এই হিসাবেই উত্তর-ভারতের বাবায়ে-রীখ্‌তা (বা উর্দু কবিতার জনক) বলিয়া ওয়ালীকে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মৌলানা আজাদ ও গুলে-রনা-প্রণেতার মতে ওয়ালী তাঁহার দেওয়ান ব্যতীত রিসালায়ে-মুরুল্‌-মরিফৎ নামক একটি সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ইহা আজকাল দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয় বার দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ওয়ালী কারবালা-প্রান্তরের বিষাদ-কাহিনীর অনুকরণে 'দহ-মজলিস' নামে একটি উর্দু কাব্য-গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আর নসর এই কাব্যকাহিনীই গদ্যে রূপান্তর করেন। কাহারো কাহারো মতে নসরের গদ্যাকারে দহ-মজলিস ওয়ালীর মূল-গ্রন্থ হইতেও রসাত্মক হইয়াছে। তাই আধুনিক যুগে গদ্যাকারে দহ-মজলিসই অধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। গুলশনে-হিন্দ রচয়িতার মতে ওয়ালী একটি হিন্দী-দেওয়ান-ও লিখিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

ওয়ালীর দেওয়ানে-রীখ্‌তার অধিকাংশ কবিতাই ঘজল। তা'ছাড়া দেওয়ানের শেষ কতকাংশে উপদেশাত্মক মুস্তজাদ্‌, মুখম্মিস্‌, তরজী-বন্দ্‌ ও কয়েকটি ছোট ছোট মসনবী কবিতা আছে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রফেসার টাসী সর্বপ্রথম প্যারিস হইতে ওয়ালীর দেওয়ান সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ অবস্থিত নওয়াল কিশোর প্রেস ইহাকে দ্বিতীয়বার সম্পাদনা করেন এবং ইহার পরে আরো কয়েকবারই নওয়াল কিশোর প্রেস ইহার সম্পাদনা কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। আধুনিক কালে পুণায় অবস্থিত দেকন কলেজ (Deccan College)-এর ফারসী অধ্যাপক ইব্রাহীম শায়ানী দিল্লী হইতে ওয়ালীর দেওয়ানের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার উপক্রমণিকাতে ওয়ালীর জীবনী ও তাঁহার কাব্যোৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তবে আহসন মারহরবী কর্তৃক সম্পাদিত কুল্লিয়াতে-ওয়ালীই আজকাল বিশেষ প্রসিদ্ধ ও তাঁহার লিখিত কুল্লিয়াতের উপক্রমণিকা বেশ সরস ও অনেক তথ্যপূর্ণ।

ওয়ালীর পরবর্তী সকল কবিই একবাক্যে তাঁহার কবিতার প্রশংসা করিয়াছেন। কাহারো কাহারো মতে তাঁহার সরল ও সরস প্রকাশভঙ্গীর জন্যই ওয়ালী এখন পর্যন্তও উর্দু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া

বিবেচিত হইয়া থাকেন। নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার কবিতার কয়েকটি বয়েৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

দিল্ ছুর্ কে ইয়ার্ কিয়োন্ কি জাওয়ে ;
জ.খ্মী হৈ শিকার্ কিয়োন্ কি জাওয়ে।

আবার,

দুশ্মন্-ই-দীন্ কা দীন্ দুশমন্ হৈ ;
রাহজ.ন্ কা চিরাঘ্ রহজ.ন্ হৈ।

কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কবি গাহিয়াছেন,

খুব রূ খুব কাম করতে হায়ঁ ;
এক নিগা মেঁ ঘুলাম করতে হায়ঁ।
দিল হুয়া হায় মরা খরাব স্থখুন ;
দেখ্ কর হুসনে-বে হিজাব স্থখুন।
বুজমে-মানী মেঁ সরখুশী হায় উসে ;
জিস কো হায় নিশায়ে-শরাব স্থখুন।
রাহে-মজমুনে-তাজা বন্দ নহীঁ ;
তা কিয়ামৎ খুলা হায় বাবে-স্থখুন।
গৌহর উসকী নজর মেঁ জা না করে ;
জিস নে দেখা হায় আব ও তাবে-স্থখুন।
হায় স্থখুন জগ মেঁ আদীমুল্-মসল ;
জুজ স্থখুন নহীঁ হু জা জবাবে-স্থখুন।
শয়র ফহমুন্ কী দেখ কর গর্মী ;
দিল হুয়া হায়ঁ মরা কবাবে-স্থখুন।
উর্ফী ও আন্ওয়ারী ও খাকানী ;
মুঝকো দিতে হায় সব হিসাবে-স্থখুন।
আয় ওয়ালী দর্দে-সর কভু না রহে ;
জব মিলে সন্দিল ও গুলাবে-স্থখুন।

خوب رو خوب کام کرتے ہیں — اک نگہ میں غلام کرتے ہیں
دل ہوا ہے مرا خراب سخن — دیکھ کر حسن بیحجاب سخن
بزم معنی میں سر خوشی ہے اُسے — جس کو ہے نشۂ شراب سخن
راہ مضمون تازہ بند نہیں — تا قیامت کھلا ہے باب سخن

گوهر اسکی نظر میں جا نہ کرے —
جس نے دیکھا هے آب و تاب سخن
هے سخن جگ میں عدیم المثل —
جز سخن نہیں دوجا جواب سخن
شعر فہموں کی دیکھ کر گرمی — دل هوا هے مرا کباب سخن
عرفی و انوری و خاقانی — مجھکو دیتے هیں سب حساب سخن
ای ولی درد سر کبھو نہ رهے — جب ملے صندل و گلاب سخن

অর্থাৎ, সুন্দর মুখের জয়—চক্ষের পলকে সে (সকলকে) ঘুলাম করে। কাব্যের অনাবৃত মুখ দেখিয়া আমার দিল পাগল-প্রায়। কাব্যই যাঁহার মদের নেশা, কবি-সভায় তাঁহারই সম্মান। নূতন ভাবধারা কখনও বন্ধ হয় না, কারণ, শেষদিন পর্যন্ত কাব্য-দ্বার খুলা থাকিবে। যে কাব্যের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার চক্ষে টাকা পয়সার বিশেষ মূল্য নাই। জগতে কাব্যই অমূল্য সম্পদ—এই উভয় পৃথিবীতে কাব্যের সমতুল্য কেবল কাব্যই। কাব্যের ভাব-সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া আমার মন বিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে। (ফারসী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবি) উর্ফী, আম্বয়ারী, ও খাকানী সকলেই আমাকে কাব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দিয়াছেন। হে ওয়ালী, যখন কাব্যের গোলাপ ও চন্দন প্রবাহিত হয়, তখন আমার আর কোন দুঃখ নাই।

ওয়ালীর ধর্মের কোন গোঁড়ামি ছিল না। বস্তুতঃ তিনি একজন খাঁটি সুফীমতবাদী ছিলেন। তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের প্রতিই বেশ হৃদ্যতা ছিল। এমন কি তাঁহার কবিতায় তাঁহার কয়েকজন হিন্দু অন্তরঙ্গ বন্ধুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি কোন রাজদরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, বা কোন আমীর-উমরার প্রশংসাসূচক কবিতাও তিনি লিখেন নাই।

ওয়ালীর মৃত্যু-তারিখ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। ফরহঙ্গে-আসফিয়াতে তাঁহার মৃত্যু তারিখ ১১০১ হিজরী (বা ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ) লিখিত হইয়াছে; আবার, তজকিরায়ে-গুয়ারায়ে-দিকনে ১১৫৫ হিজরী (বা ১৭৪২ খৃষ্টাব্দ) -তে ওয়ালীর মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় তারিখটি যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কারণ, ১১৪৩ হিঃ (বা ১৭৩০ খৃঃ) -তে আহমদাবাদে লিখিত তাঁহার দেওয়ানের একটি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার উপসংহারে লিখিত আছে—'তমাম্ শুদ্ দীবান্-ই-বলী

রহমতুল্লা 'অলয়হি'। সুতরাং ওয়ালী ১৭৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোন সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

সিরাজ নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ সিরাজুদ্দীন আওরঙ্গাবাদের অধিবাসী। তিনি ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। স্ব-রচিত মুন্তখিব-দুয়াওয়িন হইতেই তাঁহার জীবন-কাহিনী সবিস্তারে অবগত হইতে পারি। ইহা ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হয় এবং ইহাতে তাঁহার পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক ফারসী সুফীদের উপদেশপূর্ণ বাক্যাবলী উর্দু কাব্যাকারে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। তিনিও একজন প্রকৃত সুফী দরবেশ ছিলেন। তাঁহার একটি ফারসী ও একটি উর্দু দেওয়ানেরও উল্লেখ আছে। তিনি বস্তুতঃ প্রসিদ্ধ ওয়ালীর ভাবশিষ্য।

শিরাজের একটি গজল নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

খবরে-তহয়ুরে-ইশ্‌ক সুন্ না জনুন্ রহা না পরী রহী ;
না তু তু রহা না তু মেঁ রহা যো রহী সো বে খবরী রহী।
শাহে-বে-খুদী নে আতা কিয়া মুঝে আব লবাসে-বরহঙ্গী ;
না খিরদ কী বখিয়াগরী রহী না জনুন্ কী পর্দাদরী রহী।
চলী সিম্‌তে-ঘয়েব সে এক হাওয়া কি চমন সরুর কা জল গিয়া ;
মগর এক শাখে-নিহালে-ঘম জিসে দিল কহী সু হরী হরী।
নজরে-তঘাফিলে-ইয়ার কা গিল্লা কিস জবান সেঁ বয়ান করূঁ ;
কি শরাবে-সদ কদহে-আর্জু খমে-দিল মেঁ থী সো ভরী রহী।
ওহ আজব ঘড়ী থী কি জিস ঘড়ী লিয়া দর্সে-নুস্‌খয়ে-ইশ্‌ক কা ;
কি কিতাবে-অকল কী তাক পর জিয়ুন্ ধরী থী ইয়ুন্‌হী ধরী রহী।
তেরে জোশ হয়রতে হুসন কা আসর ইস কদর সেঁ আয়ান হুয়া ;
কি না আয়না মেঁ জিলা রহী না পরী কী জলুয়াগরী রহী।
কিয়া খাক আতিশে-ইশ্‌ক নে দিলে-বেনয়ায়ে-সিরাজ কোঁ ;
না খতর রহা না হজর রহা মগর এক বে-খতরী রহী।

خبر تحیر عشق سن نہ جنون رہا نہ پری رہی —
نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی سو بیخبری رہی
شہ بیخودی نے عطا کیا مجھے اب لباس برھنگی —
نہ خرد کی بخیہ‌گری رہی نہ جنون کی پردہ‌دری رہی
چلی سمت غیب سے اک ھوا کہ چمن سرور کا جل گیا —
مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ھری رہی

نظر تغافل یار کا گلہ کس زبان سین بیان کروں —
که شراب صد قدح ارزو خم دل میں تھی سو بھری رھی
وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخۂ عشق کا—
که کتاب عقل کی طاق پر جیوں دھری تھی یوں ھی دھری رھی
ترے جوش حیرت حسن کا اثر اس قدر سین عیاں ھوا—
که نہ آینہ میں جلا رھی نہ پری کی جلوہگری رھی
کیا خاک آتش عشق نے دل بیدوائے سراج کرن—
نہ خطر رھا نہ حذر رھا مگر ایک بے حطری رھی

অর্থাৎ, প্রেমের আশ্চর্য ক্ষমতার সংবাদ শুনিয়া আসুরিক বা দৈব ভাবের আর কিছুই রহিল না ; তুমি আর তুমি রাহলে না, বা তোমার মধ্যেও আর তুমি ভাব রহিল না, যা রহিল তাহা নিঃস্বার্থতা বা একাত্মবোধ। ঐক্যের সম্রাট আমাকে এখন উলঙ্গতার পোষাক দান করিয়াছে ; জ্ঞানের খোলসও আর নাই, আসুরিক শক্তির আবরণও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অদৃশ্য লোক হইতে এমন এক বাত্যা প্রবাহিত হইতেছে যে আনন্দের বাগান জ্বলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু ইহারই দুঃখরূপ এক ক্ষুদ্র বৃন্তে মন সুশোভিত রহিয়াছে। বন্ধুর তাচ্ছিল্য দৃষ্টির কটূক্তি কেমন ভাবে প্রকাশ করিব ? কারণ, ইচ্ছারূপ শত মদ্য পেয়ালা অন্তরের বক্রতার মধ্যে যেমন ছিল তেমনি পূর্ণ রহিয়াছে। ওই আশ্চর্য মুহূর্তে যখন আমি প্রেমের পাঠ লইয়াছিলাম, জ্ঞানের গ্রন্থটি তাকের উপর যেমন ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম তেমনি ধরা রহিয়াছে। তোমার আশ্চর্য সৌন্দর্যের মহিমা এমনি প্রকট হইয়াছে যে দর্পনের ঔজ্জ্বল্য যেমন হারাইয়া গিয়াছে, তেমনি দৈবশক্তির দীপ্তিও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রেমের আগুণ সিরাজের অসহায় মনকে এমনি ভস্মীভূত করিয়াছে যে ইহাতে বিপদাশঙ্কা বা সতর্কতার চিহ্ন মাত্র নাই।

সিরাজ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

(ছ) দিল্লীতে উর্দু ভাষার চর্চা (বা দিহ্‌লবী উর্দু'র প্রথম পর্যায়)

১৬শ শতাব্দীর সূচনা হইতেই দাক্ষিণাত্যে উর্দু কাব্য ও সাহিত্যের চর্চা হইতে থাকে, কিন্তু উত্তর-ভারতে ইহার চর্চা প্রায় ২ শত বৎসর পরে সূচিত হয়। আধুনিক আর্যভাষার অভ্যুত্থানের প্রথম পর্যায়ে উত্তর ভারতে উর্দু সাহিত্যিক আলোচনার বিশেষ কোন নিদর্শন নাই। তবে উর্দু ভাষা যে ইতিমধ্যেই কথাভাষারূপে সারা উত্তর ভারতে, বিশেষ করিয়া দিল্লী ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহে ব্যবহৃত হইতেছিল, তাহার নিদর্শন যথেষ্টই রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ ফারসী কবি আমীর খসরুর উর্দু কাব্যের কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, তাছাড়া অনেক মুসলিম সুফী ও দরবেশও যে হিন্দী তথা উর্দু শব্দের ব্যবহার তাঁহাদের গ্রন্থে বা কথোপকথনে করিয়া গিয়াছেন, তাহাও আমরা জানিতে পারিয়াছি। এই সকল দৃষ্টান্ত ছাড়াও আরো সাহিত্যিক নিদর্শন রহিয়াছে, যেখানে উর্দু শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, ফারসী কবি মৌলানা জমালী, মুল্লা নূরী ও শেখ সাদী তাঁহাদের ফারসী কবিতা ছাড়া এমন কতকগুলি দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন – যাহাকে আধা উর্দু আধা ফারসী কাব্য বলা যাইতে পারে। মৌলানা জমালী সম্রাট বাবরের সমসাময়িক ছিলেন এবং ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। মুল্লা নূরী সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ও তাঁহার সহিত আকবর-সভাসদ প্রসিদ্ধ ফৈজীর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। মীর হসন নূরীর এইরূপ একটি কবিতার নিদর্শন তাঁহার জীবনী-সংগ্রহে উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন,

হর কস কি খিয়ানৎ কুনদ্ আলবত্তা বতর্সদ ;
বেচারা নূরী না করে হায় না ডরে হায়।

هر کس که خیانت کند البته بترسد ـ بیچاره نوری نه کرے هے نه ڈرے هے

অর্থাৎ, অন্যায় যে করে সে নিশ্চয়ই ভয় পায় ; বেচারা নূরী (অন্যায়) করেও নাই, (আর তাহার জন্য) ভয়ও নাই।

শেখ সাদীকে কেহ কেহ ফারসী গুলিস্তান ও বুস্তান প্রণেতা শীরাজ অধিবাসী প্রসিদ্ধ ফারসী সাদী শীরাজী বলিয়া ভুল করিয়াছেন ; যদিও ইহা

সত্য যে ফারসী কবি তাঁহার ঐতিহাসিক ভ্রমণকালে ভারতেও আসিয়াছিলেন এবং কথিত আছে তথায় সোমনাথ মন্দির পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। আবার, কাহারো মতে তিনি দিকনী-কবি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মীর তকী ও ফতেহ আলী গর্দীজী এই মতের পোষণকারী। বস্তুতঃ তিনি উত্তর ভারতেরই একজন অধিবাসী। তিনি সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ও ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মুল্লা নিজামুদ্দীন আহমদ তাঁহার তবকাতে-আকবরীতে লিখিয়াছেন যে কর্কীতে হিন্দী-মিশানো-ফারসী কবি শেখ সাদীর বাসস্থান ছিল। তাঁহার কবিতার একটি বয়েৎ নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

সাদী তবাহ আঙ্গীখ্‌তা শীর ও শকর আমীখ্‌তা ;
দর রীখ্‌তা দুরে-রীখ্‌তা হম শয়ের হায় হম গীত হায়।

سعدی طبع انگیختہ شیر و شکر امیختہ ——
در ویختہ در ریختہ هم شعر ہے هم گیت ہے

অর্থাৎ, সাদী ক্ষীর ও শর্করা মিশ্রিত স্বভাব ছড়াইয়া দিয়াছে ; (ফারসীর সহিত) উর্দু-মুক্তা ছড়াইয়া দিয়াছে—ইহা একই সঙ্গে কাব্য ও গীত।

ফারসী কাব্যাদিতেই কেবল হিন্দী শব্দের প্রচলন হয় নাই—রাজপুরুষগণও তাঁহাদের চিঠিপত্র বা গ্রন্থাদিতে ফারসী বাক্যের ফাঁকে ফাঁকে হিন্দী শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে তখন দরবারী ভাষা ছিল ফারসী। দাক্ষিণাত্যের সম্রাটগণের ন্যায় যদিও উত্তর-ভারতীয় রাজন্যবর্গ হিন্দী তথা উর্দুর প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই, তথাপি স্থানীয় প্রভাব তাঁহাদিগকে হিন্দী শব্দের ব্যবহার করিতে বাধ্য করিয়াছিল। মুঘল সম্রাটগণও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের ফারসী ভাষার প্রতি যত্নবান ছিলেন। আর দাক্ষিণাত্যের মুসলিম-রাজগণ হিন্দীকেই তাঁহাদের আপন ভাষা মনে করিতেন।

সম্রাট শাজহানের রাজত্বকালে (১৬২৮-৫৮) উর্দু স্থানীয় কথ্যভাষা হইতে লিখ্য-ভাষাতেও স্থান লাভ করিয়াছে। সেই সময়কার অনেক চিঠিপত্রে উর্দুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। শাজহান নিজেও অনেক চিঠিপত্র ফারসীর স্থলে উর্দুতে লিখিয়াছেন। আওরঙ্গজেবের এক চিঠিতে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, আঁ ফরমানে-আলা কি দর জশনে-হিন্দী আজ দস্তখতে-খাস রকমী ফরমুদা শাহিদে-ঈঁ মানী অস্ত [ان فرمان عالی کہ در جشن هندی از دستخط خاص رقمی فرموده شاهد این معانی است]

আওরঙ্গজেব-লিখিত একটি 'রুকাতে-ফারসী' অর্থাৎ ফারসী-চিঠিপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যদিও মূলভাষা ফারসীই, তথাপি ইহার মধ্যে অনেক হিন্দী শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যেমন, আওরঙ্গজেব লিখিয়াছেন, দর আরসালে-ডালী-অম্ব (অর্থাৎ আম্র-ডালি) ব-তালাফীয়ে-মাফাৎ কূশান্দ। আবার, 'চার-ঘড়ী' রোজ মান্দা বাজ দেওয়ানে-আম মী ফরমুদন্দ [چار گھڑی روز ماندہ باز دیوان عام می فرمودند]

এইরূপে ক্রমে উত্তর-ভারতে উর্দু ভাষায় অভিধান রচনার প্রচেষ্টাও হয়। মুল্লা আব্দুল ওয়াসী সর্বপ্রথম আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ঘরায়িবুল্-লুখাৎ নামে এক উর্দু-হিন্দী অভিধান সঙ্কলন করেন এবং শব্দাদির ব্যাখ্যা তথায় ফারসী ভাষায় করা হয়। কিছুকাল পর ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধিতাকারে ইহারই দ্বিতীয় সংস্করণ করেন প্রসিদ্ধ ফারসী কবি সিরাজুদ্দীন আলী খান আর্জু; আর ইহার নূতন নামকরণ হয় নবাদিরুল্-অল্ফাজ।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল হইতে উত্তর-ভারতে উর্দু কবিতা লিখারও প্রচলন হয়। এই উর্দুতে কবিতা লিখার অনুপ্রেরণা বস্তুতঃ ওয়ালী আওরঙ্গাবাদী হইতেই আসে এবং তাঁহারই অনুকরণে তথার রীখ্তার প্রচলন হয়। ওয়ালীর পূর্বে যে সকল ফারসী কবি তাঁহাদের সাহিত্য চর্চার ফাঁকে ফাঁকে কতকটা অবসর বিনোদনের জন্য উর্দু কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ফিতরৎ, বরহমন, বেদীল ও কবুল অন্যতম। মশ্হদ অধিবাসী মীর্জা মুঅজুদ্দীন মহম্মদ মোসবী খান ফিতরৎ ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন। তিনি আওরঙ্গজেবের রাজদরবারের একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চন্দরভান বরহমন (ব্রাহ্মণ) একজন প্রসিদ্ধ হিন্দু ফারসী কবি। তাঁহার জন্মভূমি আকবরাবাদে, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি লাহোরেই অতিবাহিত করেন। তিনি প্রথম জীবনে লাহোরেই কোন সরকারী চাকরী করিতেন। কিন্তু তাঁহার সাহিত্য চর্চার সুযোগ হয় যখন তিনি শাজহানের রাজ-দরবারে কোন উচ্চপদস্থ কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি দারা-শিকো-র প্রাইভেট সেক্রেটারী বা খাস-মুন্সী রূপেই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এবং দারা-শিকোহ তাঁহাকে 'রায়-রায়ান' উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছেন। দারা-শিকোর প্রাণদণ্ডের পর তিনিও পদচ্যুত হইয়া বেনারস গমন করেন এবং তথায় ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার

অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ইন্‌শায়ে-চহার চমনী উল্লেখযোগ্য। খম্‌খানায়ে-জাওয়েদে তাঁহার কয়েকটি উর্দু কবিতার উল্লেখ আছে।

মীর্জা আব্দুল কাদির বেদিল আজীমাবাদ বা পাটনার অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি শাজহানাবাদ দিল্লীতেই অতিবাহিত করিয়াছেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তকী মীর তাঁহার তজকিরাতে বেদিলের নিম্নলিখিত কবিতাংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মৎ পুছ্‌ দিল কী বাতেঁ বহ দিল্‌ কহাঁ হৈ হম্‌ হৈঁ;
ইস্‌ তুখ্‌ম্‌-ই-বেনিশান্‌ কা হাস্বিল্‌ কহাঁ হৈ হম্‌ হৈঁ।
জব্‌ দিল্‌ কে আস্তান্‌ পর্‌ 'ইশ্‌ক্‌ আকর্‌ পুকারা;
পর্দে সে ইয়ার বোলা বেদিল কহাঁ হৈ হম্‌ হৈঁ।

অর্থাৎ, মনের কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না, সেই মন কোথায়?—আমি (বা খুদা)-ই তথায়; এই দিশেহারা বীজের অস্তিত্ব কোথায়—আমিই তথায়। যখন মনের আস্তানায় আসিয়া প্রেম ফুকারিয়া উঠিল, পর্দার অন্তরাল হইতে বন্ধু বলিয়া উঠিল বেদিল কোথায়?—আমিই তথায়।

মীর্জা আব্দুল ঘনী কবুল কাশ্মীরের অধিবাসী ও মীর্জা জুইয়ার শিষ্য ছিলেন। তিনিও তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় দিল্লীতেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। নস্‌সাখ্‌ তাঁহার রিসালায়ে-তহকীকে-জবানে-রীখ্‌ত-তে কবুলের নিম্নলিখিত বয়েৎটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দিল্‌ ইয়ুন্‌ খিয়াল্‌-ই-জুল্‌ফ্‌ মেঁ ফির্তা হৈ ন'রহ জন্‌;
তারীক্‌ শব্‌ মেঁ জৈসে কোয়ি পাস্‌বান্‌ ফিরে।

বস্তুতঃ ওয়ালীর উর্দুকাব্য দিল্লীতে প্রচারিত হওয়ার পর হইতেই উত্তর-ভারতে উর্দুকাব্য চর্চার বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হয়। এই যুগের কবিগণ ওয়ালী হইতেই তাঁহাদের কাব্য-রচনায় অনুপ্রেরণা লাভ করিলেও, ওয়ালী ও ওয়ালী-উত্তর কবিগণের কাব্যের একটি বিশেষ পার্থক্য এই লক্ষিত হয় যে ওয়ালীর কাব্যে অনেক দেশী তথা হিন্দী শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, আর তাঁহার অনুসরণকারীদের কাব্যের মধ্যে আরবী-ফারসী শব্দের অত্যধিক প্রাচুর্য। ইহার মূল কারণ সহজেই অনুমেয়—ওয়ালী দাক্ষিণ্যাত্যবাসী ও তাঁহার পরবর্তী কবিগণ উত্তর-ভারতীয়। যে সকল উর্দু কবি এই যুগে দিল্লীতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নজমুদ্দীন শাহ মুবারক আব্রু প্রসিদ্ধ শেখ মহম্মদ ঘউস গোয়ালিয়ারীর বংশ-সম্ভূত। শিশুকাল হইতেই তিনি দিল্লীতে অবস্থান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি উর্দু দেওয়ানে-ঘজল ও আরায়িশে-মাশুক নামে একটি মসনবী কাব্যের উল্লেখ আছে। এই উভয় গ্রন্থই এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে অধিকাংশ জীবনী-সংগ্রাহকই তাঁহার কাব্যের উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন। তিনি রূপক ও বক্রোক্তিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শেখ শরফুদ্দীন মজমুন আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন এবং যৌবনের প্রারম্ভেই দিল্লী আসেন ও তথায় জীনতুল্-মসাজিদ নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি প্রসিদ্ধ শেখ ফরীদুদ্দীন গঞ্জ শকর-এর বংশ-সম্ভূত। কথিত আছে, খান আর্জু তাঁহাকে শায়েরে-বেদানা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, কারণ শ্লেষ্মা জনিত তাঁহার উভয় পাটি দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল। তিনিও সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের ন্যায় উপমা, রূপক ও বক্রোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের বাহুল্য দ্বারা তাঁহার কাব্য সমৃদ্ধ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আর্জু কবি-নামধারী খান আর্জু নামে প্রসিদ্ধ সিরাজুদ্দীন আলী খান শাজাদা হুসামুদ্দীন হুসামের দরবারের একজন কবি ছিলেন। তিনি আগ্রা অধিবাসী প্রসিদ্ধ সুফী ঘউস গোয়ালীয়ারীর বংশসম্ভূত। যৌবনে তিনি গোয়ালীয়রের মনসবদার পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ফর্রুখশয়রের রাজত্বকালে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে আসেন এবং তখন হইতে তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। নাদির শাহের দিল্লী আক্রমন ও তৎসঙ্গে দিল্লীতে ধ্বংসলীলা চলিতে থাকিলে, তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ আসেন এবং ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তথায় প্রাণত্যাগ করেন।

আর্জু ফারসী ও উর্দু উভয় ভাষাতেই বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং এই উভয় ভাষায়ই তিনি গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন। তাঁহার পরবর্তী সকল কবি ও জীবনী-সংগ্রাহকই তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ কবি মীর, সৌদা ও দর্দ সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। মীর হসনের মতে আমীর খসরুর পরে তিনিই হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি বলেন, ইন্‌কে জ.মান্ মেঁ ইন্ সে বঢ় কর্ কোয়ি মঃহক্কিক্ আওর্ শায়রে-শীরীন্ জ.বান্ নহ থা।

আর্জুর ফারসীতে রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখই আধুনিক যুগে বিশেষ দৃষ্ট হয়। তাঁহার একটি ফারসী দেওয়ান, নিজামীর সিকন্দর-নামা, উর্ফীর কাসীদা-কাব্য ও সাদীর গুলিস্থানের ব্যাখ্যা ও সিরাজুল্-লুঘাৎ নামক একটি

ফারসী অভিধানের উল্লেখ আছে। তিনি ঘরায়িবুল্-লুখাৎ নামে একটি উর্দু অভিধানও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহা বস্তুতঃ সুফী পারিভাষিক শব্দ সম্বলিত নোয়াদিরুল-আল্ফাজের বর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র। তজকিরায়ে-আর্জু নামে প্রসিদ্ধ তাঁহার মজমা-উন্-নফায়িস নামক একটি জীবনী-সংগ্রহেরও উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে ফারসী কবিদেরই বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে।

মহম্মদ শাকর নাজী মুঘল সম্রাট মহম্মদ শার রাজত্বকালে সৈন্য বিভাগের সামান্য একজন দারোগা ছিলেন। তিনি নাদির শার ভারত আক্রমণ ও তৎসঙ্গে দিল্লী শহরের বিনাশ-সাধন নিজ চক্ষে দেখিয়াছিলেন। এবং একটি মুখম্মস কবিতায় এই করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার একটি উর্দু দেওয়ানের উল্লেখ আছে। গতানুগতিক অলঙ্কারাদির বাহুল্য ছাড়া তাঁহার কাব্য কতকটা অশ্লীলতা-গন্ধী।

মির্জা শমসুদ্দীন জানজানান মুজহর আওরঙ্গজেবের রাজদরবারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি একজন সুফী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি কোন মামুলি কবি ছিলেন না এবং তাঁহার কাব্যে একটি নূতন চিন্তা-ধারার আবেগ লক্ষিত হয়। আবার, তাঁহার কাব্যিক সৌষ্ঠবের সঙ্গে সঙ্গে ইহার আঙ্গিক সৌন্দর্যও লক্ষণীয়। কথিত আছে, তিনি কখনও আমীর-ওমরার উদ্দেশ্যে কোন প্রশংসাসূচক কবিতা লিখেন নাই; এবং এমন কি কাহারো নিকট হইতে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করাও ঘৃণা বোধ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই বিশেষ উচ্চ ধারণা ছিল, যদিও প্রকৃতপক্ষেও তাহা অনেকটা সত্য। এবং পরবর্তী কবিদের অনেকেই তাঁহার কাব্যের যথেষ্ট প্রশংসাও করিয়া গিয়াছেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুসতফা কুলীখান য়করঙ্গ দিল্লীর অধিবাসী ও খানজহানখান লোদীর পৌত্র। তিনি সম্রাট মহম্মদ শার রাজদরবারের একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার কবিতায় একদিকে যেমন গুরুগম্ভীর শব্দ ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য রহিয়াছে, আবার বেশ সরস ও চিন্তাশীল ভাবধারারও কোন সঙ্কোচতা নাই। তাঁহার ঘজল ছাড়া ইমাম হুসেন সম্বন্ধে লিখিত একটি মরসিয়া কাব্য বা শোক-গাথারও উল্লেখ আছে।

শেখ জহুরুদ্দীন হাতিম প্রসিদ্ধ উর্দু কবি মীর্জা সৌদার উস্তাদ বা কবিগুরু। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। আর তাঁহার জন্ম-তারিখ

'জহূর' (আরবী অক্ষর গণনানুযায়ী ১১১১ হিজরী বা ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দ) শব্দ হইতে পাওয়া যায়। তিনি প্রথম জীবনে একজন সাধারণ সৈন্য ছিলেন। ওয়ালীর দেওয়ান দিল্লীতে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কবির কবিতা লিখার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হয় এবং ক্রমে তাঁহার জন্মগত অধিকারের ফলে তিনি একজন উচ্চদরের কবি বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার দুইটি উর্দু দেওয়ানের উল্লেখ আছে—একটি প্রাচীন পন্থানুযায়ী ও দ্বিতীয়টি আধুনিক রীতি অনুযায়ী। প্রথম কাব্যটিতে রূপক ও বক্রোক্তির বিশেষ বাড়াবাড়ি; আর দ্বিতীয়টিতে আরবী ফারসী শব্দের বিশেষ বাহুল্য। কথিত আছে, তিনি 'হুক্কা' সম্বন্ধে একটি মসনবী কাব্যও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার একটি ফারসী দেওয়ানেরও উল্লেখ আছে। তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে মতদ্বৈধ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তকী মীর তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ খারাপ ধারণা পোষণ করিতেন; আবার মীর হসন তাঁহার কাব্যের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন।

আশরফ আলী খান ফিঘান একজন সুরসিক ও আমোদপ্রিয় ব্যক্তি। এবং সেই জন্য বাদশাহী দরবার হইতে জরীফুল-মুল্‌ক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহমদ শা আবদালীর দিল্লী লুটপাটের সময় তিনি তথা হইতে মুর্শিদাবাদ আসেন। মুর্শিদাবাদ রাজদরবারে তখন তাঁহার পিতৃব্য ইরাজ খানের বিশেষ প্রভুত্ব। কতকদিন অতিবাহিতের পর তথা হইতে ফয়জাবাদ আগমন করে। তথাকার নবাব বাহাদুর শুজাউদ্দৌলা রসিকতার জন্য তাঁহার সাহচর্য বিশেষ পছন্দ করিতেন। কিন্তু এই রসিকতার মাদকতাই পরে তাঁহাদের সাহচর্যকে গরলতায় রূপান্তরিত করে। বাধ্য হইয়া তথা হইতে তিনি পাটনায় আসেন। তথাকার মহারাজ শীতাব রায়ও তাঁহাকে বিশেষ আপ্যায়িত করেন। কিন্তু অবশেষে তথায়ও ফয়জাবাদের ন্যায় একই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিনি নির্জনতাই কাম্য উপলব্ধি করিলেন। এবং শেষ জীবন নির্জনতার মধ্যেই অতিবাহিত করিয়া ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ইহলীলার সমাপ্তি হয়।

ফিঘানের একটি সরস উর্দু দেওয়ানের উল্লেখ আছে। কাহারো কাহারো মতে তিনি একটি ফারসী দেওয়ানও লিখিয়াছেন। তাঁহার পরবর্তী প্রসিদ্ধ উর্দু কবি সৌদা ও মীর উভয়েই তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা বেশ সরস ও গভীর চিন্তাধারাপূর্ণ। তিনি তাঁহার কাব্যে অলঙ্কারাদির প্রয়োজন মোটেই পছন্দ করিতেন না। কথিত

আছে, বড় বড় মহাওরাৎ বা আনন্দ-উৎসবে তিনি ফারসী ও হিন্দী উভয় প্রকার কবিতাই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

মীর আব্দুল হাই তাবান একজন সুপুরুষ রসিক কবি। তাঁহার দেহ-সৌষ্টবের জন্য তিনি দিল্লী শহরবাসীর নিকট ইয়ুসুফে-সানী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার দেহের সৌষ্টব বৃদ্ধির জন্য তিনি অনেক সময় কাল পোষাক পরিধান করা পছন্দ করিতেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার সৌন্দর্যের সুখ্যাতি শুনিয়া শাহআলম বাদশাহ নিজে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কবি মুজহরের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁহার কবিতাও মুজহরের কাব্যের ন্যায় সরস ও আবেগপূর্ণ। তাঁহার মৃত্যু-তারিখ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ রহিয়াছে। তিনি ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাণত্যাগ করেন।

(ঙ) প্রাচীন উর্দু গদ্য-সাহিত্য

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই বোধ হয় সর্বপ্রথম উর্দু গদ্য-সাহিত্য লিখার সূচনা হয়। তবে প্রথম প্রথম যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহা কোন সাহিত্য-পদ বাচ্য নহে—কেবল ফারসী সুফীতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদির অনুবাদ অথবা সুফীদের উপদেশাবলী-সংগ্রহ মাত্র। শেখ আইনুদ্দীন গঞ্জুল্-ইল্‌ম (মৃত্যু ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দ)-এর সুফীতত্ত্ব বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি গ্রন্থ বা খাজা বন্দা নোয়াজ গীসু দরাজ (মৃত্যু ১৪২২) লিখিত সিরাজুল্-আশিকীন প্রভৃতি উর্দু গদ্য-গ্রন্থাদিই বোধ হয় উর্দু গদ্য সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন। ইহাদের মধ্যে সাহিত্যের ছাপ কিছুই নাই।

বীজাপুর-স্থিত প্রসিদ্ধ সুফী শা মীরানজী শমসুল্-উশ্‌শাকও সুফীতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটি উর্দু গদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জল্‌-তরঙ্গ ও গুল্‌বাস অন্যতম। তিনি খাজা বন্দা নোয়াজের একজন শিষ্য ছিলেন।

প্রাচীন উর্দু গদ্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সম্ভবতঃ 'সব-রস'। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে মৌলানা ওয়াজী ইহা প্রণয়ন করেন। তিনি গুলকণ্ডাধিপতি সুলতান আবদুল্লা কুতুব শার রাজত্বকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এবং কথিত আছে তিনি রাজদরবারের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সব-রস বস্তুতঃ একটি সাহিত্য-গ্রন্থ এবং ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কাব্যিক ছন্দ ও অলঙ্কারপূর্ণ শব্দ ও ঝঙ্কারে মুখরিত। মনে হয়, মুল্লা জুহুরীর সিহ-নসর-এর অনুকরণে এই গদ্য-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল।

'হুস্‌ন ও দিল' নামক একটি ফারসী সুফীতত্ত্ব বিষয়ক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া এই সাহিত্যটি রচিত হইয়াছে। ওয়াজী মূল কাহিনীর সহিত অনেক অবান্তর সুফীতত্ত্ব ও উপদেশসমূহ যোগ করিয়াছেন। একদিকে অবান্তর হইলেও, এই তত্ত্বকথা ও উপদেশাদিও সাহিত্যিক রসে পূর্ণ। কাহিনীর গূঢ়-তত্ত্ব লক্ষ্য করিলে সহজেই মনে হয় যেন রূপক-ছলে কাব্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নিম্নে সব-রসের মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল অবন্তি রাজ্যে 'জ্ঞান' নামে এক শক্তিধর রাজা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম 'জীবন'। রাজপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে 'দেহ'-রাজ্যের যুবরাজপদে অভিষিক্ত করা হয়।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে যুবরাজ জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু 'অনুসন্ধিৎসা' তাঁহার নিকট 'সঞ্জীবনী বারি'-র উল্লেখ করে। এই বারির কথা শুনামাত্রই যুবরাজ ইহাকে লাভ করিবার জন্য একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং ইহার চিন্তায় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অনুসন্ধিৎসাকে ইহার খোঁজে বাহির হইতে হইল। কিছুদূরে গিয়াই পথিমধ্যে সে 'নিরাপত্তা' নামে একটি সুন্দর সহর দেখিতে পায়। ইহার রাজা 'নিরাকাঙ্ক্ষে'র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সঞ্জীবনী বারির সন্ধান করে। কিন্তু নিরাকাঙ্ক্ষ অনুসন্ধিৎসাকে এই বিষয়ে কোন সংবাদ দিতে পারে না। তিনি বলিলেন, "সঞ্জীবনী বারি তো কল্পনা-মাত্র ; বাস্তবিক এর কোন অস্তিত্ব নাই। সঞ্জীবনী বারি বলতে মানুষের আনন্দানুভবকেই বুঝায়।" অনুসন্ধিৎসা নিরাশ হইয়া আরো অগ্রসর হয়। চলিতে চলিতে সে একটি উচ্চ পর্বতের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে এই পাহাড়ের নাম 'কৃচ্ছ্রাদ্রি' এবং এক 'বক-ধর্ম' নামধারীর বাসস্থান। তাহার সন্নিধানে গিয়া অনুসন্ধিৎসা সঞ্জীবনীর কথা জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে বক-ধার্মিক বলে, "পৃথিবীতে এর সন্ধান কোথায় পাবে? এ তো স্বর্গের জিনিষ। তবে প্রেমিকরা অনেক সময় চোখের জলের মধ্যে এর অনুসন্ধান করে থাকেন।"

কিন্তু এই উত্তরও অনুসন্ধিৎসার মনোমত হইল না। নিরাশ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং কিছু দূরেই উচ্চ-চূড়া সমন্বিত একটি দুর্গ দেখিতে পায়। এই দুর্গ 'নেতৃত্ব' নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহার অধিকারী 'মানবতা'। মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের আধার মানবতা অনুসন্ধিৎসাকে বলিল, "মানস-সরোবরের নিকটবর্তী 'প্রত্যক্ষানুভূতি' নামে একটি নগর আছে ; সেই নগরে 'চন্দ্রমুখ' নামে এক উদ্যান অবস্থিত। সেই উদ্যানের মধ্যস্থিত 'সুভাষণ' নামে একটি ঝরণার মধ্যে সঞ্জীবনী-বারি পাওয়া যায়। সেই সঞ্জীবনী-বারি তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। এ পথ অতিশয় দুর্গম। নির্ভয় ও সাহসী ব্যক্তিই কেবল সেখানে যাবার উপযুক্ত। তাছাড়া প্রত্যক্ষানুভূতি-তে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' নামে এক নগররক্ষক আছে। সে অতি হিংসুক ; সে কোন অপরিচিত লোককে সেই নগরে ঢুকতে দিতে নারাজ।" কিন্তু মানবতা অনুসন্ধিৎসাকে

সঞ্জীবনী-বারি খোঁজ করিতে খুবই উৎসাহ প্রদান করিল ও সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষানুভূতি-বাসী তাঁহার ভাই 'সরলতা'-র নামে অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা করিয়া এক হাতচিঠি দিয়া দিল।

অনুসন্ধিৎসা নানা দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করিয়া অবশেষে প্রত্যক্ষানুভূতি -নগর সীমান্তে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই প্রহরিদল অনুসন্ধিৎসাকে বন্দী করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখে উপস্থিত করিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার নিজের জীবনের আশঙ্কায় বেশ চতুরতার সহিত সে নিজেকে পণ্ডিত ও রসায়নবিদ্ বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং সেই সঙ্গে তাহাকে এইরূপ আভাসও দিল যে, সুযোগ-সুবিধা পাইলে সে সাধারণ জিনিষ হইতে বহু মূল্যবান ধাতু তৈয়ার করিতে পারে। ইহা শুনিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনে লোভের উদ্রেক হয় এবং অনুসন্ধিৎসুকে বেশ খাতির করিতে লাগিল। পরে যখন তাহার উপর মূল্যবান দ্রব্যাদি তৈয়ার করিবার আদেশ হইল, তখন সে বলিল, "রসায়ন-বিষয়ক এমন কতকগুলি জিনিষ আমার চাই, যা কেবল প্রত্যক্ষানুভূতি-শহরেই পাওয়া যায়। তাই তুমি আমায় তথায় নিয়ে চল, তাহলেই তোমাকে স্বর্ণাদি তৈরি করে দিতে পারি।"

সেখানে পৌঁছিয়া 'সরলতা'-র সহিত অনুসন্ধিৎসার সাক্ষাৎ হয় এবং সে মানবভার চিঠিটি তাহাকে প্রদান করে। তাহারই সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া অনুসন্ধিৎসা প্রত্যক্ষানুভূতি নগরের আরো অন্তর্মুখী হইল। ক্রমে সে 'মুখচন্দ্র'-উদ্যানে আসিয়া পৌঁছে এবং সেখানকার সৌন্দর্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

'সৌন্দর্য'-নাম্নী এক নারী এই উদ্যানের অধিকারিণী। এই মহিয়সী নারী 'প্রেম'-নামক সম্রাটের একমাত্র কন্যা। প্রেম এই সাম্রাজ্যের প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট। ঘটনাক্রমে সৌন্দর্যের ভ্রমণরতা এক সখীর সঙ্গে অনুসন্ধিৎসার সাক্ষাৎ হয়। সখী 'কুন্তল' তাহাকে দেখিয়া খুবই আশ্চর্যান্বিত হইল এবং এইরূপভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল যে, অনুসন্ধিৎসা ভয় পাইয়া যায়। সে 'কুন্তল'-কে বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়া বলে, "আমি অতিশয় বিপদাপন্ন, আমি কোনক্রমে এখানে এসে গিয়েছি ; কিন্তু এখন তুমি আমাকে সাহায্য না করলে আমার আর উপায় নেই। তুমি আমার প্রতি কৃপা কর।" ইহাতে তাহার প্রতি কুন্তলের দয়া হইল। সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া কতকদূর নিয়া যায়। এবং বিদায়মুহূর্তে তাহার মাথার একমুঠা কেশ দিয়া বলে, "যদি কখনও তোমার কোন বিপদ আসে, তাহলে এর দু-একটি

আগুনে পুড়িয়ে দিও—তন্মুহূর্তেই আমি জানতে পারব এবং তোমার সাহায্যার্থে আসব।"

আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া 'দৃষ্টিপাতের' সহিত অনুসন্ধিৎসার সাক্ষাৎ হয়। 'দৃষ্টিপাত' অনুসন্ধিৎসারই ভাই। কিন্তু শিশুকাল হইতেই তাহারা উভয়েই একে অন্য হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল বলিয়া কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে নাই। 'মুখচন্দ্র' উদ্যানের রক্ষক 'দৃষ্টিপাত' একজন অপরিচিত লোককে তথায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে মারিবার উপক্রম করিল। কিন্তু হঠাৎ তাহার দৃষ্টি অনুসন্ধিৎসার হাতের কবচের উপর পড়িল। জন্মের পরেই তাহাদের মা উভয়ের হাতে পরিচিতি-স্বরূপ একই প্রকার কবচ বাঁধিয়া দিয়াছিল। দৃষ্টিপাত ইহা লক্ষ্যমাত্র অনুসন্ধিৎসাকে জড়াইয়া ধরিল এবং আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে থাকে। অনুসন্ধিৎসা তাহার ভাইকে সকল ব্যাপার বিস্তৃত বলে। ইহাতে সৌন্দর্যেরই সহচর 'দৃষ্টিপাত' অনুসন্ধিৎসাকে সৌন্দর্যের নিকট নিয়া যায়।

'সৌন্দর্য' দৃষ্টিপাতের নিকট হইতে তাহার ভাই অনুসন্ধিৎসার পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিস্তৃত অবগত হইয়া তাহার নিজের বহুমূল্যবান আংটির মধ্যস্থিত প্রস্তর-খোদাই মনোহর মূর্তি তাহাকে দেখায় এবং সে এই মূর্তি সম্বন্ধে কিছু জানে কি না জিজ্ঞাসা করিল। এই মূর্তি দেখিয়া অনুসন্ধিৎসা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, "এ যে আমাদের যুবরাজ 'জীবনের' মূর্তি দেখতে পাচ্ছি।" এই উত্তরে সৌন্দর্য তাহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়। অনুসন্ধিৎসা তখন বলিল, "জীবন সঞ্জীবনী-বারির সন্ধানে আছেন এবং ইহার জন্য একেবারে উন্মত্ত। এ আপনার অধীনেই আছে। যদি ইহা তাঁর কোন উপায়ে লাভ করবার স্বযোগ থাকে, তবে তাঁকে আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারি।"

'সৌন্দর্য' ইহাতে সম্মত হয় এবং তাহারই আজ্ঞাবহ 'ভাব'-কে বহুগুণ-যুক্ত একটি হীরার আংটি দিয়া উভয়কে বলিল, "তোমরা যাও এবং যতশীঘ্র সম্ভব আমার 'জীবন'-কে নিয়ে এসো। এ আংটি সঞ্জীবনী-বারির নিদর্শন-স্বরূপ। এ মুখে রাখলে নিমিষে লোকচক্ষুর আড়াল হয়ে যাবে এবং যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে।" তাহারা উভয়ে শীঘ্রই 'দেহ'-রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। জীবনের সহিত সাক্ষাতের পর ভাবের সহিত বিশেষ আলাপ-পরিচয় হইলে, সে জীবনকে 'সৌন্দর্যের' একটি চিত্র বাহির করিয়া দেখাইল। দেখিবামাত্রই 'জীবন' ইহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়। এবং অনুসন্ধিৎসার

সহিত পরামর্শক্রমে এইরূপ ঠিক হইল যে, জীবন তাহাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষানুভূতি-তে 'সৌন্দর্য'-মিলনে রওনা হইবে।

জীবনের পিতা 'জ্ঞান'-রাজার 'উদ্বেগ'-নামে একজন পরম শুভাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রী ছিলেন। যুবরাজ ও অনুসন্ধিৎসার সলা-পরামর্শের সংবাদ শীঘ্রই তাঁহার নিকট পৌঁছে। তিনি রাজাকে 'জীবন'-অভিযানের খবর দিয়া বলেন, "যুবরাজ যে অনুসন্ধিৎসা-র পরামর্শক্রমে ও ভাবের ইচ্ছায় দূরদেশে প্রত্যক্ষানুভূতি-তে রওনা হচ্চেন, তাতে রাজ্যে ভীষণ অমঙ্গলের সূচনা দেখা যাচ্চে। সুচতুর 'ভাবের' ইচ্ছার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অসৎ-উদ্দেশ্য নিহিত আছে। অনতিবিলম্বেই সম্রাট 'প্রেমের' সহিত আলাপ-আলোচনা দ্বারা মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত। তা না হলে কোনক্রমে যদি যুদ্ধের উপক্রম হয়, আমাদের পরাজয় নিশ্চিত। কারণ প্রেম মহাশক্তিধর সম্রাট।" 'জ্ঞান' এই খবর পাইয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং 'উদ্বেগের' পরামর্শক্রমে জীবন ও অনুসন্ধিৎসা-কে বন্দী করিয়া তাহাদের উপর কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিলেন।

জীবনের নিকট যে আংটি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা সে সুযোগমত অনুসন্ধিৎসাকে দিয়া দেয়। সে ইহা মুখে রাখামাত্র লোকচক্ষুর অদৃশ্য হইয়া যায়। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া সে প্রত্যক্ষানুভূতি-নগরে গিয়া পৌঁছিল। সেখানে মুখচন্দ্রের নিকটেই 'সঞ্জীবনী-বারি' তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। এই বারি দর্শনে লোভের বশবর্তী হইয়া যেমনি ইহা পান করিতে যাইবে, তখনি তাহার মুখ হইতে হীরার আংটি জলে পড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্মুখ হইতে সঞ্জীবনী-বারিও অদৃশ্য হইয়া গেল। শীঘ্রই সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চোখে পড়ে এবং সে দেখিবামাত্র অনুসন্ধিৎসাকে বন্দী করিয়া রাখিল। কর্তব্য-অবহেলার জন্য খুবই লজ্জিত হইয়া চরম অশান্তির সহিত সে তাহার বন্দী-জীবন কাটাইতে লাগিল।

হঠাৎ একদিন তাহার কুন্তলের কেশের কথা মনে পড়ে। মুঠার একটি কেশ আগুনে নিক্ষেপমাত্র কুন্তল আসিয়া উপস্থিত হইল। সকল বৃত্তান্ত জানিয়া সে তাহাকে বন্দিশালা হইতে বাহির করিয়া মুখচন্দ্রের উদ্যান-পথ দেখাইয়া দেয়। অনুসন্ধিৎসা সেখান হইতে সৌন্দর্যের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। সৌন্দর্য সব শুনিয়া নিরাশ হয়। তথাপি সে তাহার উদ্যানের রক্ষী ও তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী 'দৃষ্টিপাত'-কে অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে দিয়া বলিল, "তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া বুদ্ধি, চতুরতা বা বশীকরণ প্রভৃতি যে কোন উপায়ে জীবনকে এখানে ধরে নিয়ে এসো।"

সুচতুর ও অভিজ্ঞ দুই ভাই 'দেহ'-রাজ্যের দিকে রওনা হইল। ইতিমধ্যে যখন অনুসন্ধিৎসা দেহ-রাজ্যের বন্দিশালা হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, তখনই জ্ঞানের আশঙ্কা হয় যে নিশ্চয়ই সে কোন বিপদ ডাকিয়া আনিবে। তাই সীমান্ত-প্রদেশের সকল সর্দারদের নিকট আদেশ জারী করিয়া পাঠান হয় যে, অনুসন্ধিৎসা বন্দিশালা হইতে পলায়ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে যেখানেই পাওয়া যায় বন্দী করা হউক।

পার্বত্য-প্রদেশের 'কৃচ্ছ্রাদি'-সর্দার পুত্র 'অনুতাপ' ও এই আদেশ অবগত হইয়াছিল। 'অনুতাপ' পর্বতের উপর হইতে 'দৃষ্টিপাত' ও 'অনুসন্ধিৎসা' -কে সৈন্য-সামন্তসহ রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিবার জন্য নিজ সৈন্যদিগকে আদেশ করিল। দুই ভাই অসম-সাহসিকতার সহিত 'অনুতাপ'-বাহিনীকে পরাজিত করে এবং অনুতাপ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। এই স্থান হইতে অগ্রসর হইয়া তাহারা সাধুর বেশ পরিধান পূর্বক 'নিরাপত্তা'-র রাজা 'নিরাকাঙ্ক্ষ'-র সহিত সাক্ষাৎ করে। তাহাদের সাধু-ব্যবহার নিরাকাঙ্ক্ষ-কে এমনভাবেই অভিভূত করে যে, তিনি অনুসন্ধিৎসাকে বন্দী করা দূরে থাকুক, নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এইদিকে 'অনুতাপ' জ্ঞানের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত ও 'দৃষ্টিপাতের' সুচতুরতার কথা রাজাকে জ্ঞাপন করে। রাজা দৃষ্টিপাতের শক্তির বিষয় জানিতে পারিয়া 'জীবন'-কে বন্দিশালা হইতে ডাকাইয়া আনিলেন ও সৌন্দর্যের সৈন্য-সামন্তের প্রভূত ক্ষমতার কথা পুত্রকে বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, "এদের কোন রকমেই বিশ্বাস করা যায় না। তুমি যদি এদের প্রতারণায় ভুলে শত্রুপক্ষ সমর্থন কর, তা'হলে তোমার নিজরাজ্য হ'তেই বঞ্চিত হবে—আর কোন লাভ হবে না।" জীবনের এই উপদেশ মনে ধরিল। সে মনে মনে ভাবিল, যদি জয়লাভ হয় তাহা হইলে তো 'সৌন্দর্য' আমার করায়ত্ত। আর পরাজিত হইলে ক্ষমাভিক্ষা তো হাতেই রহিল।

জীবন এই যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং জ্ঞানের প্রধান সেনাপতি 'ধৈর্য' সৈন্য-সামন্ত নিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই খবর পাওয়া গেল যে, সামনের জঙ্গলেই অনেক সুন্দর সুন্দর হরিণ বিচরণ করিতেছে। ইহা শুনিয়া শিকারের প্রবৃত্তি যুবরাজের মনে প্রবল হইয়া উঠে এবং তীর-ধনু সহ অশ্বারোহণপূর্বক শিকারে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সকল হরিণ প্রকৃতপক্ষে 'দৃষ্টিপাতে'র মায়াবী সৈন্য। তাহাদের

কে শিকার করিতে পারে! এই সৈন্য জীবনকে প্রতারণাদ্বারা ভুলাইয়া ক্রমে 'প্রত্যক্ষানুভূতি' নগরে নিয়া আসিল। তারপর 'দৃষ্টিপাত' 'সৌন্দর্য'-কে এই সুসংবাদ দিলে সে বিশেষ আনন্দিত হইল।

কিন্তু এখন প্রধান সমস্যা — জ্ঞান যে বিস্তর সৈন্য বাহিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাহার কি করা যায়? আর কি করেই বা এই বিপদের সম্মুখীন হওয়া যায়? অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, সৌন্দর্য তাহার পিতাকে এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল করিবে— যাহাতে তিনি এই বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের রক্ষা করিতে পারেন। সেই মতে কন্যা তাহার পিতাকে পত্রদ্বারা জানায়, "আমার এক আজ্ঞাবহ 'ভাব' অনেকদিন নিরুদ্দেশ হয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা যায় যে 'জ্ঞান' রাজা কর্তৃক সে বন্দী। 'ভাব'-কে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে লোক পাঠানো হলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা পূর্বক রাজ্য-সীমান্তে উপস্থিত।" 'প্রেম' তাঁহার আদরের কন্যার এই পত্র পাইয়া একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠেন এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জ্ঞানের এতদূর সাহস যে আমার সাম্রাজ্যে এসে শক্তি জাহির করতে চায়। পাগল না হলে কি হতভাগা 'জ্ঞান' আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহস পায়!"

অনতিবিলম্বে 'প্রেম' তাঁহার বীর সেনাপতি 'দয়া'-কে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। জ্ঞান তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং তাঁহার পুত্রের অবিবেচনা ও নিজ কৃতকার্যের জন্য বিশেষ অনুশোচনা করিতে লাগিলেন।

'দৃষ্টিপাত' 'জ্ঞান'-কে প্রথম দিন আক্রমণ করে এবং তাঁহাকে অনেকটা কাবু করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় দিন 'সরলতা'-র আক্রমণে 'জ্ঞান' একেবারে নাজেহাল। তদুপরি পরদিন 'কুন্তল' নৈশ-আক্রমণ দ্বারা নিদ্রিতদের সকলকে একসঙ্গে বন্দী করার উপক্রম করে। এমন সময় 'সুবাস' আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে জীবনের সৈন্যদের মধ্যে একটা উদ্দীপনার ভাব ফিরিয়া আসে। 'সুবাস' কুন্তলের সৈন্যদের এমনভাবে জব্দ করে যে, তাহাদের পলায়ন ছাড়া আর কোন গতি রহিল না।

'সৌন্দর্য' যুদ্ধের এই খবর শুনিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। তাহার সহচরী 'তিল' তাহাকে পরামর্শ দিল, "হিমালয়ের পাদদেশে তোমার এক 'সহোদরা' আছে। সে অতি চতুরা ও সাহসী; সৌন্দর্যও তাহার নিখুঁৎ। সে যদি তোমার সহায় হয়, তা'হলে তোমার আর কোন ভয় নাই।" সৌন্দর্য বলে,

"তাকে এই অল্প সময়ের মধ্যে কি করে আর খবর দেওয়া যায়?" 'তিলের' পক্ষে ইহা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। যাদুমন্ত্র দ্বারা মুহূর্তেই 'সহোদরা' সেখানে আনীত হইল। 'সৌন্দর্য' তাহাকে সকল বৃত্তান্ত শুনাইলে, সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "এতে আর ভয়ের কি আছে? 'জ্ঞানের' এমন শক্তি নাই যে, সে আমার আক্রমণ রোধ করতে পারে।" এই বলিয়া 'সহোদরা' তাহার 'ইসারা', 'প্রেমাদর' প্রভৃতি সৈনিককে সেনাপতি 'দয়া'-র সাহায্যার্থে প্রেরণ করিল। সৌন্দর্যের নিকট 'ভ্রূকুটি' নামক এক সিদ্ধহস্ত ধনুর্ধারী ছিল। তাহাকেও যুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। 'ভ্রূকুটি'কে পাইয়া 'দয়া'-র সৈন্যসামন্ত সকলেই বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুভব করে। সে যুদ্ধক্ষেত্রে সহজেই অগ্রসর হইয়া চলিতে লাগিল। তাহার বীরত্বের সম্মুখীন হইতে কেহই সাহস পায় না। সে একেবারে জীবনের সামনে গিয়া উপস্থিত এবং অজ্ঞাতসারে তাহার প্রতি এমনই তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে যে, সে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অচেতন হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। ইহা দেখিয়া জীবনের সৈন্যসামন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া একে একে পলায়ন করে। 'জ্ঞান'ও আর কোন উপায় না দেখিয়া পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন।

যুদ্ধজয়ের আনন্দধ্বনিতে নগর মাতিয়া উঠে। 'জ্ঞান' কে নিকটে দেখিতে না পাইয়া 'প্রেমের' সৈন্যগণ 'জীবন' কে বন্দী করিয়া সৌন্দর্যের নিকট লইয়া আসিল। জীবনের অবস্থা দেখিয়া সৌন্দর্য নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে ও 'ভ্রূকুটি' ও তাহার সহচরদের কটূক্তি করিতে থাকে। পরে নিজের ধাত্রী 'আদর'-কে তাহার দুঃখ কষ্টের সকল কথা খুলিয়া বলে। ধাত্রী বলিল, "এখন কান্না থামিয়ে বেশ ধৈর্যের সঙ্গে কাজে এগোতে হবে; তা না হলে কেবল দুর্নামেরই ভাগী হতে হবে। আমার মতে এখন জীবনকে 'চন্দ্রমুখ' উদ্যানের মধ্যস্থিত 'টোল' নামে যে একটি কাঁচা সোনার তৈরী কূপ রয়েছে, তাতে বন্দী করে রাখ। এতে বন্দী থাকলেও এর আবহাওয়া জীবনকে কতকটা আনন্দ দিবে।" এইভাবে বেচারা 'জীবন' বন্দী হইয়া রহিল, আর সৌন্দর্য বিরহ-জনিত অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল।

অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সৌন্দর্য তাহার সহচরী ও সেনাপতি 'দয়া'-র কন্যা 'বিশ্বস্ততা' কে তাহার বিরহের সকল যন্ত্রণা খুলিয়া বলে ও ইহার একটা প্রতিকার করিতে অনুরোধ করে। বিশ্বস্ততা বলিল, "আমার মতে এই শহরেই 'রস-সরোবরের' পাশে 'পরিচিতি'-উদ্যানের মধ্যে যে লতাকুঞ্জ বেষ্টিত একটি কুঠরী রয়েছে তাতে জীবনকে এনে রাখ এবং

নৈশ-অভিসারে খিড়কী-দরজা দিয়া তার সহিত মিলিত হও। তা'হলে মিলন-উল্লাসের আনন্দ তোমরা দুয়েই ভোগ করতে পারবে।" সৌন্দর্য তদনুসারে 'বিশ্বস্ততা' কে ইহার সুব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিল।

এই সঙ্গে সৌন্দর্য কুন্তলকে জীবনের বন্ধন-মুক্তির আদেশ দিল। কুন্তল জীবনকে 'টোল' হইতে বাহির করিয়া বিশেষ সমাদরের সহিত 'পরিচিতি' উদ্যানের দিকে লইয়া চলিল। জীবন এখানকার অপরূপ সৌন্দর্যে একেবারে মুগ্ধ। ঠিক সেই সময়ে 'বিশ্বস্ততা'ও আসিয়া যোগ দেয়। সে জীবনকে বলিতে লাগিল, "আপনাকে বন্দী করে রাখার মধ্যে সৌন্দর্যের কোন দোষ নাই। সে অবস্থানুযায়ীই এরূপ করতে বাধ্য হয়েছিল। তা না হলে হয়ত সম্রাট 'প্রেমের' আদেশে আপনার হত্যার ব্যবস্থা হতো। বস্তুতঃ সৌন্দর্য আপনার উপকারই করেছে। তার প্রতি আপনার ক্রুদ্ধ হওয়া তো মোটেই উচিত নয়, বরং সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সৌন্দর্য আপনাকে মনে মনে খুবই ভালবাসে।" এইরূপ মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করিয়া জীবনকে উদ্যানে লইয়া আসা হয়। উদ্যানের সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে এবং এইরূপ চিত্তাকর্ষক বাক্য শুনিতে শুনিতে জীবন সেই স্থানেই পুষ্পাবৃত তৃণের উপর নিদ্রাভিভূত হইল।

এই খবর সৌন্দর্যের নিকট পৌঁছামাত্র সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া জীবনের নিকট ছুটিয়া আসে। এবং নিদ্রাচেতন জীবনের মাথা কোলে রাখিয়া সৌন্দর্য তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে থাকে। হঠাৎ তাহার চোখের এক ফোঁটা জল জীবনের কপালে পড়ে। জাগিয়া নিকটেই সৌন্দর্যকে দেখিতে পাইয়া জীবন একেবারে আশ্চর্যান্বিত। মাধুর্যমণ্ডিত একটি নূতন পৃথিবী তাহার সামনে ভাসিয়া উঠে। সৌন্দর্যকে তাহার নিকট স্বর্গের দেবী বলিয়া মনে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়ে। সৌন্দর্যও তাহাকে পরমানন্দে হৃদয়ে গ্রহণ করে। বিদায়মুহূর্তে সৌন্দর্য বলিল, "তোমার প্রেমই আমাকে এখানে আকর্ষণ করে এনেছে। এখন আমাকে বিদায় দাও। শীঘ্রই আমি শুভ-মিলনের ব্যবস্থা করি। আমাকে আর কোনরূপ অবিশ্বাস করো না।"

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট কুঠরীতে 'বিশ্বস্ততা' ও 'আদর' শুভ-মিলনের ব্যবস্থা করিল। 'অনুসন্ধিৎসা', 'ভাব' ও 'স্মিতহাস্য' সরোবরের নিকট মিলিত হইল। তাহাদের উপর জীবনকে প্রেমোন্মত্ততার ঔষধ পান করাইবার আদেশ হয় এবং সেই উন্মত্ত অচেতন অবস্থায় তাহাকে কুঠিতে

আনিবার জন্য 'কুন্তল'-কে আদেশ দেওয়া হয়। এইভাবে রোজ জীবনকে কুঠরীতে আনা চলিতে লাগিল এবং জীবন ও সৌন্দর্য মিলনসুখ অনুভব করিতে থাকে।

কিন্তু এইরূপ কতদিন আর চলিতে পারে ? 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা'-র 'ঈর্ষা' নামে এক কন্যা সৌন্দর্যের সহচরী হিসাবে তাহার সঙ্গে থাকিত। যদিও সে বাহ্যতঃ তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিনীই, কিন্তু মনে মনে সৌন্দর্যের প্রতি সকল সময়েই তাহার একটা বিরাগের ভাব। সে দেখিল, সৌন্দর্য একা রোজ কোথায় যায়, আর সব সময়েই কি যেন তাহার নিকট হইতে গোপন রাখিতে চায়। তাই সে একদিন গোপনে সৌন্দর্যের পেছন ধরে ও কুটিরের পাশে লুকাইয়া সব বিষয় সঠিক অবগত হইল।

ঘটনাক্রমে একদিন সৌন্দর্য শহরে গিয়া ঐদিন আর ফিরিতে পারিল না। 'ঈর্ষা' সুযোগ বুঝিয়া মিলন-কুটিরে গিয়া উপস্থিত। সে যাদুমন্ত্রে সিদ্ধহস্ত। সৌন্দর্যের পোষাক পরিয়া যেমন করিয়া 'সৌন্দর্য' 'কুন্তল'-কে আদেশ দেয়, ঠিক তেমনিভাবে জীবনকে অচেতন অবস্থায় মিলন-কুঠরীতে নিয়া আসিবার জন্য 'ঈর্ষা' আদেশ করিল। কতক্ষণ পরেই 'ভাব' নিদ্রা হইতে জাগিয়া জীবনকে তাহার স্থানে দেখিতে না পাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে মিলন-কুঠরীতে আসিয়া দেখিল যে, সে 'ঈর্ষা'-র কোলে অচেতন অবস্থায় শুইয়া রহিয়াছে। তখনই সে শহরে দৌড়িয়া যায়, এবং সকল বৃত্তান্ত সৌন্দর্যকে খুলিয়া বলে। এই সংবাদে 'সৌন্দর্য' ঈর্ষার আগুনে জ্বলিয়া মরিতে লাগিল, এবং তৎক্ষণাৎ মিলন-কুটিরে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের একই অবস্থা দেখিতে পাইয়া প্রলয়কাণ্ড আরম্ভ করিয়া দিল। 'ঈর্ষা' কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চুপচাপ অন্যপথে বাহির হইয়া যায়। 'সৌন্দর্য' জীবনের প্রতিও খুব রাগান্বিত হয় এবং তাহার এই কপট প্রেম ও অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ 'অনুষ্কিংসা', 'ভাব' ও 'স্মিতহাস্য'-কে আদেশ দেয়, "এ কপটাচার মূর্খকে এখনই এ উদ্যান হইতে বের করে দাও।"

'ঈর্ষা' 'জীবন' ও 'সৌন্দর্য'-কে যেমন প্রতারিত করিল, তেমনি পিতার নিকট গিয়া তাহাদের গোপন-ভালবাসার সকল বৃত্তান্ত বলিল। 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' এইসব শুনিয়া একেবারে রাগে অগ্নিশর্মা। তখনই বন্দিশালা হইতে জীবনকে বাহির করিয়া নিজস্থানে লইয়া গেল। তথায় 'বিরহ' নামক দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। 'জীবন' একেবারে হতাশ হইয়া ভাবিতে

লাগিল, আমি জীবনে এমন কি অপরাধ করেছি, যার জন্য সৌন্দর্য হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে আমার প্রতি এরূপ কঠোর আচরণ করতে পারে ।

জীবনের প্রতি সহানুভূতি বশতঃই হউক বা অন্য কারণেই হউক, ঈর্ষার মনে হঠাৎ ভাবের পরিবর্তন দেখা দেয়। সে তাই পত্রদ্বারা সৌন্দর্যকে জানায়, এই ব্যাপারে দুর্ভাগা জীবনের কোন দোষ নাই, যা কিছু দোষ সব আমারই। সে প্রকৃতই প্রেমিক। তার উপর রাগ করে আপনার ক্রোধাগ্নি অনর্থক একজন নির্দোষকেই পোড়াইয়া মারিবে। পরে সে সেই রাত্রের সকল ব্যাপার খুলিয়া লিখিল।

এই চিঠি পাইয়া সৌন্দর্য তাহার কৃতকর্মের জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হয়। সে তৎক্ষণাৎ জীবনের নামে একটি পত্র লিখিয়া তাহা 'ভাব'-এর মারফৎ পাঠাইয়া দিল। চিঠিতে সে তাহার নির্দোষতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষার ব্যাপার বর্ণনা করিয়া তাহার নিজের অজানিত অন্যায়ের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল। সৌন্দর্যের চিঠি পাইয়া জীবন সব ব্যাপার যথার্থ বুঝিতে পারিল। সে সৌন্দর্যকে লিখিল, "এতে তোমার কোন দোষই দেখি না—দোষ যা সব ঈর্ষারই। তবে তুমি যদি প্রেমোন্মত্ততা-ঔষধ খাওয়াইয়া অনর্থক আমাকে অজ্ঞান না করতে, তাহলে তো আর 'ঈর্ষা' আমাকে এরূপ ভাবে প্রতারিত করতে পারত না? যাক, অদৃষ্টের লিখন অন্যথা হবার নয়।"

এইদিকে রাজা 'জ্ঞান' যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া নিজ রাজধানীতে আসিয়া বসিয়া রহিলেন। আর তাঁহার সেনাপতি 'ধৈর্য' পলায়ন করিয়া 'নেতৃত্ব' শহরে আসিয়া পৌছিলেন। এবং 'মানবতার'-র নিকট তাঁহাদের দুঃখের সকল কাহিনী খুলিয়া বলিলেন। 'মানবতা' ইহা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইল, এবং যথেষ্ট সহানুভূতির সহিত বলিল, "জ্ঞানের সহিত আমার অনেকদিনের বন্ধুত্ব। তাঁকে এই বিপদে আমার সাহায্য করা নিতান্তই দরকার।" 'ধৈর্য' অন্যান্য পরাজিত বা নিহত বীরদের কি অবস্থা হইয়াছে তাহার কোন খবর দিতে পারিল না। তাই 'মানবতা' তখনই সশস্ত্র সৈন্যসামন্ত নিয়া 'প্রত্যক্ষানুভূতি'-র দিকে অগ্রসর হইল। আর পথে পথে 'জ্ঞান' ও 'জীবনের' খোঁজ-খবর নিতে লাগিল। চলিতে চলিতে 'মানবতা' 'সরলতা'-র উদ্যানে আসিয়া পৌছিল।

'সরলতা' তাহার ভাইয়ের সাক্ষাতে বিশেষ সুখী এবং তাহার কার্যাদির জন্য 'মানবতা'-কে বিশেষ প্রশংসা করিল। মানবতা তাহার ভাইয়ের নিকট

হইতে জানিতে পারে যে 'জীবন' প্রায় একবৎসর যাবৎ 'বিরহ'-দুর্গে আবদ্ধ। আর জ্ঞান পরাজিত হইয়া নিজদেশে পলাতক। 'সরলতা' আরো বলিল, "প্রেমের সহিত যুদ্ধে পেরে উঠা কঠিন ; তাঁর সহিত মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত। তিনি একজন মহান সম্রাট। তাঁকে যদি বুঝিয়ে অনুনয় বিনয় করা যায়, তাহলে তিনিও নিশ্চয় মিত্রতাই প্রশস্ত মনে করবেন।" 'মানবতা'ও ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে করিল।

তখনই সৈন্যসামন্ত পরিত্যাগ করিয়া 'মানবতা' একাই প্রেমের রাজদ্বারে উপস্থিত। তাহার স্তবস্তুতিতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া, 'প্রেম' তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও সসম্মানে রাজপাশে আসন দিলেন। 'মানবতা' সুযোগ বুঝিয়া 'জ্ঞান' ও 'জীবনের' কথা উত্থাপন করিল এবং এইরূপ বুদ্ধিমত্তার সহিত তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিল যে, প্রেম তাহার সকল প্রস্তাবই মানিয়া লইলেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর এইরূপ স্থির হয় যে, 'প্রেম'-রাজার মন্ত্রিত্ব পদ 'জ্ঞান'-কে দেওয়া হইবে এবং রাজার পরেই তাঁহার পদাধিকার হইবে।

তৎপর 'প্রেম' 'জ্ঞান'-কে তাঁহার রাজ্য হইতে বিশেষ সমাদরের সহিত আনিবার জন্য 'দয়া'-কে আদেশ করিলেন। 'জ্ঞান' যখন দেখিলেন যে, তাঁহার সৈন্যসামন্ত কে কোথায় আছে তাহার কোন ঠিকানা নাই, তখন অগত্যা প্রেমের আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া 'দয়া'-র সহিত 'প্রেম'-রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 'জ্ঞান' আসিলে 'প্রেম' তাঁহাকে অতি সমাদর করিলেন এবং গলায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তুমি আমার মন্ত্রী। তোমার উপর রাজ্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হতে চাই। তোমার ইচ্ছায়ই রাজ্য চলবে।"

এইরূপ ঠিক হওয়ার পর প্রেমের আদেশে 'মানবতা' জীবনকে 'বিরহ'-কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া আনিল ও তাহার স্থানে 'ঈর্ষা'-কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা'-কেও সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইল। 'জীবন' আসিয়া সম্রাট 'প্রেম' ও তাহার পিতা 'জ্ঞানের' সহিত মিলিত হইল। রাজ্যের সব ব্যাপার সুশৃঙ্খল হওয়ার পর 'প্রেম' ও 'জ্ঞান' উভয়ের ইচ্ছামত 'জীবন' ও 'সৌন্দর্যের' বিবাহ নির্দিষ্ট হইল এবং শুভ-লগ্নে বিবাহ সুসম্পন্ন হইল।

বিবাহের পর একদিন 'জীবন', 'মানবতা' ও 'অনুসন্ধিৎসা' এই তিনজন একত্রে 'মুখচন্দ্র'-উদ্যানে বেড়াইতে বাহির হইল। সেখানে পৌছিয়া তাহাদের 'সঞ্জীবন-বারি' ঝরণা দৃষ্টিগোচর হয়। এক বৃদ্ধ ঋষিকে তথায়

দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাইল। 'মানবতা' তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া 'জীবন'-কে বলিল, "এই যে শুভ্রকেশ ঋষিকে দেখতে পাচ্ছ, তাঁর নাম 'কবিত্ব-শক্তি'। তাঁকে প্রণাম করে তাঁর শুভ-আশীর্বাদ গ্রহণ কর। 'জীবন' মানবতার কথামত তাহাই করিল। তাঁহার আশীর্বাদে 'জীবনের' নিকট জীবনের সকল গুঢ় রহস্যই প্রকাশিত হইল।

তারপর 'জীবন' ও 'সৌন্দর্য' সুখে ও শান্তিতে দিনযাপন করিতে লাগিল। ক্রমে পুত্রপৌত্রাদিতে তাহাদের গৃহ আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। তাহাদের এই পুত্র-পৌত্রাদি আর কেহই নহে—আমাদেরই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সামগ্রী।

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার এক প্রশিষ্য শেখ রুকুনুদ্দীন বিন ইমাদ কাশানী তাঁহার মুর্শিদ শেখ বুর্হানুদ্দীন ঘরীবের উপদেশাদি সংগ্রহ করিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহার নামকরণ হয় নফায়িসুল্-অন্‌ফাস্। তাছাড়া প্রায় শতাধিক আরবী-ফারসী গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়া তিনি সুফীতত্ত্ব বিষয়ক শময়িল্ অল্-অনক্বিয়া ও দলায়িল্ অল্-ইত্তিক্বিয়া নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই উভয় গ্রন্থ দিকনী উর্দুতে অনুবাদ করেন মীরান ইয়াকুব ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে। তিনিও কুতুবশাহী রাজদরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বীজাপুর অধিবাসী নূর দরিয়া সৈয়দ শা মহম্মদ কাদিরীও কয়েকটি সুফীতত্ত্ব বিষয়ক দিকনী গদ্য-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই সময়েই লিখিত আসরারুৎ-তৌহীদ নামক আর একটি গ্রন্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার প্রণেতার নাম সৈয়দ শা মীর।

উত্তর-ভারতে উর্দু গদ্য সাহিত্যের সুচনাও ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগেই হয়। তবে এই সময়ের গদ্য-গ্রন্থের বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। মৌলানা ফজলী লিখিত 'দহ মজলিস' এই যুগের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গদ্য-গ্রন্থ। ইহা রচিত হয় ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে। মুল্লা হুসেন ওয়াইজ কাশিফীকৃত সুপ্রসিদ্ধ ফারসী রৌজতুশ্-শুহদা-র অনুবাদ হইলেও, দহ-মজলিসে তর্জমাকার বেশ সহজ, সরল ভাষায় সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা একটি ধর্মমূলক গ্রন্থ। ইহা বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও, ইহাতে কোন সাহিত্যিক নিদর্শন লক্ষিত হয় না। এই গদ্যকারের কয়েকটি কবিতারও উল্লেখ আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

উর্দু সাহিত্যের মধ্য-যুগ

(ক) দিহলবী উর্দু সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায়
(বা মীর-সৌদা যুগ)

মীর সৌদা যুগকে উর্দু সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলাই সমীচীন। বস্তুতঃ মীর ও সৌদার জীবৎকালে এমন কয়েকজন উর্দু কবির অভ্যুত্থান হইয়াছিল, যাঁহারা উর্দু সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখার সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাসিদা-কবিতায় সৌদা উর্দু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। মসনবী-কবিতায় হসনের সমতুল্য কবি উর্দু সাহিত্যে বিরল। সরল ও সরস প্রেমপূর্ণ গীতিকাব্য বা ঘজল-কবিতায় মীর তকী মীর সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন। ঘজলে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী বোধ হয় এই যুগেরই অন্যতম কবি দর্দ্। পরবর্তী যুগের মীর্জা ঘালিব উর্দু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সাধারণভাবে স্বীকৃত হইলেও, তাঁহার গীতিকাব্য যতটা গভীর চিন্তাধারা-পূর্ণ, ততটা মীর তকী ও দর্দের ন্যায় আবেগপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাদ্যোতক নহে।

মীর-সৌদার গৌরবময় যুগকে যদিও উর্দু সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা হইলেও এই সময়েই আবার দিল্লীতে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান দৃষ্ট হয়। তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে সাহিত্য ও কৃষ্টির ধারক অনেক প্রখ্যাতনামা কবিকেই তাঁহাদের নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য মুসলিম-কৃষ্টির কেন্দ্রস্থলসমূহে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে।

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য ফারসী ধারা ও শব্দের বাহুল্য। উত্তর-ভারতে উর্দু সাহিত্যের ভিত্তি দৃঢ়মূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা লক্ষ্য করা যায়। তাহা মীর-সৌদার যুগে আরো প্রবলাকার ধারণ করে। আর ইহারই অবধারিত ফলে আমরা দেখিতে পাই উর্দু সাহিত্যে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ব্যাকরণ ঘটিত ব্যবহারে একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি। কারণ হিন্দীর প্রত্যেক

শব্দই পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু ফারসীতে ব্যাকরণিক লিঙ্গসূচক কোন শব্দ নাই। তাছাড়া উর্দুর বিভিন্ন কবিতা রূপায়নেও ফারসীধারাই প্রভাবান্বিত হইতে লাগিল। সৌদাই বোধ হয় উর্দুতে ফারসীর অনুকরণে কাসিদা কবিতার প্রবর্তন করেন। আর তিনিই তাঁহার শেষ জীবনে ইহার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। ফারসী ধারানুযায়ী অন্যান্য কবিতাও, যথা ওয়াসুখ্‌ৎ, মুসল্লিস্‌, মুরব্বি এবং হজ্‌ এই সময়ে প্রবর্তিত হয়।

মীর্জা মহম্মদ রফীক সৌদা (১৭১৩-১৭৮১ খৃষ্টাব্দ) উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। সৌদার পূর্বপুরুষগণ কাবুল অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা মীর্জা মহম্মদ শফী একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং কার্যব্যপদেশে কাবুল হইতে ভারতে আসিয়া দিল্লীতে অবস্থান করিতে থাকেন। তথায় আমাদের কবির জন্ম হয়। এবং এই জন্মভূমিতেই তাঁহার বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়। সুলেমান উস্তাদ তাঁহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার কাব্য-শিক্ষা লাভ উর্দু কবি শা হাতিমের নিকট হইতে। আর প্রসিদ্ধ খান আর্জুর নিকট হইতেও পরোক্ষভাবে কাব্য বিষয়ে অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছেন। সৌদা ফারসী ভাষায়ও বিশেষ বিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহার প্রথম জীবনে সৌদা ফারসী কাব্যচর্চায়ই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, খান আর্জুর উপদেশেই তিনি উর্দু কবিতা লিখিতে যত্নবান হন। শীঘ্রই তিনি একজন প্রসিদ্ধ উর্দু কবি রূপে সম্মানলাভ করেন এবং তাঁহার খ্যাতি এতটুকু প্রসার লাভ করে যে সম্রাট শা আলম তাঁহাকে তাঁহার কাব্য-গুরুরূপে গ্রহণ করেন। শা আলম নিজেও উর্দু ও ফারসী এই উভয় ভাষায়ই একজন সুদক্ষ কবি ছিলেন এবং তাঁহার কবি-নাম 'আফ্‌তাব'। কিন্তু এই গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক তাঁহাদের মধ্যে অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। বাদশাহের কোন এক বিশেষ বাক্যে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া সৌদা রাজদরবারে যোগদান করা পরিত্যাগ করেন। আর অন্যান্য আমীর-ওমরাগণ তখনকার শ্রেষ্ঠ শব্দ-শিল্পী সৌদার সেবা ও আদরযত্ন করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। এইরূপ আদর-আপ্যায়ন এবং সম্মান ও সুখ্যাতি লাভ করিয়া সৌদা যেন কতকটা আত্মাভিমানীতে রূপান্তর লাভ করিলেন। ঠিক এই সময়েই নবাব শুজা-উদ্দৌলা তাঁহার কাব্যের সুখ্যাতি শুনিয়া সৌদাকে অতি সম্মানের সহিত তাঁহার নিজ দরবারে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কবিবর ইহা অতি অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু বস্তুতঃ বিধি ছিল বাম। শীঘ্রই দিল্লীতে অরাজকতার সৃষ্টি হওয়ায়, তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ পৃষ্ঠদর্শন করিতে

লাগিলেন—কারণ, তাঁহারা তখন নিজেদের টাল সামলাইতেই ব্যস্ত। অগত্যা সৌদাও অন্যান্য সমসাময়িক কবিদের ন্যায় দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া সর্বপ্রথম ফর্রখাবাদ পৌছেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। তিনি তথাকার নবাব আহমদ খান বঙ্গীশ ঘালিব জঙ্গের দেওয়ান মিহিরবান খান রিন্দ্-এর দ্বারস্থ হইলেন। কবি ও সাহিত্যিক পৃষ্ঠপোষক রিন্দ্ সাহেব সৌদাকে বিশেষ সম্মানের সহিতই আদর-আপ্যায়ন করেন। এবং কথিত আছে, তিনি মীর্জা সৌদাকে তাঁহার কাব্য-গুরুরূপে গ্রহণ করিলেন। শীঘ্রই নবাব আহমদ খানের মৃত্যু হইলে সৌদা ফর্রখাবাদ পরিত্যাগ করিয়া ফয়জাবাদের নবাব শুজা-উদ্দৌলার আশ্রয়প্রার্থী হইলেন—যাঁহার সাদর অভ্যর্থনা তিনি একবার অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এবং পরে লক্ষ্ণৌতে নবাবের রাজধানী স্থাপিত হইলে, সৌদা তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। পরবর্তী নবাব আসফদ্দৌলার সময়েই সৌদার আবার পূর্ব-গৌরব ফিরিয়া আসে। তিনি নবাব দরবারের মালিকুশশুঅরা বা রাজকবি পদে উন্নীত হইলেন এবং কবি ও নবাবের মধ্যে এতটুকু অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয় যে নবাব অনেক সময়েই তাঁহার জরুরী রাজকার্য অবহেলা করিয়াও তাঁহার সাহচর্যে কালযাপন করিতে পছন্দ করিতেন। লক্ষ্ণৌতেই ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে সৌদার মৃত্যু হয়।

সৌদা নিম্নলিখিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন:—

(১) ঘজল ও কাসিদা সম্বলিত একটি ফারসী দেওয়ান।

(২) উর্দু দেওয়ান (=দীৱান)—ইহাতে ঘজল ছাড়া ফারসীর অনুকরণে অন্যান্য উর্দু কবিতা, যথা, রুবাইয়াৎ, কিত্বা (=ক়িত্ব'), তারীখ্, মুখম্মস্, তর্জী'-বন্দ্, ওয়াসূখ্ৎ (=ৱাসূখ্ৎ), মস্তজাদ্, তজ্‌মীন্, (=তদ্‌মীন্) প্রভৃতি কবিতাও আছে।

(৩) মসনবী দেওয়ান— ২৪টি মসনবী সম্বলিত কাব্যকারে সুন্দর সুন্দর কাহিনী। ইহাতে তাঁহার প্রসিদ্ধ হিজ্-সমূহও সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

(৪) উর্দু কাসিদা (=ক়স্বীদহ)-কাব্য: ইহাতে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও অন্যান্য স্থানের আমীর-ওমরাদের প্রশংসাসূচক কবিতা স্থান পাইয়াছে।

(৫) হজরৎ ইমামের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি উর্দু মরসিয়া কাব্য ও তৎসঙ্গে সলাম্।

সৌদা নানা প্রকার ফারসী ও উর্দু কাব্য প্রণয়ন করিলেও, তাঁহার কাসীদা ও হিজুতেই বিশেষ প্রতিপত্তি। এবং কাসীদাতে সৌদাই উর্দু-জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার এই প্রসিদ্ধির জন্য সৌদাকে অনেক সময় উর্দু

সাহিত্যের খাকানী ও আনওয়ারী সম্বোধন করা হইয়া থাকে। তিনি পুরাতন হিন্দী শব্দের স্থলে নূতন নূতন সুসামঞ্জস ফারসী শব্দের প্রয়োগ ও ফারসী ধারানুযায়ী নূতন নূতন ছন্দ-প্রণালী ও কাব্য-রসের সৃষ্টিদ্বারা উর্দু সাহিত্যে এক নূতন যুগের প্রবর্তন করেন। কবি নিজেই গাহিয়াছেন,

> সুখুন্ কো রীখ্‌তে কে পূছে থা কোয়ী সৌদা ;
> পসন্দে-খাত্বির্-ই-দিল্‌হা হোয়া ইয় ফন্ মুঝ্ সে।
> কব্ ইস্ কো গোশ্ করে থা জহান্ মেঁ অহলে-কমাল্ ;
> ইয় সঙ্গরীজ্ হোয়া হৈ দুর্-ই-'অদন্ মুঝ্ সে।

তাহা হইলেও ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ফারসী শব্দ ও সাহিত্য-ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিলেও, এই যুগে দেশীয় শব্দের প্রতি এতটা অবহেলা দৃষ্ট হয় নাই যাহা পরবর্তী যুগে আরো বিশেষ লক্ষিত হয়।

সৌদার বিশেষ করিয়া কাসিদা ও হিজূতে সুখ্যাতি লাভের কারণ তাঁহার 'শব্দ-সৃষ্টি'-তে অতুলনীয় শক্তি। যাহার সুখ্যাতি বা নিন্দা করিতে তিনি একবার আরম্ভ করিবেন, তাহাকে সুখ্যাতি-জালে আবদ্ধ বা অপযশ-বাণে বিদ্ধ করিয়া একেবারে উন্মত্ত বা পাগল করিয়া ছাড়িবেন। এবং স্থান-পাত্রানুযায়ী সূক্ষ্ম অর্থপূর্ণ উপমা, রূপক বা বক্রোক্তি সাহায্যে এরূপ শব্দ-সৃষ্টি করিবেন যে মনে হয় যেন শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই শব্দ-সৃষ্টির অত্যুক্তিই আবার তাঁহার ঘজল কবিতায় আমাদিগকে নিরাশ করে। ভাব ও আবেগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত গীতি-কাব্যে সৌদা কখনই তাঁহার সমসাময়িক মীর বা দর্দের সমকক্ষ নহেন। তাই হাকিম কুদরতুল্লা খান বকা তাঁহার জীবনী-সংগ্রহে লিখিয়াছেন, মীর্জা এক বেকিনার সমুন্দর আওর মীর এক আজীমুশ্-শান্ দরিয়া হায়ঁ। কাওয়ায়িদ কী মালুমাৎ মেঁ মীর সাহেব কো মীর্জা সাহেব পর বর-তরী হায় ; আওর কুয়তে-শায়িরী মেঁ মির্জা সাহেব কো মীর সাহেব পর ফৌকিয়ৎ হায়—

مرزا ایک بیکنار سمندر اور میر ایک عظیم الشان دریا هیں - قواعد کی معلومات میں میر صاحب کو مرزا صاحب پر برتری ہے اور قوت شاعری میں مرزا صاحب کو میر صاحب پر فوقیت ہے -

বস্তুতঃ সৌদা খাঁটি কবি এবং তাঁহার কাব্য-সমূহ সাহিত্যিক রসে পরিপূর্ণ। সেই সময়কার সুফী ভাবধারা তাঁহার কাব্যে বিশেষ প্রভাবান্বিত

হয় নাই বলিয়াই তাঁহাকে সময় সময় অন্যান্য কাব্যকার হইতে ন্যূন মনে করা হয়।

খাজা মীর দর্দ (১৭২০-১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ) প্রসিদ্ধ ফারসী কবি খাজা মহম্মদ নাসির আন্দলীবের পুত্র। সুফী ধর্মের নকৃশবন্দী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা খাজা বহাউদ্দীন নকৃশবন্দীর সহিত তাঁহার বংশ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। দর্দের পিতামহ বুখারা হইতে ভারতে আগমন করেন, এবং এই ভারতেই তাঁহার পিতার জন্ম হয়। খাজা আন্দলীব প্রথম জীবনে সৈন্য বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই সংসার ত্যাগ করিয়া সুফীধর্ম-পথ অবলম্বণ করেন ও নির্জনে বসবাস করিতে থাকেন। আমাদের কবিবর নিজেও তাঁহার পিতার উন্নত চরিত্র ও জ্ঞানের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

দর্দ তাঁহার পিতার নিকট হইতেই তাঁহার বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। মুসাহফীর মতে তিনিও তাঁহার প্রথম জীবনে সৈন্যবিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন। পরে তাঁহার ২৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সংসার-জীবন ত্যাগ করিয়া তিনিও তাঁহার পিতার আদেশে নির্জন জীবনই কাম্য মনে করিলেন। ৩৯ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। দর্দ তাঁহার পিতার উত্তরাধিকার-সূত্রে নকৃশবন্দী সম্প্রদায়ের একজন 'পীর' বলিয়া গণ্য হইলেন এবং ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলেই তাঁহার নিকট হইতে ধর্মশিক্ষা পাইতে লাগিলেন। আহমদশাহ আবদালীর দিল্লী লুণ্ঠনকালে এবং তাহার পরবর্তী সময়ে মারাঠা দস্যুদের অত্যাচারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া যখন মুসলিম পণ্ডিত ও উর্দু কবিগণ দিল্লী ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ অথবা অন্যান্য মুসলিম কৃষ্টির কেন্দ্রসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হন, তখন খোদা-নির্ভরশীল দর্দ তাঁহার নিজ আবাস ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাইতে মোটেই উদগ্রীব হন নাই। তিনি একজন খাঁটি দরবেশ ও দরবেশোচিত উন্নত-মন, স্বাধীনচেতা, নির্ভীক ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সাধারণ উর্দু-ফারসী কবিদের ন্যায় কখনও কাহারো কোন প্রশংসাসূচক কবিতা লিখেন নাই। তিনি যেমন খোদা-প্রেমিক, তেমনি ভগবৎ-প্রেম উদ্ঘাটনকারী সুফীতত্ত্বমূলক গজল বা গীতিকবিতায় শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম ছিলেন বলিয়া পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

কবিত্ব ছাড়া সুর ও গানেও দর্দের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। বড় বড় খেয়ালী ও উস্তাদ গাইয়ে তাঁহার সাহচর্যে আসিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছেন। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ কাওয়াল বা গানাদার মিঞা ফীরুজও

তাঁহার গানের মহরতে যোগদান করিতেন। বস্তুতঃ দর্দের দরবারে ধর্ম, জ্ঞান ও সুর সাধকদের একত্র সমাবেশ ছিল।

খাজা দর্দ নিম্নলিখিত কাব্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

(১) রিসালায়ে-আস্‌রারুস্‌-সলাওয়াৎ :—দর্দ তাঁহার ১৫ বৎসর বয়সের সময় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে গ্রন্থের নামানুযায়ী প্রার্থনার মাহাত্ম্য ও রহস্য বেশ সুনিপুণভাবে কীর্তিত হইয়াছে।

(২) ওয়ারদাতে-দর্দ :—তাঁহার ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রচিত। ইহাকে তাঁহার প্রথম গ্রন্থেরই অনেকটা ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। ইহাতে বস্তুতঃ সুফী ধর্মের জটিল প্রশ্নসমূহ গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে আলোচিত হইয়াছে।

(৩) ইল্‌মুল্‌-কিতাব :—তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থের আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা। ইহাতে প্রকৃষ্ট উদাহরণ-দ্বারা সুফীধর্মের জটিল প্রশ্নের উত্তর সমাধানে আরো বিশেষ আলোকপাত করা হইয়াছে। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনার উল্লেখও এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

(৪) নালায়ে-দর্দ :—১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। (৫) আহে-দর্দ :—ইহার রচনা কাল ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ। এই উভয় গ্রন্থই সুফীতত্ত্বমূলক। (৬-৭) দর্দে-দিল ও শমায়ে-দিল :—উভয় গ্রন্থই সুফীতত্ত্বপূর্ণ এবং কবির ৬২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রচিত।

(৮-৯) ওয়াক্কিয়াতে-দর্দ ও হুর্মতে-ঘিনা-তেও সুফীধর্মের জটিল রহস্যাদিই আলোচিত হইয়াছে। হুর্মতে-ঘিনা-য় বিশেষ করিয়া সুরসাধনা যে সুফীধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

(১০) দেওয়ানে-ফারসী :—একটি ফারসী কাব্য। ইহাতে দর্দের ফারসীতে লিখিত নানাপ্রকার কবিতার সমাবেশ।

(১১) দেওয়ানে-উর্দু :—দর্দের উর্দু কবিতার সমাবেশ। বস্তুতঃ তাঁহার এই কাব্যই আমাদের আলোচ্য এবং এই দেওয়ানে-উর্দু ব্যতীত উপরি-উল্লিখিত অন্যান্য সকল গ্রন্থই ফারসীতে রচিত।

এই দেওয়ানে-উর্দু-র জন্যই উর্দু-সাহিত্যের প্রভূত সমৃদ্ধি এবং এই সঙ্গে দর্দ সাহেবের অতুলনীয় সুখ্যাতি। বস্তুতঃ দর্দের ঘজল সরল, সরস ও সাহিত্যিক অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। সহৃদয়তা ও অনুকম্পার মাধ্যম সুফীতত্ত্বের এইরূপ কাব্যিক চর্চা আর কেহ বোধ হয় করিতে পারেন নাই। মীরের কবিতার ন্যায় ছোট ছোট ছন্দে রচিত দর্দের ঘজলের তুলনা হয় না। তিনি

তাঁহার কবিতায় সময় সময় ফারসীর স্থলে প্রাচীন হিন্দী শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। আর তাহা কখনই অসংলগ্ন না হইয়া, বরং প্রতি ক্ষেত্রে সুসমঞ্জস হইয়াছে। তাঁহারই সমসাময়িক মীর তকী তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আর মীর হসনের মতে, খাজা মীর দর্দের কবিতা সংক্ষিপ্ত আকারে ফারসী কবি হাফিজের কাব্যমাধুর্য সম্বলিত।

دیوانش اگرچہ مختصر است لیکن چون کلام حافظ سراپا انتخاب

তাঁহার কবিতার নিদর্শনস্বরূপ নিম্নে দর্দের কয়েকটি বয়েৎ উদ্ধৃত হইল।

সো রঙ্গ সে হৈঁ জলুয়হ-নমা গো বুতানে-খল্‌ক্;
আপনা তেরে সুয়া কোয়ি দিল্‌খাহ হী নহীন্।

سو رنگ سے هیں جلوہ نما گو بتان خلق —
اپنا تیرے سوا کوئی دلخواہ هی نہیں

অর্থাৎ, সৃষ্ট জীব যদিও শত শত রঙ্গে সৌন্দর্যপূর্ণ, (কিন্তু) আমার তোমাকে ছাড়া আর কেহই মনঃপূত নয়।

জিন্দগী হৈ ইয়া কোয়ী তোফান্ হৈ;
হম্ তো ইস্ জিনে কে হাথোঁ মর্ চলে।

অর্থাৎ, ইহা কী জীবন না তুফান-সদৃশ—আমরা তো এই বাঁচার মধ্যে মরিয়াই চলিয়াছি।

আবার,

আয় দর্দ জা চুকা হৈ মেরা কাম জব্‌ৎ সে;
মৈঁ ঘম্‌জদা তো কৎরায়ে-অশ্‌কে-চকীদা হোঁ।

اے درد جا چکا ہے مرا کام ضبط سے —
میں غمزدہ تو قطرۂ اشک چکیدہ ہوں

অর্থাৎ, হে দর্দ, আমার কর্তব্য-জ্ঞান নিজ সংযম হারাইয়া ফেলিয়াছে; দুঃখ-জর্জরিত আমি তো চক্ষু হইতে পতিত জলের ফোঁটার ন্যায়।

সোজ কবি-নামধারী সৈয়দ মহম্মদ মীর দিল্লীতেই জন্মগ্রহণ করেন, যদিও তাঁহার পূর্ব-পুরুষগণ বুখারা অধিবাসী ছিলেন। তীর-নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ ও যুদ্ধবিদ্যায় শিশুকাল হইতেই তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; তাছাড়া সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য তাঁহার বিশেষ সুনাম ছিল। যৌবনকালে তিনি বিশেষ আমোদপ্রিয় ও রসিক ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু মুঘল সম্রাট

শা আলমের রাজত্বকালে যখন দিল্লী ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে ধাবিত হইতে থাকে, তখন এই পার্থিব ধ্বংস-লীলা দৃষ্টে সোজের মনেও এক নৈরাশ্যের ছায়া পতিত হয় এবং তিনি ক্রমে একজন সুফী দরবেশে পরিণত হইয়া গেলেন।

অন্যান্য কবিদের ন্যায় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া তিনি সর্বপ্রথম ফর্রুখাবাদে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথাকার দেওয়ান মিহিরবান খাঁন রিন্দের সহিত বন্ধুভাবে কতককাল অবস্থান করার পর ফর্রুখাবাদ হইতে সোজ লক্ষ্ণৌ আগমন করেন। তখন লক্ষ্ণৌতে নবাব আসফুদ্দৌলার রাজত্বকাল। নবাব তাঁহাকে বেশ সম্মানের সহিত আদর আপ্যায়ন করেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌ-দরবার তাঁহার বিশেষ মনঃপূত না হওয়ায়, তথা হইতে তিনি মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। মুর্শিদাবাদ তখন বাঙ্‌লার নবাবের অধীন। বাঙ্‌লার আবহাওয়াও তাঁহার অসহ্য মনে হওয়ায়, তিনি আবার লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া আসেন। শীঘ্রই আসফুদ্দৌলা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু গুরু-শিষ্যের সহযোগে বাস অধিককাল অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই তাঁহার ৮০ বৎসর বয়সে সোজ তথায় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

সোজের একটি দেওয়ান রক্ষিত আছে। ইহাতে ঘজল ছাড়া মসনবী, রুবায়ী ও মুখম্মস প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ আছে। তবে তাঁহার ঘজল কবিতাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এবং তাঁহার এই গীতি-কাব্য সরল ও সরস রচনাদির জন্য যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রকাশভঙ্গীও বেশ সরল এবং অযথা অলঙ্কারাদির বালাই তাঁহার কাব্যে বিশেষ দৃষ্ট হয় না। সরল ও সরস প্রকাশভঙ্গীর জন্য সোজ মীরের সমতুল্য, কিন্তু সোজের চিন্তা-ধারা বিশেষ উচ্চ মার্গের নহে। এইদিকে লক্ষ্য করিয়া সোজকে রীখ্‌তী কবিতার অগ্রদূত বলা যাইতে পারে।

কথিত আছে, সোজ প্রথমে 'মীর' কাব্য-উপাধিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক প্রসিদ্ধ কবি মীর তকীও এই কাব্য-উপাধি গ্রহণ করায়, তিনি ইহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং 'সোজ'- উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার এই নিম্নলিখিত কবিতাংশে এই উভয় উপাধিরই উল্লেখ রহিয়াছে।

কহতে থে পহলে মীর্ মীর্ তব্ ন মুয়ে হজার্ হয়েফ্।
অব্ যো কহেঁ হৈঁ সোজ্. সোজ্. ঈ'য়নি সদা জলা করো॥

'হসন' কবি-নামধারী মীর হসন নামে প্রসিদ্ধ মীর ঘুলাম হসন মীর ঘুলাম হুসেন জাহকের পুত্র। বস্তুতঃ জাহকের বংশ উর্দু সাহিত্যে বিশেষ গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মসনবী কবিতায় মীর হসনই

বোধ হয় উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার পুত্র খলীক উর্দু সাহিত্যে মরসিয়া বা শোকগাথার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আর খলীকের পুত্র এবং মীর হসনেরই পৌত্র মীর আনীস 'শোকগাথা'-কে একটি জনপ্রিয় কাব্যে রূপদান করিয়া উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অন্যতম বিবেচিত হইয়া থাকেন।

সৈয়দ বংশীয় মীর হসনের পিতামহ মীর ইমামী হিরাৎ অবস্থিত তাঁহার পূর্বপুরুষদের ভিটা ত্যাগ করিয়া সর্বপ্রথম ভারতে আসেন এবং তথায় দিল্লীতে অবস্থান করিতে থাকেন। দিল্লীতেই ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মীর হসনের জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁহার পিতার নিকট হইতেই তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। মীর দর্দ তাঁহার কাব্য-গুরু ছিলেন। দিল্লীর পতনকালে তাঁহার পিতার সহিত দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া তিনি ফয়জাবাদে আসেন। কথিত আছে, তিনি এক সময়ে শা মদারের ভ্রাম্যমান 'ছড়ী' অন্তর্ভুক্তও ছিলেন। কবি নিজেও ইহার উল্লেখ তাঁহার 'গুলজারে-ইরম' নামক কাব্যে করিয়াছেন।

ফয়জাবাদে মীর হসন নবাব সলারজঙ্গের দরবারে একজন সম্মানিত কর্মচারী নিযুক্ত হন। তিনি নবাব পুত্র মীর্জা নোয়াজিশ আলী খানের একজন প্রিয় বয়স্য ছিলেন। আসফুদ্দৌলার সিংহাসন অধিকার করার পর মীর হসন নবাবের নূতন রাজধানী লক্ষ্ণৌতে আসেন। কিন্তু শীঘ্রই তথায় ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়।

আরবী ভাষায় তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য না থাকিলেও, ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে মীর হসন একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ফারসী ভাষায় লিখিত তাঁহার 'তজকিরায়ে-শুয়রায়ে-উর্দু' ইহার প্রভূত সাক্ষ্য প্রদান করে। কবি নিজে যেমন একজন সহাস্য-বদন ও আমোদ-প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, তেমনি তাঁহার কাব্যাদির মধ্যে সরস বাক্য ও চিন্তাধারার অভিব্যক্তি রহিয়াছে। তাঁহার কাব্যে কোন অশ্লীলতার আভাসও লক্ষিত হয় না। তিনি ঘজল, রুবায়ী, মরসিয়া প্রভৃতি অনেক প্রকার কবিতাই লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি বিশেষ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন মসনবী-কাব্যে। বস্তুতঃ তাঁহার 'সিহরুল্-বয়ান্' নামক সুপ্রসিদ্ধ মসনবী কাব্যের জন্য তিনি উর্দু সাহিত্যে চিরঞ্জীব থাকিবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তিনি কাসিদা কাব্যে মোটেই সফলকাম হন নাই।

মীর হসনের নিম্নলিখিত কাব্যের উল্লেখ আছে।

(১) ঘজল ও অন্যান্য রকমফের কবিতা সম্বলিত একটি উর্দু দেওয়ান।

ইহা ছাড়া তাঁহার ১১টি মসনবী কাব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কাব্য কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(২) মসনবীয়ে-সিহরুল্-বয়ান্ (বা বেনজীর ও বদরে-মুনীরের প্রেমকাব্য) ;

(৩) গুলজারে-ইরম্ ; এবং

(৪) রমূজ্-অল্-আরিফীন্।

সিহরুল-বয়ান বা মসনবীয়ে-মীর হসন উর্দু সাহিত্যের একটি অতুলনীয় কাব্য। কবির শেষ জীবনে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইহা রচিত হয় এবং নবাব আস-ফুদ্দৌলার নামে উৎসর্গ করা হয়। সরস ও স্বাভাবিক রসাভিব্যক্তি, ব্যঞ্জনাত্মক চিন্তাধারা ও উপাদেয় কাহিনীর জন্য এই কাব্যটি সর্বকালের জন্য মানব-হৃদয়ে আনন্দবর্ধন করিবে। যুবরাজ বেনজীর ও রাজকুমারী বদরে-মুনীরের প্রেম-কাহিনী ইহাতে বিশেষ সুনিপুণভাবে ছন্দোময় কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের বেশভূষার বর্ণনা, বিবাহের রীতিনীতি ও শোভাযাত্রার জাঁকজমক প্রভৃতির চিত্রণ বিশেষ সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়াছে। বস্তুতঃ কাব্যের ধারাবাহিক রসময় দ্যোতনা মনকে বিশেষভাবে আপ্লুত করে। কাব্যটির আরম্ভে দেখিতে পাই,

কিসী শহর মেঁ থা কোয়ী বাদশাহ ;
কি থা ওহ শহনশাহে-গীতীপনাহ।
কিসী তরহ কা ওহ না রখ্তা থা গম ;
মগর এক আউলাদ কা থা আলম্।

کسی شہر میں تہا کوئی بادشاہ — کہ تہا وہ شہنشاہ گیتی پناہ
کسی طرح کا وہ نہ رکہتا تہا غم — مگر ایک اولاد کا تہا الم

অপুত্রক বলিয়া দুঃখ থাকিলেও, পরে দৈবাদেশে বাদশার বেনজীর নামে এক সুপুরুষ সন্তান লাভ হয়। এবং এই রাজপুত্রের প্রেমকাহিনীই অতি সুনিপুণ ভাবে এই কাব্যে রূপায়িত হইয়াছে।

হসনের রুবায়ী কবিতাও অনেকটা সার্থক। ভগবানের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁহার একটি রুবায়ি বা চতুষ্পদী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

জাহির ভী তু হায় আউর নিহান ভী তু হায় ;
মানী ভী তু হায় আউর বয়ান ভী তু হায়।
দুনোঁ আলম মেঁ তুঝ্ সুয়া কোয়ী নহীঁ ;
ইয়ান ভী তু হায় আউর ওয়ান ভী তু হায়।

ظاهر بهی تو هے اور نہاں بهی تو هے —
معنی بهی تو هے اور بیاں بهی تو هے
دونوں عالم میں تجهه سوا کوئی نہیں —
یاں بهی تو هے اور واں بهی تو هے

মীর তকী মীর উর্দু সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। তাঁহার পিতা মীর আব্দুল্লা একজন সুফী ও দরবেশ ব্যক্তি ছিলেন। মীরের প্রপিতামহ হিজাজ হইতে ভারতে পদার্পণ করেন এবং দাক্ষিণাত্য হইয়া অবশেষে আকবরাবাদে বসতি স্থাপন করেন। এই আকবরাবাদেই মীরের পিতামহের জন্ম হয়। তিনি সৈন্যবিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন।

ধর্মানুশীলনের জন্য মীর মুতকী নামে প্রসিদ্ধ তাঁহার পিতার নিকট হইতেই মীর তাঁহার বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শীঘ্রই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। মীরের দুই ভ্রাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাফিজ মহম্মদ হুসন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে কৌশলে অপসারিত করায়, বাধ্য হইয়া মীর তকী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও নিজের ভরণ-পোষণের জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়া দিল্লী আসেন। তথায় নবাব সমসামুদ্দৌলার দরবারে তাঁহার একটি চাকরী লাভেরও সুযোগ হয়। কিন্তু শীঘ্রই নাদিরশাহের দিল্লী আক্রমণের ফলে এই নবাবের মৃত্যু ঘটে এবং এই সঙ্গে মীর সাহেবেরও চাকরী হইতে পদচ্যুতি হয়। পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আগ্রায় ফিরিয়া আসেন।

কিন্তু চাকরীর খোঁজে বাধ্য হইয়া মীর সাহেবের আবার দিল্লী রওনা হইতে হয়। তথায় তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই মাতুল প্রসিদ্ধ সিরাজুদ্দীন আলী খান আর্জুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কবিবর আর্জু মীরের প্রতি সহৃদয়ই ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাইয়ের কারসাজীতে সেখান হইতেও মীরকে বিতাড়িত হইতে হয়। এই দুর্ঘটনা তাঁহার নিকট মর্মান্তিক হইলেও, ধৈর্যাবলম্বন করিয়া মীর সৈয়দ সাদৎ আলী খানের নিকট হইতে উর্দু-কাব্য চর্চা করিবার সুযোগ পাইলেন। এবং শীঘ্রই তিনি রিয়ায়েৎ খান নামক দিল্লীরই এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মুসাহিব পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়েই আহমদ শা দুর্রানী সিরহিন্দের যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে। আর মীর সাহেব তাঁহার প্রভুর সহিত কতককাল দূরদূরান্তর ঘুরিয়া কাটাইবার পর কোন কারণে তাঁহার সহিত বচসা হওয়ায় এই মুসাহেবী পদে ইস্তফা দেন।

শীঘ্রই নবাব বাহাদুরের অধীনে তিনি একটি নূতন চাকরী লাভ করেন। সেই সময়ে ঘটিত রোহিলাদের যুদ্ধাভিযান কালে তিনি রোহিলখণ্ড পর্যটন করেন। কিন্তু সফদরজঙ্গ কর্তৃক নবাব বাহাদুর নিহত হইলে মীর সাহেব আবার বেকার হন। শীঘ্রই দেওয়ান মহানারায়ণের নিকট আশ্রয় লাভ করেন। আবার সেকেন্দরাবাদের যুদ্ধের সময় তিনি আহমদ শাহের সঙ্গী ছিলেন। এই সকল দুর্যোগের মধ্যে কাল যাপনকালে কতকদিনের জন্য মহারাজা নাগর মলের অধীনে আসিয়া স্বস্তিলাভ করেন। কিন্তু দিল্লীর বাদশাদের গৃহযুদ্ধের ফলে দিল্লী সাম্রাজ্যের পতনকালে এক অশুভ মুহূর্তে মীর সাহেবের নিজ বাড়ীও লুটপাট হইয়া যায়। এই সকল দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়া তিনি অবশেষে দিল্লী পরিত্যাগ করিতেই মনস্থ করিলেন।

দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে কতকদিন মথুরায় অবস্থান করার পর মীর সাহেব মথীরপুরে অবস্থিত সুরজমল জাটের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় সুরজমল তাঁহাকে বিশেষভাবে আদর-আপ্যায়ন করেন ও একটি মাসিক-ভাতা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ত্রিশ বৎসর সুরজমলের আশ্রয়ে তাঁহার জীবন বেশ সুখশান্তির মধ্যেই অতিবাহিত হয়। মথীরপুরে অবস্থান কালে সময় সময় তিনি তাঁহার জন্মভূমি আকবরাবাদ দর্শন করিতে আসিতেন এবং তথায় কতকদিন অবস্থানও করিতেন। ত্রিশ বৎসর কাল জাট পরিবারে আশ্রয় লাভের পর সেখানেও জাটদের বিদ্রোহের ফলে আবার এক নূতন দুর্যোগের সৃষ্টি হয়। এবং মহারাজা নাগরমলের সঙ্গী হইয়া তিনি মাধু সিংহের পুত্র পৃথী সিংহের সীমান্ত রাজ্য কামান নামক স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শীঘ্রই বাধ্য হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে আবার মীর সাহেব দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তথাকার হুসামুদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওয়াজীহ-উদ্দীন হইতে তিনি কিছু ভাতা পাইতে সমর্থ হইলেন। তখনকার দিল্লীর বাদশা দ্বিতীয় আলমগীর তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেও মীর সাহেব কখনই দিল্লীর বাদশার ডাকে কর্ণপাত করেন নাই। তা সত্ত্বেও বাদশা তাঁহাকে সময় সময় সাহায্য প্রেরণ করিতেন।

মীর সাহেবের এই দুর্যোগের সময় লক্ষ্ণৌর নবাব আসফুদ্দৌলার দরবার হইতে এক নিমন্ত্রণ-পত্র আসে ও তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া লেখা হয় যে, দরকার হইলে নবাব সাহেব পাথেয় পাঠাইতেও রাজী আছেন। কিন্তু তিনি নবাবের দ্বিতীয় পত্রের অপেক্ষা না করিয়াই লক্ষ্ণৌর দিকে ধাবিত হন

এবং কয়েকদিন ফর্রখাবাদে মুজফর খানের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া লক্ষ্ণৌ উপস্থিত হন। 'আবে-হয়াৎ' প্রণেতা আজাদ সাহেব বলেন, লক্ষ্ণৌ যাইবার পাথেয় পর্যন্ত তাঁহার হাতে ছিল না এবং মীর সাহেব তাহা কোন বন্ধু হইতে ধার করিয়া লক্ষ্ণৌর পথে রওনা হইয়াছিলেন। তিনি আরো বলিয়াছেন, মীর সাহেব মুসাফির বেশে সর্বপ্রথম কোন মুসাফির-খানায় উপস্থিত হন। সেই মুহূর্তেই জানিতে পারিলেন যে লক্ষ্ণৌরই কোন স্থানে সেইদিন মুশাআরা বা সংস্কৃতি-বৈঠকের আয়োজন করা হইয়াছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া দিল্লীবাসীদের সেই মুসাফিরের পোষাকেই তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই কবি-প্রকৃতি ও মুসাফিরী-পোষাক সভাসদদের হাসির উদ্রেক করে। মীর সাহেব বক্তৃতা দিতে উঠিলে কেহ কেহ অবজ্ঞাভরে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেও ইতস্ততঃ করিলেন না। ইহার উত্তরে তিনি গজল-ছন্দে গাহিলেন,

কিয়া বুদ্ ও বাশ পূছো হো পূরব্ কে সাকিনো ;
হম্ কো গরীব জান্ কে হস্ঁ হঁস্ পুকার্ কে।
দিল্লী যো এক শহর থা আলম্ মেঁ ইন্তখাব্ ;
রহতে থে মুন্তখব্ হী জহান্ রোজগার্ কে।
উস্‌কো ফলক্ নে লোট্ কে ওয়েরান্ কর্ দিয়া ;
হম্ রহনে ওয়ালে হৈঁ উসী উজড়ে দিয়ার্ কে।

کیا بود و باش پوچھو ھو پورب کے ساکنو —
ھم کو غریب جان کے ھنس ھنس پکار کے
دلی جو ایک شہر تہا عالم میں انتخاب —
رھتے تہے منتخب ھی جہاں روزگار کے
اُس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا —
ھم رھنے والے ھیں اس اُجڑے دیار کے

অর্থাৎ, হে পূর্ববাসী, আমাকে গরীব জানিয়া হাসিয়া হাসিয়া (অর্থাৎ বিদ্রূপছলে) কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? পৃথিবীর মধ্যে দিল্লী নামে যে একটি প্রসিদ্ধ শহর রহিয়াছে—সেখানে আমি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে বসবাস করিতেছিলাম। দুরদৃষ্ট ইহাকে লুটপাট করিয়া ধ্বংস করিয়া দিয়াছে, সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানেরই আমি একজন বাসিন্দা।

এই ছন্দিত উত্তরে সহজেই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, এই উদ্ভট

প্রকৃতির লোকটি দিল্লীর শ্রেষ্ঠ কবি তকী মীর ছাড়া আর কেহই নয়। শীঘ্রই নবাব আসফুদ্দৌলাও তাঁহার আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে সমাদরে তাঁহার নিজ দরবারে নিয়া গেলেন ও তাঁহাকে ২০০৲ টাকা মাসিক বেতন নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

লক্ষ্ণৌতে মীর সাহেবের জীবৎকাল অনেকটা সুখময় ও শান্তিপূর্ণ হইয়াছিল। নবাব সাহেব কবিবরের সঙ্গ ও সাহচর্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন। কথিত আছে, শিকারকালে পর্যন্ত মীর সাহেবকে তিনি সঙ্গে নিয়া যাইতেন এবং শিকারের ঘটনাসমূহের মালমসল্লা নিয়াই মীর সাহেবের দুইটি 'শিকার-নামা' কাব্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু শেষ জীবনে নবাব আসফুদ্দৌলার সহিতও তাঁহার সদ্ভাব থাকে নাই। বস্তুতঃ মিথ্যা আত্মাভিমান ও আত্মসচেতনতার জন্যই তাঁহাকে সারাজীবন দুঃখকষ্টের মধ্যে কালযাপন করিতে হইয়াছে। উপর্যুপরি শেষজীবনে স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পীড়াই তাঁহাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়াছে।

মীর সাহেব দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারীখ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মহম্মদ আস্‌করীর মতে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে মীর সাহেব জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮২০ (১২২৫ হিজরী) খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কবি নাসিখ তাঁহার মৃত্যু-তারীখ নিম্নলিখিত 'তারীখ্'-এর মাধ্যমে বিবৃত করিয়াছেন,

ওয়া ওয়েলা মুর্দ্ শহে-শায়েরান্[১]

وا ویلا مرد شه شاعران

মীর তকী তাঁহার কাব্যের অনেকস্থানে নিজকে দরবেশ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ও তাঁহার দুঃখময় জীবনের জন্য বিশেষ আফশোষ করিয়াছেন। তাঁহার নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে কবি বলিতেছেন,

হালৎ তো ইয় হৈ মুঝকো ঘমোঁ সে নহীঁ ফরাঘ্ ;
দিল্ সোজিশে-দরুনী সে জল্‌তা হৈ চুঁ চরাঘ্।
সিনা তমাম্ চাক্ হৈ সারা জিগর্ হৈ দাঘ্ ;
হৈ নাম্ মজলিসোঁ মেঁ মরা মীরে-বে-দিমাঘ্।

حالت تو یه ہے مجھکو غموں سے نہیں فراغ —
دل سوزش درونی سے جلتا ہے چوں چراغ

১। অর্থাৎ, হায় হায় কবি-সম্রাট মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।—ইহার আরবী আক্ষরিক গণনানুসারে ১২২৫ হিজরী।

سینه تمام چاک ہے سارا جگر ہے داغ —
ہے نام مجلسوں میں مرا میر بے دماغ

অর্থাৎ, অবস্থা তো এই যে দুঃখ হইতে অব্যাহতি নাই—হৃদয় আভ্যন্তরীণ অগ্নিদাহে প্রদীপের ন্যায় জলিতেছে। সমস্ত বুক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে (এবং) সারা হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। (আর) আমি সভা-সমিতিতে 'নিরহঙ্কার মীর' বলিয়া অভিহিত।

কবি নিজকে 'বে-দিমাঘ্' বা নিরহঙ্কার সম্বোধন করিয়া থাকিলেও তিনি যে অহঙ্কারের পূর্ণ প্রতীক ছিলেন, তাহা তাঁহার নিজ-জীবন বা তাঁহার সমালোচনা-সংগ্রহ আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তাঁহারই অগ্রগামী সমসাময়িক প্রসিদ্ধ কবি শা হাতিম সম্বন্ধে মীর সাহেব বলিতেছেন, মর্দীস্ত্ জাহিল্, অর্থাৎ তিনি (একেবারে) অজ্ঞ ব্যক্তি। আবার, তাঁহার প্রসিদ্ধ মসনবী-কাব্য অজগর-নামা-তে দেখিতে পাই, তিনি নিজেকে অজগর সর্পের সহিত, আর অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিকদের অজগর-ভক্ষ্য ছোট ছোট জন্তু-জানোয়ারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এবং তিনি এই রূপকের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, তাঁহার স্বাধীন, তেজঃপূর্ণ ও সার্থক চিন্তাধারার সামনে অন্যান্য কবিদের অর্থহীন, ফাঁকা চিন্তাধারার কোন সামঞ্জস্যই হয় না।

নিজে আত্মাভিমানী ও অহঙ্কারী হইলেও, মীর সাহেব খাঁটি জিনিষের কদর বুঝিতেন। প্রসিদ্ধ কবি সৌদাকে তাঁহার জীবনী-সংগ্রহে তিনি বেশ সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সৌদা সম্বন্ধে লিখিতেছেন, মলিকুশ্-শুয়ারায়ে-রীখ্তা উ-রা শায়েদ্—

(ملک الشعرائی ریختہ او را شاید)

অর্থাৎ, তিনিই রাজ-কবির উপযুক্ত।

দীর্ঘ জীবন হেতু মীর তকী অনেক কাব্য লিখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

(১) ঘজল সম্বলিত ৬টি বৃহদায়তন দেওয়ান।

(২) বহুসংখ্যক মসনব কাব্য। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—(ক) (পূর্বে উল্লিখিত) অজগর-নামা ; (খ) শুয়ালয়ে-ইশ্‌ক্ ; (গ) জোশে-ইশ্‌ক্ ; (ঘ) দরিয়ায়ে-ইশ্‌ক্ ; (ঙ) অইজাজে-ইশ্‌ক্ ; (চ) খাব ও খিয়াল ; (ছ) মুয়ামলাতে-ইশ্‌ক ; (জ) তম্বীহ অল্-খিয়াল এবং (ঝ) শিকার-নামা—এই

নামেই তিনটি মসনবী-কাব্যের উল্লেখ আছে। ইহাদের ছাড়া আরো অনেক ছোট ছোট মসনবী-কাব্য তিনি লিখিয়াছেন। বিল্লী, বক্‌রী ও কুত্তা প্রভৃতি নিয়াও তিনি কাব্য লিখিয়াছেন। 'মুর্গ বাজী' সম্বন্ধে তাঁহার একটি কাব্যের উল্লেখ আছে। 'বর্সাৎ' সম্বন্ধেও তিনি কয়েকটি ছোট ছোট মসনবী-কাব্য লিখিয়াছেন ; যেমন, মৌসুমে-বর্সাৎ, বারিশ কী শিদ্দৎ ও সফরে-বর্সাৎ প্রভৃতি।

(৩) একটি ফারসী দেওয়ান।

(৪) জিক্‌রে-মীর :—ফারসীতে লিখিত মীর সাহেবের আত্ম-জীবন কাহিনী।

(৫) নুকাতুশ্‌-শুয়ারা বা ফারসীতে লিখিত উর্দু সাহিত্যিকদের জীবনী-সংগ্রহ।

এই সকল গ্রন্থ ছাড়াও মীর সাহেব উর্দুতে বিভিন্ন কাব্য ধারার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যেমন, ওয়াসুখ্‌ত, মুসল্লিস বা মুরব্বি[১]। এবং এই সঙ্গে অনেক ফারসী বয়েৎ-কে উর্দু মুসল্লিস বা মুরব্বি ছন্দে রূপান্তরিত করিয়াছেন। আবার অনেক ফারসী কবিতারও উর্দু কাব্যানুবাদ করিয়াছেন। আবে-হয়াৎ-প্রণেতা ইহাদের কয়েকটি নিদর্শন তাঁহার প্রসিদ্ধ জীবনী-সংগ্রহে উল্লেখ করিয়াছেন। তাছাড়া মীর সাহেব কাসিদা, রুবায়ি, হিজ্‌ প্রভৃতি প্রচলিত উর্দু কবিতাও লিখিয়াছেন, কিন্তু এই সকল কবিতায় তিনি মোটেই প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই।

মীর তকী মীরের প্রসিদ্ধি বিশেষ করিয়া তাঁহার উর্দু ঘজল বা গীতি-কাব্যের জন্য। বস্তুতঃ তিনিই বোধ হয় ঘজল-কবিতায় উর্দু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। মসনবী কবিতায়ও তাঁহার স্থান উর্দু সাহিত্যে কম নহে। মীর হসনকে বাদ দিলে উর্দু সাহিত্যের মসনবী কাব্যেও তাঁহার তুলনা হয় না।

ঘজল-কবিতার বৈশিষ্ট্য সরলতা, সরসতা, ভাবব্যঞ্জনা ও সর্বোপরি দুঃখকষ্টময় জীবনের যাতনা ও প্রেমাস্পদের জন্য বিরহ-বেদনা তাঁহার কাব্যে পূর্ণমাত্রায় স্থান পাইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার দুঃখময় জীবনই যেন একটা মহান্‌ কাব্য এবং তাহাই তাঁহার কাব্যের প্রতি অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহাকে অনেক সময় উর্দু কাব্যের সাদী বলিয়া অভিহিত করা হয়। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী সকল প্রসিদ্ধ কবিই একবাক্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সমসাময়িক মীর ও সৌদার তুলনা করিতে যাইয়া

১। যথাক্রমে ৫, ৩ বা ৪ পংক্তিতে স্তবক-বিশিষ্ট গাথা।

প্রসিদ্ধ সাহিত্য-রসিক খাজা বাসিৎ বলিয়াছেন, দুনো সাহেবে-কমাল হায়ঁ; মগর ফরক ইৎনা হায় কে মীর সাহেব কা কলাম 'আহ' হায় আওর মীর্জা কা কলাম 'ওয়াহ' হায়।

دونوں صاحب کمال ہیں - مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام
آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے -

সোজাকথায় মীর নৈরাশ্যের কবি, আর সৌদা সরসতার কবি। এ যেন বাঙলা সাহিত্যের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। উভয়েই শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়া আছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস বিরহ বর্ণনায় আর বিদ্যাপতি মিলন-কাব্যে।

মীর-কাব্যের নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ইশ্‌ক্ হী ইশ্‌ক হায় জহাঁ দেখো;
সারে আলম মেঁ ভর রহা হায় ইশ্‌ক।

عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو —
سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق

কবি কেবল প্রেমের মহিমাই কীর্তন করেন নাই, দার্শনিক-মীরের পরিস্ফুরণ নিম্নের পঙ্‌ক্তিগুলিতে বিশেষভাবে লক্ষিত হইবে।

ইয় যো মুহলৎ জিসে কহেঁ হৈঁ 'উমর্;
দেখ্‌লো ইন্তিজার্ সা হৈ কুছ্।

অর্থাৎ, (পার্থিব-) জীবন বলে যাহা অভিহিত হয়, তাহা (দীর্ঘ যাত্রা-পথের) বিশ্রাম (-স্থান মাত্র); লক্ষ্য করিয়া দেখ ইহা (তোমার আদর্শ লাভের জন্য) 'অপেক্ষা' (ছাড়া) আর কিছুই (নয়)।

আবার,

কুফর্ কুছ চাহিয়ে ইসলাম কী জীনৎ কে লিয়ে;
হুসন জুন্নার হায় তসবীহে-সুলেমানী কা।

کفر کچھ چاہئے اسلام کی زینت کیلئے —
حسن زنار ہے تسبیح سلیمانی کا

অর্থাৎ, যদি ইসলামের অলঙ্কার (বৃদ্ধির) জন্য কিছু 'বিধর্ম'-এর প্রত্যাশা থাকে, তাহা এই— সুলেমানী নাম-মালার পৈতা 'সৌন্দর্য'।

(খ) দিহলবী উর্দু সাহিত্যের তৃতীয় পর্যায়
(বা ইন্‌শা—মুসহফী যুগ)

ইন্‌শা-মুসহফীর যুগে দুই বিভিন্ন ধারার সমাবেশ হইয়াছে। মুসহফী-অনুসারিগণ প্রাচীন ধারাকে বহন করিয়া থাকিতে পছন্দ করিতেন, অন্যথা ইন্‌শা-পথাবলম্বিগণ আধুনিকতার বার্তা বহন করিয়া চলেন। তাহাতে বাক্য-রীতি আরো সরস হয়, কিন্তু কৃত্রিমতার বাহুল্য ঘটে।

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে এই সময়কার পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণ সকলেই ক্রমে ক্রমে দরবারী-কবিতে পরিণত হইতে লাগিলেন। সৌদা-মীরের যুগে দেখিতে পাইয়াছি যে কবিগণ রাজদরবার হইতেই পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের স্বাধীনতা কখনই বিসর্জন দেন নাই এবং তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশ করিতে মোটেই ভীত ছিলেন না। বরং তাঁহাদের স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে গিয়া যদি রাজ-অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাও নতশিরে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই যুগের কবিগণ রাজ-অনুগ্রহ লাভের জন্য নিজেদের স্বাধীন মতবাদ বিসর্জন করিতে মোটেই কার্পণ্য করেন নাই। ফলে ফারসী সাহিত্য-চিন্তাধারার অনুসরণকারী সুফীমতবাদপূর্ণ 'রীখ্‌তা' কবিতা অনেক স্থলে অর্থগৃধ্নু ও লালসাপূর্ণ 'রীখ্‌তী' কবিতায় রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

সরস ও উচ্চ-চিন্তাধারাপূর্ণ কবিতার অভাব দৃষ্ট হইলেও, এই যুগে নব নব কাব্য-রীতি ও প্রকাশভঙ্গীর বহুল প্রভাব সূচিত হয়। আধুনিকতার পরিপোষকগণ কাব্যের বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন; আর প্রাচীন-পন্থীরা এই পথ হইতে অনেকটা দূরে থাকিয়া কাব্যের খাঁটিরূপের প্রকাশনায়ই মনোনিবেশ করিয়া গিয়াছেন। এই দুই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণকারীদের সাহিত্যিক তর্কযুদ্ধ ও আলোচনাও অনেক সময় বেশ আনন্দদায়ক হইয়াছে।

'ইন্‌শা' কবি-নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ ইন্‌শা আল্লা খানের পিতা হকীম মীর মাশা আল্লা খান নজফ হইতে দিল্লী আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। আবার কাহারো কাহারো মতে সমরকন্দ হইতে তাঁহারা সর্বপ্রথম কাশ্মীরে আসিয়া

পদার্পণ করেন এবং পরে ক্রমে ক্রমে রাজদরবারের সান্নিধ্যে আসিয়া ইন্‌শার পিতা রাজ-কবিরাজ বা শাহী-ত্ববীব পদে উন্নীত হন। হকীম সাহেবও কাব্য-আলোচনায় বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার কবি নাম ছিল 'মসদর'। দিল্লীর রাজশক্তি পতনোন্মুখ হইলে তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্‌লায় তৎকালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে আগমন করেন এবং এই মুর্শিদাবাদেই আমাদের কবিবর ইন্‌শার জন্ম হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা কবিবর তাঁহার পিতার নিকট হইতেই লাভ করেন। কবি-প্রতিভায় তাঁহার জন্মগত অধিকার ছিল। তাই শীঘ্রই তিনি একজন কবিরূপে সুখ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবি-প্রতিভার যে বর্ণনা আবে-হয়াতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা এক অপূর্ব সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। আজাদ সাহেব লিখিয়াছেন, যব ইয় হোনিহার নও নিহাল তালিম কে চমন সে নিকলা তো হর রিশা মে কোঁপল পত্তে ফুল ফল কী কোয়ায়ে মুখ্‌তলিফা মৌজূদ থী। ইস তরা কে জিস সরজমীন পর লগে ওহীন্ কী আব ও হাওয়া কে বমৌজব বহার দিখ্‌লানে লগে। অইসা তবা আওর আলী দিমাঘ আদমী হিন্দুস্তান মেঁ কম পয়দা হোয়া হোগা। উঅ অগর উলুম মেঁ সে কিসী এক ফন্ কী তরফ মতৌজ্জ হোতে তো সদ্‌হা সাল তক উঅহীদে-আসর গনে যাতে।...ইন্‌হোঁ নে কিসী সে ইস্‌লাহ নহীঁ লী। উআলিদ কো ইব্‌তদা মেঁ কলাম দিখায়া। হক ইয় হায় কে শঅর শায়েরী কা কোচা জহাঁ সে নিরালা হায়।

جب یہ ہونہار نونہال تعلیم کے چمن سے نکلا تو ہر ریشہ میں کونپل پتے پھول پھل کی قواے مختلفہ موجود تھیں - اس طرح کہ جس سرزمیں پر لگے وہیں کی آب و ہوا بموجب بہار دکھلانے لگے - ایسا طباع اور عالی دماغ آدمی ہندوستان میں کم پیدا ہوا ہوگا - وہ اگر علوم میں سے کسی ایک فن کی طرف متوجہ ہوتے تو صدہا سال تک وحید عصر گنے جاتے - --- انہوں نے کسی سے اصلاح نہیں لی - والد کو ابتدا میں کلام دکھایا - حق یہ ہے کہ شعر شاعری کا کوچہ جہان سے نرالا ہے

অর্থাৎ, যখন প্রতিভাসম্পন্ন সেই নব চারাগাছটি শিক্ষা-উদ্যান হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কলি, পাতা, ফুল ও ফলের বিভিন্ন গুণাবলী যেন সঞ্চিত ছিল। এমনিভাবে যে, যেরূপ মাটির মধ্যেই

রোপিত হউক না কেন, সেই স্থানের প্রকৃতি-অনুযায়ী বসন্তের সৃষ্টি করিয়া দিতেছিল। এই কবি-প্রকৃতি ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তিনি সাহিত্যের যে কোন শাখায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, তথায়ই শতাব্দী কালের জন্য যুগ-অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। ···তিনি কাব্যসাধনায় কাহারো নিকট হইতে কোন শিক্ষালাভ করেন নাই। কেবল মাত্র প্রথম জীবনে তাঁহার পিতার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কাব্যসাধনার গতিবিধিই আশ্চর্য।

যৌবনের প্রারম্ভেই ইন্‌শা মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে আসেন। তখনকার দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শা আলম (১৭৫৯-১৮০৬) নামে মাত্র সম্রাট হইলেও, তিনি বিশেষ কাব্যানুরাগী ছিলেন। হৃত-গৌরব মুঘল দরবারের সকল শ্রী লুপ্ত হইয়া গেলেও, সম্রাট কবি ইন্‌শার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ দেখাইতে কোনই কার্পণ্য করিতেন না। আর রসিক ইন্‌শা তাঁহার মধুর প্রকৃতি দ্বারা বাদশাকে এমনিভাবে বশ করিয়াছিলেন যে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও কবি-সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করিতেন না। কিন্তু শীঘ্রই কবিবর তাঁহার কবিত্বের মূল্য সঠিক নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন উর্দু চর্চার কেন্দ্রস্থল লক্ষ্ণৌর দিকে ধাবিত হন।

লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়া প্রথমে ইন্‌শা শাহ্‌জাদা সুলেমান শুকূহ্-র আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শাহ্‌জাদা নিজেও কাব্যচর্চা করিতেন ও তাঁহার একটি দেওয়ানেরও উল্লেখ আছে। কাব্যানুরাগী ছিলেন বলিয়া স্বভাবতঃই তাঁহার বিদগ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার দরবারে তখন মুসহফী, জুরাৎ, মির্জা কতীল ও অন্যান্য কবি কাব্যচর্চা করেন। আর শাহ্‌জাদা নিজে মুসহফীর নিকট কাব্যানুশীলন করেন। কিন্তু ইন্‌শা তাঁহার দরবারে যোগদান করার পর তাঁহার রসিকতা ও কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া যুবরাজ সুলেমান শুকূহ্ তাঁহাকেই তাঁহার কবি-গুরু রূপে গ্রহণ করিয়া নিলেন।

ইংরেজ সরকারের মতামিদ (ম্'অতমিদ বা বিশ্বস্ত) প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ্ তফজল হুসেন খান ইনশার বাকচাতুর্য, ভাষাজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া সময় সময় তাঁহার সান্নিধ্যলাভের সুযোগ নিতেন। তফজল হুসেন আবার নবাব সাদৎ আলী খানের একজন উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার নিকট ইন্‌শার গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া নবাব সাহেব তাঁহাকে তাঁহার 'মুসাহিব' পদে নিযুক্ত করিলেন। সংসারাভিজ্ঞ, সংস্কার-প্রিয় ও শাসনকামী নবাবকে ইনশা সহজেই আমোদাভিলাসী ও রসানুরাগী করিয়া তুলিলেন। আর তাঁহার

প্রভাব এমনি বিস্তার করে যে রাজকার্যে পর্যন্ত ইন্‌শা তাঁহার চির-সহচর ছিলেন। রাজকার্যাদিতেও ইনশার কথার কখনই অন্যথা হইত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের মধ্যেও মনোমালিন্য হয় এবং ইহার ফলে ইন্‌শার শেষ জীবন বেশ দুঃখের মধ্যেই অতিবাহিত হয়।

ইনশা যেমন রসিক-কবি, তেমনি একজন বিখ্যাত ভাষাবিদ্‌। বস্তুতঃ তাঁহার দরিয়ায়ে-লতাফৎ (বা রস-সমুদ্র) হিন্দুস্তানী ভাষার প্রথম শ্রেষ্ঠ তুলনামূলক ব্যাকরণ হিসাবে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে। তিনি আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষায় যেমন বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি হিন্দুস্তানী ভাষা ছাড়া প্রাদেশিক অন্যান্য ভাষাসমূহেও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। এমন কি তাহার গ্রন্থে ব্রজভাষা, পশ্‌তু, পঞ্জাবী, পূরবী (-হিন্দী), কাশ্মীরী, মারাঠী ও গুজরাটি ভাষায় কবিতাদিরও উল্লেখ আছে। কথিত আছে, তিনি এই সকল ভাষায় বাক্যালাপও করিতে পারিতেন। তাঁহার গভীর ভাষাজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য অনেক সময় ইন্‌শাকে ভারতের দ্বিতীয় আমীর খসরু বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ইন্‌শাকে অনেকটা তাঁহারই সমসাময়িক বাঙলার কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। উভয়েই শব্দকুশলী কবি ও তাঁহাদের ভাষাজ্ঞানের গভীরতা ও প্রসারতা হেতু উভয়েই সুললিত ও রসাল শব্দ-চয়নে সিদ্ধহস্ত। খাঁটি কবি বলিতে যাহা বুঝায়, তাঁহাদের উভয়েই সেইরূপ ছিলেন না। তবে কাব্যের রস-সৃষ্টিতে তাঁহাদের যে যথেষ্ট হাত ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যুগের আবহাওয়া তাঁহাদের কবিত্ব ও রস-সৃষ্টির উন্নত শিখরে আরোহণ করিবার সুযোগ দেয় নাই।

ইন্‌শা নিম্নলিখিত কাব্যসমূহ লিখিয়াছেন।

(১) উর্দু-ঘজল সম্বলিত একটি বৃহদাকার দেওয়ান।

(২) দেওয়ানে-রীখ্‌তী: ইহার শেষদিকে কয়েকটি মুস্তজাদ, ফেলিয়ান ও তিলিস্‌মাৎ কবিতাও সংযুক্ত হইয়াছে।

(৩) উর্দু ও ফারসীতে লিখিত কাসিদা কবিতা।

(৪) ফারসী-দেওয়ান।

(৫) শীর ও বরনজ্‌: মৌলানা রুমীর প্রসিদ্ধ ফারসী মসনবীর অনুকরণে এই মসনবী কাব্যটি রচিত। যেমন ইহাতে রুমীর কাব্য-ছন্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, তেমনি প্রসিদ্ধ মসনবীর সুফীতত্ব কথাও বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ইনশার কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও,

তাঁহার স্বভাবগত প্রভাব ইহাকে খাঁটি কাব্য করিয়া তুলিতে দেয় নাই। মৌলানা আজাদ তাঁহার আবে-হয়াতে সত্যই লিখিয়াছেন, খীর্ মেঁ নিমক্ ডাল্ কর্ তম্ব্রার্ কো তমসখর্ কর দিআ (ক্ষিরে লবণ ঢালিয়া রসকাব্যকে কৌতুককাব্য করিয়া ফেলিয়াছেন)।

(৬) নুক্‌তা (= নুক্‌ত্‌হ বা বিন্দু) বর্জিত একটি মসনবী কাব্য।

(৭) শিকার-নামা: ইহাও একটি মসনবী কাব্য। নবাব সাদৎ আলী খানের আদেশে ইহা রচিত হয়। ইন্‌শার কাব্যসমূহের মধ্যে ইহা একবাক্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাঁহার প্রভুর শিকার ঘটিত বিষয় সমূহ ও প্রকৃতির স্বাভাবিক সুনিপুণ বর্ণনা ইহাকে রসঘন করিয়া তুলিয়াছে।

(৮) শিকায়ৎ ই-জমানা নামক একটি মসনবী-কাব্য।

(৯) কয়েকটি প্রেম বিষয়ক মসনবী কাব্য: ইহাদের একটিতে হাতী ও চঞ্চলপিয়ারী নামে একটি হস্তিনীর বিবাহের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

(১০) নুক্‌তা বর্জিত বিভিন্ন প্রকার কবিতা সম্বলিত একটি উর্দু দেওয়ান।

(১১) নানা প্রকার কবিতা (যথা, মুঅম্মা, রুবায়ী, কিতা ও তারীখ) সম্বলিত উর্দু-দেওয়ান।

(১২) হিজ্ব (বা ব্যঙ্গার্থক) কবিতা: ইহাতে নানা প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গপূর্ণ কবিতা ছাড়া বোলতা ছারপোকা ও মক্ষিকা প্রভৃতি প্রাণী বা কীট এবং শীতোষ্ণ ভেদে প্রকৃতির বিরুদ্ধেও তিনি হিজ্ব কবিতা লিখিয়াছেন।

(১৩) মাড়োয়ারী ভাষায় গিআন্ চন্দ্ সাহুকারের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গপূর্ণ একটি মসনবী কাব্য।

(১৪) এই সকল কাব্য ছাড়া ইন্‌শা ঠেট্ হিন্দী তথা উর্দুভাষায় গদ্যাকারে একটি রূপ-কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কোন আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ নাই; আবার, সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দের ব্যবহারও তিনি করেন নাই। এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল হইতে কয়েক ভাগে ইহা সম্পাদিত হইয়াছে।

ইন্‌শার প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ রসিকতা ও হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে চটুল বাক্যাদির সৃষ্টি। এই হাস্যকৌতুকপূর্ণ কবিতায়, তাঁহার তুলনা কেবল প্রসিদ্ধ উর্দু কবি সৌদার সহিতই হইতে পারে। তবে সৌদার রসজ্ঞানের

সহিত ইন্‌শার কবিত্বের কোন তুলনাই হয় না। তিনিও সৌদার ন্যায় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার আলোচনা ও সেই সকল বিষয়ে কাব্য লিখিতে সযত্ন হইয়াছেন। কিন্তু অনেক সময় তাঁহার কৌতুক প্রবণতার প্রাবল্য হেতু কাব্যের রসসৃষ্টিতে তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার ঘজল-কবিতা লিখার প্রচেষ্টায় রীখ্‌তা রীখ্‌তীতে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি রীখ্‌তী কবিতার অন্যতম পথ-প্রদর্শক।

ইন্‌শা গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন না। অদ্ভুত পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহার 'মন্‌-চলী' স্বভাব তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ কবির আসনে উপবিষ্ট হইতে দেয় নাই। তিনি কবি না হইয়া অনেকটা রাজ-ভাঁড় ছিলেন। আর তাই তাঁহার সমসাময়িক মুসহফী তাঁহাকে সত্যই বলিয়াছেন, ও আল্লা কে শায়ের নহীঁ তো ভাঁড় হায় ভিড়োয়ে—

و اللہ کہ شاعر نہیں تو بہاڑ ہے بہڑوے —

ইনশার কবি-প্রকৃতি ও সেই সঙ্গে তাঁহার কাব্য-পরিচয় কতকটা নিম্নে বিবৃত হইল।

সাদৎ আলী খানের মুসাহিব-পদে নিযুক্ত থাকাকালীন, একদিন কোন এক ব্যক্তির পাগড়ী খাপছাড়া অবস্থায় সজ্জিত দেখিয়া নবাব সাহেবের কবিত্ব ফুটিয়া উঠে এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন, পগড়ী তো নহীঁ হৈ ফরাসীস্ কী টোপী। কিন্তু সাদৎ আলী খানের কবিত্বের দৌড় আর অগ্রসর হইল না; তিনি তাঁহার মুসাহিবকে সম্পূর্ণ ঘজলটি তৈয়ার করিতে নির্দেশ দেন। ইহার উত্তরে ইন্‌শা গাহিলেন,

পগড়ী তো নহীঁ হৈ ফরাসীস্ কী টোপী;
ইয়ান্ বরক্‌ৎ-ই-সলাম্ উৎরে হৈ ইব্‌লীস্ কী টোপী।
হৈ শেখ্‌ কে সর অঙ্গেসী হী তল্‌বীস্ কী টোপী;
জিস্ সে কি পড়ী কাঁপে হৈ ইব্‌লীস্ কী টোপী।
দীতে হৈঁ কুলহ অপনে মুরীদুন্ কো জো সুফী;
কহতে হৈঁ ইহী থী সর্-ই-জর্জেস্ কী টোপী।
সো চিক্কটী হোয়ী হৈ ইয় মুনঘ্‌ঘব্‌ কি জহান্ মেঁ;
অঙ্গেসী তো নহ হোগী কিসী সাঈস্ কী টোপী।
হুদ্‌হুদ্ কো খুশী তব হোয়ী জিস্ দম্ নজর্ আয়ী;
হাথুন্ মেঁ সুলেমান্ কে বিল্‌কীস্ কী টোপী।

কুল্ সৌজ়.ন্-ই-'ঈসা মেঁ পরো খত্-ই-শু'আয়ী ;
খুর্শীদ্ নে সী ঃহদ্রৎ-ই-ইদ্রীস্ কী টোপী।
কীওন্ রাস্তে জুর্বাব্ কে মেরী নহ হো ঃহাদ্বির্ ;
ঘুল্মান্ কী অব্রব্ ঃহূর্-ই-ফরারীস্ কী টোপী।
পরীওন্ কে ঘরোঁ মেঁ রহী চোরী কে মজেঁ. লেঁ ;
জিন্ পাস্ হো জিন্নোন্ কী জোআসীস্ কী টোপী।
মুম্কিন্ হো তো দহর্ দীজে বনা কর্ তেরে সর্ পর্ ;
জ়.র্বফ্ৎ-ই-মহ র জু.হরহ র বর্জৈস্ কী টোপী ।
অঙ্গরীজ.্ কে ইক্বাল্ কী হৈ অঈসী হী রস্‌সী ;
আব্রেখ্ৎ হৈ জিস্ মেঁ ফরাসীস্ কী টোপী।
ইন্‌শা মেরে আগা কী সলামী কো ঝুকে হৈ ;
মুক্কান-ই-সরা পর্দহ্-ই-তক্দীস্ কী টোপী।

আবার, একদিন তাঁহার প্রভুর সহিত মুসাহিব সাহেব নৌকাবিহারে চলিয়াছেন—আর নবাব সাদৎ আলী ইন্‌শার কোলে মস্তক রাখিয়া নদীর দৃশ্য দেখিতেছেন। হঠাৎ দৃষ্টিপথে একটি গৃহের সামনে লেখা দেখিতে পাওয়া গেল—

حویلی علی نقی خاں بہادر کی

তখন কবিবরকে সম্বোধন করিয়া নবাব সাহেব কহিলেন, মনে হইতেছে কেহ গৃহপ্রতিষ্ঠার সময় নির্দেশক (আরবী ধারামতে) 'তারীখ' লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যাকারে লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। তুমি ইহা হইতে রুবায়ী-ছন্দে একটি 'তারীখ্' বলিয়া দাও। কবিবর তৎক্ষণাৎ গাহিলেন,

নহ আরবী নহ ফারসী নহ তুর্কী ;
নহ সম্কী নহ তাল্কী নহ সুর্কী।
ইয় তারীখ্ কহী হায় কিসী লুর্কী ;
হোয়েলী আলী নকী খান্ বহাদুর্ কী।

نہ عربی نہ فارسی نہ ترکی — نہ سم کی نہ تال کی نہ سر کی
یہ تاریخ کہی ہے کسی لڑکی – حویلی علی نقی خاں بہادر کی

শব্দ-কুশলী কবির রসসৃষ্টি প্রতিভার নিদর্শনও আছে। শিকারনামা-র অনেক বয়ৎ-ই এই সম্বন্ধে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—তবে ইহা ফারসীতে

রচিত। তৃতীয় জর্জ-এর সম্রাট পদে অভিষিক্ত হওয়ার সময়ে লিখিত ইন্‌শার উর্দু-কশীদহ-টি তাঁহার কবিত্বের উৎকর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ইন্‌শা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

'জুরাৎ' কবি-নামধারী প্রসিদ্ধ শেখ কলন্দর বক্সিশের আসল নাম ইয়হীয় আমান। তাঁহার পিতার নাম হাফিজ আমান। কথিত আছে, জুরাতের পূর্বপুরুষ রায় আমান দিল্লীর বাদশা মহম্মদ শা-র রাজত্বকালে একজন দরবারী দারোয়ান ছিলেন এবং নাদির শা-র দিল্লী আক্রমণকালে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়। আর তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ দিল্লীপথে এখনো 'রায়েমান' নামে একটি গলি দৃষ্ট হয়।

জুরাতের বাল্যকাল ফয়জাবাদে অতিবাহিত হইলেও, তিনি যৌবনের প্রারম্ভে আবার তাঁহার জন্মভূমি দিল্লীতে চলিয়া আসেন এবং তথায় নবাব মহাব্বৎ খানের অধীনে চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। তৎপর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ আসেন এবং তথায় সুলেমান শুকুহ্-র আশ্রয় গ্রহণ করেন। জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত লক্ষ্ণৌতেই অতিবাহিত করিয়া ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

জুরাৎ কবি হিসাবে খুব প্রসিদ্ধিলাভ না করিলেও, তাঁহার অন্যান্য গুণাবলী ছিল। তিনি একজন জ্যোতির্বিদ ছিলেন; তাছাড়া একজন উস্তাদ গানাদার ছিলেন এবং সেতার বাজনায় তাঁহার বিশেষ হাত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বসন্তে আক্রান্ত হইয়া যৌবনকালেই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

যদিও আবে-হয়াৎ প্রণেতা তাঁহার কাব্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন, তিনি উচ্চদরের কবি মোটেই ছিলেন না। তবে তাঁহার পক্ষে এই বলিবার আছে যে আরবী-ফারসীর জ্ঞান বিশেষ ছিল না বলিয়া তিনি স্বভাবতই তাঁহার ঘজল সমূহ সরল ভাষায় ও সহজ সুরে গাহিয়া গিয়াছেন! তাঁহার প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ, এই সহজ সরল গীতি-কবিতাসমূহ সাধারণ জন-সমাজের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কতকটা তীব্র হইলেও তাঁহার অগ্রগামী সমসাময়িক খাঁটি সমালোচক তকী মীর তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন, তুম্ শয়ের কহনা কিয়া জানো — অপনে চুমাচাটী কর লিয়া করো—

تم شعر کہنا کیا جانو — اپنے چوما چاٹی کر لیا کرو —

অর্থাৎ, তুমি কাব্য সাধনার কি বুঝিবে, তোমার পক্ষে স্মরকেলিই শোভা পায়।

জুরাতের একটি দেওয়ান ও দুইটি মসনবীর উল্লেখ আছে। তাঁহার দেওয়ানে ঘজল ছাড়া রুবায়ী, মুখম্মস্, মুসদ্দস, হফ্‌ৎ-বন্দ, তর্জী-বন্দ, ওয়াসুখ্‌ৎ, তারীখ, হিজ্‌ৱ, সলাম এবং মর্সিয়া প্রভৃতি অনেক কবিতাই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাঁহার দুইটি মসনবীর একটিতে বর্ষার বর্ণনা রহিয়াছে; আর অন্যটির নাম হুস্‌ন্ ও ইশ্‌ক্। দ্বিতীয়টিতে বেশ্যাসক্ত হুসেনের প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ভাব-ব্যঞ্জনা কতকটা গভীর ও ভাষাও বেশ সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক।

জুরাৎকে মীর তকীর ভাবশিষ্য বলা হইয়া থাকে। তকীর ন্যায় জুরাৎও তাঁহার ঘজল ও মসনবী কাব্য সমূহে প্রেম ও সৌন্দর্যের কাহিনীই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মহাকবি মীর তকীর রসব্যঞ্জনা ও ভাবগাম্ভীর্যের সহিত জুরাতের তুলনা কি করিয়া হইতে পারে? রামবাবু সকসেনার অনুকরণে আস্করী সাহেব সত্যিই লিখিয়াছেন, মীর আমীক আওর জুরাৎ সত্থী শায়ের হাঁয়—

میر عمیق اور جرات سطحی شاعر ہیں —

অর্থাৎ, মীর গভীর চিন্তাশীল এবং জুরাৎ খামখেয়ালী কবি। বস্তুতঃ তাঁহাদের উভয়ের কাব্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। মীরের গভীর ভাবদ্যুতি ও রসব্যঞ্জনা অতি উচ্চস্তরের বস্তু ও স্বর্গীয় আভায় দীপ্ত। আর জুরাতের ভাবসামগ্রী মাটির তৈয়ারী ও পার্থিব রঙ্গে সজ্জিত। তাঁহাদের মূল পার্থক্য প্রকৃতিগত।

'মুসহফী' (১৭৫১-১৮২৪ খৃষ্টাব্দ) নামে প্রসিদ্ধ শেখ ঘুলাম হমদানী তাঁহার পিতৃপুরুষদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে বসতি স্থাপন করেন। এবং শীঘ্রই একজন কবি বলিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। আমরা দেখিতে পাই যে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে রচিত মীর হসনের তজকিরর মধ্যেও তাঁহার নাম বেশ শ্রদ্ধার সহিতই উল্লিখিত হইয়াছে। ১২ বৎসর কাল দিল্লী অবস্থানের পর অন্যান্য প্রসিদ্ধ কবির ন্যায় মুসহফীও লক্ষ্ণৌ আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি তথায় শাহজাদা সুলেমান শুকুহ-র সান্নিধ্য লাভ করেন। শাহজাদা তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই তাঁহার কবি-গুরু বরণ করিয়া লইলেন। পাণ্ডিত্য হিসাবে মুসহফী সর্বজন স্বীকৃত হইলেও, চটুলস্বভাব ইন্‌শাই শেষ পর্যন্ত শাহজাদাকে অধিকতর মুগ্ধ করেন এবং পরবর্তীকালে

ইনশা তাঁহার দরবারী কবি রূপে মুসহফী হইতে বেশী শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন।

মুসহফী ফারসী ও উর্দু উভয় ভাষায়ই বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। আধুনিক যুগে তাঁহার একটি মাত্র ফারসী দেওয়ানের উল্লেখ থাকিলেও, কথিত আছে তিনি ৪ খানি ফারসী দেওয়ান লিখিয়াছিলেন এবং ইহাদের তিনটিই কালস্রোতে বিলীন হইয়া যায়। তাছাড়া ফারসীতে লিখিত দুইটি তজকিরার উল্লেখ আছে—একটি ফারসী কবিদের ও অন্যটি উর্দু কবিদের জীবনী-সংগ্রহ। মুসহফী বিশেষ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহার উল্লিখিত উর্দু সাহিত্যিকদের জীবনী-সংগ্রহ ও তাঁহার বিখ্যাত সরস ও চিত্তাকর্ষক ঘজল সম্বলিত ৮টি দেওয়ানের জন্য। ইহাদের মধ্যে ঘজল ছাড়াও অন্যান্য কবিতা, যেমন, কাসিদা, কিত্বা প্রভৃতি কিছু কিছু রহিয়াছে।

মুসহফীর প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ পরবর্তী যুগের অনেক প্রসিদ্ধ কবিই কাব্য-সাধনায় তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছেন। আর তাঁহার কবিতার অন্যতম বিশেষত্ব এই যে, 'শুতুর্-গুর্বহ' (অর্থাৎ 'শব-পোড়া মরা-দাহ')-র যে ক্রটি, এমন কি উর্দুর প্রখ্যাত কবি মীর সৌদার মধ্যেও কিছু কিছু লক্ষিত হয়, তাঁহার কাব্যে এইরূপ ক্রটি নাই।

মুসহফীর কাব্যে মীরের প্রেমাকর্ষণ ও নৈরাশ্য-ব্যঞ্জকতা, সৌদার শব্দার্থের ঝঙ্কার ও দীপ্তভাব, বা সোজের সরলতা ও সরসতার ঝলক স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইলেও, সাধারণভাবে তিনি মামুলী ধারায়ই তাঁহার কবিতা সকল লিখিয়াছেন। ইহার মূলকারণ সম্বন্ধে জীবনীকারগণ এই মত পোষণ করেন যে, তিনি যখন কাব্য-রচনা করিতেন, বিশেষ চিন্তা করিয়া কিছু লিখিতেন না—অনেক সময় দর্শকদের মনে হইত যে তিনি যেন কোন বিষয় নকল করিয়া যাইতেছেন। তিনি যেমন দ্রুত কাব্য লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তেমনি অনর্গল কবিতা বলিতে পারিতেন।

মুহসফী ও ইনশার মুয়র্কা (=মু'অর্কহ বা তর্কযুদ্ধ) বেশ চিত্তাকর্ষক ও ইহা উর্দু সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের তর্কযুদ্ধ বস্তুতঃ দুই বিভিন্ন পথাবলম্বী তথা প্রাচীন ধারার বাহক ও আধুনিক মতবাদী-দের মধ্যে সাহিত্যিক তর্ক ও বিতণ্ডা। এবং ইহাতে স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী আধুনিক মতবাদীদের ধারক ইনশারই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ হইলেও, মুসহফী বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট কখনই হেয় প্রতিপন্ন হন নাই। বস্তুতঃ এই তর্কযুদ্ধ মুসহফীর প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল বলিয়াই, তাঁহার শেষ পর্যন্ত জয়লাভ হয় নাই।

তবে এই সকল বাক্-বিতণ্ডার মধ্য হইতে আমরা মুসহফীর অনেক হিজ্ব (ব্যঙ্গার্থক) ও কৌতুকপূর্ণ কবিতার নিদর্শনও পাইতেছি।

মুসহফী সুলেমান শকুহ-র দরবারে একটি ঘজল গাহিলেন; এবং ইহার শেষ বয়তে রহিয়াছে,

থা মুসহফী ইয় মায়িলে-গিরিয়া কে পস আজ মর্গ;
থী উনকী ধরী চশ্ম্ পহ তাবূৎ মেঁ অঙ্গ্লী।

تہا مصحفی یہ مائل گریہ کہ پس از مرگ —
تہی اسکی دھری چشم پہ تابوت میں انگلی

অর্থাৎ মুসহফী (প্রকৃতির অনিষ্টকর প্রভাব বশতঃ) এইরূপ বিষণ্ণ-হৃদয় হইলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর পর্যন্ত কফিনে তাঁহার অঙ্গুলী চক্ষের উপর নিবদ্ধ ছিল। আর ইন্শা বা তাঁহার অনুসারিগণ এই বয়ৎ-কে বিকৃত করিয়া গাহিলেন,

থা মুস্বঃহফী কানা যো ছাপানে কো পস্ অজ্ মর্গ্;
রখে হোয়ে থা আঁখ্ পহ্ তাবূৎ মেঁ অঙ্গ্লী।

যখন ইন্শা দলের এই বিকৃত বয়ৎ-যুক্ত ঘজলটি সাধারণের নিকট প্রচারিত হইল, জনসাধারণ এই ব্যঙ্গোক্তিতে বেশ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। মুসহফীর নিকটও এই ব্যঙ্গোক্তি প্রচারিত হয়। বস্তুতঃ তিনি তো আর সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না! তাঁহারও বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি তখন অহঙ্কৃত অথচ বিষণ্ণ-হৃদয়ে গাহিলেন,

মুদ্দৎ সে হোঁ মায় সরখোশে-সহবায়ে-শায়েরী;
নাদান হায় জিসকো মুঝসে হায় দবায়ে-শায়েরী।
মায় লখনো মেঁ জমজমে-সন্জানে-শয়েরকো;
বর্সোন্ দিখাচুকা হোঁ তমাশায়ে-শায়েরী।
ফব্তা নহীঁ হায় বুজমে-আমীরানে-দহর মেঁ;
শায়েরকো মেরে সামনে ঘোঘায়ে-শায়েরী।
এক তরফা খরসে কাম পড়া হায় মুঝে কি হায়;
সমঝে হায় আপকো উঅ মসিহায়ে-শায়েরী।
হায় শায়েরোন্ কী অব্কে জমানে কী ইয়া ময়াশ্;
ফিরতে হায়ঁ বেচতে হোয়ে কালায়ে-শায়েরী।
লীতা নহীঁ যো মূল্ কোয়ি মুফ্ৎ ভী উসে;
খিফ্ফৎ উঠাকে আতে হায়ঁ ঘর ওয়ায়ে-শায়েরী।

আয় মুসহফী জে গোশায়ে-খলুয়ৎ বেরোন্ খরাম্ ;
খালী অস্ত আজ বরায়ে-তু খুদ্ যায়ে শায়েরী।
হর সিকলা রা জবান ও বয়ানে-তু কি রসদ্ ;
আরে তুয়ি ফিঘানী ও বাবায়ে-শায়েরী।
মজনূঁ মনম্ চিরা দিগরে রঞ্জ্ মী বরদ্ ;
দর হিস্বায়ে-মন আমদা লায়লায়ে-শায়েরী।

مدت سے ہوں میں سر خوش صہبای شاعری —
ناداں ہے جس کو مجھ سے ہے دعوائے شاعری
من لکھنؤ میں زمزمہ سنجان شعر کو —
برسوں دکھا چکا ہوں تماشائے شاعری
پہنچا نہیں ہے بزم امیران دھر میں —
شاعر کو میرے سامنے غوغائے شاعری
اک طرفہ خرسے کام پڑا ہے مجھے کہ ہائے —
سمجھے ہے آپ کو وہ مسیحائے شاعری
ہے شاعروں کی اب کے زمانے کی یہ معاش —
پھرتے ہیں بیچتے ہوئے کالائے شاعری
لیتا نہیں جو مول کوئی مفت بھی اسے —
خفت اٹھاکے آتے ہیں گھر وائے شاعری
اے مصحفی زگوشۂ خلوت برون خرام —
خالی است از برای تو خود جائے شاعری
ہر سفلہ را زبان و بیان تو کے رسد —
آرے توئی فغانی و بابائے شاعری
مجنوں منم چرا دگرے رنج می برد
در حصۂ من آمدہ لیلائے شاعری

অর্থাৎ, বহুদিন যাবৎ আমি কবিত্বের মদ পান করিয়া মত্ত হইয়াছি ; যে আমার হইতে অধিক কবিত্বের বড়াই করে সে তো মূর্খ।

আমি লক্ষ্ণৌ শহরে বহুদিন স্বর্গীয় স্রোত প্রাবহিত করিয়া কাব্যের রঙ্গীন ছটা দেখিয়া আসিয়াছি।

এই পৃথিবীর রাজন্যবর্গের দরবারে এই (খামখেয়ালী) কবিত্বের চটক কোনরূপেই কাব্যহিসাবে সমর্থিত হইবে না।

এক গাধার দল নিয়া আমি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি—(কারণ) ইহারা মনে করে যে তাঁহারা যেন কবিত্বের অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আধুনিক কবিদের এখন উপজীবিকা হইয়াছে এই যে, তাহারা কাব্যের সম্পদকে (দ্বারে দ্বারে) বিক্রী করিয়া বেড়াইতে উৎসুক।

(কিন্তু) বিনা পয়সায়ও কেহ ইহা ক্রয় করিতে চায় না, তাই লজ্জিত হইয়া আবার তাহারা গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, হায় কবিত্বের কী বিড়ম্বনা!

হে মুসহফী, তুমি নির্জনতা হইতে আবার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আস; কারণ, কবিত্বের (শ্রেষ্ঠ) আসন তোমার জন্য শূন্যই পড়িয়া রহিয়াছে।

এই অন্তঃসারশূন্যদের বাক্য ও বর্ণনা তোমার (কাব্যের) সহিত কি করিয়া তুলনা হইতে পারে? (বস্তুতঃ) তুমি যে (প্রসিদ্ধ ফারসী কবি) ফিযানী (সমতুল্য) ও কবিত্বের শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট।

আমিই মজনুঁ, অন্যের তাহাতে বিষণ্ণ হইবার কি আছে? লায়লারূপ কবিত্বশক্তি আমার প্রতিই আসক্ত।

সাদৎ ইয়ার খান রঙ্গীন (১৭৫৫-১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ) সিরহিন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তহমাস্প বেঘ খান সর্বপ্রথম তোরান হইতে লাহোরে আসেন এবং তথায় হুসেন অল্-মুল্‌ক্ মীর মনোয়র খানের অধীনে একজন কর্মচারী নিযুক্ত হন। তৎপর দিল্লীতে আসেন এবং তথায় রাজসরকার হইতে 'হফ্‌ৎ-হজারী' পদ লাভ করেন ও 'জঙ্গ-বহাদুর' ও 'মহকুমুদ্দৌলহ' উপাধিতে ভূষিত হন।

বাল্যকাল হইতেই রঙ্গীনের কাব্য চর্চার প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাই যুবরাজ সুলেমান শকুহ-র অধীনে সহজেই তিনি একটি চাকরী পাইয়া গেলেন। লক্ষ্ণৌ থাকাকালীন তিনি প্রায়ই ইন্‌শার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাঁহার সহিত রঙ্গীনের বিশেষ বন্ধুত্বও ছিল। তিনি একজন দক্ষ অশ্বারোহীও ছিলেন এবং অস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি অনেকদিন হায়দরাবাদের নিজামের অধীনে সৈন্যবিভাগে 'তোপখানা'র একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই চাকরীতে ইস্তফা দিয়া কতকদিন ঘোড়ার ব্যবসাও করিয়াছেন।

প্রথম জীবনে শা হাতিম তাঁহার কাব্যগুরু ছিলেন। কথিত আছে,

তিনি কোন সময়ে মীর তকীর নিকট কাব্য-চর্চা অনুশীলনে সাহায্য চাহিলে তিনি রঙ্গীনকে এই বলিয়া বিফলমনোরথ করেন যে আমীর-ওমরাদের কাব্যচর্চা শোভা পায় না। কাহারো কাহারো মতে তিনি মুসহফীকেও তাঁহার কবিতা দেখাইয়াছেন।

রঙ্গীন একজন রঙ্গীলা-স্বভাব ব্যক্তি—সকল সময় তাঁহার হাস্যমুখর দার ভাব। কথিত আছে, তাঁহার চেহারাও অতি সুন্দর ছিল। ধনী পিতার পুত্র বশতঃ তাঁহার জীবনও অতি সুখসমৃদ্ধির মধ্যেই অতিবাহিত হইয়াছে।

রঙ্গীনের নিম্নলিখিত কাব্যসমূহের উল্লেখ আছে :

(১) মসনবীয়ে-দিল্‌পজীর : ইহার মধ্যে শাহ্‌জাদা মাহ্‌জবীন্ ও শ্রীনগর-রাণীর প্রেমকাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

(২) ইজাদে-রঙ্গীন : ইহা একটি মসনবী-কাব্য এবং কয়েকটি চিত্তাকর্ষক রূপ-কাহিনী ও হাস্যরসপূর্ণ গল্পের সমাবেশ।

(৩) মজহরুল্‌-আজায়িব বা আজায়িবুল্‌-মশ্‌হুর একটি মসনবী-কাব্য। ইহাতেও কয়েকটি চিত্তাকর্ষক রূপকাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

(৪) চারিটি দেওয়ান— ইহাদের সকলের একত্রে নামকরণ হইয়াছে চার উনসরে-রঙ্গীন। ইহাতে প্রত্যেকটির যথাক্রমে নামকরণ হইয়াছে :—(ক) দেওয়ানে-রীখ্‌তা, (খ) দেওয়ানে-বীখ্‌তা; (গ) দেওয়ানে-আমীখ্‌তা; ও (ঘ) দেওয়ানে-আঙ্গীখ্‌তা।

(৫) মজালিসে-রঙ্গীন : ইহা কতকটা আধুনিক যুগের সমালোচনা সাহিত্যের ন্যায়। ইহাতে রঙ্গীনের কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া, তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের জীবন-কথা ও তাঁহাদের কাব্যের সমালোচনা করা হইয়াছে।

(৬) ফরস্‌-নামা : ইহাতে ভালমন্দ ঘোড়ার পরিচয়— ইহাদের রোগের ঔষধ ও ঘোড়া বিষয়ক নানা তথ্য বিবৃত হইয়াছে।

রঙ্গীনের 'চার উনসরে রঙ্গীন'-এর প্রথম কাব্যে ঘজল ও রুবায়ী ছাড়া, ২টি কাব্যাকারে পত্র ও একটি কাসিদার উল্লেখ আছে। ২য় কাব্যে কেবল ঘজল ও কাসিদা-র সমাবেশ। ৩য় কাব্যে তাঁহার হাস্য-কৌতুকপূর্ণ কবিতা (বা হজলিয়াৎ) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাতে শয়তানের প্রশংসাসূচক একটি কাসিদা-কবিতারও উল্লেখ আছে। আর ৪র্থ কাব্যে 'রীখ্‌তী'-কবিতা। রঙ্গীন তাঁহার দেওয়ানে-আঙ্গীখ্‌তার দীবাচা বা উপ-

ক্রমণিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনিই এই কাব্য-ধারার পথপ্রদর্শক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই বিষয়ে রীখ্‌তী-কবিতার নাম-পরিচয়ে পূর্বেই সবিশেষ ব্যক্ত করা হইয়াছে। রীখ্‌তী-কবিতার ন্যায় বাঙলায়ও অনেকটা এইরূপেই স্ত্রীজোনোচিত ছন্দে ও মেয়েলী ঢঙ্গে কবিতা লেখার রীতি ১৭, ১৮ ও ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে এই সময়ে সারা ভারতেই একটা সমাজ-বিশৃঙ্খলা ও সাহিত্যিক-অধঃপতনের যুগ সূচিত হইতেছিল।

দিহলবী উর্দুর তৃতীয় পর্যায়ের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয় যে এই যুগের শেষভাগে কয়েকজন মোঘল-সম্রাটও উর্দু-কবি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুঘল-সম্রাটগণ তাঁহাদের সাহিত্যিক পৃষ্ঠপোষকতার জন্য চির-প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের কেহ কেহ আবার কাব্যেরও চর্চা করিয়াছেন। কিন্তু গভীরভাবে কাব্যে মনোনিবেশ করিয়া কাব্যাদি রচনা করা মুঘল-সাম্রাজ্যের শেষভাগেই বিশেষ করিয়া লক্ষিত হয়। ইহার একটি প্রধান কারণ অন্যান্য যুগে সম্রাটদের কর্মময় জীবন তাঁহাদের এই দিকে মনোনিবেশ করিবার সুযোগ দেয় নাই। কিন্তু এই যুগের সম্রাটগণ নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন—তাঁহাদের রাজকার্যের বিশেষ বাহুল্য ছিল না। তাই অফুরন্ত অবসর কাব্য-চর্চার মধ্য দিয়া কাটাইবার সুযোগ হইয়াছে।

কবি হিসাবে দ্বিতীয় শাহ আলম্ (১৭৫৭-১৮০৬) 'আফ্‌তাব্' কবি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার মজমূনে-আক্‌দস্ নামক একটি মসনবী কাব্যের উল্লেখ আছে। তাছাড়া বহু ঘজল সম্বলিত ১টি ফারসী ও একটি উর্দু দেওয়ান তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক সকল প্রসিদ্ধ কবিই, যথা সৌদা, মীর, ইনশা ও অন্যান্য অনেক কবিই তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন।

মীর্জা সুলেমান শুকূহ দ্বিতীয় শাহ আলমের তৃতীয় পুত্র। তিনি দিল্লীর রাজকীয় ঝঞ্ঝাট হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব আসফুদ্দৌলা তাঁহাকে মাসিক ৪ হাজার টাকা সাহায্য করিতেন। তাছাড়া অন্যান্য রাজন্যবর্গও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। শেষ জীবনে তিনি আকবরাবাদে অতিবাহিত করেন এবং তথায় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

সুলেমান শুকূহ উর্দু কবি ও সাহিত্যিকদের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকের সহৃদয় বন্ধুও ছিলেন। তিনি নিজেও

একজন কবি এবং তাঁহার একটি উর্দু দেওয়ানেরও উল্লেখ আছে। তিনি প্রথম জীবনে কবি হাতিমের নিকট হইতে কাব্য-শিক্ষালাভ করেন; এবং পরে মুসহফী ও ইনশা হইতেও কাব্যানুশীলনে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার দরবার মুসলিম কৃষ্টি ও সাহিত্য আলোচনার একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল।

ভারতের শেষ স্বাধীন বাদশাহ দ্বিতীয় বহাদুর শা (১৮৩৭-৫৭)-ও একজন প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার কবি-নাম 'জফর'। তাঁহার পিতা দ্বিতীয় আকবর শা (১৮০৬-৩৭) ও একজন কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাহাদুর শা ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন-চ্যুত হইয়া ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হন এবং তথায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কাব্য ছাড়া গানেও বহাদুর শার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং কথিত আছে ঠুংরী বাদ্যে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। তাঁহার হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর ছিল। এবং তাঁহার হস্তাক্ষরে লিখিত কোরান-শরীফ দিল্লীর অনেক মসজিদে যত্ন সহকারে এখনো রক্ষিত আছে। সাহিত্য-সমালোচক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি প্রসিদ্ধ ফারসী গ্রন্থ গুলিস্তানের উর্দু ব্যাখ্যা বেশ সরস ও নিপুণভাবে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিশেষ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন কাব্যে, এবং তাঁহার সরল, সরস ও চিত্তাকর্ষক চারিটি দেওয়ান সকল পাঠককেই মুগ্ধ করে।

(গ) লখ্নৌয়ী উর্দুর প্রথম পর্যায়
(বা নাসিখ ও আতিশ যুগ)

মুঘল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের যুগ হইতেই মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান সূচিত হয়। সেই সময়ে পারস্যরাজ নাদির শাহের ভারত-আক্রমণ (১৭৩৯ খ্রীঃ) ও দিল্লীতে তাঁহার নৃশংস অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড সকল অধিবাসীর মনেই একটা ভীতির সঞ্চার করে। ইহার কিছুকাল পরে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মারাঠা উৎপীড়িত মুসলমান কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া দুর্রানী (=দুর্-ই-দৌরান বা যুগরত্ন) উপাধিধারী আহমদ শা আবদালী পঞ্জাব আক্রমণ করেন। কিন্তু মহম্মদ শা (১৭১৯-৪৮)-র পুত্র যুবরাজ আহমদ শা ও মন্ত্রী কমালুদ্দীনের হাতে তাঁহার পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। সেই বৎসরই তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর আহমদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালেই দুর্রানীর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ভারত-আক্রমণের ফলে দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্য আরো সঙ্কুচিত হয় এবং ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে আহমদ শা সিংহাসনচ্যুত হইয়া তাঁহার স্থলে বাদশা জহানদার (১৭১২-১৮)-এর পুত্র আজিজুদ্দীন্ দ্বিতীয় আলমগীর নাম ধারণ পূর্বক সিংহাসন লাভ করিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আহমদ শা দুর্রানী চতুর্থবার ভারত আক্রমণ করেন ও দিল্লীর রাজপথ পুনরায় নরনারীর রক্তে রঞ্জিত হয়।

এই সময়ে মারাঠা জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে এবং সিন্ধু ও হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সর্বভারতের প্রভু হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পেশোয়াদের এই বিশাল শাসন ক্ষমতা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই দ্বিতীয় আলমগীর আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারায় এবং তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় শাহ আলম সিংহাসন লাভ করেন (১৭৫৯ খৃ)। এই সময়ে আহমদ শা দুর্রানী পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন ও ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে দুর্রানী-সৈন্যের নিকট মারাঠা শক্তি পরাজয় স্বীকার করে। আর পেশোয়াদের ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

এই দ্বিতীয় শাহ আলমকে ধরিয়াই ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ লাভ করেন।

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মারাঠাদের আশ্রয়ে দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া সেখানে বাস করিবার সুযোগ লাভ করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর আমলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে সেনাপতি লেক দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। তাহার পর হইতে মুঘল বাদশাহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তিজীবী হইয়া দাঁড়াইলেন। শাহ আলমের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-৩৭) এবং পৌত্র দ্বিতীয় বাহাদুর শা (১৮৩৭-৫৮) দিল্লীর নাম সর্বস্ব বাদশারূপে কোম্পানীর বৃত্তিভোগ করিতে থাকেন। এই দ্বিতীয় আকবরই তাঁহার ন্যায্য টাকা আদায়ের জন্য রাজা রামমোহন রায়কে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। আর সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই দ্বিতীয় বাহাদুর শা-কে ভারতের সম্রাট ঘোষণা করিয়াই দিল্লীর বিদ্রোহিগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ফলে বিদ্রোহ দমিত হইলে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। এইরূপে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান হয় এবং ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে অন্ধ ও শোকাতুর অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের এইরূপ অধঃপাতিত অবস্থায় রাজধানী দিল্লীতে কোন কৃষ্টির প্রসার বা সাহিত্যালোচনার সুযোগ কোথায়? আমরা দেখিতেও পাইয়াছি যে সকল সাহিত্যানুরাগী ও কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই ক্রমে ক্রমে দিল্লী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন। আর লক্ষ্ণৌর নবাবগণ ইহাকেই একান্ত সুযোগ মনে করিয়া মুসলিম কৃষ্টির প্রসারার্থে নিজেদের দরবারে তাঁহাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। এইরূপ অবস্থার মধ্যে লখ্‌নোয়ী কৃষ্টির গোড়াপত্তন যে দিহলবী ভাবধারা অনুযায়ীই গড়িয়া উঠিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এইরূপ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হইল না। লক্ষ্ণৌতে মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল গড়িয়া উঠার ফলে শীঘ্রই এখানকার স্থানীয় অধিবাসীও ক্রমে ক্রমে কৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। সূচনায় দিহলবী আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হইলেও, ক্রমে ক্রমে একটা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও লখনোয়ী ছাপ এই যুগের কবিদের মধ্যে প্রকাশ পাইতে থাকে। নাসিখ ও আতিশের যুগেই লখনোয়ী উর্দুর নিজস্ব ভাবধারায় প্রকাশ সর্বপ্রথম লক্ষিত হয়।

লখনোয়ী মুসলিম কৃষ্টির অভ্যুত্থানের যুগে তথায় কোন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না। পরবর্তী যুগে দিহলবী কবিদের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হইয়া লখনোয়ী-কবিদের অভ্যুত্থান দৃষ্ট হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের যুগে যে সকল কবি তাঁহাদের ভিটে-বাড়ী ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন—তাঁহারা অনেকটা পেটের দায়ে সাহায্যের অন্বেষণ করিতে-

ছিলেন। তাই তাঁহাদের লেখনীতে আশ্রয়কারীদের প্রতি তুষ্টির মোহিনী কাব্য যে গ্রথিত হইবে তাহা স্বাভাবিক। আর লখ্নোয়ী কবিগণ তাঁহাদের অনুকরণ করিতে যাইয়া প্রশংসাসূচক কাসিদা কবিতা ও নিকৃষ্ট হীনার্থক ঘজল কবিতা লিখিতেই মশগুল হইয়াছেন। বস্তুতঃ লখ্নোয়ী যুগে কোন খাঁটি কবির নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে ইহাও ঠিক যে ফারসী কাব্যকে অনুসরণ করিয়া কাব্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গী ও নূতন নূতন কাব্য-ধারার প্রকাশন এই যুগে যত বিস্তার লাভ করিয়াছে, আর কোন যুগেই তাহা হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা বিভিন্ন কাব্যের বহিরঙ্গের দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, ইহার অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সুযোগ পান নাই। আর কেবল মুসলিম-কৃষ্টির প্রসারতার দিকেই বিশেষ করিয়া সজ্ঞান থাকার ফলে, আরবী-ফারসীর শব্দ-ভাণ্ডার অফুরন্তভাবে বহন করিয়া আনিয়াছেন। আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই যে শব্দ-মাধুর্যের দিকেই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখার জন্য এবং হিন্দী পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সঠিক জ্ঞান না থাকায় ফারসী-দরদী কবিগণ তাঁহাদের কাব্যে লিঙ্গ-ভেদের বেশ একটা বিভ্রাট সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দিহলবী ও লখ্নোয়ী উর্দুতে ব্যাকরণগত অনেক পার্থক্যই দৃষ্ট হইবে।

শেখ ইমাম বখ্শ্ নাসিখ্ (মৃত্যু ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ) উর্দু সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ কবি এবং লখনোয়ী কাব্য-ধারার একজন শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক। কথিত আছে, খোদা বখ্শ্ নামে লাহোরের একজন নিঃসন্তান ধনী তাবু-ব্যবসাদারের তিনি একজন পালিত পুত্র। তাঁহার বাল্যজীবন লক্ষ্ণৌতেই অতিবাহিত হয় এবং তথায়ই তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তিনি আরবী ও ফারসীতে বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁহার কাব্য-গুরু কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই। কথিত আছে, তিনি মীরের নিকট কাব্য-শিক্ষার্থে গিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। কাহারো কাহারো মতে তিনি তনহা নামে মুসহফী-র একজন শিষ্য হইতে কাব্য চর্চায় সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

নাসিখ আজন্ম অবিবাহিত ও বেশ সুস্থ এবং সবলকায় পুরুষ ছিলেন। তিনি নিত্য ব্যায়াম করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার প্রত্যেকটি দিন নিয়মানুবর্তিতার বশবর্তী ছিল। তিনি ভোজন-প্রিয় ছিলেন বলিয়াও খ্যাতি আছে, কিন্তু দিনে একবার মাত্র আহার করিতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় নিত্য তাঁহার নিজ বাড়ীতে শিষ্যবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া বৈঠকী কাব্যালোচনা হইত। আর

রাত্রিকালে নিজে কবিতা লিখিতেন বা কাব্য-পাঠে আনন্দ উপভোগ করিতেন। তাঁহার সময়ের অতি পরমুখাপেক্ষী যুগে ইহা অতি আশ্চর্যজনক যে তিনি কোন কাসিদা কবিতা লিখেন নাই। মনে হয় তিনি একজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন।

নাসিখ একজন বেশ রসিক ও আমোদপ্রিয় ব্যক্তি। এইজন্য তাঁহার শিষ্যবর্গ ছাড়াও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সাহচর্য লাভ করিয়া কৃতার্থ মনে করিতেন। আর তাঁহাদের সৌজন্যেই তিনি কাহারো অধীনে কোন চাকরী বা উমেদারী না করা সত্ত্বেও লক্ষৌতে তাঁহার জীবন বেশ সুখেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু নবাব ঘাজীউদ্দীন হয়দরের সময়ে তাঁহার দরবারের রাজকবি বা মলিকুশ্-শুঅরা পদ অবহেলায় উপেক্ষা করায় ১৮৩১ সনে কতক-কাল তিনি নবাবের ক্রোধাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লক্ষৌ ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে বসবাস করেন। সেই সময়ে হায়দরাবাদের আসফিয়া সাম্রাজ্যের দেওয়ান সাহিত্যিক ও কবি-দরদী রাজা চন্দূলাল ১২ হাজার টাকা নজরানা পাঠাইয়া তাঁহাকে তাঁহার দরবারে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন। কিন্তু নাসিখ অতি সহজেই এই আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন। এবং নবাব ঘাজীউদ্দীনের মৃত্যুর পরেই আমাদের জন্মভূমি-পিয়াসী কবি আবার তাঁহার জন্মভূমিতে ফিরিয়া গেলেন। কথিত আছে, ইহার পরেও আবার তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকদের একজন শত্রু হকীম মহদীর ক্রূর দৃষ্টি হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে লক্ষৌ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এইবার তিনি এলাহাবাদ ছাড়া বেনারস, কানপুর, পাটনা প্রভৃতি স্থানে কতকদিনের জন্য ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। শীঘ্রই হকীম সাহেবের মৃত্যুর পর আবার জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন এবং তথায় ১২৫৪ হিজরীতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য রশ্‌ক্ তাঁহার উদ্দেশ্যে তারীখ (বা মৃত্যু দিবসকে নির্দিষ্ট করিয়া কবিতা) লিখিয়া গিয়াছেন—দিলা শয়র্-গুয়ী উঠি লখ্‌নো সে—

দلا شعرگوئی اٹھی لکھنؤ سے —

নাসিখের প্রসিদ্ধির তিনটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। (১) নানা ছন্দে ও বিভিন্ন ভঙ্গীতে ঘজল কবিতা লিখা। (২) উর্দুতে নূতন একটি কাব্য-ধারা বা পদ্ধতির সৃষ্টি করা। এবং (৩) একটি কবি-গোষ্ঠী গড়িয়া তোলা।

নাসিখের তিনটি দেওয়ানের উল্লেখ আছে। প্রথমটির নাম দফ্‌তরে-

পরীশান্। ইহাতে অধিকাংশই ঘজল, তাছাড়া কয়েকটি রুবায়ী ও অন্যান্য কবিতাও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দেওয়ানের উভয়ই তারীখ কবিতায় পূর্ণ। তাঁহার তারীখের একটি বিশেষ সার্থকতা এই যে, ইহাতে অনেক বিখ্যাত কবি ও প্রসিদ্ধ ঘটনার তারিখ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

নাসিখের কবিতায় আরবী ফারসী শব্দের অজস্র আমদানী এবং অনেক সময় ইচ্ছা করিয়া কবি অধিক সমঞ্জস হিন্দী শব্দ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্যে পাণ্ডিত্য থাকিলেও তাহা রসাল ও শ্রুতিমধুর হয় নাই। তাছাড়া ফারসী ধারানুযায়ী রূপক ও সাদৃশ্যের অবতারণা করিয়া তিনি যেন বন্য ফুলের সঙ্গে বিলাতী ফুল একত্র সজ্জিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

নাসিখ-কবিতার একটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ঘয়েরে-কৌসর কিসী দরিয়া কা মৈঁ সববাহ নহীঁ ;
বেশায়ে-শীরে খোদা বিন্ কহীঁ সইয়াহ নহীঁ।
জুল্‌ম তৌলে-শবে-ফির্কৎ কে ততাওল নে কিয়া ;
দাদ্ রস কোয়ী বজুজ্ খালিকুল্-আস্‌বাহ নহীঁ।

غیر کوثر کسی دریا کا میں سباح نہیں —
بیشۂ شیر خدا بن کہیں سیاح نہیں
ظلم طول شب فرقت کے تطاول نے کیا —
دادرس کوئی بجز خالق الاصباح نہیں

অর্থাৎ, কৌসর নদী ছাড়া আমি আর কোথাও সন্তরণ করিব না ; খোদার শীর-বন ছাড়া আর কোথাও আমি ভ্রমণ করিব না। বিরহের দীর্ঘ রাত্রির যাতনা আমাকে (সততই) দগ্ধ করিতেছে ; (কিন্তু) সদানুষ্ঠানের মালিক ছাড়া আর কাহারো নিকট এই দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্তি কামনা করি না।

নাসিখ গঠিত কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে নিম্নলিখিত কবিগণ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন :—উঅজীর, বর্‌ক্, রশ্‌ক্, বহর, মুনীর, মিহর, নাদির, আবাদ এবং যাহির।

খাজা মহম্মদ উঅজীর হজরৎ খাজা বহাউদ্দীন নক্‌শবন্দীর বংশোদ্ভূত খাজা মহম্মদ ফকীরের পুত্র। খাজা উঅজীর নিজে একজন সংস্বভাব ও দরবেশ ব্যক্তি ছিলেন। তাছাড়া নক্‌শবন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া লক্ষ্ণৌ শহরে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। অধিকন্তু তিনি পণ্ডিত,

সাহিত্যিক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন ; এবং তাঁহার এই স্বাধীন-স্বভাব বশতঃ বাদশা উআজিদ আলীর দরবার হইতে দুইবার আমন্ত্রিত হইয়াও তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ বয়সে খাজা উঅজীর লোক সমাগম হইতে দূরে নির্জনে ভগবৎ-চিন্তায় অতিবাহিত করিয়াছেন। অবশেষে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

খাজা উঅজীরের মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধুবর্গ ও শিষ্যগণের সম্মিলিত চেষ্টায় তাঁহার কবিতাসমূহ একত্রে সন্নিবদ্ধ করিয়া 'দফ্তরে-ফসাহৎ' প্রকাশিত হয়। উঅজীরের আবার অনেক কবিশিষ্য ছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে ফকীর মহম্মদ খান গোইয়া প্রসিদ্ধ। উঅজীরেরও কাব্য-ধারা তাঁহার কবিগুরু নাসিখের অনুযায়ীই ছিল। বস্তুতঃ তিনি নাসিখের সবচেয়ে প্রিয় ও প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন।

ফতেহউদ্দৌলা বখ্শী অল্-মুল্‌ক্ মির্জা মহম্মদ রিজা বর্‌ক্ মির্জা কাজিম্ আলী খানের পুত্র এবং তিনি অযোধ্যায় শেষ বাদশা উআজিদ আলী শা-র মুসাহিব ছিলেন। বস্তুতঃ কবির সহিত নবাব সাহেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি নবাব সাহেবের কবি-গুরুও ছিলেন। কবি বর্‌ক তাঁহার পৃষ্ঠপোষক উআজিদ আলী শার সিংহাসন-চ্যুতির পর তাঁহার কলিকাতা অবস্থানকালে নবাব সাহেবের সহগামী হইয়াছিলেন এবং তথায়ই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

কবি বর্কের নানা প্রকার কবিতা সম্বলিত একটি দেওয়ানের উল্লেখ আছে। তিনিও তাঁহার কবি-গুরু নাসিখের অনুযায়ীই তাঁহার কাব্যসমূহ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারও আবার দুইজন কাব্যশিষ্য যথা জলাল ও সিহর বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

নিম্নে কবি বর্কের কয়েকটি বয়েৎ তাঁহার কাব্যের নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত হইল :—

আতা নহীঁ করার্ দিল-ই-বেকরার্ কো ;
ঘম্ মেঁ ফস্লা হূঁ দাম্-ই-মঃহব্বৎ সে ছূট্ কর্।

অর্থাৎ, অস্থির মনে স্থিরতার অভাব দেখা যাইতেছে—প্রেমের জাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুঃখ (-জালে) জড়িত হইয়া গিয়াছি।

আবার,

আজান দী কাবা মেঁ নাকুস দয়ের মেঁ ফুঁকা ;
কহাঁ কহাঁ তেরা আশেক্ তুঝে পুকার আয়া।

اذاں دی کعبہ میں ناقوس دیر میں پھونکا —
کہاں کہاں ترا عاشق تجھے پکار آیا

অর্থাৎ, কাবায় আজান দেওয়া হইতেছে এবং গীর্জায় বাদ্য বাজিতেছে; (কিন্তু) কোথায় তোমার প্রেমিক তোমাকে সম্বোধন করিতেছে?

মিহর্ কবি নামধারী মির্জা হাতিম আলী বেগ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ইস্‌ফহানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা মির্জা ফয়েজ আলী বেগ কিজিল্‌বাশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগে আলিগড়ের তহশীলদার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ মির্জা মুরাদ্ আলী খানই সর্বপ্রথম নবাব সুজাউদ্দোলার রাজত্বকালে লক্ষ্ণৌ আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং তথায় 'রুকন্-উদ্দৌলা' উপাধিতে ভূষিত হন।

বাল্যকাল হইতেই মিহরের কাব্য-প্রতিভা লক্ষিত হয়। কথিত আছে, তাঁহার ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, 'মাহ' কবি-নাম ধারী তাঁহার বড় ভাই মির্জা এনায়েৎ আলী বেগকে আতিশের নিকট হইতে কাব্যে দীক্ষা গ্রহণ করিতে দেখিয়া মিহরও নাসিখের নিকট কাব্য শিক্ষায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। এবং শীঘ্রই তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া পরিচয় লাভ করেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সরকারী পরীক্ষা পাশ করিয়া মিহর চুনারগড়ের মুনসিফ পদ প্রাপ্ত হন। তিনি প্রধান বিচারালয় তথা হাইকোর্টের একজন উকিলও ছিলেন। কয়েকজন ইংরেজকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ইংরেজ গভর্নমেণ্টের বিশেষ সুনজরে ছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে সরকারী জায়গীর ও অন্যান্য অনেক সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ঈটায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

মিহর ইমামিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাম্প্রদায়িক কোন গোঁড়ামী ছিল না। তাঁহার সমসাময়িক ঘালিব, আনীস, দবীর, ঘুলাম ইমাম শহীদ, সবা, মুনীর ও অন্যান্য সকল প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গেই তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার অন্যান্য অনেক গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ উল্লেখযোগ্য :—

(১) অল্‌মাসে-দরখ্‌শান্ নামক একটি উর্দু কাব্য। ইহার তারীখী-নাম (অর্থাৎ সময় নির্দেশক নাম) খিয়ালাৎ-ই-মিহর্। ইহা ১২৮৭ হিজরী বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

(২) মসনবীয়ে-দাঘে-নিগার।

(৩) মসনবীয়ে-শুয়ায়ে-মিহর। কবি ঘালিব তাঁহার পত্রাদিতে ইহার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন।

(৪) উআসুখ্‌ৎ-ছন্দে লিখিত দাঘে-দিলে-মিহর।

(৫) পীরায়ায়ে-আরুজ্‌ :—ইহা কাব্য-ছন্দ সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থ। এবং

(৬) আয়াঘে-ফিরিঙ্গিস্তান :—ইংরেজদের রাজত্বকালের প্রথম পর্বের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

'আতিশ' কবি-নামে প্রসিদ্ধ খাজা হায়দর আলীর পিতা খাজা আলী বখশ দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত। তিনি নবাব শুজাউদ্দৌলার রাজত্বকালে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া ফৈজাবাদে আসেন এবং তথায় মুঘলপুর নামক স্থানে অবস্থান করিতে থাকেন। এই মুঘলপুরেই কবি আতিশের জন্ম হয়। তাঁহার বাল্যকালেই আতিশের পিতার মৃত্যু হয়। তাই তাঁহার লেখাপড়া বিশেষ হয় নাই, কিন্তু বাল্যকালেই তাঁহার কাব্য-প্রতিভা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। শীঘ্রই মির্জা মহম্মদ তকীখান তরক্কীর সঙ্গ লাভের সুযোগ হয় এবং তাঁহার সহিত আতিশ লক্ষ্ণৌ আসেন। তথায় কবি মুসহফীর নিকট তিনি কাব্যে দীক্ষা লাভ করেন। এবং ক্রমে একজন কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার কাব্য নাসিখের কাব্যের ন্যায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ না হইলেও, সরল ও স্বাভাবিক রসব্যঞ্জনার জন্য তাঁহার কাব্য অনেকের চিত্ত বিনোদন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বস্তুতঃ নাসিখ ও আতিশের কাব্য-ধারা তাঁহাদের জীবন-প্রবাহের ন্যায়ই পৃথক পথে চালিত হইয়াছিল। আতিশ যেমন ছিলেন সাধারণ মানুষ, তেমনি তাঁহার কাব্যও ছিল সরল ও স্বাভাবিক। তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ অলঙ্কার প্রয়োগের কোন চেষ্টাই করিতেন না—বলিতে কি, তাঁহার এই সকল অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষমতাই হয়ত ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বভাব-কবি এবং রসব্যঞ্জনাই তাঁহার কাব্যের প্রধান অবলম্বন। সাধারণ ভারতবাসীর ন্যায় মহল্লায়ে-মালী খানের সরাই থানার একটি ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে বসবাস করিয়া তাঁহার সরল ও স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন ছিলেন লোভ-হীন, তেমনি শান্তিপ্রিয়। এবং রাজা-বাদশা বা আমীর উমরার নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতে তিনি কখনই আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। স্বতঃপ্রবৃত্ত আমীর উমরাদের সাহায্য বা শিষ্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়ই তাঁহার কোন রকমে দিন গুজরান হইয়াছে।

আতিশ নাসিখেরই সমসাময়িক এবং তাঁহার সহিত নাসিখের বিশেষ

বন্ধুত্বও ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুইটি কাব্য-ধারার সৃষ্টিতে আতিশ গোষ্ঠী ও নাসিখ গোষ্ঠীর মধ্যে কতকটা বাক-বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়—যদিও এই বাক-যুদ্ধ পূর্বযুগের দুই গোষ্ঠীর বাগবিতণ্ডার ন্যায় কখনই এত জোরালো হয় নাই। তাঁহাদের বাক-বিতণ্ডার স্বরূপ কতকটা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

নাসিখ লিখিয়াছেন,

এক জাহেল কহ্ রহা হায় মেরে দেওয়ান কা জবাব ;
বু-মুসৈলম নে কহা থা জৈসে কোরান কা জবাব।
ایک جاھل کہہ رھا ھے میرے دیوان کا جواب —
بو مسیلم نے کہا تھا جیسے قران کا جواب

অর্থাৎ, আবু মুসৈলম যেমন কোরানের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিল, তেমনি এক অজ্ঞান আমার দেওয়ানের সমালোচনা করিতেছে।

আতিশ-গোষ্ঠী ইহার উত্তরে বলিলেন,

কীওন্ নহ দে হর্ মৌমিন্ উস্ মুল্হিদ্ কে দীবান্ কা জবাব্ ;
জিস্ নে দীবান্ অপ্না ঠর়াইয়া হৈ কুরান্ কা জবাব্।

অর্থাৎ, যে (কাফির) তাহার দেওয়ানকে কোরানের উত্তর (বা সমতুল্য) মনে করে, সেই মুলহিদের দেওয়ানের উত্তর (বা সমালোচনা) কেন (তাঁহার অনুসরণকারী) মৌমিন বা বিশ্বাসিগণ দেয় না।

আতিশের কবি-নাম অনুযায়ী তাঁহার কাব্যও ছিল বেশ সতেজ ও উদ্দীপ্ত। উর্দু কাব্য-জগতে ঘজল কবিতায় মীর ও ঘালিবের পরেই তাঁহার স্থান এইরূপ কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সাধারণ কথ্য ভাষার মধ্য দিয়া সহজ সরলভাবে রসব্যঞ্জনা সৃষ্টি করায় আতিশ বোধ হয় উর্দু কাব্য-জগতে অদ্বিতীয়। পাণ্ডিত্য নাই, অথচ ভাব-গম্ভীর চিন্তাধারা—এইরূপ স্বাভাবিক গুরু-গম্ভীর ভাব-প্রকাশের তুলনা ঘালিব ব্যতীত উর্দু সাহিত্যে আর বিশেষ দৃষ্ট হয় না। আতিশ ঘজল ছাড়া আর কোন কবিতার চর্চা করেন নাই এবং তাঁহার ১ম দেওয়ানটি তাঁহার জীবিতকালেই প্রকাশিত হইয়া বেশ সুনাম অর্জন করে। আর দ্বিতীয় কাব্যটি তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পরম সুহৃদ ও শিষ্য মীর দুস্ত আলী খলীল আতিশের প্রথম কাব্যেরই একটি বর্দ্ধিত-রূপ হিসাবে প্রণয়ন করেন।

আতিশের কাব্য সম্বন্ধে কেহ কেহ এরূপ সমালোচনা করেন যে, ইহাতে কোন পাণ্ডিত্যের লক্ষণ নাই। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কাব্য কখনও পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করে না—রসব্যঞ্জনাই ইহার মূল

ভিত্তি। তাছাড়া আতিশ অনেক সময় আরবী-ফারসী শব্দের বিকৃত ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাকে সমালোচকগণ তাঁহার পাণ্ডিত্যের ন্যূনতা বলিয়া সপ্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। আতিশ বস্তুতঃ এই সকল শব্দ সাধারণ লোক যেমনভাবে উচ্চারণ করে সেই উচ্চারণ ভঙ্গীকেই কাব্যে রূপ দিয়াছেন, তিনি কখনও ইহাদের খাঁটীরূপের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। তাহাতেই আতিশের কাব্য বোধ হয় আরো সরস ও স্বাভাবিক হইয়াছে।

নিম্নে আতিশের একটি ঘজল নমুনা-স্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

খানা খরাব নালুন্ কী বল্ বে-শরারতীন্
বহতী হায়ঁ পানী হো হো কে সঙ্গীন্ ইমারতীন্।
সর কোন্ সা হায় জিস্ মেঁ কি সৌদা নহীঁ তেরা ;
হোতী হায়ঁ তেরে নকশে-কদম্ কী জিয়ারতীন্।
খানা হায় গঞ্জফা কা হর এক কসর শহরে-ইশক্ ;
ঘর ঘর হায়ঁ বাদশাহীয়ান্ ঘর ঘর উজারতীন্।
দীদারে-ইয়ার বর্কে-তজল্লী সে কম নহীন্ ;
বন্দ আঁখীন্ হোঙ্গী দেঙ্গী দোয়ায়িন্ বসারতীন্।
আঁখোন্ মেঁ আপনী দৌলতে-বীদার হায় উস খাব্ ;
হোতী হায়ঁ তেরে উসল কী জিন্ বিশারতীন্।
কহতে হায়ঁ মাদর ও পিদরে-মিহর্বান্ কো বদ ;
কর্তে হায়ঁ উস জো আর্জ ও সমা কী হকারতীন্।
গোইয়া জবান্ হো তো করে শুক্র্ আদমী ;
সমঝে জো তু তো করতে হায়ঁ ইয়া গঙ্গ্ ইশারতীন্।
জীরে-জমীন্ ভী ইয়াদ হায়ঁ হফ্ৎ আসমান্ কে জুলুম্ ;
ভূলা নহীন্ মৈঁ সঙ্গ্ দিলোন্ কী শরারতীন্।
খিজির ও মসীহ কাটতে হায়ঁ রশক্ সে গলা ;
তু ভী তো কর শহীদোন্ কী আপনে জীয়ারতীন্।
আলম্ কো লোট খায়া হায় এক পেট্ কে লিয়ে ;
ইস্ গার মে গয়ী হায়ঁ হজারোন্ হী ঘারতীন্।
বাকী রহে গা নাম হমারা নিশান্ কে সাথ্ ;
আপনী ভী চন্দ্ বয়েতীন্ হায়ঁ আপনী ইমারতীন্।
অহলে-জহান্ কা হাস হায় কিয়া হম্ সে কিয়া কহীন্ ;
বদ্ গোইয়ান্ হায়ঁ পীছে তো মুঁহ পর্ ইশারতীন্।

নকশ্ ও নিগারে-হুসনে-বুতান্ কা না খা ফরীব্ ;
মতলব সে খালী জান্ লে তু ইয়া ইবারতীন্।
আশেক্ হায় হম্ কো মদ্দে-নজর্ কোয়ি ইয়ার হায় ;
কাবা কে হাজীওন্ কো মুবারক্ জিয়ারতীন্।
অইসী খিলাফ্ হম্ সে হোয়ী হায় হাওয়ায়ে-দহর ;
কাফুর্ খায়ে তো হোন্ পয়দা হরারতীন্।
আতিশ ইয়া শশ্ জিহৎ হায় মগর্ কোচা ইয়ার কা ;
চারোন্ তরফ সে হোতী হায় হম্ পর্ ইশারতীন্।

خانہ خراب نالون کی بل بے شرارتیں —
بہتی ہیں پانی ہو ہو کے سنگین عمارتیں
سر کونسا ہے جس میں کہ سودا نہیں ترا —
ہوتی ہیں تیرے نقش قدم کی زیارتیں
خانہ ہے گنجفہ کا ہر ایک قصر شہر عشق —
گھر گھر ہیں بادشاہیاں گھر گھر وزارتیں
دیدار یار برق تجلی سے کم نہیں —
بند انکھیں ہونگی دینگی دعائیں بصارتیں
آنکھوں میں اپنی دولت بیدار ہیں وہ خواب —
ہوتی ہیں تیرے وصل کی جن میں بشارتیں
کہتے ہیں مادر و پدر مہربان کو بد —
کرتے ہیں وہ جو ارض و سما کی حقارتیں
گویا زبان ہو تو کرے شکر آدمی —
سمجھے جو تو تو کرتے ہیں یہ گنگ اشارتیں
زیر زمیں بھی یاد ہیں ہفت اسمان کے ظلم —
بھرتی نہیں میں سنگدلوں کی شرارتیں
خضر و مسیح کاٹتے ہیں رشک سے گلا —
تو بھی تو کر شہیدوں کی اپنے زیارتیں
عالم کو لوٹ کھایا ہے اک پیٹ کے لئے —
اِس غار میں گئی ہیں ہزاروں ہی غارتیں

باقی رهیگا نام همارا نشاں کے ساتھ —
اپنی بهی چند بیتیں هیں اپنی عمارتیں
اهل جہاں کا حال هے کیا هم سے کیا کہیں —
بد گوئیاں هیں پیچهے تو منه پر اشارتیں
نقش و نگار حسن بتاں کا نه کها فریب —
مطلب سے خالی جان لے تو یه عبارتیں
عاشق هیں هم کو مد نظر کوی یار هے —
کعبه کے حاجیوں کو مبارک زیارتیں
ایسی خلاف هم سے هوئی هے هواے دهر —
کافور کهائے تو هوں پیدا حرارتیں
اتش یه شش جہت هے مگر کوچه یار کا —
چاروں طرف سے هوتی هیں هم پر اشارتیں

অর্থাৎ, গৃহ-ভগ্নকারী (বা বিষন্ন ও বেদনাময়) অশ্রু অহিতকর নয় ; (তাহা হইলেও) পাষাণ-অট্টালিকা (বা হৃদয়) জলে পরিবর্তিত হইয়া বহিয়া যাইতেছে। (যখন) তোমার পায়ের ছাপ দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তখন এমন কোন মাথা (বা মন) রহিয়াছে যে তোমার (প্রেমে) পাগল না হয়? প্রেম-নগরের প্রত্যেকটি অট্টালিকা (যেন নানা বর্ণে চিত্রিত) তাসের ঘর ; ঘরে ঘরে বাদশাহী ও ঘরে ঘরে উজারতী বিরাজ করিতেছে। তোমার মুখ জ্ঞানের বিদ্যুৎ-ছটা হইতে কিছু কম নহে ; চক্ষু বন্ধ থাকিলেও দৃষ্টিলাভের করুণা পাওয়া যাইবে। যাঁহার নিকট তোমার মিলন-সংবাদ পৌছিয়াছে— তাঁহার চোখে এই জাগ্রৎ সম্পদ স্বপ্ন বলিয়া অনুভূত হয়। যে এই স্থান ও সময় (অর্থাৎ স্বর্গীয় অনুভূতি) কে তাচ্ছিল্য করে, সে তাঁহার দয়ালু মাতাপিতাকেও কটূক্তি করে। অনুভূতিসম্পন্ন লোকের নিকটে মনে হইবে যে (সমস্ত পৃথিবীর) মানব যেন গঙ্গারূপ জিহ্বা দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। মাটির নীচেও সপ্তাকাশের অত্যাচার কাহিনী জড়িত আছে ; আমি নিষ্ঠুরতার ক্ষতিকর কার্যের কথা এখনো ভুলি নাই। খিজির ও যিশু (তোমার প্রেমে) পাগল হইয়া যখন তাঁহাদের মাথা কাটিয়া ফেলে, তখনই তুমি শহীদদের (বা আত্মবিসর্জনকারী) নিজ-দর্শন দাও। সারা পৃথিবী এক পেটের জন্য লুণ্ঠিত হইতেছে—এই গর্তের মধ্যে হাজার হাজার লোক গহ্বরস্ত হইয়াছে। আমার নামের চিহ্ন চিরকাল স্থায়ী হইয়া

থাকিবে—আমার এই কয়েকটি কবিতাই আমার স্মৃতি-স্তম্ভ। পার্থিব লোকের সহিত আমার কি সম্বন্ধ—তাঁহাদের কথার কি মূল্য? তাহারা যদিও পেছন হইতে নিন্দা করে, তাহাদের মুখেই ইহার প্রকাশ (দৃষ্ট হয়)। প্রেমিকের বাহ্যিক সৌন্দর্য হইতে প্রতারিত হইও না; হে নিঃস্বার্থ মন, তুমি এই উপদেশ গ্রহণ কর। আমরা প্রেমিক, আমাদের দৃষ্টি কেবল বন্ধুর বাসস্থানের প্রতি নিবদ্ধ; কাবাগমনকারীই শুভ-দর্শন লাভ করে। কর্পূরের বশীভূত হইলে যেমন বিশুদ্ধ ভাবের উদয় হয়, তেমনি পার্থিব চিন্তা আমা হইতে দূরে রহিয়াছে। হে আতিশ, এই দিকসমূহ সকলই খোদার বাসস্থান—চারিদিক হইতে এই নির্দেশই আমার নিকট আসিতেছে।

আতিশ-কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে নিম্নলিখিত কবিগণ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—রিন্দ্, সবা, খলীল, নসীম, নবাব মির্জা শৌক্ এবং আগা হিজ শরফ্।

রিন্দ কবি-নামধারী নবাব সৈয়দ মহম্মদ খান সিরাজ-উদ্দৌলহ নবাব ঘিয়াস্ মহম্মদ খানের পুত্র। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ফয়জাবাদে তাঁহার জন্ম হয়। বুর্হানুল্-মুল্ক্ সাদৎ খানের বংশ-সম্ভূত বলিয়া তিনি বহুবেগম সাহেবার নিকট হইতে শিক্ষাদি ব্যাপারে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ফয়জাবাদে বাসকালীন তিনি কবিবর খলীককে তাঁহার কাব্য-রচনাদি দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার কবি-নাম 'উঅফা' গ্রহণ করেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্ণৌ আগমন করেন এবং তথায় তিনি আতিশ-গোষ্টীর অন্তর্ভুক্তি লাভ করেন। লক্ষ্ণৌতে তিনি তাঁহার নূতন কবি নাম 'রিন্দ' গ্রহণ করেন। কবি নামোচিত লক্ষ্ণৌতে তাঁহার পরবর্তী জীবন তিনি বেশ সুখ ও সমৃদ্ধিতেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। রিন্দের প্রথম কাব্য গুলদস্তায়ে-ইশক্ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। আর তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যটি তাঁহার মৃত্যুর পরে সম্পাদিত হয়। কথিত আছে, রিন্দ তাঁহার কবিগুরু আতিশের মৃত্যুর পর শরাব পান করা পরিত্যাগ করেন এবং পরবর্তী জীবন বেশ নিষ্ঠা ও সংযমের সহিত অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি হজ (বা তীর্থ যাত্রা) মানসে মক্কায় রওনা হন, কিন্তু পথিমধ্যে বোম্বাইতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রিন্দের কাব্যে উচ্চ ভাবধারার কোন সমাবেশ না থাকিলেও, চটুল বাগ্‌ধারার কোন অভাব নাই। তাছাড়া তাঁহার কাব্য বেশ সরল ও সরস এবং তাঁহার কোন কোন কবিতায় সুফীচিন্তাধারা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার একটি বয়েৎ উদ্ধৃত হইল।

দীদে-লায়লাকে লিয়ে দীদায়ে-মজনূঁ হায় জরুর্‌ ;
মেরী আঁখুন সে কোয়ি দেখে তমাশা তেরা।
دید لیلی کے لئے دیدۂ مجنوں ہے ضرور —
میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشہ تیرا

অর্থাৎ, লায়লার দর্শনের জন্য (যেমন) মজনূর চক্ষু সদা উন্মুখ, (তেমনি) আমার চক্ষেও তোমার ছবিই উদ্ভাসিত হইতেছে দেখা যাইবে।

'নসীম' কবি-নামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দিয়া শঙ্কর কোল তাঁহার মসনবী কাব্য গুলজারে-নসীম লিখিয়া উর্দু সাহিত্যে বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম পণ্ডিত গঙ্গা পরশাদ কোল। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত কাশ্মীরী বংশোদ্ভূত পণ্ডিত। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার কাব্যশক্তির বিশেষ উন্মেষ হয় এবং তাঁহার ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আতিশকে তিনি কাব্য গুরু রূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম কাব্যই গুলজারে-নসীম ও এই মসনবী কাব্যকে কেহ কেহ মীর হসনের সিহরুল্‌-বয়ানের সমতুল্য মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ গুলজারে-নসীম চটুল বাগ্‌ধারা ও শব্দার্থালঙ্কারের সমাবেশে এক অপূর্ব রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

(ঘ) লখ্‌নোয়ী উর্দুর দ্বিতীয় পর্যায়
(বা উআজিদ্ আলী শা আখতরের যুগ)

নবাব শুজাউদ্দৌলার পুত্র আসফুদ্দৌলা নামে প্রসিদ্ধ নবাব ইয়াহী খান নাম মির্জা আমানী তাঁহার ২৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ফয়জাবাদের সিংহাসনাধিকার লাভ করেন। এবং এই সিংহাসন অধিকার করার কিছু কাল পরে তিনি তাঁহার নূতন রাজধানী লক্ষৌতে স্থাপন করেন। আসফুদ্দৌলা নিজেও একজন সাহিত্যিক ছিলেন এবং তাঁহার কবি-নাম ছিল 'আসফ্'। তিনি বিশেষ করিয়া একজন সাহিত্য-সমজদার ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালেই প্রসিদ্ধ দেহলবী-কবিগণ তাঁহার দরবারে অতি সমাদরের সহিত আপ্যায়িত হন। এই সময় হইতেই আউধ্‌ বা অযোধ্যায় ইংরেজদের প্রতিপত্তি বিশেষ দৃষ্ট হয় এবং আসফুদ্দৌলাকে এই ইংরেজদের তদারক হেতু ১ লক্ষ টাকার উপর খরচ করিতে হইত।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে আসফুদ্দৌলার পুত্র উঅজীর আলী সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি ইংরেজদের কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার স্থলে আসফুদ্দৌলার বৈমাত্রেয় ভাই সাদৎ আলী খান অধিষ্ঠিত হইলেন। ইংরেজদের আধিপত্য ক্রমশঃ এইরূপভাবে বিস্তার লাভ করে যে সাদৎ আলী খান নামে মাত্র নবাব রহিলেন এবং ইংরেজ রেসিডেণ্ট জোন বেইলীই কার্যতঃ রাজ্যশাসন পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সাদৎ আলী খানকে রাজ্যশাসন ব্যাপারে বিশেষ মনোনিবেশ করিতে হইত না বলিয়া তিনি কাব্য-চর্চার বিশেষ সুযোগ পাইলেন। তিনিও একজন কাব্য-রসিক ব্যক্তি এবং তাঁহার দরবারের প্রধান কবি ছিলেন মুসহফী ও ইন্‌শা।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সাদৎ আলী খানের পুত্র ঘাজীউদ্দীন হায়দর মন্ত্রিত্ব-পদ লাভ করেন এবং ইহার বৎসর পাঁচেক পরে গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংসের ইচ্ছায় তিনি রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। তিনিও অনেক উর্দু কবিতা লিখিয়াছেন, তবে তিনি মরসিয়া বা শোকগাথা লিখিয়াই কতকটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

ঘাজীউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নসীরুদ্দীন হায়দর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৮২৭ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষৌর নবাব

ছিলেন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় ইমামদের প্রশংসায়ই কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার কবি-নাম ছিল 'বাদশাহ'।

নসীরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার খুল্লতাত মহম্মদ আলী শা ১৮৩৭ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আমজদ আলী শা ১৮৪২ হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন। তিনিও একজন মহানুভব ও সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি। আমজদের মৃত্যুর পর উআজিদ আলী শা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

'আখ্তর' কবি-নামধারী সুলতান আলম হজরৎ উআজিদ আলী শা আউধ বা অযোধ্যার শেষ নবাব বা বাদশা। তিনি মাত্র ২০ বৎসর বয়সে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। শিল্প ও কলার সকল বিভাগেই তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাছাড়া তিনি নিজেও ইহার প্রত্যেকটি বিভাগের বিশেষ চর্চা ও মনোনিবেশ করিয়া গিয়াছেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পরেই কাইসরে-বাগ নামক সুরম্য প্রাসাদের কল্পনা তাঁহার মনে উদয় হয়। এবং ইহা তৈয়ার করিতে দুই কোটি টাকার উপর খরচ হয়।

উআজিদ আলী শা তাঁহার প্রথম জীবনে বেশ সুশৃঙ্খলার সহিতই রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজন্যবর্গ ও মুসাহিবদের প্রভাবে রাজকীয় সুখ ও বিলাসিতার মধ্যেই নিজকে বিলাইয়া দেন। এবং তাঁহার সুরসিক মনের সহচর কাব্য ও গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ ও রঙ্গের উচ্ছৃঙ্খলতা মিশিয়া তাঁহার রাজত্বে অরাজকতার ছোঁয়াচ লাগিয়া যায়। সুচতুর ও সতর্ক ইংরেজ এই সুযোগ বুঝিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া রাজ্যভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। আর উআজিদ আলী শা অন্তরীণ-অবস্থায় তাঁহার পরবর্তী জীবন কলিকাতার নিকটবর্তী মাটিয়াবরুজে (বা মটিয়া-বুর্জ্) কালাতিপাত করেন।

মাটিয়াবরুজে অবস্থানকালে তথায়ও উর্দু চর্চার যথেষ্ট প্রসার হয়। তাছাড়া রসিক কবির কাব্য ও কলা চর্চা ছাড়া অন্যান্য অনেক শখও ছিল। তাঁহার পশু ও পাখী পালনের একটা বিশেষ উৎসাহ ছিল। এবং সেই সময়ে তাঁহার চিড়িয়াখানা একটি দর্শনযোগ্য বিষয় ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। বস্তুতঃ মাটিয়াবরুজে উআজিদ আলীর 'অন্তরীণ'-দরবার গান, বাজনা ও নাচের একটি প্রসিদ্ধ আসর ছিল। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্র-শিল্পী ও 'লখ্নৌয়ী-বাঈ' তাঁহার আসরে সকল সময়েই সমবেত থাকিত। বস্তুতঃ ঠুমরী ও দাদরী গানের সুর তাঁহার সময়েই বাঙলায় প্রচলিত হয়। উআজিদ

আলী শা নিজে গান রচনা করিয়া তাহাতে এই সকল সুর সংযোজনা করিতেন এবং এই সকল গানে সুরকার হিসাবে তিনি 'জানে-আলমপিয়া' নাম ব্যবহার করিতেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাটিয়াবুরুজেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আখ্‌তর কাসিদা, ঘজল, মসনবী ও মরসিয়া প্রভৃতি অনেক প্রকার কবিতাই লিখিয়াছেন। তাঁহার নিম্নলিখিত কাব্য বা গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

(১) বিভিন্ন নামে তাঁহার ছয়টি দেওয়ান :— (ক) শীওয়ায়ে-ফয়েজ, (খ) কমরে-মজমুন, (গ) সুখুনে-আশরাফ্, (ঘ) গুলদস্তায়ে-আশিকান্, (ঙ) মাহে-মুল্‌ক্, এবং (চ) নজমে-নামওয়ার।

(২) কয়েকটি মসনবী কাব্য :— (ক) হুজনে-আখতরী—ইহাতে লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতায় দেশান্তরিত হওয়া কালীন তাঁহার দুঃখপূর্ণ হৃদয়ের মর্মব্যথার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

(খ) খিতাবাতে-মহল্লাৎ —ইহাতে তাঁহার মহিষীদের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

(গ) বনী। (ঘ) নাজ্। (ঙ) দুল্‌হন্।

(চ) মস্‌নবী দর ফনে-মৌসিকী (অর্থাৎ সঙ্গীত বিষয়ক কাব্য)।

(ছ) দরিয়ায়ে-তাশুক্।

(৩) মরাসী (বা শোকগাথা) কাব্য :— ইহাও তিন ভাগে বিভক্ত।

(ক) জিল্‌দে-মরাসী— ইহাতে ২৫টি মর্সিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(খ) দফ্‌তরে-ঘম্ ও বহরে-আলম্—ইহাতে ২২টি মরসিয়া আছে।

(গ) সরমায়ায়ে-ইমান্ :—ইহাতে ৬৩টি শোকগাথা রহিয়াছে।

(৪) কস্বায়িদ্ অল্-মুবারক (অর্থাৎ উর্দু ও ফার্সী প্রসংশাসূচক কবিতা)।

(৫) মুবাহিসা বাইমুল্-নফস ও অল্-আকল্ (অর্থাৎ জ্ঞান ও রিপুর কথোপকথন)।

(৬) সহিফায়ে-সুলতানী :— ইহাতে কোরানের কয়েকটি প্রার্থনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(৭) নসায়িয়ায়ে-আখতরী— অর্থাৎ কবি আখতরের উপদেশাবলী।

(৮) ইশ্‌ক্-নামা বা প্রেমগাথা।

(৯) রিসালায়ে-ইমান্ দর বয়ানে-মুসায়িবে-আহ্‌ল-বয়েৎ (অর্থাৎ হাসান-হোসেনের দুঃখময় সৎ-জীবনের কাহিনী)।

(১০) দফ্‌তরে-পরীশান বা দুঃখপূর্ণ কাহিনী।

(১১) মক্‌তলে-মুঅতবর্ বা পবিত্র শহীদ স্থান।

(১২) দস্তুরে-উআজিদী দর সিয়াসতে-মদন্‌ (শা উআজিদের রাজ্য-শাসন নিয়মাবলী)।

(১৩) সুওৎ অল্‌-মুবারক (বা পবিত্র ধ্বনি-তত্ব)।

(১৪) হয়বতে-হায়দরী (বা বীরোচিত ভক্তিমিশ্রিত ভয় বা বিস্ময়)।

(১৫) জৌহরে-আরুজ্‌ (বা ছন্দ-রত্ন)।

(১৬) ইর্শাদে-খাকানী (বা রাজকীয় সঙ্কেৎ) :— ইহাও ছন্দ বিষয়ক কাব্য।

আখতর সর্বসমেত প্রায় ৪০ খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি তাঁহার কাব্য-নির্দেশ তাঁহারই সভাকবি মীর মুজফর আলী আসীর ও নবাব ফতহ-উদ্দৌলা বর্ক হইতে পাইয়াছেন। কবিবর বর্ক-কে উআজিদ আলী শা বস্তুতঃ খুবই ভালবাসিতেন এবং কথিত আছে তাঁহার কলিকাতায় বসবাসকালে তাঁহার এই প্রিয় কবিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। আর আসীর লক্ষ্ণৌতেই রহিয়া যান। এই দুইজন কবি ছাড়া আরো অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার সভাকবি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আমানৎ, খল্‌ক, বহর, সিহর, জকী, দরখ্‌শান, কবুল, শফীক্‌, বে-খুদ, হুনর, হিলাল ও সুরুর অন্যতম। আখতরের পুত্রদের মধ্যেও কৌকব ও বর্জাইস কবি-নামধারী দুই পুত্র কবি-হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

আখতরের কাব্য-ধারা সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে তাঁহার কাব্য ও সাহিত্যে এই যুগের প্রভাবানুযায়ী শব্দালঙ্কারের প্রাধান্যই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সাহিত্যের প্রকৃষ্ট রূপ মনোবেদনা বা অনুভূতির প্রকাশ তথায় বিশেষ নাই। তাঁহার মসনবী-কাব্য হুজনে-আখতরী কিন্তু ইহাদের ব্যতিক্রম। ইহাতে তাঁহার লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতার বিষাদপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী বেশ কাব্য-ব্যঞ্জনাপূর্ণ অনুভূতি সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার প্রায় প্রত্যেকটি দেওয়ান ও মসনবী কাব্যই সরস কাব্য-ব্যঞ্জনা-সহকারে রচিত হইয়াছে। তাছাড়া তাহার খতুত বা চিঠিপত্রও বেশ মনোমুগ্ধকর ও সরস। তিনি এই সকল চিঠি কলিকাতা অবস্থানকালে তাঁহার প্রেয়সী বেগম জীনৎ মহলের নামে লিখিয়াছিলেন। এবং তাঁহার দুঃখপূর্ণ বিরহবেদনাই এই সকল চিঠিতে কাব্য-রূপ লাভ করিয়াছে।

কাব্যের নিদর্শনস্বরূপ আখতরের কয়েকটি বয়েৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ইস্‌ 'ইশ্‌ক্‌ নে রস্‌ওআ কিয়া মৈঁ কিয়া বতাওন্‌ কিয়া কিয়া ;
আহে-দিলে-নাশাদ নে আওর্‌ আসমান্‌ পয়দা কিয়া।

কমর্ ধূকা দহন্ 'উক্‌দ্ ঘজ়াল্ আখীন্ পরী চিহ্‌রহ্,;
শিকম্ হীরা বদন্ খুশ্‌বু জ়বীন্ দরিয়া জ়বান্ 'ঈসা।
বরায়ে-সয়ের্ মুঝ্‌সা রিন্দ্ ময়খানহ্ মেঁ গর্ আয়ে;
গিরে সাঘির্ লুণ্টে শীশা হাঁসে সাকী বহে দরিয়া।

অর্থাৎ, এই প্রেমই আমাকে কলঙ্কী করিয়াছে—কি যে করিয়াছে, আমি আর কি বলিব! দুঃখপূর্ণহৃদয়ের হাহুতাশ আর একটি নূতন আকাশ সৃষ্টি করিয়াছে। কোমর (যেন) প্রতারক, মুখ (যেন) গ্রন্থি, চোখ (যেন) হরিণ, পরীর ন্যায় চেহারা, হীরার ন্যায় পেট, মুখমণ্ডল সুগন্ধিপূর্ণ, নদীর ন্যায় কপোল, (আর) ঈশার ন্যায় জিহ্বা। (একটু) আমোদ আহ্লাদের জন্য আমার ন্যায় ভ্রষ্ট যদি মদ্যশালায় ঢুকে, (তাহা হইলে) পেয়ালা পড়িয়া যায়, বোতল ভাঙ্গিয়া যায়, সাকী (বা পেয়ালা বাহক) হাসে ও নদীর স্রোত বহিতে থাকে।

আমীর কবি-নামধারী সৈয়দ মুজফর আলী খান সৈয়দ ইম্‌দাদ আলীর পুত্র। বাল্যশিক্ষা তিনি লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত ফিরিঙ্গি মহলের শিক্ষকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। আর সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেন তিনি কবিবর মুসহফীর নিকট হইতে। নসীরুদ্দীন হায়দরের রাজত্বকালে তিনি সর্বপ্রথম একজন রাজ-কর্মচারী পদে নিযুক্ত হন। এবং ক্রমে আমজদ আলীর রাজত্বকালে তাঁহার বেশ পদোন্নতি হয়। পরবর্তী ৮।৯ বৎসরকাল তিনি উআজিদ আলী শা-র একজন বিশেষ প্রিয় বয়স্য ছিলেন। এই সময় বাদশা সময় সময় তাঁহার নিকট কাব্য-বিষয়ক উপদেশও গ্রহণ করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালেই তিনি তদবীরুদ্দৌলা ও মুদববরুল্-মুল্‌ক্ উপাধিতে ভূষিত হন। পরবর্তীকালে বাদশা যখন কলিকাতা যাইতে বাধ্য হইলেন, তখন উআজিদ আলী তাঁহাকে সঙ্গী করিতে ইচ্ছা করিলে আমীর কলিকাতা যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাতে বাদশা খুবই ব্যথিত হন এবং এই ব্যথার প্রকাশ তাঁহার কাব্যসমূহের অনেক স্থানেই করিয়াছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ) পর রামপুরের শাসনকর্তা ইউসুফ আলী খান এবং পরবর্তীকালে তাঁহার পুত্র কলব আলী খান আমীরও তাঁহার কাব্যসমূহের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী জীবনে কবিবর আমীরও রামপুর রাজ্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি তাঁহার শেষ জীবনে বৎসরের ছয়মাস রামপুরে থাকিতেন,

এবং বাকী ছয়মাস লক্ষ্ণৌতে বসবাস করিতেন। তাঁহার ৮১ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্ণৌতেই প্রাণত্যাগ করেন।

আসীর অতি সুরসিক ব্যক্তি ও বিজ্ঞ কবি ছিলেন। তাঁহার ছয়টি উর্দু দেওয়ান ও একটি ফারসী দেওয়ানের উল্লেখ আছে। তাঁহার দুর্‌তুল্‌-তাজ নামে একটি মসনবী-কাব্য এবং ছন্দ-বিষয়ক একটি গ্রন্থও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাছাড়া তিনি অনেক মরসিয়া ও কাসিদা কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ কাব্যালঙ্কার, শব্দালঙ্কার ও ছন্দানুশাসনের উপর তাঁহার বিশেষ হাত ছিল। এই সকল কাব্যোৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনই একজন উচ্চদরের কবি বলিয়া পরিগণিত হন নাই। তিনি সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের ন্যায় মামুলী লখনোয়ী-ধারামতেই কাব্যাদি লিখিয়া গিয়াছেন।

আসীরের অনেক কবি-শিষ্যের উল্লেখ আছে। তাঁহাদের মধ্যে আমীর মীনায়ী অন্যতম। তাছাড়া হকীম ও আফজল কবি-নামধারী তাঁহার দুই পুত্রও কবি হিসাবে কতকটা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

বাঙলার হুগলী অধিবাসী কাজী মহম্মদ সাদিক খান আখতর ঘাজীউদ্দীন হায়দরের রাজত্বকালে তাঁহার নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। ঘাজীউদ্দীন তাঁহার কাব্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'মালিকুশ্‌-শুঅরা' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ফারসী কবি মির্জা কতীলের একজন কবি-শিষ্য ছিলেন এবং তথায় প্রসিদ্ধ মুসহফী, জুরাৎ, ইন্‌শা ও অন্যান্য উর্দু কবিদের মুশাঅরা বা সংস্কৃতি সভায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কতককাল ফর্‌রুখাবাদেও অবস্থান করিয়া-ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার অনুমতি নিয়াই উআজিদ আলী শা তাঁহার কবি-নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই জন্য বাদশা তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া সন্তুষ্ট করেন। কিন্তু পরে আবার কোন কারণ বশতঃ উআজিদ আলী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলে বাঙ্গালী কবি আখতর লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করেন এবং তহসীলদারের পদ গ্রহণ করিয়া ইটাওয়া গমন করেন। তথায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আখতর একজন সমসাময়িক প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তবে তিনি ফারসী সাহিত্যেরই অধিক চর্চা করিয়াছেন। তাঁহার প্রায় ১০টি ফারসী গ্রন্থ ও কাব্যের উল্লেখ আছে। উর্দুতে লিখিত তাঁহার দেওয়ানে-রীখ্‌তাও বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

(৬) লখনোয়ী উর্দু'র তৃতীয় পর্যায়ঃ মরসিয়া কাব্যের সূচনা এবং আনীসী ও দবীরী যুগ

সাধারণভাবে কোন মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত প্রশংসাসূচক কবিতাকে মরসিয়া বা শোকগাথা বলে। কিন্তু কারবালা প্রান্তরে নিহত হুসেনের উদ্দেশ্যে লিখিত শোকসূচক কবিতাকেই বিশেষ করিয়া মরসিয়া কাব্য বলিয়া ইসলামিয় সাহিত্যে উক্ত হয়। প্রথমে মহরমের সময় যে তাজীয়া বা শোভা-যাত্রা চালিত হইত তাহাতে হুসেনের শোক প্রকাশার্থেই মাত্র এই সকল শোকগাথা বাঁধা হইত। তাছাড়া প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থাদিতেও কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কয়েক ছত্রে প্রশংসাসূচক শোকগাথা লিখিত হইতে দেখা যায়। এই সকল শোকগাথা স্বপ্রকাশ কাব্য-রূপ গ্রহণ করে অনেক পরবর্তী যুগে।

ইসলাম-পূর্ব আরবী-সাহিত্যের আদিযুগেও মরসিয়া বা শোকসূচক কবিতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতা হইতে কোন পুরস্কার প্রাপ্তির আশা নাই বলিয়া এই শোকসূচক কবিতাই পরবর্তী যুগে কাসিদা বা জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রশংসাসূচক কবিতাতে রূপান্তর লাভ করে।

এই কাসিদা কবিতাই ক্রমে ফারসী সাহিত্যে বহুল প্রচার হইতে দৃষ্ট হয়। এবং অনেক প্রসিদ্ধ ফারসী কবিই আনন্দের উচ্ছ্বাসে বা রাজা বাদশাদের নিকট হইতে বিবিধ পুরস্কারের আশায় কাসিদা কবিতা লিখিয়াছেন। তাহাতে আনন্দের উচ্ছ্বাস যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনি সময় সময় মনের নিরানন্দ বা মৃত ব্যক্তির জন্য শোকও উছলিয়া উঠিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ফারসী সাহিত্যে এই সকল কবিতার মধ্যেই মরসিয়ার আদিরূপ দেখিতে পাই। মহাকবি ফির্দৌসী তাঁহার শাহনামায় সুহরাবের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতার দুঃখব্যথাপূর্ণ যে শোকগাথা লিখিয়াছেন, অথবা সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর ফরুখী যে মরসিয়া গাহিয়াছেন, তাহাকে আধুনিক যুগে মরসিয়া কাব্য না বলিলেও ইহাতে যে মরসিয়া-কাব্যের বীজ লুক্কায়িত ছিল তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সাদী ও আমীর খসরুও এইরূপ কবিতা

লিখিয়াছেন। মুল্লা মুহতশম কাশীকেই বোধ হয় সর্বপ্রথম ফারসী মরসিয়া কবি বলা যাইতে পারে। তারপর আসেন তালিব আমুলী, ঘজালী, কলীম ও অন্যান্য অনেক কবি। তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু শোকগাথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কবিতাও ফির্দৌসীর শোকগাথা হইতে বিশেষ রূপান্তর লাভ করে নাই। মুল্লা মুক্‌বিল্-ই বোধ হয় সর্বপ্রথম ফারসী কবি যাঁহারা কবিতায় আধুনিক যুগের মরসিয়া লক্ষণযুক্ত শোকগাথার আভাস পাওয়া যায়।

উর্দু সাহিত্যের বিকাশ যেমন দাক্ষিণাত্যেই প্রথম সূচিত হয়, তেমনি ভাবে উর্দু মরসিয়া কাব্যের আরম্ভও তথাকার উর্দু কবিদের লেখনীতেই সর্বপ্রথম বিকাশপ্রাপ্ত হয়। দাক্ষিণাত্যে মুসলিম বাদশাগণ যেমন উর্দু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক তেমনি আবার সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই তাঁহারা স্বভাবতই আলীর বংশধর হাসান-হুসেনের বিষাদময় মৃত্যুকাহিনী তাঁহাদের মনে জাগরূক রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন। এই কারণেই তখনকার কবিদের লেখনীতেও কারবালার বিষাদময় ঘটনা রূপলাভ করিয়াছে—যদিও তখন পর্যন্ত এই সকল শোকগাথা কয়েক ছত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

উর্দু সাহিত্যের প্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ওয়ালী লিখিত কোন মরসিয়ার উল্লেখ নাই। উঅজীহ-উদ্দীনের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁহার প্রশংসাসূচক শোকগাথাটির মধ্যে কতকটা মরসিয়া কাব্যের আভাস পাওয়া যায়। সমসাময়িক কোন কোন জীবনী সংগ্রাহক লিখিয়াছেন যে উঅলী কারবালার ঘটনা সম্বলিত একটি মসনবী কাব্য লিখিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের সম্রাটদের ন্যায় উত্তর-ভারতের বাদশাগণও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এবং তাঁহারাও কারবালার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। উর্দু-কবি-জীবনীসংগ্রহকার মীর তকী ও মীর হসন সেই যুগের অনেক মরসিয়া কাব্য-কারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন মীর আমানী, মীর আসিমী, মীর আল্-আলী দরখ্শান, সিকন্দর, সবর, কাদির, গমান ও নদীম প্রভৃতি। মীর এবং সৌদাও শোকগাথা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের এই সকল কবিতার বিশেষত্ব কিছুই নাই। তেমনিভাবে মীর হসন এবং মীর জাহিকও মরসিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহাদের কবিতার মধ্যেও মরসিয়া কাব্যের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত দুঃখ ও বিষাদ-ব্যথা ফুটিয়া উঠে নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই মীর হসন ও মীর জাহিকের বংশোদ্ভূত মীর আনীসই উর্দু মরসিয়া কাব্যাকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল তারকা।

সৌদার পূর্ব পর্যন্ত মরসিয়া চার পংক্তি বিশিষ্ট কবিতা বা ছন্দে লিখিত হইত। সৌদাই সর্বপ্রথম মরসিয়া কাব্যে ছয় পংক্তি বা মুসদ্দস-ধারার প্রবর্তন করেন। এবং এই ধারাই মরসিয়া কাব্যে এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে। পরবর্তী যুগে জমীরই সর্বপ্রথম বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে যুদ্ধের ঘটনা নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারের অবতারণা করেন এবং এই প্রসঙ্গে বিষয়বস্তু সমূহের উপমা ও রূপকপূর্ণ নানা চিত্রের উদ্ভাবন করেন। আর ইহারই পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই আনীস ও দবীরের মরসিয়া কাব্য সমূহে।

মীর মুস্তাহুসন খলীক মীর হসনের পুত্র। তাঁহারা চারি ভাই—তাঁহাদের তিনজনেই ছিলেন কবি, এবং তাঁহাদের নাম যথাক্রমে—খল্ক, খলীক ও মহসীন। এই তিনজন কবিই অন্যান্য কবিতা ছাড়া মরসিয়া কাব্যও অনেক লিখিয়া গিয়াছেন।

খলীক ফয়জাবাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার বাল্যশিক্ষা তিনি লক্ষ্ণৌতেই প্রাপ্ত হন। মীর হসন তাঁহার অধিক সময় কাব্যাদি লিখিতেই ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার পুত্রের কাব্য-শিক্ষার ভার তিনি মুসহফীর উপর অর্পণ করেন। খলীক শীঘ্রই একজন কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার প্রথম জীবনে খলীক ঘজল কবিতা লিখিলেও, শেষ জীবনে বিশেষ করিয়া তিনি মরসিয়া-কাব্যই লিখিয়াছেন। জমীর, ফসীহ ও দিলগীর ছিলেন তাঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ মরসিয়া-কাব্যকার। মিঞা দিলগীরের তোৎলামী-দোষ ছিল বলিয়া তিনি নিজে কখনই মরসিয়া আবৃত্তি করিতেন না। আর ফসীহ শীঘ্রই হজ-উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করিয়া তথায়ই বসবাস করিতে থাকেন। সুতরাং জমীর ও খলীক পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে নিজেদের কাব্যিক সুখ্যাতির জন্য যত্নবান হইলেন। এবং তাঁহাদের এই সাংস্কৃতিক চর্চা ও কাব্যিক যুদ্ধ ও বাক্-বিতণ্ডার মধ্য দিয়া মরসিয়া-কাব্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। আর মরসিয়া-কাব্যের বিকাশের এই প্রথম যুগকে সাধারণতঃ জমীর ও খলীকের যুগ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

জমীরের পূর্বপর্যন্ত মরসিয়া ৪০।৫০ বন্দ্-এর বেশী দীর্ঘ হইত না। জমীরই সর্বপ্রথম মরসিয়া-কাব্যের দৈর্ঘ আরো বিস্তৃত করেন। তাছাড়া মরসিয়ার গঠনপ্রণালী তাঁহাদের সময়ে নিম্নলিখিতরূপ গ্রহণ করে—প্রথমে তম্হীদ্, তারপর যথাক্রমে সরাপা, যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা ও শহাদৎ বা ধর্মমৃত্যুবরণ। জমীর ও খলীক উভয়েই মরসিয়া-কাব্যের গঠন-প্রণালী ও ইহার সুগভীর ভাবের ব্যঞ্জনায় ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তবে

তাঁহাদের কাব্যের একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে জমীর গুরুগম্ভীর শব্দযোজনা এবং উপমা ও রূপকের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ; আর খলীকের কাব্যে অন্তরের অনুভূতি ও স্বাভাবিক শব্দযোজনাই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। তাঁহাদেরই উত্তরসাধকরূপে যথাক্রমে দবীর ও আনীস মরসিয়া কাব্যের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করেন।

মীর ববর আলী আনীস ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ফয়জাবাদের অন্তর্গত গোলাব-বাড়ী মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খলীকের নিকট হইতেই তিনি তাঁহার বাল্যশিক্ষা প্রাপ্ত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আনীসের বংশটিই ছিল কবি-কুলোদ্ভব। তাঁহার পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ যেমন ছিলেন উর্দুভাষার প্রসিদ্ধ কবি, তেমনি কবি আনীস ও তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণের মধ্যেও অনেকেই ছিলেন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে তাঁহারা অনেকটা বংশপরম্পরায় ছিলেন মরসিয়া-কাব্যকার।

বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আনীস ফয়জাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ আসেন। তথায় শীঘ্রই তিনি একজন কবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাছাড়া ব্যায়ামচর্চা, অশ্বারোহণ ও সৈন্যচালনার কলাকৌশল তিনি এই সকল বিষয়ে বিশারদদের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করেন। আর এই জ্ঞান ও কলাকৌশলের সুযোগ নিয়াই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের নানা চিত্র বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যেমন কাব্যে তেমনি তাঁহার ব্যবহারেও সৌন্দর্য ও সুসামঞ্জস্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। নিজের পোযাক-পরিচ্ছদ, লোকের প্রতি আচার-ব্যবহার ও স্বকীয় চালচলনে সকলসময়েই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর একটা বিশিষ্টতা ছিল। নিজের বংশগৌরবের প্রতি যেমন তাঁহার খেয়াল ছিল, তেমনি কাব্য-চর্চাকে তিনি সকল সময়েই একটি সম্মানজনক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। সম্মান ও সম্ভ্রমের দিক দিয়া যদিও তিনি মনে করিতেন যে তিনি কোন রাজা বা বাদশা হইতে কোন বিষয়ে কম নহেন, তাঁহার কিন্তু ধনরত্ন বা টাকা পয়সার প্রতি কোন সময়েই কোন লোভ ছিল না। তবে কেহ যদি তাঁহার কাব্যকে নবীবংশের উজ্জ্বলতম তারকার প্রতি পুষ্পাঞ্জলি হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কোন কিছু উপঢৌকনরূপে দান করিতেন, তাহা তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন।

আনীস লক্ষ্ণৌতে মুসলিম বাদশাহীর ধ্বংশের পূর্ব পর্যন্ত তথা হইতে

অন্য কোথাও যান নাই। আর কেহ তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রচার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বাহিরে যাইতে উপদেশ দিলে তিনি বলিতেন, লক্ষ্ণৌর অধিবাসী তাঁহার কাব্যের যে মর্যাদা দিবে অন্যের তাহা বুঝিবার শক্তি কোথায়? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তথায় মুসলিম আধিপত্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবার পরে তাঁহাকেও অন্যান্য স্থানে যাইতে হইয়াছিল। নবাব কাসিম আলীখানের অনুরোধ ও নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত হইয়া তিনি ১৮৫৯ ও ১৮৬০ খৃষ্টব্দে দুইবার আজীমাবাদ বা পাটনায় গমন করেন এবং তথা হইতে ফিরিবার পথে বারানসীতেও বসবাস করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নবাব খুরজঙ্গের অনুরোধক্রমে তিনি হায়দরাবাদও গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ফিরিবার কালে এলাহাবাদ আসেন। আর জীবনের অবশিষ্টকাল তথায়ই বসবাস করেন। কথিত আছে তথায় অবস্থান কালে যখন তিনি মুগ্ধচিত্তে ও মধুরস্বরে তাঁহার কাব্যগাথা আবৃত্তি করিতেন তথায় অদম্য লোক সমাগম হইত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মীর আনীস স্বভাব-কবি এবং বলা যাইতে পারে যে কবিত্ব শক্তি তিনি তাঁহার বংশ-ঐতিহ্যরূপে লাভ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার কবিত্বের স্ফুরণ হয়। কথিত আছে তিনি তাহার প্রথম জীবনে প্রসিদ্ধ ফারসী কবি হাজীনের নামানুসারে কবি নাম হাজীন গ্রহণ করেন। পরে লক্ষ্ণৌ আসিয়া যখন তিনি তাঁহার পিতার উপদেশানুযায়ী কবি নাসিখের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, কবিবর তাঁহাকে তাঁহার কবিনাম হাজীন পরিবর্তন করিয়া আনীস গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। এই আনীস উপাধি গ্রহণ করিয়াই ক্রমে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বাল্যকালেই তিনি মরসিয়া-কাব্য লিখিতে প্রয়াস পান এবং পরবর্তীকালে এই কাব্যধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রূপে পরিগণিত হন।

মীর সাহেব শত শত মরসিয়া, সলাম, কিতা ও রুবায়ী লিখিয়াছেন। তাঁহার কিছু ঘজল কবিতারও উল্লেখ আছে। কথিত আছে সর্বশুদ্ধ তিনি আড়াই লক্ষ কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন পর্যন্ত তাঁহার কাব্যের পাঁচটি খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, যদিও তাঁহার অন্যান্য রচনাবলীও তাঁহার বংশধরদের নিকট এখনো সংরক্ষিত রহিয়াছে। তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুভূতিপূর্ণ সরল ও সুসমঞ্জস চিন্তাধারা। এই জন্যই উর্দু সাহিত্যে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া আছেন। কাব্যের চিত্তোৎকর্ষতার জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে ভারতের সেক্সপীয়র বলিয়া অভিহিত

করেন। তাঁহার মরসিয়া-কাব্য জাতীয় মহাকাব্যের সুর প্রবর্তন করিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে অনেক সময় হোমর, ভর্জিল বা মহাকবি বাল্মিকির সহিতও তুলনা করা হয়।

মীর আনীস উর্দু ভাষারও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। কেবল পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বিদেশীয় আরবী ফারসী শব্দের পরিবর্তে স্থানীয় বাগধারাকে প্রবর্তন করিয়া তিনি উর্দু ভাষাকে সুমধুর ও রসপূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাছাড়া ভাষার মাধুর্য ও উপকর্ষার্থে স্থানভেদে একই অর্থযুক্ত নূতন নূতন শব্দের ব্যবহার দ্বারা উর্দু শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আনীসের পূর্বে লখনোয়ী ও দিহলবী উর্দুর বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইত। তিনিই সর্বপ্রথম এই দুই উপভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া উর্দু ভাষার প্রাধান্য ও উৎকর্ষ আরো বিস্তার করেন। সাহিত্যে প্রকৃতির ও যুদ্ধের বর্ণনা তিনিই সর্বপ্রথম সার্থকভাবে ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ মরসীয়া কাব্যে তম্‌হীদ, যুদ্ধ-চিত্র এবং অন্যান্য চিত্র ও চরিত্র বর্ণনায় তিনি যে সফলতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাহাকে প্রসিদ্ধ ফারসী কবি ফির্দৌসী বা নিজামীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

প্রকৃতির বর্ণনা সুদক্ষ তুলিকার সাহায্যে আনীস যেরূপ সুনিপুণ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উর্দু সাহিত্যে অভূতপূর্ব। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের স্বর্গীয় আভা, মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রতেজ ও অন্ধকার রাত্রির ভীষণতা, কিংবা সান্ধ্যবায়ু ও চাঁদনী রাতের স্নিগ্ধতা তিনি বেশ সফলতার সহিতই চিত্রিত করিয়াছেন। এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র কখনই কাব্যে অসংলগ্ন হইয়া দাঁড়ায় নাই; বরং বর্ণনীয় ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি কাব্যকে আরো রসমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

বহির্জগতের বর্ণনা যেমন সুনিপুণ ভাবে রঞ্জিত করিয়াছেন, তেমনি মহাকবিদের ন্যায় অন্তর্জগতের রূপায়নেও আনীস সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অনুভূতিপূর্ণ অন্তরের দুঃখ-ব্যথা, হাসি-আনন্দ বা প্রেম-ভালবাসা ও হিংসা-দ্বেষের বর্ণনায় তিনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন। বর্ণনীয় পুরুষদের বক্তব্য-বিষয়ের প্রকাশে তিনি স্ত্রী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ বা বালকের ভাব ও কথার সামঞ্জস্য ও স্বাভাবিকতার প্রতিও সকল সময়েই সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়াছেন। এই সকল বর্ণনায় তিনি বস্তুতঃ একজন কৃতী নাট্যকারের পরিচয় দিয়াছেন। তাছাড়া যুদ্ধ বর্ণনা সংক্রান্ত সৈন্যদের হল্লা, ঘোড়া ও অশ্বারোহীদের চালচলন ও তলোয়ারের ঝনঝনানি প্রভৃতি যুদ্ধের খুঁটিনাটি সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম বর্ণনায়

তিনি আশ্চর্য স্বাভাবিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা পাঠে মনে হয় অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সকল বিষয় দেখিয়া তিনি যেন তাহার প্রকাশ করিয়াছেন।

আনীস একজন প্রকৃত কবি। ঐতিহাসিক দৃষ্টি হয়ত তাঁহার কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার কল্পনাশক্তির মাধুর্য দ্বারা তিনি যে রসঘন চিত্র-চরিত্রের ব্যাখ্যান করিয়াছেন তাহা খাঁটি সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। তাছাড়া কেহ কেহ তাঁহার কাব্যে ভাষার ত্রুটিও খুঁটিয়া বাহির করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যের ভাবস্ফুরণে ছোটখাট ব্যাকরণ ভুলে কোন সাহিত্যিক কখনও অশ্রদ্ধালাভ করেন না। তাঁহার সাহিত্যে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে পরবর্তী কবি ও সাহিত্যিক-দের পথপ্রদর্শকরূপে তিনি ভাষায়ও স্বাভাবিকতার প্রতিই বিশেষ জোর দিয়াছেন। তখনকার সময় ছিল কাব্যে অলঙ্কার-আতিশয্যের যুগ। তিনি সেই আতিশয্য হইতে দূরে থাকিয়া কাব্যকে রসঘন করিবার উদ্দেশ্যে যখন যেরূপ অলঙ্কার তথা অর্থালঙ্কারের আবশ্যক হইয়াছে তাহার ব্যবহার দ্বারা ভাব ও ভাষা সুসমঞ্জস করিতে যত্নবান হইয়াছেন।

তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীর নিদর্শন রূপে এখানে একটি বন্দ্ উদ্ধৃত হইল।

পয়হম্ যো লগে তীর্ ফরস্ বন্ গিয়া ত্বাউস্ ;
দম্ ভর্ মেঁ লহূ হো গিয়া জরার্ কা মল্‌বূস।
সীনহ হৈ কি তৌদা হৈ নহ হোতা থা ইয় মঃহ্‌সূস্ ;
ঘশ্ আনে লগে শের হোআ জন্‌গ্ সে মায়ূস্।
রুখ্ জর্দ্ থা গুল্‌জার্ থী পোযাক লহূ সে ;
ফোআরহ-ই-খূন্ ছুট্‌তে থে হর্ বুনে-মূ সে।

অর্থাৎ, তীরের ক্রমবর্দ্ধমান আক্রমণে ঘোড়া ময়ূরে রূপান্তর লাভ করিল ; মুহূর্তের মধ্যে রক্ত সাহসী যোদ্ধার পোষাকে রূপান্তরিত হইল। ঠিক অনুমান করা যাইতেছে না যে ইহা বক্ষঃস্থল বা (আক্রমণকারীর) লক্ষ্যস্থল ; এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া সিংহ (-বিক্রম যোদ্ধা) যুদ্ধে নিরাশ হইলেন। মুখমণ্ডল হলুদবর্ণ ধারণ করিল. (এবং) রক্তরঞ্জিত পোষাক গুলজার বা উদ্যানে রূপান্তরিত হইল ; (আর) প্রত্যেক লোমকূপ বা পুষ্পশীর্ষ হইতে রক্তের ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল।

'দবীর' কবি-নামে প্রসিদ্ধ মীর্জা সলামাৎ আলী ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মীর্জা ঘুলাম হুসেন এবং জীবনী-সংগ্রহকারীগণ তাঁহার পূর্বপুরুষগণ সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন। দিল্লীতে অরাজকতার যুগে তাঁহার পিতা ঘুলাম হুসেন লক্ষ্ণৌ আসেন ও তথায়ই বিবাহ করেন। আবার দিল্লীর অরাজকতা দূরীকৃত হইয়া শান্তি স্থাপিত হইলে তিনি তথায় ফিরিয়া যান। কিন্তু তাঁহার পুত্র মীর্জা দবীর তাঁহার সাত বৎসর বয়স হইতেই লক্ষ্ণৌ বসবাস করিতে থাকেন। বাল্যকাল হইতেই দবীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন এবং কবিত্বের আভাসও তাঁহার মধ্যে লক্ষিত হয়। তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং বিবিধ কাব্য-ধারায়ই হাতপাকা করিলেও মরসিয়া-কাব্যের প্রতিই তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। তিনি মীর জমীরের কবি-শিষ্য ছিলেন এবং শীঘ্রই মরসিয়া কাব্যে একজন প্রসিদ্ধ কবি রূপে খ্যাতিলাভ করেন। বস্তুতঃ বাহ্য-আড়ম্বরপূর্ণ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার যুগে দবীরই মরসিয়া-কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া রাজা বাদশাগণও তাঁহাকে প্রভূত সম্মান করিতে লাগিলেন।

এই সময়েই মীর আনীস ফয়জাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ আগমন করেন। তাঁহার আভিজাত্যপূর্ণ বংশগৌরব ও নিজ অনুভূতিপূর্ণ কবিত্বশক্তির জন্য তিনিও তথায় সম্মান পাইতে লাগিলেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দুইজন কবির একই সময়ে আগমনের ফলে লক্ষ্ণৌতে মরসিয়া-কাব্যের দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। এবং একদল অন্যদলকে কখনই বিদ্রূপ বা তাচ্ছিল্য করিতে ছাড়িত না। কিন্তু দবীর ছিলেন বিশেষ অমায়িক ব্যক্তি এবং আনীসের কবিত্বের মর্যাদা দিতে তিনি কখনই বিমুখ হইতেন না। এই সকল কারণেই দুইদলের কাব্য-বিতণ্ডা কখনই সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

মীর আনীসের ন্যায় মীর্জা দবীরও পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শীদাবাদ গিয়াছিলেন এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কতককাল তিনি পাটনায়ও অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মীর্জা সাহেব দৃষ্টিশক্তির হীনতায় কষ্ট পাইতে থাকেন। ইহা জানিতে পারিয়া মাটিয়াবুরুজে অবস্থানকারী উআজিদ আলী শা কলিকাতার বিশেষজ্ঞ চক্ষু-চিকিৎসকদ্বারা তাঁহার রোগের উপসম করাইয়া কবিবরকে বিশেষভাবে বাধিত করেন। কিন্তু শীঘ্রই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মীর্জা দবীর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সাহিত্যিক ব্যক্তি। মীর আনীসের স্বভাব-কবিত্বের কতকটা অধিকার ছাড়াও, তাঁহার কাব্যে শব্দের

আড়ম্বর এবং পাণ্ডিত্যের ঝলক বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। তিনি অনেক সময়েই তাঁহার কাব্যে কোরানের আয়াৎ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আরবী-ফারসী শব্দ বা বাক্যাংশের ব্যবহারদ্বারা উর্দু সাহিত্যে আভিজাত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। আর তাঁহার কাব্যের ভাব ও কল্পনার চিত্র অনেকসময়েই সহজ ও স্বাভাবিক না হইলেও সরসতা ও সমৃদ্ধিগুণে পরিপুষ্ট।

মরসিয়া-কাব্যের দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে কে যে বড় তাহার কোন নিদর্শন দেওয়া বাতুলতা মাত্র। তাঁহাদের নিজস্ব বিশেষত্ব দ্বারা উভয়েই তাঁহাদের অনুসরণকারী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিদের বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি বা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র যেমন তাঁহাদের নিজেদের বিশিষ্টতাদ্বারা বিভিন্ন যুগে বাঙলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন, তেমনি আনীস ও দবীর তাঁহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য 'আনীসী' ও 'দবীরী'-গোষ্ঠীদ্বারা যথাক্রমে বিশেষভাবে সম্মানিত ও মরসিয়া-কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে বিবেচিত হইয়াছেন।

আনীস ও দবীর যে মরসিয়া-কাব্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহাই পরবর্তীযুগে এপিক বা জাতীয় মহাকাব্যরূপে বিকাশ লাভ করে। বস্তুতঃ ফারসী মসনবী-কাব্যই ক্রমে উর্দু সাহিত্যে মরসিয়া-কাব্যে রূপান্তর লাভ করে। এবং আধুনিক যুগেও যে সকল দেশাত্মবোধক বা চিত্তাকর্ষক উত্তেজনাপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার অনেক চিন্তধারা বা কাব্যের গঠন-প্রণালী এই মরসিয়া-কাব্য হইতেই গৃহীত। আধুনিক যুগের বিখ্যাত কবি হালী 'মুসদ্দসে-হালী' নামে বিখ্যাত তাঁহার মদ্দ্ ও জজ্রে-ইসলাম লিখিবার কালে এই মরসিয়া-কাব্যধারায় প্রণোদিত হইয়াই তাঁহার এই সার্থক কাব্য লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আনীস ও দবীরের মৃত্যুর পর তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যেই অনেকে মরসিয়া-কাব্যের চর্চা করিয়াছেন। আনীসের বংশধরগণই এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আনীসের ছোট ভাই মীর মৌনিসও একজন বিখ্যাত মরসিয়া-কাব্যকার ছিলেন। তিনি নির্জনে বসবাস করিয়া তাঁহার কাব্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মামুদাবাদের রাজা আমীর হসন খানও তাঁহার একজন কাব্য-শিষ্য ছিলেন।

আনীসের পুত্র নফীস, সলীস ও রয়ীস—এই তিনজনই মরসিয়া-কাব্য লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মীর খুর্শীদ আলী নফীস বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন ও তাঁহার পিতার নাম অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। তিনি

একটি মরসিয়া-কাব্য ও কয়েকটি সলাম, রুবায়ী ও অন্যান্য কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আরিফ নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ আলী মহম্মদ হইলেন মীর নফীসের দৌহিত্র। তিনি তাঁহার মাতামহের নিকটেই লালিত পালিত এবং তাঁহার নিকট হইতেই বাল্যশিক্ষা ও কাব্যে দীক্ষালাভ করেন। শীঘ্রই তিনিও একজন মরসিয়া কাব্যকাররূপে খ্যাতিলাভ করেন। মামুদাবাদের মহারাজা স্যার মহম্মদ আলী মহম্মদ তাঁহারই একজন কাব্য-শিষ্য এবং মীর আরিফ তাঁহারই দরবারের একজন সভাকবি ছিলেন। তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

আনীস-গোষ্ঠীর ন্যায় উন্‌স্‌-গোষ্ঠীও মরসিয়া-কাব্যে কতকটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সৈয়দ মহম্মদ মীর্জা উন্স্‌ সৈয়দ আলী মীর্জার পুত্র এবং সৈয়দ জুলফিকার আলীর পৌত্র। তিনি অনেকটা প্রাচীন-পন্থী। তিনিও লক্ষ্ণৌ-দরবারের পতনের যুগে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রামপুরের শাসনকর্তা কল্‌ব্‌ আলী খান কর্তৃক তাঁহার দরবারে আমন্ত্রিত হন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর আবার লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া আসেন। ৯৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে লক্ষ্ণৌতেই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পাঁচ পুত্র—ইশ্‌ক্‌, তাশুক্‌, স্বব্‌য়, স্বাবির এবং আশিক্‌। এবং তাঁহাদের সকলেই মরসিয়া-কাব্যে কতকটা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

তাশুক মরসিয়া ও ঘজল এই উভয় কাব্যেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কথিত আছে তিনি কতককাল মরসিয়া-কাব্যে প্রেরণা-লাভার্থে কারবালা-প্রান্তরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি একজন স্বভাব-কবি। তিনি নাসিখের কাব্য-শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি মীর আনীসের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। কথিত আছে লক্ষ্ণৌর অনেকেই তাঁহার স্বভাব-কবিত্বে মুগ্ধ ও বর্ণনীয় বিষয়ের আন্তরিকতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট হইতে 'দুয়া' বা আশীর্বাদ লাভের প্রার্থনা করিতে সমবেত হইত। তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

মীর্জা স্বাবির তাঁহার কবিত্বশক্তি অপেক্ষা প্রসিদ্ধ মরসিয়া কবি রশীদের পিতা ও বিখ্যাত মীর আনীসের জামাতা বলিয়াই অনেকটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। নবাব উআজিদ আলী শা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন।

মীর্জা স্বাবিরের পুত্র পিয়ারে-সাহেব নামে প্রসিদ্ধ রশীদ কবি-নামধারী সৈয়দ মুসতফা মীর্জা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে

তাঁহার চাচা ইশ্‌কের কাব্য-শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অপর চাচা তাশুক হইতে কাব্যশিক্ষা লাভ করেন। তিনি এই বিষয়ে মীর আনীস হইতেও অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছেন। আর তিনি মীর আনীসেরই পুত্র মীর আস্‌করী রয়ীসের সুযোগ্য জামাতা।

রশীদ তাঁহার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ উর্দু কবি বলিয়া অভিহিত। কাব্যে তিনি মীর আনীসকেই সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। মরসিয়া-কাব্য যেমন তিনি সুনিপুণভাবে রচনা করিয়াছেন, তেমনি অন্যান্য কবিতা, যথা ঘজল রুবায়ী সলাম প্রভৃতিও লিখিয়াছেন। কাসীদা কবিতাও তিনি কিছু কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তবে তাঁহার কাব্যে ভাষার সরলতা সরসতা ও ইহার প্রাঞ্জলতা যতটা লক্ষিত হয় কল্পনাশক্তির মাধুর্য ততটা বিকাশলাভ করে নাই। তিনি মরসিয়া-কাব্যে ইহার আঙ্গিকরূপে সাকী-নামা ও বহার যুক্ত করিয়া শোক-গাথার আরো পূর্ণতা দান করিয়াছেন। সমসাময়িক অন্যান্য কবিও মরসিয়া কাব্যে এই সকল অঙ্গের যোগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় কেহই এই কাব্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করিয়া ইহাকে মাধুর্যময় করিয়া তুলিতে পারে নাই।

রশীদ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য রামপুরে অবস্থান করেন। তিনি কিছুকাল পাটনায়ও বসবাস করিয়াছিলেন এবং তথায়ও বেশ সুনাম অর্জন করেন। নবাব বহরামুদ্দৌলার ইচ্ছা ও অনুরোধে তিনি হয়দরাবাদ গমন করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার কিছুকাল কলিকাতায় অবস্থান করিবারও সুযোগ হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কাব্য-শিষ্যের মধ্যেও অনেকে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে হমীদ, মুআদব, অধ্যাপক নাস্বিরী, জলীস, অশহর, শহীদ, নাজ্মি এবং ফরহাদ উল্লেখযোগ্য।

দবীর-গোষ্ঠীর মধ্যে মীর্জা দবীরের পুত্র মীর্জা আউজ-ই-বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিও মরসিয়া-কাবেই প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং কাব্য-ধারায় তিনি তাঁহার পিতাকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় একজন পণ্ডিত ও ছন্দকার ছিলেন এবং তাঁহার ছন্দ-বিষয়ক একটি নিবন্ধেরও উল্লেখ আছে। সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের ন্যায় তিনিও পাটনা, হয়দরাবাদ ও রামপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন ও সেইসকল স্থানে বিশেষ খ্যাতিলাভও করিয়াছেন।

(চ) দিহলবী যুগের চতুর্থ পর্যায়ঃ
(বা নজীর আকবরাবাদী ও শা নসীরের যুগ)

নজীর আকবরাবাদী যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন দ্বিতীয় মহম্মদ শার রাজত্বকাল, আর ভারতের উপর নাদির শার লুটতরাজ ও অত্যাচার বহিয়াই চলিয়াছে। দীর্ঘজীবন লাভ করার জন্য তিনি মীর-সৌদা ও ইন্‌শা-জুরাৎ এই উভয় যুগই পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তিনি তাঁহাদের কাহাকেও অনুকরণ করেন নাই; আবার তাঁহার পরবর্তী দিহলবী যুগের পঞ্চম পর্যায়ভুক্ত জোক (=যৌক্‌) বা ঘালিবের কাব্য-বৈশিষ্ট্যও তাঁহার মধ্যে লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ নজীর আকবরাবাদী ছিলেন আধুনিক কবিদের অগ্রদূত এবং তাঁহার কবিতায় কথা ও ভাবের আশ্চর্য স্বাভাবিকতা পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি ছিলেন স্বভাব-কবি; তাঁহার মধ্যে যেমন নাই কল্পনার উচ্ছ্বাস, তেমনি নাই অলঙ্কার-পাণ্ডিত্য বা আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য। তিনি ছিলেন নিছক ভারতীয় কবি; এবং সেই জন্যই তখনকার যুগে কতকটা অবহেলিত হইলেও আজকাল তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কতকটা উপলব্ধ হইতেছে।

নজীরের প্রকৃত নাম উআলী মহম্মদ এবং তাঁহার পিতার নাম মহম্মদ ফারূক। দিল্লীতেই তাঁহার জন্ম এবং তাঁহার পিতার ১২টি সন্তানের মধ্যে কেবল একা নজীরই বাঁচিয়া ছিলেন—তাই তিনি তাঁহার পিতামাতার বড় আদরের ধন ছিলেন। আহমদ শা আব্দালীর ভারত আক্রমনের সময় তিনি তাঁহার মাতা ও মাতামহীর সহিত আগ্রায় গমন করেন এবং তথায় তাজমহলের নিকটবর্তী তাজগঞ্জে বসবাস করিতে থাকেন। এই তাজগঞ্জেই নজীরের বিবাহ হয় এবং গুলজার আলী নামে তাহার এক পুত্রও লাভ হয়।

বাল্যকালেই নজীরের কাব্যশক্তির বিকাশ হইয়াছিল। এবং সেই আরবী-ফারসীর যুগে তিনিও আরবী ফারসীতে কিছুটা দখল লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার ব্যবহার তাঁহার কাব্যে বিশেষ দৃষ্ট হয় না। তাঁহার কবিসুলভ স্বভাবে সদা প্রফুল্লতা ও হাস্যময় রসিকতা বিরাজিত ছিল। টাকার প্রতি তাঁহার কখনও বিশেষ লিপ্সা ছিল না। তাই দেখিতে পাই

লক্ষ্ণৌ ও ভরতপুর হইতে আমন্ত্রিত হইয়াও তিনি অন্যান্য কবিদের ন্যায় কখনও নিজ জন্মভূমি বা বাসস্থান পরিত্যাগ করেন নাই। তাছাড়া তিনি জীবনে কখনও কাসীদা বা প্রশংসা-সূচক কবিতা ও মরসিয়া বা শোকগাথার চর্চা করিতে মনোনিবেশ করেন নাই। তিনি কতককাল একটি শিক্ষকের পদ লাভ করিয়া মথুরায় গিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আগ্রায়ই এক গৃহ-শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হইয়া বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি ১৮৩০ বা ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রকৃতির কবিতা ফারসী বা উর্দু সাহিত্যে বিরল। উর্দু সাহিত্যে নজীরের মধ্যেই এই গুণটি বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। যেমন তিনি প্রকৃতিকে আপনার করিয়া দেখিতে পারিতেন, তেমনি তাঁহার ভালমন্দ সকল লোককেই সহজে আপনার কবিয়া নিবার ক্ষমতা ছিল। তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই মিশিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তাই এই সকল লোকের চরিত্র-চিত্রণ স্বাভাবিক ও সহজভাবে করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, গৃহপালিত পশুপাখিদের বর্ণনায়ও তিনি সহজ অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন—তাহাতেই তাঁহার কাব্য আধুনিক যুগে বেশ সম্মান লাভ করিয়াছে। যৌবনে তিনি কতকটা বিলাসী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন; এবং কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করেন যে তিনি কতকটা স্বেচ্ছাচারীও ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাঁহার স্বভাবের আমূল পরিবর্তন হয় এবং সুফী-প্রভাব তাঁহার চরিত্রে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এইভাবে সকল স্তরের ভাব ও ভাষার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার শেষ জীবনে তিনি যে সকল কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্যই তিনি উর্দু সাহিত্যে একজন উচ্চদরের এবং একক ও অন্যতম কবি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কথিত আছে তিনি অনধিক ছয় হাজার কবিতা লিখিয়াছেন।

নজীরের শেষ জীবনের কবিতা বিশেষ করিয়া তত্ত্বকথায় পূর্ণ। এই সকল কবিতা পড়িলে অনেক সময় মনে হয় যেন একজন উচ্চস্তরের সাধক বা দরবেশ কবিত্ব-রসে পূর্ণ ধর্মোপদেশ দান করিতেছেন। এই সকল কবিতাকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে অনেক সময় ফারসী কবি সাদীর সহিত তুলনা করা হয়। তাছাড়া তাঁহার কাব্যে ধর্মের কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তাঁহার ধর্মমত ছিল 'অল্-ব্বহ্‌দৎ ফী অল্-কস্‌.ব্রৎ' অর্থাৎ সর্বজীবেই ভগবান বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার নিকট হিন্দু-মুসলমানের কোন পার্থক্য ছিল না। এই কারণে হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। এই

বিষয়ে তাঁহার মত ছিল 'বা-মুসল্‌মান্ আল্লাহ বা-বর্‌হমন্ রাম্ রাম্' অর্থাৎ হিন্দুদের যেমন রাম, তেমনি মুসলমানদের আল্লা। বস্তুতঃ তিনি সমসাময়িক সকল লোকের নিকট নানক বা কবীরের ন্যায় গুরু বা পীর বলিয়া অভিহিত হইতেন। আর তাঁহার স্বচ্ছ ও সাবলীল চিন্তাধারা ও কবিত্বশক্তি আমাদের ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কতকটা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

নজীর ছিলেন দরদী কবি, কিন্তু তাঁহার দরদ কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পশুপাখি ও অন্যান্য জীবজন্তুর বর্ণনাও তিনি তাঁহার কাব্যে বেশ দরদের সহিত গাহিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সামাজিক উৎসবের বর্ণনায়ও তিনি বেশ অনুভূতিপূর্ণ হৃদয় নিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। কবি ছিলেন ভ্রমণ-বিলাসী ; আর এই ভ্রমণের সুযোগ নিয়া প্রকৃতির সহিত তিনি বিশেষ পরিচয় লাভ করেন। তাঁহার ফলে তিনি সকল জিনিষের মধ্যেই সত্য, শিব ও সুন্দরের স্বরূপ দেখিতেই কেবল শিক্ষা লাভ করেন। আর সহজ, সরলভাবে এই স্বরূপটি তাঁহার কাব্যে অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার কাব্যের এই সরল ও স্বাভাবিক ভাষাকেই অনেকে বিদ্রূপ করিতেও ইতস্তত করেন নাই। নজীরের ভাষা 'বাজারী' বলিয়া অনেকের নিকট তাঁহার কাব্য 'অপাঙ্‌ক্তেয়' রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার ভাষা মামুলী ও 'গ্রাম্য' এবং শব্দালঙ্কারে আভিজাত্য মণ্ডিত নহে বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিতেও নারাজ। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব আভিজাত্যপূর্ণ ভাষার উপর নির্ভর করে না—ইহা নির্ভর করে রসঘন সুসমঞ্জস শব্দ ও অর্থের উপর এবং তাহা পূর্ণমাত্রায়ই নজীরের কাব্যে বিদ্যমান। সেই জন্যই তাঁহার যুগে আমাদের কবিবর কতকটা অবহেলিত হইলেও, আধুনিক যুগে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। মোটকথা, অনর্থক শব্দের কারিগুরি বা অলঙ্কারের বাহাদুরী তাঁহার কাব্যে নাই। এই বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিয়াই বোধহয় হালী তাঁহার কাব্যকে আনীসের কাব্য হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

নজীরের হাস্যকৌতুক বেশ স্বাভাবিক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁহার ব্যঙ্গ বা রহস্য কোন বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কখনই ব্যবহৃত হয় নাই। তিনি সকল লোকের সহিতই প্রাণ খুলিয়া মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

এবং এই সুযোগের ফলে তাহাদের যে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়াছেন, তাহারই ব্যঙ্গ বা রহস্য বেশ অনুভূতিপূর্ণ হৃদয় নিয়া তাহাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে ইন্‌শার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তবে ইনশা ছিলেন দরবারী-কবি, আর আমাদের কবি সাধারণ মানবের কবি। ইনশা দরবারী-কবি, তাই দরবার বা আপন লোকের প্রীত্যর্থে তিনি হাস্যকৌতুকের উদ্ভাবনা করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার কাব্যে সহজ ও স্বাভাবিক অনুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের আভাস পাওয়া যায় নাই—তাহাতে রহিয়াছে দরবার-প্রীত্যর্থে পাণ্ডিত্যপূর্ণ শব্দের ছড়াছড়ি। অন্যথায় নজীরের ব্যঙ্গ কৌতুকের অন্তরালে পাই গভীর অর্থপূর্ণ উপদেশাত্মক ভাবের সমাবেশ।

সুরের প্রতিও নজীরের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সহজ, সরল শব্দদ্বারা সুরের ঝঙ্কারের মাধ্যমে বিষয় অনুযায়ী যে সকল অর্থ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কথা ভাবিলে আমাদের স্বতঃই ইংরেজ কবি টেনিশন বা বাঙ্‌লার নজরুল ইসলামকে মনে পড়ে। ইহা সত্য যে নজীর বিষয়ভেদে কোন শ্রেষ্ঠ উর্দু কবিরই সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার কাব্যে এই শ্রেষ্ঠ কবিদের ভিন্ন ভিন্ন গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। মীর্জা মহম্মদ আস্‌করী সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, নজীর মেঁ সোদা কা জোর্, মীর্ কী বলন্দ্‌-পরওয়াজী, ইন্‌শা কী জরাফৎ, আনীস্ ও দবীর্ কা জোশ্‌ ও খরূশ্‌ নহীন্ হৈ; মগর্ ইয় সব্‌ স্বফাৎ উস্ মে ছুরূর্ পায়ী জাতী হৈঁ। তাঁহার এই সকল বিভিন্ন গুণের একত্র সমাবেশের জন্য রামবাবু সক্‌সেনা তাঁহাকে সেক্সপিয়ারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তেমনিভাবে আমরা তাঁহার এই সকল বিভিন্ন গুণ দৃষ্টে তাঁহাকে আমাদের রবীন্দ্রনাথের সহিতও তুলনা করিতে পারি। তবে ইহা ঠিক যে কবিত্বশক্তির তুলনা করিতে হইলে তাঁহাকে কখনও ইংরেজ কবি সেক্সপিয়ার বা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সমপর্যায়ে স্থাপন করা যাইতে পারে না।

নজীরের কাব্যের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অয় দিল্ কহীঁ তু জাকে নহ অপ্‌নী জ়বান্ হলায়ে;
অওর্ দর্দে-দিল্ কা অপ্‌নে কিসী কো তু মৎ সুনায়ে।
মাঙ্‌ উস্‌সে জিস্ কে হাথ্‌ সে তু পেট্ ভর্‌কে খায়ে;
মশ্‌হুর্ ইয় মসল্ হৈ কহুঁ কিয়া মৈঁ তুঝ সে হায়।
ঘঙ্গৈর্ অজ়্‌ খুদাকে কিস্ মেঁহৈ ক়ুদ্‌রৎ জো হাথ্‌ উঠায়ে;
মক়্‌দূর্ কিয়া কিসী কা ওহী দে ওহী দিলায়ে।

'উম্‌দহ হৈঁ জিৎনে খ.লক্‌. মেঁ কিয়া শাহ কিয়া উজী.র্‌ ;
আল্লাহ্‌ হী বস্‌ ঘনী হৈ মিয়্যাঁ অওর সব ফকীর।
কিয়া গঞ্জ. ও মুল্‌ক্‌ ও মাল মকান্‌ তাজ কিয়া সরীর্‌ ;
জো মাঙনা হৈ উস্‌সে হী মাঙ্গো মিয়্যাঁ নজীর।
ঘঈর্‌ অজ. খুদাকে কিস্‌ মেঁ হৈ ক.দ্‌রৎ জো হাথ উঠায়ে ;
মক্‌দূর্‌ কিয়া কিসী কা ওহী দে ওহী দিলায়ে।

অর্থাৎ, হে মন, কোথাও গিয়া তোমার জিহ্বা খুলিও না ; আর আপন মনের কথা অন্য কাহাকেও শুনাইও না। তাহার নিকট হইতেই প্রার্থনা কর, যাহার নিকট হইতে পেট ভরিয়া খাইয়াছ ;—এই প্রবাদই প্রসিদ্ধ হইয়াছে, হায়, তোমাকে আর কি বলিব! ভগবান ছাড়া আর কাহার শক্তি আছে যে হাত তুলিবে ? আর কাহার সামর্থ্য আছে ?—সে-ই দেয়, সে-ই দেওয়ায়। সৃষ্টিজীবের মধ্যে রাজা বা মন্ত্রী যাহাকেই তুমি গণমান্য (মনে কর না কেন —বস্তুতঃ) ভগবানই প্রকৃত ধনী, আর সকলই দরিদ্র। হে নজীর মিঞা, যাহা চাহিবার তাঁহার নিকট হইতেই চাও।......

নজীরের ন্যায় কতকটা প্রাচীন যুগের হইলেও, শা নসীর (শাহ্‌ নস্বীর) ও ছিলেন আধুনিক যুগের অগ্রদূত। এইজন্য তাঁহাদের উভয়কে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের চিন্তাধারার সংযোগকারীরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। নসীর উপাধি-ধারী শা নসীরুদ্দীন কালো রং বিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া তিনি 'মিয়্যাঁ কল্লু' উপাধিতেই কতকটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

শা ঘরীবের পুত্র শা নসীর দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায়ই অধিকাংশ সময় বসবাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন ফকীর ও দরবেশ ব্যক্তি। তাহা হইলেও তিনি তাঁহার পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। তবে বাল্যকালেই নসীরের কবিত্বের উন্মেষ হয় এবং শীঘ্রই তিনি একজন কবিরূপে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি কিয়ামুদ্দীন কায়িমের শিষ্য শা মহম্মদী মায়িলের কাব্য-শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে, তিনি সৌদা ও মীর দর্দ হইতেও কিছুকাল কাব্য-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশ মর্যাদা ও কবিত্ব শক্তির জন্য শা আলমের দরবারে শীঘ্রই তিনি একজন দরবারী কবি হইবার সুযোগ লাভ করেন। দরবারে ক্রমেই তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে এবং তথা হইতে অনেক সম্মান ও পুরস্কারেও তিনি ভূষিত হইয়াছেন। কবিবর নানাদেশেই ভ্রমণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি

দিল্লীর প্রতিই বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন এবং তথায়ই অধিকাংশ সময় বসবাস করিয়া উর্দু সংস্কৃতি-সত্তার উন্নয়নে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এবং তাহার ফলে পরবর্তী যুগের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ উর্দু কবিই তাঁহার নিকট কাব্য শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ উর্দু কবি জৌক অন্যতম।

দিল্লী-অধঃপতনের যুগে তিনিও অন্যান্য কবিদের ন্যায় নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। লক্ষ্ণৌ তিনি দুইবার গিয়াছিলেন, আর হয়দরাবাদে চারিবার। শাদান নামে বিখ্যাত দেওয়ান চন্দূলালের আদেশ ও অনুরোধ-ক্রমেই নসীর হয়দরাবাদে গিয়াছিলেন এবং দেওয়ান সাহেব তাঁহাকে যথেষ্টই সম্মান করিতেন—বিশেষ করিয়া দেহলবী-কবিদের প্রতিই তাঁহার একটা বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। হয়দরাবাদেও তাঁহার অনেক শিষ্যবর্গের সমাবেশ হয়। তাঁহাদের মধ্যে মৌমিন অন্যতম। অবশেষে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে হয়দরাবাদেই নসীরের মৃত্যু হয়।

নসীর অনেক কবিতাই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সংগ্রহ করিয়া রাখিবার প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল না বলিয়া তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মহারাজ সিংহ নামে তাঁহার এক কাব্য-শিষ্য প্রায় এক লক্ষ ঘজলের সমাবেশে একটি দেওয়ানের সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাছাড়া মৌমিনের শিষ্য মীর তস্কীনের বংশধর মীর আব্দুর্-রহমান ও নসীরের অনেক কবিতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

নসীরের কবিতা বেশ সরস, সতেজ ও জোরালো—সঙ্গে সঙ্গে কতকটা ব্যঙ্গ ও কৌতুকের আমেজ রহিয়াছে। তাঁহার কবিতার বৈশিষ্ট্য হইয়াছে কঠিন রদীফ ও কাফিয়দ্বারা ঘজল কবিতার প্রবর্তন করা। তাঁহার যেমন ছিল নানা ছন্দ ও সুর উদ্ভাবনের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ, তেমনি গুরুগম্ভীর শব্দ এবং সাদৃশ্য রূপক ও অন্যান্য অলঙ্কারের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কাব্যে গভীর ভাবের কোন সমাবেশ নাই। আবার তিনি বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না বলিয়া, তাঁহাব ভাষায়ও কিছু কিছু অশুদ্ধি দৃষ্ট হয়। তবে উল্লেখযোগ্য যে নসীর হনফী সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, তাঁহার ধর্মের কোন গোঁড়ামি ছিল না।

কাব্যের নিদর্শনস্বরূপ নসীরের একটি কবিতাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

উয়াকৃতে-নমাজ হায় ইন্‌কা কামৎ গাহ খদঙ্ ও গাহ কমান ;
বস যাতে হায় আহলে-ইবাদৎ গাহ খদঙ্ ও গাহ কমান।

মর্দ্ যোয়ানী মেঁ তো হায় সীধা পীরী মেঁ ঝুক্ যাতা হায় ;
কুঅৎ ও জুফ্ কী হায় ইয়া ইলামৎ গাহ খদঙ্ ও গাহ কমান।

وقت نماز ہے ان کا قامت گاہ خدنگ و گاہ کمان —
بن جاتے ہیں اہل عبادت گاہ خدنگ و گاہ کمان
مرد جوانی میں تو ہے سیدھا پیری مین جھک جاتا ہے
قوت و ضعف کی ہے یہ علامت گاہ خدنگ و گاہ کمان

অর্থাৎ, প্রার্থনার সময় তাহাদের শরীর কোন সময় তীর, কোন সময় ধনুকের আকার ধারণ করে ; প্রার্থনাকারিগণ কোন সময়ে তীর ও কোন সময়ে ধনুকে রূপান্তর লাভ করে। মানুষ যৌবনে সোজা থাকে এবং বার্দ্ধক্যে নত হইয়া যায়—সামর্থ্য ও দুর্বলতার ইহাই চিহ্ন যে সময়ে তীর ও সময়ে ধনুক।

(ছ) দিহলবী কাব্যের দ্বিতীয় বিকাশ
(বা দিহলবী যুগের পঞ্চম পর্যায়) :
জৌক ও ঘালিবের যুগ

সৌদা ও মীরের যুগ ছিল উর্দুকাব্য তথা দিহলবী কাব্যের স্বর্ণযুগ, আবার জৌক ও ঘালিবের সময়ে দিহলবী কাব্যের নব-বিকাশ দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ দিহলবী-ভাষাই উর্দু বা হিন্দুস্তানীর জন্মভূমি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দিল্লীতে মুসলিম প্রাধান্যের অধঃপতন হইলে, এই দিহলবী ভাষা মুসলিম ভারতীয় বা হিন্দুস্তানী ভাষায় রূপান্তর লাভ করিয়া যেখানেই মুসলিম প্রাধান্য বা ইসলাম কৃষ্টির প্রভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল, তথায়ই উর্দুভাষার প্রভাব ও বিকাশ হইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উর্দুভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্য দিয়াই আমরা ভারতে (ও অধুনা পাকিস্তানেও) মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস খুঁজিয়া পাইতে পারি।

দিহলবী যুগের প্রথম বিকাশে তথা উর্দু সাহিত্যের স্বর্ণযুগে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ উর্দু কবির একসঙ্গে উদ্ভাবন হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় বিকাশে সেইরূপ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবির একসঙ্গে উদ্ভাবন না হইলেও, এই যুগের প্রসিদ্ধ কবি ঘালিব উর্দু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং তিনি বিশ্বশ্রেষ্ঠ কবিদের হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন। তাছাড়া এই যুগের অন্যান্য কবি তথা জফর, জৌক ও মৌমিন কোন নিকৃষ্ট কবি ছিলেন না।

লখ্নোয়ী যুগের আরবী-ফারসী শব্দের প্রভাব এই যুগেও থাকিয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ঘালিব ছিলেন একজন বিখ্যাত ফারসী কবি। তবে অলঙ্কারের প্রাধান্য রূপান্তর লাভ করিয়া সহজ ও সরলভাবে অর্থ প্রকাশের সূচনা আবার লক্ষিত হয়। অনেক আরবী ও ফারসী শব্দ সহজ ও স্বাভাবিক উর্দুরূপ গ্রহণ করে।

শেখ ইব্রাহীম জৌক এক গরীব সিপাই শেখ মহম্মদ রমজানের পুত্র। সেই গরীব সিপাই নবাব লুৎফ্ আলী খানের অধীনে কাজ করিতেন। উচ্চসম্ভূত না হইলেও জৌক তাঁহার নিজ মেধা ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা অনেক উচ্চবংশীয়দের হইতেও সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বাল্যশিক্ষা হাফিজ ঘুলাম রসুল নামক এক ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত হন। এই ঘুলাম রসুল

একজন মামুলী কবিও ছিলেন। তিনি অনেক সময় নিকটস্থ কাব্য-সংস্কৃতি সভায় তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য জৌককেও সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইতেন। এই সকল সভায় কবিদের আবৃত্তি শুনিয়া জৌকের মনেও কাব্যস্পৃহা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে। তিনি তাঁহার বাল্যশিক্ষক রসুলকে কবিতা লিখিয়া দেখাইতে লাগিলেন। আর তখন হইতেই ভাবী-কবি শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতা সমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতেন। সেই সময় জৌকের এক বাল্যসাথী মীর কাজিম হুসেন প্রসিদ্ধ শা নসীরের একজন কাব্য-শিষ্য হইলেন। জৌকও তাঁহার বন্ধুর সহিত তাঁহার নিকট যাইতে লাগিলেন। এবং পরে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট হহতে কাব্যানুশীলন গ্রহণ করেন। শা সাহেব জৌকের কবিত্ব-শক্তির অপূর্ব স্ফুরণ দেখিতে পাইয়া একবারে আশ্চর্য হইলেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার ভয় হইতে লাগিল যে শিষ্যই হয়ত গুরুকে ছাড়াইয়া যাইবে। বস্তুতঃ হইলও তাহাই ; এবং নসীর সাহেব তাঁহার শিষ্যের কাব্য হইতে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি খুঁজিয়া বাহির করিলেও জৌকের এই ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ কাব্যই জনসাধারণ ও কাব্যামোদীদের নিকট হইতে যথেষ্ট সমাদর পায়।

এই সময়ে যুবরাজ মীর্জা আব্দুল মুজফরের কর্তৃত্বাধীনে রাজ-দরবারেই সংস্কৃতি-সভার আয়োজন হয়। তরুণ কবিদের কাব্য-চর্চার উৎসাহের জন্য প্রসিদ্ধ কবিদেরও তথায় সমাগম হইত। মীর কাজিম বেকরারীর সুপারিশে গরীব জৌকও যোগদান করিবার সুযোগ পাইলেন। যুবরাজ মুজফরও তথায় কাব্যালোচনায় যোগদান করিতেন এবং তিনি তাঁহার কাব্যনুশীলন শা নসীর হইতেই গ্রহণ করিতেন। ঘটনাক্রমে শা নসীর কোন কারণবশতঃ দিল্লীর বাহিরে গিয়াছিলেন। জফর কবি-নামধারী যুবরাজের কাব্যানুশীলন তত্ত্বাবধানের ভার তখন মীর কাজিম হুসেনের উপর অর্পিত হয়। তিনিও জোন এলফানষ্টাইনের সহিত রাজধানীর বাহিরে চলিয়া গেলেন। অগত্যা যুবরাজ জৌককে তাঁহার কাব্য-পরিশুদ্ধ করিবার জন্য মাসিক মাত্র ৪৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিলেন। এই সামান্য টাকাকে উপেক্ষা না করিয়া এই নিয়োগকেই তিনি সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার ফলে তাহার কবিত্বশক্তির সুখ্যাতি ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে তাঁহার শিষ্যবর্গও বেশ জুটিতে লাগিল। কথিত আছে, মারুফ নামে প্রসিদ্ধ মীর্জা ঘালিবের শ্বশুর নবাব ইলাহী বখশও এই সময়ে জৌকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন জৌকের মাত্র ২০ বৎসর বয়স।

শা নসীর পরে দিকন হইতে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু ক্রমে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে জৌকের সুখ্যাতির নিকট তিনি আর টিকিয়া থাকিতে পারিলেন না। আর রাজদরবার হইতে জৌকের বেতন ক্রমে চারি টাকা হইতে পাঁচ টাকা সাত টাকা এইরূপে বাড়িয়া ১০০৲ টাকা পর্যন্ত হইল। তাছাড়া কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা বা উৎসব উপলক্ষেই রাজদরবার হইতে তিনি নানাপ্রকার উপঢৌকন পাইতে লাগিলেন। কথিত আছে, তাঁহার এক কাসীদায় মুগ্ধ হইয়া তদানীন্তন দ্বিতীয় আকবর শা তাঁহাকে 'খাকানী-ই-হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন। আর মীর্জা আবুল মুজফর বাদশা হইয়া যখন বাহাদুর শা উপাধি গ্রহণ করিলেন, তিনিও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতে লাগিলেন। আরও কথিত আছে যে কোন একবার এই বাহাদুর শা অসুস্থ হইলে পরে কবিবর তাঁহাকে একটি স্বরচিত কাসীদা আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন। ইহাতে মুগ্ধ হইয়া বাদশা নানাপ্রকার উপঢৌকনসহ তাঁহাকে 'খান্ বহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার কিছুকাল পরেই আর একটি কাসীদায় মুগ্ধ বাদশা তাঁহাকে একটি 'গ্রাম' জায়গীররূপে দান করিলেন। জৌক ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ৬৮ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

আশ্চর্য স্মরণশক্তি ছাড়া তাঁহার মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্যও জৌক বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বেশ ধার্মিক ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিত্যকার অবশ্যকর্তব্য নমাজ রোজা যেমন করিতেন, তেমনি তাঁহার সকল কাজকর্ম কোরানের বিধি অনুযায়ী করিতে চেষ্টা করিতেন। কাব্যালোচনা ছাড়া অন্যান্য বিদ্যায়ও তাঁহার আগ্রহ ও সখ কোন কম ছিল না। কথিত আছে, তিনি সংগীত, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, স্বপ্নতত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাছাড়া হাদিস, তফসীর, ফিকা, তসয়্যুফ বা সুফী-ধর্ম প্রভৃতিতেও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাঁহার টাকা-পয়সার প্রতি যেমন অহেতুক কোন আকর্ষণ ছিল না, তেমনি আবার নিজ জন্মভূমির প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কথিত আছে দেওয়ান চন্দুলাল সকল সাহিত্যিক সমাগমে মুখরিত হয়দরাবাদে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলে, জৌক তথায় যাইতে অস্বীকার করিয়া দেওয়ান সাহেবকে লিখিয়াছিলেন,

ইন্ দিনোঁ গরচি দিকন্ মেঁ হৈ বড়ী কদর্-ই-সুখন্ ;
কৌন জায়ে ধৌক পর্ দিল্লী কী গলীয়ান্ ছুড় কর্।

অর্থাৎ আজকাল যদিও দাক্ষিণাত্যে কাব্যের বড় সম্মান, কিন্তু দিল্লীর ক্ষুদ্রপথ তাগ করিয়া জৌক কি করিয়া যাইবে ?

যে জৌক তাঁহার পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাব্যসাধনাই করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অনেক কবিতা লেখাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহার প্রিয় কাব্য শিষ্য আবে-হায়াৎ প্রণেতা প্রসিদ্ধ মহম্মদ হুসেন আজাদ অতি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি অনেক ও নানাপ্রকার কবিতাই লিখিয়া থাকিলেও সিপাহী বিদ্রোহের যুগে খুব সম্ভবতঃ তাঁহার অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। জৌক কাসীদা ও ঘজলই বিশেষ করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন। এবং এই কাব্যদ্বয়ে তিনি বেশ সুনামও অর্জন করেন। তাছাড়া তাঁহার অন্যান্য কবিতার মধ্যে রুবায়ী, মুখম্মস ও তারীখ প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ আছে। কথিত আছে পত্রাকারে নামায়ে-জাহান্‌সুজ নামক একটি মসনবী-কাব্যও তিনি লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অন্যান্য কবিদের ন্যায় জৌকও অনেক কাব্য-শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে দাঘ্, জফর, আজাদ, জহীর ও আনোয়ার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জৌক ভাষাকে যেরূপে মার্জিত করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার সাহিত্যকে রসঘন করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি শব্দার্থালঙ্কারে বেশ সিদ্ধহস্ত। তাঁহার কাব্যে ছন্দ ও সুরের বাহাদুরীও লক্ষণীয়। ঘজল কবিতায় যদিও তিনি তাঁহার সমসাময়িক ঘালিবের সমপর্যায়ভুক্ত নহেন, কিন্তু ইহা একবাক্যে স্বীকার্য যে কাসীদা কবিতায় তিনি তাঁহার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকার ছিলেন। ভাবের গভীরতার প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা যদিও সত্য যে জৌক ঘালিবের তুল্য নহেন, কিন্তু প্রকাশভঙ্গী ও সহজ সরল প্রকাশনার প্রতি লক্ষ্য করিলে জৌককে নিশ্চয়ই ঘালিবের সমপর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। মোটকথা, জৌক তাঁহার ঘজল ও কাসীদা এই উভয় প্রকার কবিতায়ই তাঁহার পূর্ববর্তীদের উৎকর্ষসমূহ সম্পূর্ণরূপেই আয়ত্ত করিয়াছেন, আবার তাঁহাদের কাব্যের অপকর্ষসমূহ সঙ্গে সঙ্গে নিজ কাব্য হইতে অপসারণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাহার ফলে জৌক উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম বলিয়া চিরকালই প্রসিদ্ধ থাকিবেন।

মৌমিন নামে প্রসিদ্ধ হকীম মৌমিন খান ঘুলাম নবী খানের পুত্র। মৌমিনের ঠাকুরদাদা হকীম নামদার খান শা আলমের রাজত্বকালে কাশ্মীর হইতে দিল্লীতে আগমন করেন এবং শীঘ্রই তথায় রাজবংশধর বলিয়া কিছু

'জায়গীর' প্রাপ্ত হন। ইহারই ফলে ইংরেজদের রাজত্বকালে এই হকীম বংশীয়গণ সরকার হইতে 'পেন্সন' বা রাজকীয় ভাতা পাইতে লাগিলেন। আমাদের হকীম মৌমিন খানও এই সুযোগ লাভ করেন।

মৌমিন খান ১৮০০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতেই জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া তাঁহার মেধা ও স্মরণশক্তি ছিল অতি প্রবল। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। বংশ-পরম্পরা হকীমী-শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। তিনি এই হকীমী বা চিকিৎসাবিদ্যা তাঁহার পিতার নিকট হইতেই শিক্ষালাভ করেন। কথিত আছে, তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। এবং অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি পর্যন্ত তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণীর ফলপ্রসূ কার্যকারিতা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। তাছাড়া সৎরঞ্জ বা দাবা খেলায়ও তাঁহার বিশেষ যশ ছিল।

এই সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও মৌমিন ইহাদের কোন কিছুকেই তাঁহার জীবিকারূপে গ্রহণ করেন নাই। তিনি ছিলেন বড় আমোদপ্রিয় ও হাস্য-রসিক। তাছাড়া তিনি অতি সু-পুরুষ ও চঞ্চল স্বভাব ব্যক্তি। দিল্লী শহর তাঁহার এই চঞ্চল স্বভাবের সুযোগ নিয়া তাঁহাকে সহজেই হীন কামনা বাসনার বশবর্তী করিয়া তুলে। সৌভাগ্যবশতঃ যৌবন-অপরাহ্নে তাঁহার এই উদ্দাম প্রকৃতির কতকটা ভাটা দেখা দেয় এবং যৌবনের লালসাপূর্ণ কবিতাই ক্রমে প্রেমপূর্ণ কাব্যে রূপান্তর লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রেও সংযতভাব দৃষ্ট হয় এবং তিনি পবিত্র ধর্মজীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তাঁহার প্রথম জীবনে মৌমিন শা নসীর হইতে কাব্যানুশীলন গ্রহণ করেন, কিন্তু শীঘ্রই কাব্যের স্বরূপ নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিয়া কাহারো নিকট হইতে আর এই বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। দিল্লী হইতে পাঁচবার বাহিরে গমন করিয়া তিনি রামপুর জাহাঙ্গীরনগর ও সহারণপুর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু দিল্লীর প্রতি প্রবল আকর্ষণবশতঃ প্রত্যেকবারই তিনি শীঘ্রই তাঁহার নিজ জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন। কথিত আছে, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মীর্জা ঘালিব দিল্লী কলেজের ফারসী অধ্যাপকের পদ প্রত্যাখ্যান করিলে টমাস সাহেব এই পদে মৌমিনকে অনুরোধ করেন। কিন্তু এই পদের সর্তে দরকার হইলে দিল্লীর বাহিরেও যাইতে হইতে পারে বলিয়া মৌমিনও এই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

এই ফারসী অধ্যাপক-পদের বেতন মাত্র ছিল ৮০৲ টাকা। কিন্তু ২৫০৲ টাকা বেতনের এক চাকরীতেও তিনি কপুরথল যাইতে অস্বীকার করেন, যখন তিনি শুনিলেন যে এই মাহিনা কোন একজন গায়ককেও দেওয়া হয়। একবার টোঙ্কের নবাব উজীরুদ্দৌলা বাহাদুর তাঁহাকে তাঁহার পার্ষদরূপে গ্রহণ করিতে চাহিলে টোঙ্ক অতি নগণ্য শহর বলিয়া দিল্লীর সমৃদ্ধি ও জাঁকজমক ছাড়িয়া তথায় যাইতেও তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মৌমিন ছিলেন একজন স্বাধীনপ্রকৃতি-বিশিষ্ট এবং অল্পতেই সন্তুষ্ট ব্যক্তি। তাছাড়া নিজ দেশের প্রতি ছিল তাঁহার প্রবল আকর্ষণ। আমরা আরো দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন কাব্যের সাধনা করিয়া থাকিলেও আমীর-উমরাদের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রশংসাসূচক কাসিদা কবিতা তিনি কদাচিত লিখিয়াছেন।

মৌমিন তাঁহার কবিত্বশক্তি ও নিজ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ সজ্ঞান ছিলেন। এবং তাঁহার সমসাময়িক উর্দু কবিদের দূরের কথা, জগৎ-বিখ্যাত ফারসী কবিদেরও তিনি বিশেষ মর্যাদা দিতে চাহিতেন না। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ ফারসী কবি সাদী লিখিত গুলিস্তানকে তিনি একটি মামুলী কিতাব বা সাধারণ গ্রন্থ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার অন্যান্য কাব্যের মধ্যে মৌমিন 'তারীখ' লিখিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

তাঁহার শিষ্য শীফ্‌তা কর্তৃক সঙ্কলিত মৌমিনের দেওয়ানে ছয়টী মসনবী-কাব্য ছাড়া অন্যান্য নানা প্রকার কবিতারই উল্লেখ আছে। তাঁহার কবিতায় যেমন আছে শব্দের লালিত্য, তেমনি রহিয়াছে গভীর ভাবের সমাবেশ। সুসামঞ্জস অলঙ্কারাদির ব্যবহারও অপ্রচুর নহে। তবে প্রকাশভঙ্গি অনেক-সময় সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে রচিত হয় নাই। ঘালিবের কাব্যের ন্যায় তাঁহার কাব্যেও ফারসী শব্দের আধিক্য দৃষ্ট হয়। সময় সময় এই ফারসী শব্দের বাহুল্য তাঁহার কাব্যকে পাণ্ডিত্য-ঘেষা করিয়া তুলিয়াছে—ইহাতে কাব্যের মাধুর্য অনেক সময় বিকৃত হইয়াছে।

মৌমিন উর্দু সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবিমাত্র ছিলেন না। তিনি যেমন সমসাময়িক সকল কবির নিকট হইতে সুখ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার অগণিত শিষ্যবর্গ হইতেও যথেষ্ট সম্মানলাভ করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিগণ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন :—নবাব মুসতফা খান শীফ্‌তা, মীরহুসেন তস্‌কীন, মীর ঘুলাম আলী উঅহ্‌শৎ ও আস্‌ঘর আলী খান নসীম্‌।

মৌমিন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কোনস্থান হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। কথিত আছে, মৌমিন তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে ৫ দিন ৫ মাস বা ৫ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইবে। আর সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৫ মাস পরেই তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়। তাঁহার মৃত্যু-'তারীখ্'-ও তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছিলেন—

'দস্ত্‌ব্র বাজ্ূব-শিকস্ত্' (বা হিজরী ১২৬৮ সন)।

মীর্জা আসদুল্লা খান ঘালিব উর্দু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক। তিনি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার 'লকব' মীর্জা নৌশা ও দিল্লীর বাদশা হইতে প্রাপ্ত তাঁহার খেতাব নজমুদ্দৌলা দবীরুল্-মুল্‌ক্ নিজামজঙ্গ। তিনি যেমন ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক, তেমনি তাঁহার বংশও ছিল বিশেষ আভিজাত্য-মণ্ডিত। তিনি নিজেই তাঁহার বংশ-গৌরব সম্বন্ধে গাহিয়াছেন,

ঘালিব আজ খাকে-পাকে-তুরানীম্;
লাজিরাম্ দর নসবে-ফরামন্দীম্।

غالب از خاک پاک تورانیم – لاجرم در نسب فرهمندیم

অর্থাৎ, হে ঘালিব, তুরানের পবিত্র মাটি হইতে উদ্ভূত বলিয়াই আমি উচ্চ-বংশ-জাত।

কথিত আছে, তুরস্কদেশীয় আইবক বংশ হইতে উদ্ভূত সলজুকীয় সম্রাটের সহিত তিনি সম্বন্ধযুক্ত। ঘালিবের পিতামহ সর্বপ্রথম ভারতে আসিয়া শা আলমের দরবারে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। ঘালিবের পিতা মীর্জা আব্দুল্লা খান কতকটা চঞ্চল-প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন এবং তিনি ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। তিনি কতকদিন অযোধ্যায় অবস্থান করেন; তৎপর অযোধ্যা হইতে হায়দরাবাদে গমন করেন। তথায় নবাব নিজাম আলী খান বহাদুরের অধীনে ৩ শত অশ্বারোহীর অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। এই পদে কয়েক বৎসর নিযুক্ত থাকার পর তিনি হায়দরাবাদ হইতে স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এবং তথা হইতে আলোয়ারের রাজা বখতাউর সিংহের অধীনে কোন কার্যে নিযুক্ত হন। তথায় কোন এক সামান্য যুদ্ধে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তখন ঘালিবের বয়স মাত্র ৫ বৎসর। ঘালিবের মাতামহও ছিলেন একজন সেনাধ্যক্ষ এবং আগ্রা শহরের একজন বিত্তশালী ব্যক্তি।

পিতার মৃত্যুর পর ঘালিবের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার চাচা মীর্জা নসীরুল্লা বেগের উপর ন্যস্ত হয়। তিনি ইংরেজ-অধীনে একজন রিসালদার বা সেনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার বিশ্বস্ত চাকরীর জন্য তিনি ইংরেজ সরকার হইতে একটি জায়গীরও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শীঘ্রই তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন ঘালিবের বয়স মাত্র ৯ বৎসর। তারপর ঘালিব তাঁহার মামার-বাড়ীতেই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন এবং সরকার হইতেই তাঁহার কাকার উত্তরাধিকারসূত্রে পেন্সন পাইতে থাকেন। তাঁহার প্রথম জীবন আগ্রাতেই অতিবাহিত হয়। তিনি শেখ মুআজ্জম্ নামক এক আরবী ও ফারসী পণ্ডিত হইতে তাঁহার বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার কবিত্বশক্তির বিকাশলাভ করে। এবং কথিত আছে, প্রসিদ্ধ কবি নজীর আকবরাবাদী হইতে তিনি তাঁহার কাব্যের প্রাথমিক শিক্ষা কতকটা লাভ করিয়াছিলেন। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পহলবী ও পার্শী ভাষায় পণ্ডিত হরমুজ নামক এক পার্শীর সহিত ঘালিবের সাক্ষাৎ হয়। ক্রমে তাঁহার সহিত ঘালিব বিশেষ অন্তরঙ্গভাবে মিশিতে থাকেন এবং এই হরমুজের সহায়তায়ই তাঁহার ফারসী বাগধারায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে। এই পণ্ডিতপ্রবর পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষালাভ করেন এবং তাঁহার নূতন নামকরণ হয় আব্দুল সামদ।

ঘালিব ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চাচার শাদী উপলক্ষে সর্বপ্রথম দিল্লীতে আসেন। চাচা নসীরুল্লার বিবাহ হয় নবাব ফখরুদ্দৌলার মেয়ের সহিত। আর ফখরুদ্দৌলা লোহারুরই ছোট ভাই ইলাহী বখ্শ্ খান মারুফের কণ্যার সহিত বিবাহ হয় আমাদের কবিবর মীর্জা ঘালিবের। এই বিবাহ যখন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়, তখন ঘালিবের বয়স মাত্র ১৩ বৎসর। তাঁহার বিবাহের পর হইতেই ঘালিব প্রায়ই দিল্লীতে যাতায়াত করিতে থাকেন এবং পরবর্তী জীবনে দিল্লীতেই তাঁহার কায়েমী বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। এই সময়ে দিল্লীতে কাব্য ও সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ছিল এবং নানাস্থানে মুশাঅরা বা সংস্কৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হইত। ঘালিবও এই সকল সভায় বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। একজন প্রসিদ্ধ কবির জামাতা বলিয়া তাঁহার প্রথম হইতেই কতকটা সমাদর ছিল। প্রথম জীবনে ঘালিব ফার্সী সাহিত্যের বিশেষ চর্চা করিলেও ক্রমে তাঁহার মন উর্দুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এবং কথিত আছে, তাঁহার উর্দু কবিতায় ঘালিব প্রথমে 'আসদ্' কাব্য-উপাধি ব্যবহার করিতেন। কিন্তু যখন শুনিলেন আর একজন কবিও এই কাব্য-উপাধি গ্রহণ করিয়াই কাব্য-চর্চা করেন, তখন ইহা পরিবর্তন

করিয়া আমাদের কবিবর 'ঘালিব' উপাধি গ্রহণ করিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই নূতন কাব্য-উপাধি গ্রহণ করিলেও, তাহার পূর্ববর্তী যে সকল কবিতা তিনি লিখিয়াছিলেন তাহাতে অনেকটা কবি-স্বাক্ষররূপে 'আসদ্' নামই রহিয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকার হইতে জায়গীরের পরিবর্তে ঘালিব মাসিক ভাতা পাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পর তাঁহার এই নির্দিষ্ট ভাতাও বন্ধ হইয়া যায়। তাহারই বিহিতের জন্য ঘালিব ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন ও তথায় হাইকোর্টে তাঁহার ভাতার পুনরুদ্ধারের জন্য আপীল করেন। কিন্তু ইহাতে ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। কলিকাতা হইতে ফিরিবার পথে তিনি লক্ষ্ণৌ ও বারানসী গমন করেন। সেই সময়ে তিনি নবাব নাসিরুদ্দীন হয়দরের নামে একটি কাসীদা এবং তাঁহার মন্ত্রীর নামেও একটি প্রশংসা সূচক নিবন্ধ উৎসর্গ করেন। কথিত আছে, লক্ষ্ণৌর শেষ বাদশাহ উআজিদ আলী শা তাঁহাকে বাৎসরিক ৫০০৲ টাকা ভাতা নিদিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বৎসর দুই অতিবাহিত হইলেই উআজিদ আলী শার অন্তরীণ অবস্থায় এই ভাতাও বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে দিল্লী কলেজের ফারসী অধ্যাপকের পদ খালি হওয়ায় তিনি সেই পদপ্রার্থী হন। কিন্তু কথিত আছে, সেই চাকরীতে নিয়োগের সময়, ডি. পি. আই. বা শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া ঘালিব সেই চাকরীতে উপযুক্ত বিবেচিত হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে শহরের পুলিশ সাহেবের কারসাজীতে ঘালিবের তিন মাসের জন্য কারাজীবনও বাস করিতে হয়। তবে কবির সম্মানার্থে তাঁহাকে সাধারণ কয়েদী জীবন যাপন করিতে হয় নাই। শীঘ্রই ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশা তাঁহাকে নজমুদ্দৌলা দবীরুল্-মুল্‌ক্ নিজামজঙ্গ উপাধিতে ভূষিত করেন। এবং তয়মুরীয় বংশের ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে ৮৫৲ টাকা মাহিনা নির্দিষ্ট করিয়া দেন। আবার জৌকের মৃত্যুর পর ঘালিব বাদশার কাব্য-গুরু নিযুক্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাজসংশ্লিষ্ট বশতঃ তিনি ইংরেজ সরকার কর্তৃক সন্দেহের চক্ষে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পেন্সনও বন্ধ হইয়া যায়। তবে পরে তিনি নির্দোষ বিবেচিত হইলে তাঁহার পূর্ববর্তী সম্মান ও ভাতা ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

ঘালিব রামপুর নবাব ইয়ুসুফ আলী খানেরও কাব্য-গুরু ছিলেন। এবং

তাঁহার নিকট হইতেও কবিবর মাসিক ১০০৲ টাকা ভাতা পাইতেন। এই ভাতা তাঁহার জন্য যাবজ্জীবন নির্দিষ্ট ছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সের সময় ঘালিব দিল্লীতেই প্রাণত্যাগ করেন।

ঘালিব অতিশয় রসিক ও গল্প-পটু এবং তাঁহার অনেক সমজদার বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের সহিত পত্র ব্যবহারে তিনি বিশেষ আনন্দানুভব করিতেন। তাঁহার এই চিঠি-পত্রগুলি কবি-অনুভূতির প্রকাশরূপে উর্দু সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠদান হিসাবে চিরদিন গণ্য থাকিবে। তা'ছাড়া তাঁহার কাব্য-শিষ্যদের নিকটও সাহিত্যের রূপ প্রকাশ করিয়া তিনি অনেক চিঠিপত্র লিখিয়াছেন। এই হিসাবে ঘালিব আমাদের রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য। চিঠিপত্রও যে সাহিত্যরূপে গণ্য হইতে পারে তাহা যেমন বাঙ্‌লা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে জানিতে পারি, তেমনি ঘালিব চিঠিপত্রের মাধ্যমে উর্দু সাহিত্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া এক নূতন পথ দেখাইয়াছেন। এতদিন চিঠিপত্র আমাদের নিকট সংবাদ আদান-প্রদানের বাহকরূপেই গণ্য ছিল। কিন্তু খবরের সহিত অন্তরের অনুভূতি এবং মানুষের প্রতি মানুষের দরদ ও সহানুভূতি থাকিলে সেই নিরেট সংবাদও যে রসঘন সাহিত্যে রূপান্তর লাভ করিতে পারে তাহা ঘালিবই সর্বপ্রথম আমাদের উপলব্ধি করাইয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি অতিশয় দরদী ও সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মধ্যে গোঁড়ামির লেশমাত্রও ছিল না। তিনি ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক ও তাঁহার ধর্মের মূলকথা মানবতা।

আর্থিক সচ্ছলতা যদিও ঘালিবের বিশেষ ছিল না, তথাপি বন্ধুবান্ধবের সহিত সকল সময় রসিকতা ও আমোদ আহ্লাদের সহিত সময় কাটাইতেই তিনি বিশেষ আনন্দানুভব করিতেন। তাঁহার যেমন ছিল উদার হৃদয়, তেমনি অন্তরে-বাহিরে তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী। তাঁহার মধ্যে লুকোচুরির কোন বালাই নাই। মানুষ মাত্রেই কোন না কোন দোষ থাকা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। তাঁহার মধ্যেও তেমনি দোষ ছিল, কিন্তু ঘালিব তাহা কখনই লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন না। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন দিলখোলা ব্যক্তি। কথিত আছে, ঘালিবের মদ্যপানের স্বভাব ছিল। তিনি বন্ধুবান্ধবের নিকট ও কাব্য ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহার এই দোষের কথা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে কখনই দ্বিধাবোধ করিতেন না। অকৃত্রিম সরলতার সহিত তাঁহার সকল দোষ অকপটে ব্যক্ত করিলেও ঘালিবের আত্মসম্মান জ্ঞান খুবই ছিল। কবিবরের অধ্যাপকপদ ত্যাগের মধ্যে তাহা ইতিপূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে।

মাত্র ১৩ বৎসরের সময় বিবাহ করিলেও ঘালিবের বিবাহ-বন্ধন বিশেষ সুখের হয় নাই। স্ত্রীর সহিত তাঁহার অন্তরের মিল কখনই হয় নাই। তাহা হইলেও তাঁহার সহিত কলহ বা ঝগড়াঝাঁটি করিয়া সংসারে বাহ্যিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে কবিমন কখনই বিশেষ উৎসাহী ছিল না। তাছাড়া তাঁহার কয়েকটি সন্তান হইয়া শিশুবয়সেই মারা যায়। বস্তুতঃ কবিবরের সাংসারিক জীবন নানাদিক দিয়াই অশান্তিপূর্ণ ছিল। তাঁহার স্ত্রীর ভাগিনের কবি আরিফ্ নামে প্রসিদ্ধ জয়নুল্-আবিদীন্ ঘালিবের সহিতই একত্র বসবাস করিতেন। এবং তিনি কবিবরের অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মৃত্যু তাঁহাকেও কবিবরের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে মোটেই দ্বিধাবোধ করে নাই। এই সকল মানসিক অশান্তি ও আর্থিক অসচ্ছলতা ব্যতীত শারীরিক ব্যাধিতেও তিনি অনেক সময়ই কষ্ট পাইয়াছেন। এই সকল কারণে তাঁহার পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নয় যে মন হইতে এই সকল অশান্তি সাময়িকভাবে দূর করিবার জন্য মদ্যপানের নেশায় মজিয়া থাকিবেন। কবি নিজেই গাহিয়াছেন,

মায় সে গরজ নিশাৎ হায় কিস রোসিয়া কো ;
এক গুনা বেখুদী মুঝে দিনরাৎ চাহিয়ে।

مے سے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو —
اک گونہ بےخودی مجھے دن رات چاہئے

অর্থাৎ, কোন হতভাগা কেবল নেশার জন্যই মদ্যপান করে? আমার যে দিনরাত কোনরূপ আত্ম-বিস্মরণ চাই।

এইদিকে লক্ষ্য করিলে মীর্জা ঘালিবও কবি মীরের ন্যায় দুঃখকষ্টের মধ্যেই জীবনযাপন করিয়াছিলেন। এবং সেইজন্য উভয়ের কাব্যই দুঃখ ও ব্যথাপূর্ণ। তবে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে মীরের কাব্য যেমন হৃদয়কে মুহ্যমান ও হতাশ করিয়া দেয়, ঘালিবের কাব্য সেইরূপ কেবল কান্নার স্বরূপ নহে। ইহা রসমাধুর্যে পূর্ণ শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে প্রকাশলাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ ঘালিবের চরিত্রের প্রধান মাধুর্য ইহাই ছিল যে হাজার দুঃখকষ্টের মধ্যেও তিনি কখনই অবিচলিত হইয়া পড়িতেন না এবং সকল প্রকার অবস্থাকেই তিনি অকুণ্ঠ হৃদয়ে ও লীলাচ্ছলে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মনের এই অবস্থাকে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের ন্যায় কি সুন্দর ও সহজভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন!

রঞ্জ সে খু গর হুয়া ইন্সান তো মিট্ যাতা হায় রঞ্জ্;
মুশ্কিলীন্ ইত্নী পড়ী মুঝ্ পর্ কি আসান্ হো গয়ী।

رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج —
مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں

অর্থাৎ, মানুষ যদি দুঃখকে তাহার স্বভাবগত করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে আর দুঃখ থাকে না ; দুঃখকষ্টের মধ্যে আমি এতই নিমজ্জ ছিলাম যে সকল কষ্টই আমার নিকট সহজ অনুভূত হইত।

সকল প্রকার অবস্থার মধ্যে ঘালিবকে সন্তুষ্টচিত্ত ও রসপিপাসু দেখিয়া তাঁহাকে অনেক সময় রসনাগর বলিতে ইচ্ছা করে। বস্তুতঃ সকল অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যেই তিনি যেমন ছিলেন সন্তুষ্টচিত্ত, তেমনি অন্যের দুঃখ ব্যথাকেও বেশ সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়া হাস্য-লাস্যের মধ্যে সেই ব্যথাকে লাঘব করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার হাস্যরসের অনেক দৃষ্টান্তই মৌলানা হালী তাঁহার 'ইয়াদগারে-ঘালিবে' সংযোজনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার স্ত্রীকে লিখিত একটি চিঠিতে রহিয়াছে, এক উপর পচাস্ বরস্ সে জো ফাঁসী কা ফন্দা গলে মেঁ পড়া হৈ—তো নহ ফন্দা হী টূট্তা হৈ নহ দম্ হী নিকল্তা হৈ। অর্থাৎ, একপঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তো ফাঁসের ফাঁদ গলায় পরিয়া আছি—এই ফাঁদও ছিঁড়ে না, আমার প্রাণও বাহির হয় না।

ঘালিব উর্দু সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী সকল কবিই ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ফারসী ভাষায়ও অনেক কবিতা লিখিয়াছেন এবং তিনি নিজে মনে করিতেন যে তাঁহার ফারসী কবিতা তাঁহার উর্দু কবিতা হইতে আরো গভীর ভাব-সমৃদ্ধ। আর তিনি বিশেষ করিয়া তাঁহার প্রথম জীবনে ফারসী কাব্যসাধনাকেই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন এবং উর্দু সাহিত্যের চর্চাকে অনেকটা তাঁহার অবসরবিনোদনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবি নিজেই তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

ফার্সী বীন্ তা বদানী কান্দর্ ইক্লিমে-খিয়াল্ ;
মানী ওআর্ জঙ্গম্ ও আন্ নুস্খা আজ্ নঙ্গে-মন্ অস্ত্।

فارسی بین تا بدانی کاندر اقلیم خیال —
مانی وار ژنگم و آن نسخهٔ از ننگ من است

অর্থাৎ, আমার ফার্সী কাব্য লক্ষ্য কর, তাহা হইলেই কল্পনা-রাজ্যে আমার সুরসাধনার প্রচেষ্টা বুঝিতে পারিবে এবং এই (উর্দু-) কাব্য আমার অখ্যাতিরই পরিচায়ক।

কিন্তু কবি তাঁহার অবসরের সামগ্রী ও বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ উপরোধে ইহার চর্চা করিলেও, শেষ পর্যন্ত উর্দু কাব্যের জন্যই তিনি পৃথিবীবিখ্যাত হইয়াছেন।

ঘালিব একজন দার্শনিক কবি হইলেও তাঁহার ছন্দজ্ঞান ছিল অসীম। সাধারণ কবিদের ন্যায় তিনি কখনও ছন্দ মিলাইয়া কবিতা লিখিতেন না। তাঁহার কবিতার ভাব-অনুযায়ী ছন্দ এবং সেই তালে কাব্যের সুর প্রতিধ্বনিত হইত। সেইজন্যই বিজনূরী সাহেব তাঁহার কাব্যের প্রত্যেক শ্লোককে 'তারে-রিবাব্' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তথাপি কেহ কেহ তাঁহার এই অপূর্ব সুর সাধনার প্রতি বক্রদৃষ্টি করিতেও ইতস্তত করেন নাই এবং তাঁহার কাব্যে অনেক ছন্দঃপাত ও তাঁহার শব্দচয়ন ব্যাকরণ দোষে দুষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাঁহার কাব্যের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীখ্যাত কবিগণ কখনই ভাষার 'পাবন্দী' ছিলেন না, বরং ভাষাই তাঁহাদের চিন্তা-ধারানুযায়ী নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই সম্বন্ধে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবি-গণের সহিত তুলনা করিয়া ডক্টর বিজ্‌নূরী তাঁহাকে 'পয়গম্বরে-সুখুন্' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর ঘালিবের এই ত্রুটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া কি সুন্দরভাবে আমাদের কৃতী সমালোচক লিখিয়াছেন, ঘালিব কী শায়রী কে জিস্ম্ পর জবান কা জামা ইসী উজা সে তঙ্গ হায়। ইহান্ তক্ কি বাজ্ জাগা সে চাক্ হো গিয়া হায় আওর উরিয়ান্ বদন্ অন্দর সে নজর আতা হায়।

غالب کی شاعری کے جسم پر زبان کا جامہ اسی وجہ سے تنگ ہے ۔ یہاں تک کہ بعض جگہ سے چاک ہو گیا ہے اور عریاں بدن اندر سے نظر آتا ہے —

অর্থাৎ, ঘালিবের কাব্য-শরীরের পরিচ্ছদ এই কারণেই আঁটা হইয়াছে। এমন কি স্থানে স্থানে ইহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং নগ্ন শরীর বাহির হইতে দৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

বস্তুতঃ দার্শনিক গূঢ় তত্ত্বসকল বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া শব্দ ও ছন্দঃ-পরিচ্ছদের অকুলান হইয়া গিয়াছে বলিয়াই তাঁহাকে সময় সময় এইরূপ অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। কবিবর নিজেই এই সম্বন্ধে গাহিয়াছেন,

মুশ্‌কিল্ হৈ জি বস্ কলাম্ মেরা আয় দিল্ ;
সুন্ সুন্ কে উসে সুখুন্-উআরানে-কামিল্।

আসান্ কহনে কী করতে হৈঁ ফর্মায়িশ্ ,
গোয়িম্ মুশ্কিল্ ও গর্নিহ গোয়িম্ মুশকিল্ ।

مشکل ہے ز بس کلام میرا اے دل —
سن سن کے اسے سخنوران کامل
آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمایش —
گویم مشکل و گرنہ گویم مشکل

অর্থাৎ, হে দিল, অনেক কাব্য-বিশারদই আমার কাব্যকথা শুনিয়া ইহা কঠিন হইয়াছে বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে সরল ও সাধারণ ভাবে ব্যক্ত করিতে আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমার এইরূপ কঠিনভাবে ব্যক্ত করা ছাড়া যে আর উপায় নাই।

ঘালিব নিম্নলিখিত কাব্য ও গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন :—

(১) উদে-হিন্দী ; (২) উর্দূয়ে-মুআল্লা, (৩) কুল্লিয়াতে-নজমে-ফার্সী ; (৪) কুল্লিয়াতে-নসরে-ফার্সী ; (৫) দেওয়ানে-উর্দু ; (৬) লতায়িফে-ঘয়বী ; (৭) তেঘে-তেজ ; (৮) কাত্বি-বুর্হান্ ; (৯) পঞ্জ্-আহন্গ্ ; (১০) নামায়ে-ঘালিব্ ; (১১) মিহরে-নীম্রূজ্ ; (১২) দস্তম্বূ ; এবং (১৩) শব্দ্-চীন্।

উদে-হিন্দী ও উর্দূয়ে-মুয়াল্লা তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের নিকট লিখিত পত্রাদির সঙ্কলন। এই দুইটিই ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। উদে-হিন্দীতে চিঠিপত্র ছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার লিখিত 'ভূমিকা' (দীবাচা) ও সমালোচনা বা রিভিউ (তক্রীজহ)-ও সংযুক্ত হইয়াছে।

লতায়িফে-ঘায়বী ঘালিবের নানা বিষয়ের সমালোচনা বা মুবাহিসা। তিনি এই সকল রসপূর্ণ সমলোচনামূলক রচনা তাঁহার সাইফুল্-হক্ ছদ্মনামে প্রকাশিত করিয়াছেন।

তেঘে-তেজ ও নামায়ে-ঘালিব-ও এইরূপ রসপূর্ণ রচনা। ঘালিব এই দুইটি সমালোচনা-গ্রন্থ তাঁহার লিখিত কাত্বি-বুর্হানের সমর্থনে লিখিয়াছেন। পঞ্জ্-আহঙ্ তাঁহার ফারসী রসপূর্ণ রচনার কয়েকটি নিদর্শন।

কুল্লিয়াতে-নজমে-ফারসীতে তাঁহার বিভিন্ন ফারসী কবিতা, যথা, ক্বাসীদা, ঘজল, কিত্বা, মসনবী, রুবায়ী প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মিহরে-নীমরূজ্ একটি ইতিহাস গ্রন্থ। ইহাতে ঘালিব আমীর তয়মূর হইতে হুমায়ুন পর্যন্ত তয়মূরিয় সম্রাটদের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ঘালিবের এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে ইহারই পরিশিষ্টরূপে মাহে-নীম্মাহ নামক গ্রন্থে

সম্রাট আকবর হইতে বহাদুর শা পর্যন্ত সম্রাটদের জীবনকাহিনী সন্নিবিষ্ট করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইতিমধ্যে সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায় তাঁহার এই কাজে আর অগ্রসর হইবার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। দস্তম্বু-তে ঘালিব সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ঘটিত কাহিনীর বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে হইতে ১লা জুলাই পর্যন্ত সময়ের ঘটনাসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দিল্লী-ধ্বংসের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজ জীবনের কাহিনীও ইহাতে কিছুটা স্থানলাভ করিয়াছে।

কাত্বি-বুর্হান প্রসিদ্ধ ফারসী অভিধান বুর্হান্-কাত্বি-র একটি রসপূর্ণ সমালোচনা সাহিত্য। ইহাকে আরো রসঘন করিয়া পরবর্তী বৎসর দরফ্শে-কাবীয়ানী নামক আর একটি রস-সাহিত্য রচনা করেন। ইহার বিদ্রূপ করিয়া কলিকাতা হইতে মীর্জা আহমদ বেগ 'মুঅয়্যিদ্-অল্-বুর্হান্' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ইহারই প্রত্যুত্তরে 'তেঘে-তেজ' রচিত হয়। আর সেইরূপ সাত্বি-বুর্হানের প্রত্যুত্তরে নামায়ে-ঘালিব রচিত হইয়াছিল।

যদিও মীর্জা ঘালিব উর্দু কবিতাকে তাঁহার অবসর-বিনোদনের উপায়-স্বরূপ মাত্রেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ও তিনি নিজে তাঁহার ফারসী কবিতাকেই তাঁহার কবিত্বের প্রতীকরূপে উপস্থাপিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে উর্দু কাব্য লিখিয়াই তিনি বিশ্ব-বরেণ্য হইয়াছেন। আর তাঁহার উর্দু-দেওয়ানে বয়ৎ বা দ্বি-পঙ্ক্তির সংখ্যা ন্যূনাধিক ১৮শত মাত্র হইলেও ইহাই উর্দু-সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট অমূল্য রত্নভাণ্ডার।

ঘালিবের উর্দু-কাব্যকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম পর্যায়ে কবিজীবনের সূচনা হইতে তাঁহার ২৫ বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত সময়কে গ্রহণ করা হয়। এই পর্যায়ের কবিতাসমূহে ফারসী শব্দ ও বাগ্ধারার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। তিনি এই সময়ে মির্জা আব্দুল্-কাদির বেদিল-কেই বিশেষ করিয়া অনুসরণ করিয়াছেন। কবিবর নিজেও গাহিয়া গিয়াছেন,

> মুঝে রাহে্-সুখুন্ মেঁ খৌফে-ঘম্রাহী নহীঁ ঘালিব ;
> ইসায়ে-খিজরে-সহরায়ে-সুখুন্ হৈ খামা বেদিল্ কা।
>
> مجھے راہ سخن میں خوف گمراہی نہیں غالب —
> عصائے خضر صحرائے سخن ہے خامہ بیدل کا

অর্থাৎ, হে ঘালিব, কাব্য-পথে আমার পথভুলের কোন ভয় নাই ; বেদিলের লেখনীই আমার কাব্য-প্রান্তরের খিজির-যষ্টিস্বরূপ।

বেদিলের কাব্য-ধারার ন্যায় ঘালিবের এই সময়কার কাব্যসমূহেও দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি সহজ কথাকেও ফারসী চিন্তাধারানুযায়ী ফারসী অলঙ্কারপূর্ণ আড়ম্বরযুক্ত শব্দার্থময় বাক্যে বিভূষিত করিয়াছেন। সময় সময় গভীর চিন্তাধারার উল্লেখ থাকিলেও, এই সকল প্রয়োগ আড়ম্বরদোষে দুষ্ট হইয়া এই সময়কার কাব্য সহজ ও সচ্ছল কাব্য-রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই—যাহা পরবর্তী যুগের কাব্যসমূহে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। সংক্ষেপে এই যুগে তাঁহার কবিত্ব হইতে পাণ্ডিত্যই বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঘালিবের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যসমূহ আরো সহজ ও সচ্ছল গতিবেগ লাভ করিয়া কতকটা কাব্যরসাশ্রিত হইয়াছে। পাণ্ডিত্যের আমেজ তখনও তিনি ছাড়িতে পারেন নাই, তাই তাহাতে ফারসী কাব্যানুযায়ী অলঙ্কার-সমূহের প্রয়োগ তিনি যথেষ্টই করিয়াছেন। তাসত্ত্বেও এইসব অলঙ্কারের প্রাচুর্যের মধ্যেও রসসিক্ত অনুভূতিসমূহ যখন প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সহজেই কোন কাব্য-রসিককে অভিভূত করে।

তৃতীয় পর্যায়েই গভীর অনুভূতিপূর্ণ ও রসমণ্ডিত ঘালিবের কাব্যসমূহ সহজ, সরল ও স্বচ্ছ গতিবেগ ধারণ করিয়া পূর্ণমাত্রায় সফলতা লাভ করিয়াছে। এই সময়ের কাব্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা যাইতে পারে যে ঘালিব কেবল উর্দু সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন প্রধানতম বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই পর্যায়েই মহান কাব্যের প্রধান প্রধান গুণ তাঁহার কাব্যে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যাদির ন্যায় ঘালিব-কাব্যের প্রধান ও প্রথম গুণ কবির নিজস্ব কবি-মানস ও আপন ব্যক্তিত্ব। এই নিজস্ব কবি-মানস ও আপন ব্যক্তিত্বই তাঁহার চিন্তাধারা, প্রকাশভঙ্গি এবং শব্দ ও অলঙ্কারের প্রয়োগে একটা বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে ইহাই একটা প্রধান গুণ যে তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব অনুভূতি সমূহ এরূপ সহজ, সরলভাবে অভিব্যক্ত করেন যে তাঁহাদের নিকট হইতে যাহাই শুনা যায়—কি শব্দ, কি অর্থ—তাহাই নূতন ও রসসিক্ত বলিয়া অনুভূত হয়। ঘালিবের কাব্য কেবল ছন্দের কারসাজী নহে, তাহা ভাবের সহিত ছন্দের সমন্বয়ে রসঘন হইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কবি নিজেও গাহিয়াছেন,

ঘালিব্ ন-বুর্‌দ্ শীরহ-ই-মন্ কাফিয়হ-বন্দী;
জুলুমে অস্ত্ কি বর্ কিল্‌ক্ ব ওরক মীকুনম্ ইম্‌শব্।

অর্থাৎ, হে ঘালিব, আমার কবিপ্রকৃতি ছন্দানুগামী নহে ; (এইরূপ হইলে) আজ রাত্রের লেখনী ও লেখার উপর আমার অত্যাচার করা হইবে।

ঘালিবের দ্বিতীয় কাব্য-বৈশিষ্ট্য তাঁহার অসাধারণত্ব। এই অসাধারণত্ব তাঁহার চালচলন, স্বভাব-প্রকৃতি, চিন্তাধারা ও প্রেমাকর্ষণ প্রভৃতি সব কিছুতেই লক্ষিত হয়। সর্ববিষয়েই একটা নূতনত্ব ও অসাধারণত্ব প্রকাশ করাই যেন তাঁহার একটি বিশেষ প্রকৃতি। প্রেমের প্রকাশেও তিনি বিশেষ একটি নূতনত্বের স্বাদ পাইতেই যেন ব্যাকুল। ঘালিব গাহিয়াছেন,

কিয়া আব্রুয়ে-ইশ্‌ক জহান্ আম্ হো জফা ;
ডরতা হুঁ তুম্‌কো বে-সবব্ আজার্ দেখ কর্।

کیا آبروئے عشق جہاں عام ہو جفا —
ڈرتا ہوں تم کو بے سبب آزار دیکھ کر

অনুভূতির সহজ ও স্বচ্ছ অভিব্যক্তি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের ন্যায় ঘালিবেরও আর একটি প্রধান গুণ। বস্তুতঃ প্রকৃতি ও মানবমনের প্রতিটি রূপ তিনি সুর ও ব্যঞ্জনার সহিত অভিব্যক্ত করিয়াছেন। মানবজীবনের সুখদুঃখ, আশানিরাশা এবং সাফল্য-অসফলতার মধ্যে দিয়া যে সকল অনুভূতি তিনি লাভ করিয়াছেন, তাহারই প্রকৃষ্ট রূপটি তিনি অনুভূতিপূর্ণ, রসিক পাঠকদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদেরই জীবন-কাহিনীর একটি কাব্যিক রূপ ঘালিব-কাব্যে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের অন্তরের কবি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বের বরমাল্য তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়াছেন।

ঘালিবের যেমন ছিল অন্তরের অনুভূতি, তেমনি তাঁহার মধ্যে পাই মানবসমাজের প্রতি সহৃদয়তা ও আন্তরিক সহানুভূতি। কবি যেমন দুঃখপূর্ণ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, তেমনি তাঁহার কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে মানব মনের সূক্ষ্ম দুঃখ-ব্যথা, নিরাশ ও ছলনার অভিব্যক্তি। বিশ্বপ্রেমিক কবি অনেক সময়েই এই সকল দুঃখব্যথার রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন ; আবার সময় সময় ইহা উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম না হইয়া ব্যথিত চিত্তে মানব সমাজের সম্মুখেই তাঁহার অকৃতকার্যতার প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা সহজেই দরদী পাঠককে ব্যথিত ও অশ্রুসিক্ত করে। তাঁহার ২।১টি বয়ৎ হইতে ইহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। তিনি লিখিয়াছেন,

দিল্ হী তো হায় ন সঙ্ ও খিশ্‌ত্ দর্দ্ সে ভর্ ন আয়ে কিয়োন্ ;
রোয়েঙ্গে হম্ হাজার বার্ কোয়ী হমীন্ সতায়ে কিয়োন্।

دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں —
روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں

অর্থাৎ, সবারই তো হৃদয় আছে, কেহই তো আর ইট বা পাথর নয়—তাহা হইলে তাহারা কেন দুঃখে ব্যথিত হয় না? শতসহস্রবার অশ্রুবর্ষণের পরেও সেই অত্যাচারই আবার্ কেন?

আবার,

কফস্ মেঁ মুঝ্ সে রুদাদে-চমন্ কহতে ন ডর্ হমদম্;
গিরী হৈ জিস্ পহ কল্ বিজ্লী উও মেরা আশীয়ান্ কিয়োন্ হো?

অর্থাৎ, আমার (দেহরূপ) খাঁচা হইতে (আত্মারূপ) উদ্যানের প্রতিভূ বারবার বলিতেছে, 'ভয় নাই'। কিন্তু কাল যেখানে বজ্রপাত হইয়াছে, সেখানে কিরূপে বাসা তৈয়ার করা যাইতে পারে?

এই সকল স্থানে ঘালিব সাধারণভাবে জীবন-রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে না পারিলেও, একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব যে তিনি বস্তুতঃ দ্বার খুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। কারণ তিনি যে একজন মহান দার্শনিক কবি। এবং তাঁহার এই সূক্ষ্ম দর্শানুভূতির জন্যই বিশ্বসাহিত্যে তাঁহার এত সুখ্যাতি। তাঁহার সম্বন্ধে উর্দু সাহিত্যের কৃতী সমালোচক ডক্টর আব্দুর রহমান্ বিজনূরী লিখিয়াছেন, 'ভারতের ধর্মগ্রন্থ মধ্যে দুইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের একটি পবিত্র বেদ ও অন্যটি ঘালিবের দেওয়ান বা কাব্যগ্রন্থ।' ইহা কতকটা অতিশয়োক্তি হইলেও ইহা হইতে উর্দু শিক্ষিত সমাজে ঘালিবের স্থান যে কত উচ্চে, তাহা অনেকটা ধারণা করা যায়।

ঘালিব ছিলেন একজন খাঁটি দার্শনিক এবং তাঁহার মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামির লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না। তিনি নিজেই গাহিয়াছেন, আমি একজন একেশ্বরবাদী; ধর্মের গোঁড়ামি-বর্জনই আমার ধর্ম। যখন বিভিন্ন ধর্মের বালাই মিটিয়া যায়, তখনই খাটি ধর্ম, বিশ্বাস বা ভক্তির বিকাশ হয়।

হম্ মুরঃহিদ্ হৈঁ হমারা কেশ্ হৈ তর্কে-রসূম্;
মিল্লতীন্ যব্ মিট গয়ীঁ 'ইজ্জয়ে-ঈমান্ হোগয়ীঁ।

ঘালিব কেবল এই খাঁটি ধর্মের রূপ গাহিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না, ইহা তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত করিতেও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ধর্মের সকল গোঁড়ামির বাহিরে ছিলেন এবং তাঁহার ধর্মাদর্শ অতি উচ্চস্তরে অবস্থিত ছিল। তাঁহার মতে, "আমার ভক্তির পাত্র মানসিক চিন্তা

বা ধারণার অতীত। জ্ঞানী ব্যক্তি মন্দিরকে দেবস্থানের প্রতীকমাত্র মনে করিয়া থাকে।

হৈ পরে সর্‌হদ্দে-ইদ্‌রক্‌ সে অপ্‌না মস্‌জূদ্‌ ;
ক্বিব্‌লহ কো অহ্‌লে-নজর্‌ ক্বিব্‌লা-নুমা কহতে হৈ।"

কোরানে স্বর্গের বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে সকল পার্থিব সুখসম্পদের কথা বলা হইয়াছে, তাহাকে ঘালিব স্বর্গের প্রকৃত সুখের প্রতীকমাত্র মনে করিয়া থাকেন। তিনি কখনই মনে করিতে পারেন না যে, কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তিই স্বর্গের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই তিনি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "হে ঘালিব, স্বর্গ বস্তুতঃ কি তাহা আমরা জানি, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রীত্যর্থে এইসব বর্ণনা ঠিকই হইয়াছে। ......কারণ ভক্তিশ্রদ্ধা বা প্রীতিভালবাসার মধ্যে যদি মদ্যাদির আকর্ষণ থাকে, তাহা হইলে এইরূপ স্বর্গকে নরকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও।

হম্‌কো ম'আলূম হৈ জিন্নৎ কী হকীকৎ লিকন্‌ ;
দিল্‌কে খুশ্‌ রখ্‌নে কো ঘালিব্‌ ইয় খিয়াল্‌ অচ্ছা হৈ।
ত্বা'এৎ মেঁ তা রহেঁ ময় ও অঙ্গবীন্‌ কী লাগ্‌ ;
দূজখ্‌ মেঁ ডাল্‌দে কোয়ী লে কর্‌ বেহিশ্‌ত্‌ কো।

বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণলীলা-বর্ণনায় মিলন হইতে বিরহকেই প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের বিরহ-বর্ণনায় যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন, এইরূপ মিলন-বর্ণনায় পারেন নাই। তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে বিরহই মানবের অন্তর বিকাশের পরশপাথর এবং এই বিরহের সুরই মানবজীবনে আবহমানকাল হইতে ধ্বনিত হইতেছে। তাই বিখ্যাত সুফী কবি মৌলানা রূমী তাঁহার মসনবীর প্রারম্ভেই গাহিয়াছেন, 'শোন, বাঁশী কি কাহিনী বর্ণনা করিতেছে—ইহা যেন বিরহের ক্রন্দন করিতেছে।'

বশ্‌নো অজ্‌ নঈ চি হিকায়েৎ মী কুনদ্‌ ;
অজ্‌ জুদায়িহা শিকায়েৎ মী কুনদ্‌।

সৃষ্টির প্রথম হইতে বিরহের সুর ধ্বনিত। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর মধ্যেও তো এই বিরহের ধ্বনিই আবহমানকাল হইতে শব্দিত। ইহা এত মনোমোহন বলিয়াই ইহার নাম মোহন বাঁশী।

আমাদের দরদী কবি ঘালিবও চণ্ডীদাস বা মৌলানা রূমীর ন্যায় জীবনকে বিরহের পুঞ্জীভূত বিরাট সত্তা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জীবন দুঃখ কষ্টে পরিপূর্ণ এবং এই দুঃখের অনুভূতি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী

থাকিবেই। এই দুঃখব্যথা জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইহা সঠিক জানিতেন বলিয়াই সকল ব্যথাই সহ্য করিবার শক্তি ঘালিব অর্জন করিয়াছিলেন। কি অপূর্ব তাঁহার মানবজীবন রহস্যের প্রকাশন!—জীবন কারাবাস ও দুঃখবন্ধন উভয়ই মূলতঃ এক। মৃত্যুর পূর্বে মানুষ কেমন করিয়া দুঃখকষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে?

> ক়য়দে-ঃহয়াৎ ও বন্দে-ঘম্ অস্বল্ মেঁ দুনোঁ এক্ হৈঁ ;
> মৌৎ সে পহলে আদ্মী ঘম্ সে নজাৎ পায়ে কিয়োন্।

এই দুঃখ কেবল গরীব-দুঃখীই ভোগ করে না, ধনীরাও করিয়া থাকে। বস্তুতঃ এই জীবনটা কি? ইহা জীবনাদর্শের প্রতি নিয়ত ধাবমান প্রবাহ। এই চলার পথ সকল সময়েই কণ্টক-পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে যে সময়টুকুতে মিলনসুখ অনুভূত হয়, ইহা আদর্শের ক্ষণিক আস্বাদ মাত্র। এই ক্ষণ-আস্বাদ লাভেই যে সন্তুষ্ট তাহার আর আত্মোন্নতির আশা নাই। তাছাড়া আত্মোন্নতির পথ কখনই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না—ইহা সীমাবদ্ধ হইলে, জীবনস্রোত যে আবার ক্লেদ ও পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। তাই ঘালিব নিজকে সম্বোধন করিয়া গাহিয়াছেন, হে অসদ্, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই পার্থিব দুঃখ হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইতে পার?—রাত্রির আলো ভোর না হওয়া পর্যন্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়া জলিতেই থাকিবে।

> ঘমে-হস্তী কা অসদ্ কিস্ সে হো জুজ্ মর্গ্ 'ইলাজ্ ;
> শম' হর্ রঙ্গ্ মেঁ জল্তী হৈ সঃহর্ হোনে তক্।

পরম সত্তার মধ্যে কোন সুখদুঃখের অনুভূতি নাই। মানবাত্মা যখনই নিজকে তাহার পরম সত্তা হইতে পৃথক মনে করে এবং এই ভাবে নিজকে সীমাবদ্ধ করিয়া প্রবৃত্তির পুঞ্জীভূত সত্তা হইয়া দাঁড়ায়, তখনই মানবসৃষ্টির পত্তন হয়; জীবন-ধারণই দুঃখকষ্টের মূলীভূত কারণ জানিয়াই ঘালিব দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে যদি জন্মলাভ না হইত তাহা হইলে তো আর তাঁহাকে সসীমতার জালা ভোগ করিতে হইত না এবং পরমসত্তা ভগবান হইতেও তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। তাই বীতশ্রদ্ধ ঘালিব সৃষ্টির স্বরূপ প্রকাশার্থে গাহিয়াছেন, যখন আমি কিছু ছিলাম না, তখন ভগবান ছিলাম। আর যদি কিছু না হইতাম তাহা হইলে ভগবানই থাকিতাম। পৃথক অস্তিত্ববশতঃ আমি ধ্বংসোন্মুখ। যদি ইহা না হইত, তাহা হইলে কি আর দোষের হইত?

ন থা কুছ্ তো খুদা থা ন হোতা তো খুদা হোতা ;
ডুবোইয়া মুঝকো হোনে নে ন হোতা তো কিয়া হোতা।

এই সৃষ্টির যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি দুঃখকষ্টের উর্দ্ধে উঠিয়া ভারত-ঋষিদের ন্যায় সুখ-দুঃখের অসারতা উপলব্ধি পূর্বক মনের আনন্দে গাহিয়াছেন, স্বপ্নে আমার তোমার খেলা চলিয়াছে—যখন চক্ষু খুলিয়া গেল, তখন দেখিতে পাইলাম যে আমার কোন লাভও হয় নাই, ক্ষতিও হয় নাই।

থা খ্বাব্ মেঁ খিয়াল্ কো তুঝ্ সে মু'আমল্ ;
জব্ আখ্ খুল্ গয়ী ন জিয়ান্ থা ন সূদ্ থা।

এই পার্থিব জীবন বস্তুতঃ স্বপ্নের বিলাস। ইহার সুখদুঃখকে স্বপ্নবৎই মনে করা উচিত।

ঘালিব স্রষ্টা ও সৃষ্টির সন্ধিতে বিশ্বাসী। তিনি স্রষ্টাকে সৃষ্ট জীব হইতে কখনই পৃথক মনে করিতে পারেন না। সৃষ্টিরহস্য তাঁহার নিকট স্রষ্টারই প্রকাশ মাত্র। তাই তিনি গাহিয়াছেন, এই পৃথিবী সেই একক প্রেমিকের সৌন্দর্যের বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নহে—আমরা কোথায় থাকিতাম, যদি সেই সৌন্দর্য স্বয়ং প্রকাশ না হইত।

দহর্ জুঙ্ক্ জলুয়হ-ই-একতায়ে-ম'অশূক্ নহীন্ ;
হম্ কহাঁ হোতে অগর্ হুসন্ ন হোতা খুদ্‌বীন্।

এই জগৎ সৌন্দর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই সৌন্দর্য তাঁহার আত্মপ্রকাশ চায়। এইজন্যই সেই অনাদি-অনন্তের বিকাশ জগতের মধ্য দিয়া স্থিতিলাভ করিয়াছে। এই পৃথিবী যেন একটি দর্পণ এবং ইহার মধ্যে সেই পরম-সৌন্দর্যের বিকাশ প্রতিফলিত হইয়াছে। এই ভাবধারাকে ফারসী সুফী কবিদের অনেকেই বিবৃত করিয়াছেন। আমাদের ঘালিবও ইহার বর্ণনায় বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছেন।

এই ভগবৎ-পথের পথিক (সালিকে-রাহ) আত্মবিকাশের পথকে হিন্দুবিজ্ঞানীদের সত্য, তপঃ ইত্যাদি সপ্তলোক বা ফারসী সুফীদের নাসূৎ, মলকুৎ, জবরূৎ প্রভৃতি হফৎ-আলম্ (সপ্তলোক) বা সাত উন্নত মার্গের অবস্থায় বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার প্রথম মার্গের অবস্থা সম্বন্ধে ঘালিব বলিয়াছেন, তোমার দৃষ্টিমধ্যে শত সৌন্দর্য প্রকাশলাভ করিয়াছে—আমার শক্তি কোথায় যে এই সৌন্দর্যের বর্ণনা করি?

খুদ্ জলুঅহ রুবরু হৈ জো মজ্‌গান উঠায়ে ;
ত্বাকৎ কহান্ কি দীদ্ কা ইঃহসান্ উঠায়ে।

পার্থিব সত্তার নিজের কোন অস্তিত্ব বা সজীবতা নাই। যাহা এই প্রাণহীন বস্তুকে সজীবতা দান করে তাহাকে প্রকৃতি বা হর্‌কৎ বলে। কিন্তু এই 'প্রকৃতি' যে পর্যন্ত না কোন নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়া 'শিব'-এর সহিত মিলিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই দেখিতে পাই সৃষ্টির মূলভিত্তি সেই শিবশক্তি পৃথিবীকে প্রাণদান করিয়াছে। সেই শিব-শক্তিকে সম্বোধন করিয়া কবিবর গাহিয়াছেন, তোমার ইচ্ছায়ই এই বিশ্বের প্রকাশ—তোমার আলোতেই সূর্যের প্রতিকণায় সজীবতা রহিয়াছে।

হৈ কায়নাৎ কো ঃহর্‌কৎ তেরে ধৌক্ সে ;
পরতূ সে আফ্‌তাব্ কে ধরহ (জরহ) মেঁ জান্ হৈ।

ভগবৎ-পথের পথিক তাঁহার এই প্রথম স্তরে সকল জিনিষের মধ্যে ভগবৎ-শক্তি বা সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিতে পায়। তাই সে বলিতে পারে, "তোমার সকল সৃষ্টির মধ্যে তোমারই সৌন্দর্যের বিকাশ ; তাই প্রতি ধূলিকণা সূর্যালোকের মধ্য দিয়াই বিকাশলাভ করে।"

হৈ তজল্লী তেরে সামানে-উঅজূদ্ ;
জরহ বে-পরতবে-খূরশীদ্ নহীঁ।

যতই সে আলমে-নাসূৎ হইতে আরম্ভ করিয়া আলমে-জবরূৎ ও লাহূৎ ইত্যাদি স্তরের মধ্য দিয়া ভগবৎ-শক্তি বা সৌন্দর্যের ক্রমবর্ধমান বিকাশ দেখিতে পায়, ততই সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। তখন তাহার মনে জাগে, 'যদি তোমার ছাড়া আর কাহারো অস্তিত্ব নাই, তাহা হইলে হে হরি, এই বিশ্বসৃষ্টি কি জন্য ?'

যব কে তুঝ্ বিন্ কোয়ী নহীঁ মৌজূদ্ ;
ফির্ ইয় হঙ্গামহ অয় খুদা কিয়া হৈ।

বস্তুতঃ এই পথের অনেক পথিকই এখানে আসিয়াই থামিয়া যায়—এই সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু ঘালিব এই বিমুগ্ধতা, এই বিহ্বলতা হইতে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারেন—"ভাবের পূজারী একের মধ্যে বহুর প্রকাশ দেখিতে পায় ; এই ভাবের মূর্তিসকল আমাকে কাফির করিয়া দিয়াছে।"

কস্‌রৎ আরায়ি উঅঃহদৎ হৈ পরস্তারিয়ে-উঅহম্ ;
কর্ দিয়া কাফির ইন্ ইস্ন্‌নামে-উঅহম্ মুঝে।

বস্তুতঃ সেই একই কেবল স্থিতিশীল, আর কাহারো অস্তিত্ব নাই। নানা চিন্তাধারার বশবর্তী হইয়া আমরা একের মধ্যে বহুর প্রকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু যখন ভগবৎ-প্রেমিক সেই পরমসত্যকে উপলব্ধি করেন, তখন বুঝিতে পারেন যে, আমি তুমি সব সেই একের মধ্যে মিলিত হইয়া গিয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন, জলবিন্দু যখন সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, তখন সে সমুদ্রে পরিবর্তিত হইয়া যায়—উদ্দেশ্য তখনই সার্থক, যখন পরিসমাপ্তি সার্থক হয়।

কত্‌রহ দরিয়া মেঁ যো মিল্ যায়ে তো দরিয়া হো যায়ে ;
কাম্ অচ্ছা হৈ উথ যিস্ কা কি মাল্ অচ্ছা হৈ।

এই ভাবের বশবর্তী হইয়াই প্রসিদ্ধ সুফী মনসুর বলিতে পারিয়াছিলেন, অনাল্-ঃহক্ (আমিই ভগবান)। তাই ঘালিবও ভারতের অন্যতম সুফী-সাধক সরমদের ন্যায় বলিতে পারিয়াছেন, জল্লাদ হইতে ভয় পাইয়া থাকে, যদিও ধর্মপ্রচারকের সহিত কোন ঝগড়া করে না। কিন্তু তিনি যে বেশেই আসুন না কেন আমরা তাঁহাকে বুঝিয়া নিয়াছি।

জল্লাদ্ সে ডর্‌তে হৈঁ ন ওআ'অজ্ সে ঝগড়তে ;
হম্ সমঝে হুয়ে হৈঁ যিস্ ভেশ্ মেঁ যো আয়ে।

ডক্টর বিজ্ঞানূরীর মতে ঘালিবের প্রেমিকা প্রবৃত্তির সকল তাড়নার ঊর্দ্ধে অবস্থিতা নারী নহেন, তিনি ফারসী সুফীদের জুলেখা। কিন্তু প্রেমিক সেই সুফীদের ইউসুফ্ নহেন, যাঁহার মধ্যে চঞ্চলতার কোন প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না, তিনি হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার প্রেমিক একজন বিদগ্ধ পুরুষ। তিনি প্রেমের সকল লীলাই অবগত আছেন। এবং তাঁহার মনোমোহনরূপ ভক্তকে পার্থিব আকর্ষণ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহার বিশ্বাকর্ষণী রূপের প্রতি প্রলুব্ধ করে। ঘালিব সেই প্রেমিকের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, যে পর্যন্ত না আমি বন্ধুর দেহ-গড়ন সৌন্দর্যের জগতের প্রতি বিশ্বাস করিয়াছিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তির ঝঞ্চাটের প্রতি বিশ্বাসী হই নাই।

যব্ তক্ কি ন দেখা থা কদ্দে-ইয়ার্ কা 'আলম্ ;
মৈঁ মুতকদ্দে-ফিৎনহ-ই-মহশর্ ন হুয়া থা।

ঘালিবের প্রেমাদর্শের পরিসীমা নাই। ইহাতে সকল সময়ের জন্য মিলনাকাঙ্ক্ষা রহিয়া গিয়াছে। কবির মতে প্রেমাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি বা প্রেমিক প্রেমিকার মিলন কামনা-বাসনার বশীভূত প্রেমের নামান্তরমাত্র। তাই আমরা দেখিতে পাই রাধার বিরহের সমাপ্তি নাই। এইখানেই রাধার

প্রেম সার্থক। ঘালিবও সেই প্রেমাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই গাহিয়াছেন, বন্ধুর সহিত মিলন হইবে—এইরূপ ভাগ্য আমাদের কখনই হয় নাই। যদি আরো বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলেও সেই মিলনের আশাই কেবল থাকিয়া যাইবে।

ইয় ন থী হমারী কিস্‌মৎ কি ওঅস্বালে-ইয়ার্‌ হোতা ;
অগর্‌ আওর জীতে রহ্‌তে এহী ইন্তিজার্‌ হোতা।

ঘালিবের ছোট ছোট উপদেশপূর্ণ ঘজল রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'-র কথা স্মরণ করাইয়া দেয় :

ন সুনো গর্‌ বুরা কহে কোয়ী ;
ন কহো গর্‌ বুরা করে কোয়ী।
রুক্‌লো গর্‌ ঘলত্ব্‌ চলে কোয়ী ;
বখ্‌শ্‌দো গর্‌ খত্বা করে কোয়ী।

হাঁ ভলা কর্‌ তেরা ভলা হোগা ;
অওর্‌ দর্‌বেশ্‌ কী স্বদা কিয়া হৈ।

বস্তুতঃ তাঁহার অন্তরের অনুভূতির গভীরতা ছিল বলিয়াই ঘালিব দার্শনিক তত্ত্বসমূহও অতি সহজ ও সরলভাবে পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের আপ্যায়িত করিয়াছেন। তাছাড়া অনেক দুঃখ ও ব্যথাপূর্ণ কবিতা লিখিলেও ঘালিবের কাব্য কখনও মীরের কবিতার ন্যায় নৈরাশ্য-জনক ছিল না। তাহার কারণ আমাদের কবি মূলতঃ আশাবাদী। পরন্তু তিনি ছিলেন খুব সুরসিক ব্যক্তি। সেইজন্য নৈরাশ্যজনক ও দুঃখপূর্ণ কবিতাকেও তিনি বলার ভঙ্গি ও কাব্য-ব্যঞ্জনাদ্বারা রসঘন করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কাব্যের মাধ্যমে রসপূর্ণ চিত্রাঙ্কনেও ঘালিবের অপূর্ব ক্ষমতা ছিল। তাঁহার নিম্নলিখিত কবিতা লক্ষ্য করিলে ইহা সহজেই অনুভূত হইবে।

মুন্দ্‌ গয়ীঁ খুল্‌তে হী খুল্‌তে আঁখীন্‌ হৈ হৈ ;
খুব্‌ উঅক্‌ৎ আয়ে তুম্‌ উস আশিকে-বীমার্‌ কে পাস্‌।

مند گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں ہے ہے —
خوب وقت آئے تم اس عاشق بیمار کے پاس

অর্থাৎ, হায় হায়, চক্ষু খুলিতে খুলিতেই ইহা মুঁদিয়া গেল ; পীড়িত প্রেমিকের নিকট তুমি ঠিক সময়েই আসিয়াছিলে।

সমসাময়িক উর্দু কবিদের সহিত তুলনা করিলে ইহা একবাক্যে স্বীকৃত হইবে যে উচ্চভাব, দার্শনিকতত্ত্ব ও অনুভূতিপূর্ণ রসকাব্যে ঘালিব অদ্বিতীয় ; কিন্তু বাগ্‌ধারা ও সহজ, সরল অভিব্যক্তির বিচার করিলে জোক, এমন কি মৌমিনকেও তাঁহার উপরে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ঘালিব তাঁহার চিন্তাধারা অনেকাংশে প্রসিদ্ধ ফারসী কবি মৌলানা রুমী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে রুমী যেমন তাঁহার কাব্যসমূহে সুফীতত্ত্ব সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন, ঘালিবের মধ্যে সেরূপ প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার প্রকৃত কারণ ঘালিব মূলতঃ কবি, দার্শনিক নহেন। আবার, সুফী-কবিদের দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যে প্রেমের পরাকাষ্ঠাই দেখাইয়া গিয়াছেন—তাহাতে অন্তরানুভূতিই মূল কথা, জ্ঞানদ্বারা বিচারের কোন সুযোগ নাই। কিন্তু ঘালিব তাঁহার সুফীচিন্তাধারাসমূহ জ্ঞান ও যুক্তিদ্বারা বিচারের চেষ্টা করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাকে কতকটা ইংরেজ কবি ব্রাউনিং-এর সহিত তুলনা করা যায়। আর আমরা দেখিতেও পাই যে প্রসিদ্ধ সমালোচক রামবাবু সকসেনা তাঁহাকে 'সুফী ব্রাউনিং' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন, যদি কোন একক ইউরোপীয় কবির সহিত তুলনা করিতে হয় তাহা হইলে ঘালিবকে জার্মন কবি 'গেটে'-র সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ঘালিব অনেকাংশে বাঙলার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন উপনিষদের ভাব-শিষ্য, তেমনি ঘালিব সুফী-তত্ত্বের—কিন্তু তাঁহাদের বিশেষ চিন্তাধারা ও প্রকাশভঙ্গি তাঁহাদের কাব্যকে এক নূতন রূপ দান করিয়াছে। সেই নবরূপকে সারাবিশ্ব গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। তাঁহারা উভয়েই একাধারে প্রাচীন ও আধুনিক ; আবার, অতি-আধুনিক হইয়াও অতি-প্রাচীন।

ঘালিবের অন্যান্য অনেক শিষ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিগণ প্রসিদ্ধ—রখ্‌শান্‌, মীর মহদী মজ্‌রুহ, সালিক, হালী ও তফ্‌তা।

শীফ্‌তা নামে প্রসিদ্ধ নবাব মুর্তজা খানের পুত্র নবাব মুস্তফা খান্‌ শীফতা ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। এবং তথায়ই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর তিনি জহাঙ্গীরাবাদে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন ; এবং তাঁহার জীবনের পরবর্তী-কাল তথায়ই অতিবাহিত করিয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

শীফতা তখনকার একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ফারসী ও উর্দু উভয়

ভাষায়ই কবিতা লিখিয়াছেন। ফারসীতে তাঁহার কবি-নাম ছিল হসরতী, আর উর্দুতে শীফতা। কথিত আছে, তিনি তাঁহার উর্দু কবিতা মৌমিন হইতে সংশোধন করাইতেন, আর ফারসী কবিতা ঘালিব হইতে। পরবর্তী-কালে ঘালিব যখন তাঁহার একজন ঘনিষ্ট বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইলেন, শীফতা তাঁহার ফারসী ও উর্দু উভয় কবিতাই তাঁহার নিকট হইতে সংশোধিত করিয়াছেন। নবাব শীফতার গৃহেই সেই সময়ে সপ্তাহে সপ্তাহে সংস্কৃতি সভার আয়োজন হইত এবং সমসাময়িক সকল স্যাহিত্যিকই তথায় যোগদান করিতেন। আর নবাব সাহেব যে কাব্যে একজন সমঝদার ব্যক্তি ছিলেন, তাহা ঘালিবের নিম্নলিখিত উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়।

ঘালিব্ ব-ফনে-গুফ্তগ্ নাজ.দ্ বদীন্ আর্জিশ্ কি উ ;
ন-নবিশত দর্ দীবান্ ঘজল্ তা মুস্বত্বফহ খান্ খুশ নকর্দ।

غالب بفن گفتگو نازد بدین ارزش که او —
ننوشت در دیواں غزل تا مصطفٰه خاں خوش نکرد

অর্থাৎ, ঘালিব তাঁহার কাব্যকথা সম্বন্ধে এইজন্য গর্বানুভব করে যে সে তাহার ঘজল মুসতফা খানের সম্মতি ছাড়া রচনা করে নাই।

নবাব শীফতার ফারসী ও উর্দু এই উভয় ভাষায়ই একটি করিয়া দেওয়ানের উল্লেখ আছে। তাঁহার কাব্য গভীর অর্থপূর্ণ চিন্তাধারা সমন্বিত। ঘালিব তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

ঘালিব্ জি-হসরতী চি সরায়িম্ কি দর্ ঘজল ;
চুঁ উ তলাশে-মানী ও মজমূন্ নকর্দ কস্।

غالب ز حسرتی چه سرایم که در غزل —
چوں او تلاش معنی و مضموں نکرد کس

অর্থাৎ, হে ঘালিব, হস্‌রতীর ঘজল সম্বন্ধে আর কি প্রশংসা করিব—বিষয়ের তথ্যপূর্ণ অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার মত আর কেহই চিন্তা করেন নাই।

তাছাড়া তাঁহার ফারসীতে রচিত গুল্‌শনে-বেখার্ নামক একটি উর্দু কবি-জীবন সংগ্রহেরও উল্লেখ আছে। শীফতা বিশেষ করিয়া তাঁহার এই জীবনী-সংগ্রহের জন্যই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাই উর্দু সাহিত্যের সর্বপ্রথম নির্ভীক ও স্বাধীন সমালোচনা।

মীর হুসেন তস্‌কীন্ মীরন্ সাহেব নামে প্রসিদ্ধ মীর আহসনের পুত্র। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতেই তাঁহার জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তিনি শা নসীর

হইতে কাব্য শিক্ষা লাভ করেন। শা নসীরের মৃত্যুর পর তস্‌কীন মৌমিনের একজন প্রিয় শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন। কথিত আছে, কাব্য-ধারায় তিনি মৌমিনের এইরূপ অনুকারী হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের কাব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজিয়া পাওয়া অনেক সময় মুস্কিল হইত।

তস্‌কীন্ জীবিকান্বষণে লক্ষ্ণৌ ও মীরাট গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল স্থানে কোন সফলতা লাভ না করিয়া তিনি রামপুর গমন করেন। তথায় নবাব ইয়ুসুফ আলী খান তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করেন। এবং পরবর্তী জীবন রামপুরেই বসবাস করিয়া ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তস্‌কীন তথায়ই প্রাণত্যাগ করেন।

তস্‌কীনের পুত্র মীর আব্দুর রহমান আসীও রামপুরের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি নবাব কলব আলী খানের সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

নসীম কবি-নামধারী মীর্জা আস্‌ঘর আলী খান নবাব আকা-আলী খানের পুত্র। তিনি ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তথায়ই তাঁহার প্রথম জীবন অতিবাহিত হয় ও বাল্যশিক্ষা লাভ হয়। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর ভাইদের সহিত মনোমালিন্য বশতঃ দিল্লী ত্যাগ করিয়া তিনি লক্ষ্ণৌ চলিয়া আসেন এবং তথায় তাঁহার স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তথায় তাঁহার অনেক সময় দুঃখ-কষ্টে অতিবাহিত হইলেও তিনি কখনো পরমুখাপেক্ষী হন নাই। অবশেষে সিপাহী-বিদ্রোহের পর তিনি নবলকিশোর প্রেসের অধীনে আরবী আলিফ-লায়লা-র উর্দু কাব্যানুবাদ করিতে নিযুক্ত হন। কিন্তু ইহার প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিবার পরেই তিনি নবলকিশোর প্রেস হইতে সরিয়া পড়েন এবং ইহার অবশিষ্টাংশ মুন্সী তুতারাম শায়ান সমাপ্ত করেন।

নসীম একজন প্রসিদ্ধ উর্দু কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে তিনি দিহলবী ধারায় তাঁহার কবিতা লিখিলেও লক্ষ্ণৌতেই তাঁহার কাব্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি মৌমিনের অনুসরণ করিয়াই তাঁহার গজল-কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কাব্যের স্থিতিরক্ষার প্রতি তিনি বিশেষ সযত্ন ছিলেন না বলিয়া তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মুসতফায়ি প্রেসের মালিক তাঁহার এক শিষ্য হাফিজ আব্দুল উআহিদ তাঁহার দেওয়ান প্রকাশ করিয়া উর্দু সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু কথিত আছে কবিবর এই

প্রকাশনায় নিজে সকল সময়েই সঙ্কোচবোধ করিতেন। কবি ছিলেন একজন সুফী-সাফী মানুষ এবং সুপ্রসিদ্ধ কবি ঘালিবও তাঁহার তত্বপূর্ণ ঘজলসমূহের সুখ্যাতি করিয়াছেন। নসীম ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতেই প্রাণত্যাগ করেন।

জহীর নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ জহীরুদ্দীন সৈয়দ জলালুদ্দীন হয়দরের পুত্র। জলালুদ্দীন তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য আব্দুল্ মুজফর বহাদুর শা কর্তৃক 'খান্ বহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার ন্যায় জহীরও অল্প বয়সেই তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য একজন রাজকর্মচারীরূপে গৃহীত হন এবং শীঘ্রই 'রাকিমুদ্দৌলহ' উপাধিতে ভূষিত হইলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিতা লিখার প্রতিও বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তাঁহার ১৪ বৎসর বয়সের সময়েই তিনি প্রসিদ্ধ জৌকের একজন প্রিয় শিষ্যরূপে পরিগণিত হন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় দিল্লীর দুর্যোগকালে জহীর বাধ্য হইয়া জীবিকান্বেষণে নানা স্থান ঘুরিয়া বেরিলী পৌঁছেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর রামপুর আগমন করেন। রামপুরে তিনি চারি বৎসর কাল অতিবাহিতের পর আবার তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। তথায় চুঙ্গীতে তাঁহার একটি চাকুরীলাভ হয়। শীঘ্রই বুলন্দশহর হইতে প্রকাশিত জলুয়ায়ে-ত্বউর্ নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধসমূহ দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া আলোয়ারের মহারাজা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং তথায় জহীর চারি বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। তৎপর তথাকার কৃত্রিমতায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন এবং শীফতার সুপারিশে জয়পুরের পুলিশ বিভাগে একটি চাকরী লাভ করেন। এই চাকরীতে প্রায় ১৯ বৎসরকাল নিযুক্ত থাকার পর তথাকার শাসনবিভাগের কর্তা তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যুর পর তাঁহারও চাকরী যায়। কিছুকাল বেকার অবস্থানের পর টোঙ্কের নবাব মহম্মদ আলী খান কর্তৃক তিনি আমন্ত্রিত হন এবং তথায় নবাব সাহেবের জীবৎকাল পর্যন্ত তিনি বেশ সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত বসবাস করেন। এই নবাব সাহেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নবাব ইব্রাহিম আলী খান জহীরের একটি ভাতা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে প্রায় ১৪।১৫ বৎসর টোঙ্কে অবস্থানের পর তিনি হয়দরাবাদে যাইতে মনস্থ করেন। তথায় তাঁহার একটি নূতন চাকরীরও সুযোগ হইয়াছিল; কিন্তু ইহার বেতনের ফলভোগ করিবার পূর্বেই ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

জহীর তাঁহার যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি। তাঁহার লিখিত ৪টি

দেওয়ানের মধ্যে প্রথমটিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার নাম গুলিস্তানে-স্থখুন্। জৌকের শিষ্যরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও তাঁহার কাব্যে মৌমিন্ খানের প্রভাবই বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। কবি নিজেই গাহিয়াছেন,

তরজে-মৌমিন্ সে ন আগাহ্ থা যবতক্ কি জহীর্ ;
সচ্ তো ইয় হৈ কি কভি রঙ্গে-ঘজল্ নে ন দিয়া।

নইয়ার ও রখ্শান নামে প্রসিদ্ধ নবাব জিয়াউদ্দীন্ আহমদ খান লোহারুর নবাব আহমদ বখ্শ খানের কনিষ্ঠ পুত্র। মীর্জা ঘালিবের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তাও ছিল। ঘালিব তাঁহাকে তাঁহার 'খলিফা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি একজন কবি ও ঐতিহাসিক ছিলেন।

রখ্শানের দুই পুত্র সাকিব উপাধিধারী নবাব সিহাবুদ্দীন আহমদ খান ও তালিব উপাধিধারী সঈদ্ উদ্দীন্ আহমদ খানও কবি ছিলেন। কবি সাকিব ঘালিব-পত্নীর ভাইপোকে বিবাহ করেন এবং তিনি ঘালিবেরই একজন কবি-শিষ্য ছিলেন। তিনি ফারসী ও উর্দু উভয় প্রকার কবিতাই লিখিতে পারিতেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তালিব ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং কাব্যে হাতেখড়ি তাঁহার বড়ভাই সাকিবের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন। পরে সাকিবের মৃত্যুর পর মীর মজরূহ, সালিক ও হালী হইতেও কাব্যে শিক্ষালাভ করেন। তিনি কতক-কাল দিল্লীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও পঞ্জাবের একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনার ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সালিক নামে প্রসিদ্ধ মীর্জা কুর্বান্ আলী বেগ মীর্জা আলিম বেগের পুত্র। হয়দরাবাদে তাঁহার জন্ম হয়। আবার কাহারো কাহারো মতে দিল্লীই তাঁহার জন্মভূমি ছিল। বস্তুতঃ দিল্লীতেই তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। তিনি প্রথমে মৌমিনের কাব্য-শিষ্য ছিলেন ও কবি-নাম কুর্বান গ্রহণ করেন। পরে মৌমিনের মৃত্যুর পর ঘালিবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সালিক কবি-নাম ধারণ করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আলোয়ারে আসেন। আলোয়ারে কিছুকাল ওকালতী করার পর তিনি হয়দরাবাদে আসেন এবং তথায় শিক্ষাবিভাগের একটি উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। হয়দরাবাদে অবস্থানকালে কিছুকালের জন্য মখজনুল্-ফুয়ায়িদ্ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হয়দরাবাদেই তাঁহার মৃত্যু হয়। হন্জারে-সালিক্ নামে তাঁহার একটি দেওয়ানের উল্লেখ আছে।

মীর মহ্‌দী মজরূহ ঘালিবের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। তিনি মীর হুসেন ফিগারের পুত্র। দিল্লীতেই তাঁহার জন্ম এবং তথায়ই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে কিছু-কালের জন্য তিনি পানিপথ যান ও তথায় অবস্থান করেন। দিল্লীর অবস্থা কিছুটা শান্ত হইলে আবার তিনি তথায় ফিরিয়া আসেন ও কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু বাধ্য হইয়া শীঘ্রই তাঁহাকে পুনরায় রোজগারের চেষ্টায় নানাদিকে ছুটিতে হয়। প্রথমে তিনি আলোয়ারে যান ও তথাকার মহারাজা তাঁহার বিশেষ সম্মান করেন। শেষজীবনে রামপুর-নবাব কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি তথায় যান এবং অবশিষ্টকাল রামপুরেই পরম সুখ ও শান্তিতে বসবাস করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মজহরে-মানী নামক মজরূহ-র একটি দেওয়ান প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কবিতা বেশ সরল ও সুমিষ্ট। তাঁহার কবিতায় রসসিক্ত গভীর অনুভূতির কোন প্রমাণ না থাকিলেও, তিনি ছোট ছোট ছন্দে কল্পনার মাধুর্যে বক্তব্য বিষয়ের যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন—তাহাতে তাঁহাকে এই যুগের শেষ শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম বলা যাইতে পারে। তাছাড়া আমরা দেখিতে পাই যে ঘালিব তাঁহার ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার চিঠিপত্রের অনেক শিরোনামাই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন।

(জ) রামপুর ও হায়দরাবাদের দরবার : আমীর ও দাঘের যুগ।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলে দিল্লীর সম্রাট বহাদুর শা এবং অযোধ্যার নবাব উআজিদ আলী শা যথাক্রমে রেঙ্গুন ও কলিকাতায় অন্তরীন অবস্থায় বন্দী হইলে পরে দিল্লী ও অযোধ্যার রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের সঙ্গে সাহিত্য ও কৃষ্টির চর্চাও অবশ্যম্ভাবীরূপে বিনষ্ট হয় এবং তাহার ফলে পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত স্থান ও পাত্র খোঁজের অপেক্ষায় রহিলেন। যদিও দিহলবী ও লখনোয়ী প্রভাবই উর্দু-সাহিত্যে চির-বিদ্যমান, তথাপি সাময়িকভাবে ইহার পরবর্তীযুগে রামপুর ও বিশেষভাবে হায়দরাবাদের

দরবারই উর্দু-সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছে। উর্দু সাহিত্যের চর্চার সূচনা হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কালকে এককথায় 'দরবারী যুগ' বলা যাইতে পারে। মুসলিম শাসিত দরবার হইতে পুষ্টিলাভ করিয়া এই কয়েক শতাব্দীর উর্দু-সাহিত্য বিকাশলাভ করিয়াছে। দিল্লী ও লখ্নো দরবারের অধঃপতনের পরেও ছোটখাট অনেক মুসলিম শাসিত দরবারই উর্দু পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। রামপুর ও হয়দরাবাদের দরবারের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস বর্ণনার পূর্বে সংক্ষেপে সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দরবারের সাহিত্যিকদের ইতিহাস বিবৃত হইল।

উআজিদ আলী শা কলিকাতায় অবস্থিত মাটিয়াবুর্জে আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরে সর্বপ্রথম তথায়ই একটি ছোটখাট উর্দু-সাহিত্য-কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। নবাবের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সাহিত্যিক তাঁহার অনুগমন করেন; এবং তাছাড়া উআজিদ আলী নিজেও একজন উর্দু-সাহিত্যিক ও ইহার একজন দরদী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া অনেকেই তাঁহার নিকট আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা দূরবর্তী স্থান হইতে তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছেন।

মাটিয়াবুর্জ কলিকাতার নিকটবর্তী হইলেও নবাব উআজিদ আলীর আশ্রয়ের ফলে এবং তথাকার উর্দু-সাহিত্যের চর্চার প্রভাবে ইহা একটি দ্বিতীয় লখ্নো শহরে পরিগণিত হয়। মাটিয়াবুর্জের স্ববেহ-সিতারা (বা স্ব'হ-সিতারহ অর্থাৎ সপ্ত-তারকা) উপাধিপ্রাপ্ত সাতজন উর্দু কবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া নবাব সাহেবের দুইজন বিবিও বিশেষ সাহিত্য-রসিক ছিলেন। ইঁহাদের উৎসাহ ও সাহিত্য-চর্চায় এই নূতন কেন্দ্রস্থল বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তদুপরি তদানিন্তন প্রসিদ্ধ কবি দাঘ ও নজম তবাতবায়ীর আগমনের ফলে বাঙ্‌লার উর্দু-চর্চা বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করে। একজন বাঙ্গালী মুসলমানও এই সুযোগে একজন উর্দু-সাহিত্যিকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। নস্‌সাখ্ কবি-নামধারী মৌলভী আবদুল ঘফূর বিশেষ করিয়া অনেক উর্দু প্রবন্ধ লিখিয়াই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন রাজশাহীর অধিবাসী এবং একজন কৃতী ডিপুটী-কলেক্টর। তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্যে :—

(১) তজকিরায়ে-সুখুনে-শুআরা (বা উর্দু কবিজীবন কাহিনী); (২) দফ্তরে-বেমিসাল্; (৩) কিত্বায়ে-মুন্তিখব্; (৪) চশ্মায়ে-ফয়েজ্; (৫) শাহিদে-ইশ্রৎ; (৬) মঘূর্ব্-দিল্; (৭) অশ্আরে-নস্‌সাখ্; (৮) গঞ্জে-তওয়ারীখ্; (৯) কন্দে-পার্সী; (১০) আর্মঘান্; এবং (১১) বাঘে-ফিকর্।

বাঙলার মুর্শিদাবাদের নবাবগণও উর্দু সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দিল্লীর অধঃপতনের সূচনা হইতেই তথাকার সাহিত্যিকগণকে মুর্শিদাবাদ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখা যায়। মীর ও সোদার সমসাময়িক মীর সোজ ও মীর কুদ্রৎ-উল্লা কুদরৎ মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন। আর কুদরৎ তথায়ই ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। সুলতান মহম্মদ শার রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ মরসিয়া-কবি মীর্জা জহুর্ আলী খলীক তদানিন্তন নবাব মুয়াজিশ মহম্মদ খান শিহাবকে যুদ্ধসংবাদ প্রদানার্থে মুর্শিদাবাদ প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তিনিও কতককাল তথায় অবস্থানপূর্বক সাহিত্যচর্চা করিয়া গিয়াছেন।

সেই যুগে বাঙলারই অন্তর্ভুক্ত আজিমাবাদ পাটনাও উর্দু-সাহিত্যচর্চার একটা কেন্দ্রস্থল ছিল। মহারাজা শিতাব রায় ও 'রাজা' কবি-নামধারী তাঁহার পুত্রের সময়েই উর্দুচর্চা তথায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধিলাভ করে। প্রসিদ্ধ কবি মীর বাকির্ হাজীন্ আজিমাবাদের বিখ্যাত নবাব সাদৎজঙ্গ হইতেই পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মীর্জা মুজহর জানজনানের একজন প্রসিদ্ধ কবি-শিষ্য এবং মুর্শিদাবাদেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

কিন্তু বাঙলা বা বিহার মুসলিম কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল হইতে কতকটা দূরে ছিল বলিয়া উর্দু সাহিত্যিকগণ অধিকতর নিকটবর্তী পৃষ্ঠপোষকদের অধীনেই বসবাস করিতে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। হায়দরাবাদকেও এই কারণেই উর্দু সাহিত্যিকগণ প্রথম প্রথম কতকটা এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রামপুর ও হায়দরাবাদ ছাড়া আর যে সকল রাজ্য বা রাজ্যাধিকারী উর্দু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্যতম ঃ—টাণ্ডা (রামপুরেরই নিকটবর্তী বেরিলী জেলার অন্তর্ভুক্ত), আলোয়ার, জয়পুর, ভরতপুর, পাতিয়ালা, কপূরথলা, টোঁক্, (কাঁথিয়াওয়ার অন্তর্ভুক্ত) মঙ্গরূল্, ভূপাল ও ভাওয়ালপুর।

আলোয়ারের মহারাজা শিবধন সিংহ একজন প্রসিদ্ধ উর্দু-পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়েই জৌকের শিষ্য তিশ্না, জহীর ও তসবীর এবং ঘালিবের শিষ্য মীর মজরূহ ও সালিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ফসানায়ে-অজায়িব-প্রেণতা সরওয়ার নামে বিখ্যাত মীর্জা রজব আলী বেগও তাঁহার দরবারে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। জহীর ও তাঁহার ছোট ভাই আনোয়ার অনেকদিন জয়পুরও বসবাস করিয়াছিলেন এবং তথায়ই তাঁহাদের মৃত্যু হয়। আর ভাওয়ালপুরে প্রসিদ্ধিলাভ করেন ইর্শাদ গুর্গানী।

টোঁকের নবাব মহম্মদ ইব্রাহীম আলী খান ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পিতা নবাব মহম্মদ আলী খানের পদচ্যুতির পর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি নিজেও একজন কবি এবং তাঁহার কবি-নাম ছিল খলীল। তাঁহার দরবারে অনেক কবিই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আসদ্ নামে প্রসিদ্ধ নবাব স্থলেমান খান ও জহীর অন্যতম। আসদ ছিলেন মীর মুজফর আলী আসীরের শিষ্য এবং নবাব ইব্রাহীম আলী খান বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার দরবারে আনয়ন করিয়াছিলেন। আসদের শিষ্যবর্গের মধ্যে আক্র, জব্‌ৎ ও শরফ্ প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ দাঘের শিষ্য কিরামৎ আলী খলশ-ও টোঁক দরবারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং তথায়ই ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

মঙ্গরুল একটি মুসলিম শাসিত ক্ষুদ্ররাজ্য এবং তথাকার সকল নবাবই মুসলিম সাহিত্য ও কৃষ্টির উন্নতি সাধনে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তথাকার জলবায়ু ভাল নহে বলিয়া অনেক সময় পণ্ডিত ও সাহিত্যিকবর্গ তথায় বেশী দিন বসবাস করিবার স্থযোগ পান নাই। তাহা হইলেও তথাকার নবাবগণ দূরদেশ হইতেই উর্দু সাহিত্যিক এবং পণ্ডিতবর্গের যথেষ্ট পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়াছেন। মঙ্গরুল-দরবারে যে সকল কবি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে—দাঘ্, তস্‌লীম্, জলাল্ এবং শম্‌শাদ্ প্রসিদ্ধ।

ভূপাল রাজ্যের নবাবগণ সকলেই অতি শিক্ষিত ও কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহারা যেমন ছিলেন উর্দু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক, তেমনি নিজেরাও বিশেষ পণ্ডিত ও সাহিত্যিক। দৌলৎ কবি-নামধারী নবাব জহাঙ্গীর মহম্মদ খান অনেক স্থন্দর স্থন্দর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার কন্যা নবাব শাহজান বেগম আরবী ও ফারসী উভয় ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি উর্দু সাহিত্যে তাঁহার কবিনাম 'শীরীন্' ও পরবর্তীকালে 'তাজওয়ার' গ্রহণ করেন। ফারসী সাহিত্যে তাঁহার কবিনাম ছিল 'শাহজহান্'। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী নবাব স্বদীক্ হুসেন খান্-ও একজন বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আরবী, ফারসী ও উর্দু এই তিন ভাষায়ই তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। আরবী ও ফারসী সাহিত্যে তাঁহার কবিনাম ছিল 'নবাব্' এবং উর্দু সাহিত্যে তিনি 'তৌফিক্' কবিনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মুফতী আজরদহ-র কবিশিষ্য ও তাঁহার প্রায় দুইশত গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তাঁহাদেরই উপযুক্তা উত্তরাধিকারিণী নবাব স্থলতানা জহান বেগম উর্দু সাহিত্য ও মুসলিম ভাষা ও কৃষ্টির উন্নতি সাধনে যে

পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুসলিম শিক্ষা কেন্দ্রস্থল স্থাপন বা উর্দূ ভাষার চর্চা ও প্রসারে তাঁহার অদম্য উৎসাহের তুলনা হয় না। মৌলানা শিব্‌লী নুমানী তাঁহারই সাহায্য পাইয়া সীরতে-নবুয়ী ও অন্যান্য গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তিনি ভূপালেও অনেক স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিয়া উর্দূ সাহিত্য ও সাধারণভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এই নবাব-বংশীয়দের ছাড়াও অন্যান্য অনেক কবি ও সাহিত্যিক ভূপালে বসবাস করিয়া গিয়াছেন এবং সারা ভারতই নবাব-সরকার হইতে মুসলিম কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নতি বিষয়ক সকল প্রকার সহায়তাই সর্বকালের জন্য লাভ করিয়া আসিয়াছে।

এইযুগে রামপুরেই পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের বিশেষ সমাগম হয়। এবং তাহার কয়েকটি বিশেষ কারণও ছিল। প্রথমতঃ রামপুর দিল্লী ও লখ্‌নোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সেইজন্য এই উভয়স্থানের পণ্ডিতবর্গই সর্বপ্রথম রামপুরেই তাঁহাদের ভাগ্যপরীক্ষা করিতে আগ্রহশীল হইয়াছেন। তাছাড়া রামপুর-নবাবগণ সকলেই বিশেষ শিক্ষিত, ভদ্র ও সুজন এবং উর্দূ সাহিত্যের উন্নতি-সাধনে অতি যত্নশীল ছিলেন।

নবাব সায়িদ খানের পুত্র নবাব ইয়ুসুফ আলী খান যেমন ছিলেন পণ্ডিত, জ্ঞানী ও প্রকৃত গুণী ব্যক্তি, তেমনি নিজেও ছিলেন একজন কবি ও কবিদের প্রকৃত সমঝদার ব্যক্তি। তিনি ফারসী ও উর্দূ উভয় ভাষায়ই কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। উর্দূ সাহিত্যে তাঁহার কবিনাম ছিল নাজিম্‌। তিনি প্রথমে মৌমিন হইতে কাব্য-নির্দেশ লাভ করিয়াছেন। এবং পরে যথাক্রমে ঘালিব ও আসীরকে তাঁহার কবি-গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত কবিদের ছাড়া অন্যান্য অনেক কবিই তাঁহার দরবারে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ফজল হক খঈরাবাদী ও মীর হুসেন তসকীন্‌ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিল্লী ও লখ্‌নো কবিদের একত্র সমাবেশের ফলে উর্দূ ভাষার আর একটি সুষ্ঠু প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। ইহা হইতেছে দিহলবী ও লখনোয়ী উর্দূর সম্মিলিত নূতন ভাবধারা। এই নূতন ভাবধারাই আধুনিক উর্দূ সাহিত্যকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ইয়ুসুফ আলীর পুত্র নবাব কলব আলী খানের আমলকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক লক্ষ্য করিয়া রামপুরের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নবাবী-মস্‌নদে আরোহণ করেন। তিনি কেবল শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গকে তাঁহার দরবারে আমন্ত্রিত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই,

তাঁহাদিগকে নির্দিষ্ট বেতন ছাড়া নানাভাবে সুযোগ সুবিধা দিয়া তাঁহাদের আপ্যায়িত করিতে তিনি সকল সময়েই বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। তাছাড়া তিনি সাহিত্যিকদেরই কেবল অভ্যর্থনা করেন নাই, বস্তুতঃ তাঁহার সময়ে ছোট বড় সকলপ্রকার শিল্পীই তাঁহার দরবারে সমবেত হইয়াছিলেন। চোব্‌দার, বাবুরচি, রিকাবদার প্রভৃতি ছোট-খাট শিল্পীদের ছাড়া চিকিৎসকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন—হকীম্ মহম্মদ ইব্রাহিম্, হকীম্ আব্দুল আলী, হকীম্ আলী হুসেন, হকীম্ আহমদ রিজা প্রভৃতি। পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিও কম সমবেত হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন—অল্লামা আব্দুল হক্ খঈরাবাদী, অল্লামা আব্দুল হক্ মুহানদিস্ ও মৌলানা ইর্শাদ হুসেন। কিন্তু সমবেত সাহিত্যিকদের সংখ্যা ছিল অগণ্য। তাঁহাদের হইতে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে: আসীর, বহর, আমীর, দাঘ, জলাল, তসলীম্, মুনীর, হয়া, জান স্বাহিব, বশীর, মন্‌সুর, রিজা, উন্স্, শাখিল, শাদান ও ঘনী। যে কোন কৃষ্টিসম্পন্ন গুণী ব্যক্তিই তাঁহার দরবারে স্থান পাইলেও এবং তিনি তাঁহাদের প্রতি সকল সময়েই বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেও বা সকলের প্রতিই সহৃদয় হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে কেবল ২।৩ জন মহাভাগ্যবান ছাড়া আর কাহাকেও তিনি ১০০্ টাকার উপর মাহিনা প্রদান করেন নাই। এই ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হইলেন—মৌলানা ইর্শাদ হুসেন, মৌলবী আব্দুল হক্ ও কবিবর আমীর আহমদ মীনাঈ।

নবাব কলব আলী নিজেও একজন পণ্ডিত ও সাহিত্যিক। তাঁহার শিক্ষক ছিলেন মৌলানা ফজল হক খঈরাবাদী। আর কবিগুরু হইলেন আমীর মীনায়ী। তিনি প্রথমে গদ্য গ্রন্থাদিই প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে কাব্যেও মনোনিবেশ করেন ও ফারসী এবং উর্দু উভয় ভাষায়ই কবিতা লিখিয়াছেন। উর্দু সাহিত্যে তাঁহার কবিনাম ছিল 'নব্বাব্'। তাঁহার নিম্নলিখিত উর্দু-গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য :—বুল্‌বুল্-নঘ্‌মা-সঞ্জ্, তরানায়ে-ঘম্, কন্‌দিলে-হরম্ এবং শগুফায়ে-খস্‌রুয়ী। তাছাড়া তাঁহার চারিটি উর্দু কাব্য বা দেওয়ানের উল্লেখ আছে। ইহাদের নাম যথাক্রমে নশীদে-খস্‌রুয়ানী, দস্তাম্বুয়ে-খাকানী, দুর্‌রুল্-ইন্তিখাব এবং তোকীয়ে-সুখুন্। এই সকল কাব্যদ্বারাই তিনি উর্দু সাহিত্যে এক নূতন রীতির প্রবর্তন করেন। এবং তাঁহার পিতার সময় হইতেই সূচিত এই সম্মিলিত দিহলবী ও লখনোয়ী ভাবধারা ও ভাষাগঠন-প্রণালীর মধ্যেই আমরা খুঁজিয়া পাই আধুনিক উর্দুর গোড়া পত্তন।

তাঁহার পরবর্তী নবাব মহামান্য সৈয়দ হামিদ আলী খানও উচ্চশিক্ষিত, সহৃদয় ও উর্দু সাহিত্যের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সময়েও অনেক পণ্ডিত ও সাহিত্যিক রামপুর দরবারের বদান্যতায় সন্তুষ্ট হইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছেন।

মুন্সী আমীর আহমদ মীনায়ী মৌলবী করম মহম্মদের পুত্র। নসীরুদ্দীন হায়দরের রাজত্বকালে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহারই বংশসম্ভূত হজরৎ মখদূম শা মীনা-র নামানুসারে তিনি মীনায়ী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এবং এই মীনার কবরস্থান লক্ষ্ণৌ শহরে এখনো অবস্থিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মীনায়ী বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন এবং মুফ্‌তী সাদুল্লা ও তাঁহার সহকর্মী ফরহঙ্গী মহলের শিক্ষকদের নিকট হইতে পাঠ্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় পারদর্শী হইলেন। মীনায়ী সাহেব বাল্যকাল হইতেই বিশেষ ধার্মিক ও সুফীভাবাপন্ন ছিলেন এবং স্থাবির চিশ্‌তিয়ার উত্তরাধিকারী হজরৎ আমীর শা হইতে দীক্ষালাভ করেন। টোট্‌কা বা মন্ত্র-চিকিৎসা এবং জ্যোতিষবিদ্যায়ও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাছাড়া তাঁহার সহজ ও সরল প্রকৃতির জন্য কবিবর সর্বমান্য ছিলেন।

বাল্যকালেই মীনায়ীর কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়। তিনি মুন্সী মুজফর আলী আসীর নিকট হইতেই সর্বপ্রথম কাব্যে দীক্ষালাভ করেন; কিন্তু শীঘ্রই কাব্যে তাঁহার কবি-গুরু হইতেও প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার কবি-নাম 'আমীর্'। ক্রমে তাঁহার কাব্য-খ্যাতির প্রসার হইলে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে উআজিদ আলী শা তাঁহার কবিতা শুনিবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার দরবারে আহ্বান করেন। এবং তাঁহার কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া 'ইর্শাদুস্-সুলতান্' ও 'হিদায়তুস্-সুলতান্' নামক দুইটি গ্রন্থ লিখিবার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। তখন হইতেই কবিবর উআজিদ আলীর দরবারে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্রই সিপাহী বিদ্রোহের ফলে তথাকার দরবারী-প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয় এবং ইহার প্রতিক্রিয়ারূপে মীনায়ী সাহেবও তাঁহার ভাগ্যান্বেষণে নানাস্থানে ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন।

শীঘ্রই রামপুর-নবাব ইয়ুসুফ আলী খান আমীর মীনায়ীকে তাঁহার দরবারে আহ্বান করেন। অনতিকাল পরেই নবাব ইয়ুসুফ আলীর মৃত্যুর পর নবাব কলব আলীর রাজত্বকালে যেমন উর্দু সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়,

তেমনি মীনায়ীও তাঁহার দরবারে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। নবাব কলব আলী তখনকার সকল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের তাঁহার দরবারে সমবেত করিয়াছিলেন। এই সকল গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে মীনায়ীই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান লাভ করিয়াছেন। এইরূপে প্রায় ৪৩ বৎসরকাল খুব সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত কাব্যচর্চা ও সাহিত্যালোচনায় দিনাতিপাত করিয়া তাঁহার অতি শেষ বয়সে মীনায়ী হায়দরাবাদের দিকে ধাবিত হন। কথিত আছে, হায়দরাবাদের নিজাম কোন সময়ে কলিকাতা হইতে হায়দরাবাদ প্রত্যাবর্তনের সময় কয়েকদিন বেনারস অবস্থান করেন। সেই সময় আমাদের কবিবরও তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই সুযোগে তাঁহাকে একটি কাসীদা লিখিয়া প্রেরণ করেন। নিজাম তাঁহার কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া শীঘ্রই ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে হায়দরাবাদে সম্বর্ধনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনতিকাল পরেই তাঁহার প্রায় ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মীনায়ী হায়দরাবাদেই প্রাণত্যাগ করেন।

দীর্ঘকাল সুখ ও শান্তিতে কাব্যালোচনা করার ফলে, আমীর মীনায়ী নানা উর্দু সাহিত্য রচনা করার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে এবং তাহার পরবর্তীকালে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের কোন এক অশুভ মুহূর্তে তাঁহার গৃহে আগুন লাগায় তাঁহার অনেক মূল্যবান গ্রন্থই বিনষ্ট হয়। কথিত আছে, তাঁহার প্রসিদ্ধ 'ঘয়রতে-বহারিস্তান্' নামক উর্দু দেওয়ান্ সিপাহী-বিদ্রোহের দুর্যোগে বিনষ্ট হইয়া যায়। আধুনিক কালে তাঁহার যে সকল সাহিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) ইর্শাদুস্-সুল্তান্ ; (২) হিদায়তুস্-সুল্তান্ ; (৩) ঘয়রৎ-ই-বহারিস্তান্ ; (৪) নূর্-ই-তজল্লী ; (৫) আব্রে-করম্ ;

(৬) জিক্রে-শাহে-আম্বিয়া : ইহা হজরৎ মহম্মদের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি মুসদ্দস্ কাব্য।

(৭) সুবহায়ে-আজল্ : তাঁহারই উদ্দেশ্যে লিখিত একটি জন্ম-গীতিকা।

(৮) শামে-আবদ্ : তাঁহারই মৃত্যু-গীতিকা। (৯) লয়লাতুল্-কদর্ : ইহাতে হজরৎ মহম্মদের মিরাজ-(স্বর্গভ্রমণ বা আত্মোপলব্ধির) কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। (১০) মজ্মুয়ায়ে-উআস্থৎ ;

(১১) ইন্তিখাবে-ইয়াদ্গার্ : উর্দু সাহিত্য-জীবন সংগ্রহ। ইহা নবাব কলব আলীর আদেশে রামপুর দরবার হইতে রচিত হয়।

(১২) মিরাতুল্-ঘয়ব্ ; (১৩) স্বনম্খানায়ে-ইশ্ক্ ;

(১৪-১৫) জৌহরে-ইন্তিখাব্ এবং গৌহরে-ইন্তিখাব্ : মীর দর্দ ও মীর তকী মীরের অনুকরণে ঘজল-কাব্য।

(১৬) খিয়াবানে-আফরীনশ্ : উর্দু-গদ্যে হজরৎ মহম্মদের জন্ম-কাহিনী।

(১৭) সুর্মায়ে-বস্বীরৎ : যে সকল আরবী-ফারসী শব্দ উর্দু ভাষায় বিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের শুদ্ধ ব্যবহারযুক্ত টিকা-টিপ্পনী-সহ একটি উর্দু অভিধান।

(১৮) বহারে-হিন্দ্ : উর্দু শব্দ ও বাগ্ধারার একটি সংক্ষিপ্ত অভিধান। ইহাকে কতকটা আমীরুল্-লুঘাৎ-এর উপক্রমণিকা হিসাবেও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(১৯) আমীরুল্-লুঘাৎ : ইহাই মীনায়ির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা আটখণ্ডে সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্য ছিল এবং তিনি ইহার প্রথম দুইখণ্ডে আলিফে-মম্দুদহ ও আলিফে-মক্সুরহ (অর্থাৎ অ এবং আ)-দ্বারা গঠিত শব্দের বিন্যাস করিয়াছেন মাত্র।

(২০) খতুত্ব্ : তাঁহার চিঠিপত্র ও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধের সংগ্রহ। অতি মূল্যবান রসগ্রাহী দিবাচা বা ভূমিকা সহকারে তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য মৌলবী আহসন উল্লা খান সাকিব কর্তৃক ইহা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতে দরদী, সাহিত্যরসিক, মানুষ মীনায়ির খাঁটি পরিচয়টি পাইতে পারি।

মীনায়ী কেবল একজন প্রসিদ্ধ কবিই ছিলেন না—একজন বিজ্ঞ, পণ্ডিত বলিয়াও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহার কাব্যে যেমন রহিয়াছে সুবিন্যস্ত রসগ্রাহী চিন্তাধারা, তেমনি পাওয়া যায় বিভিন্ন কাব্যধারার সংযত প্রকাশ। তিনি একাধারে কবি, ভাবুক ও ছন্দকার। তাছাড়া তাঁহার সুফীমন ও সহৃদয় চিত্ত তাঁহার কাব্যকে এক অতি উচ্চস্তরে স্থাপন করিয়া দিয়াছে। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন বলিয়াই তাঁহার কবি-শিষ্যও ছিল অসংখ্য। ইঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিদের নাম উল্লেখযোগ্য :—নাজ্মি, নবাব্, স্বফদর্, জাহ, জলীল্, রিয়াজ্, বর্হম্, জাহিদ্, কৌসর্ খঈরাবাদী, উঅসীম্, হয়রান্, আবিদ্, রিজা, দিল্, করার্, সাকিব্, আস্ঘর্, হাফীজ জোনপুরী, আখতর্ এবং কমর প্রভৃতি।

নিদর্শনস্বরূপ মীনায়ীর কয়েকটি বয়ৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

আয় রূহ কিয়া বদন মেঁ পড়ী হায় বদন্ কো ছোড়্ ;
ময়লা বহুৎ হোয়া হায় অব ইস্ পীরহন্ কো ছোড়্।

ای روح کیا بدن میں پڑی ہے بدن کو چھوڑ —
میلا بہت ہوا ہے اب اِس پیرھن کو چھوڑ

অর্থাৎ, হে আত্মা তুমি কি করে শরীরের সহিত যুক্ত হয়ে রয়েছ—শরীরকে পরিত্যাগ করে এসো। অনেক ময়লা জমে গিয়েছে, এখন এই পোষাক পরিত্যাগ করে ফেলো।

আবার,

নিম্ জান্ করকে মুঝে সর্ পহ খড়ে হৈঁ চুপ কে ;
হাথ্ উঠাতে ভী নহীঁ হাথ লগাতে ভী নহীঁ।
উল্ফৎ মেঁ বরাবর্ হৈ উফা হো কি জফা হো ;
হর্ বাৎ মেঁ লজ্জৎ হৈ অগর্ দিল্ মেঁ মজা হো।
আয়ে জো মরী লাশ্ পহ উহ ত্বন্জ্ সে বোলে ;
অব্ হম্ হৈঁ খফা তুম্ সে কি তুম্ হম্ সে খফা হো!

نیم جان کرکے مجھے سر پہ کھڑے ہیں چپ کے —
ہاتھ اُٹھاتے بھی نہیں ہاتھ لگاتے بھی نہیں
اُلفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو —
ہر بات میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو
آئے جو مری لاش پہ وہ طنز سے بولے —
اب ہم ہیں خفا تم سے کہ تم ہم سے خفا ہو

অর্থাৎ, আমাকে অর্ধমৃত অবস্থায় রেখে মাথার উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে—(আমাকে) ছাড়েও না, (আবার) কোন কাজেও লাগায় না। ন্যায় বা অন্যায় যাই হউক ব্যবহারে নিরপেক্ষ; (বস্তুতঃ) যদি মনে শান্তি থাকে, তাহলে সব কথাতেই আনন্দ পায়। ওহে, যদিও তুমি আমার (অর্ধ-) মৃত দেহকে খুব অবহেলার চক্ষে দেখছো, কারণ আমি তোমার নিকট আবদ্ধ—(এমন দিনও আসতে পারে, যখন) তুমি আমার নিকট আবদ্ধ থাকবে।

নবাব মির্জা খান দাঘ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দিল্লী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নবাব শম্সুদ্দীন খান্ লোহারের অধিকর্তা নবাব জিয়াউদ্দীন খানের ভাই। দাঘের ৬।৭ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা বহাদুর শার পুত্র মির্জা মহম্মদ সুলতানের সহিত পুনরায় বিবাহিত হন। নব-পরিণীতা তাঁহার মাতা শৌকৎ মহলের সহিত দাঘও দিল্লীর দরবার-স্থিত লালকেল্লায় উপনীত হন এবং তথায়ই শিক্ষা-দীক্ষা পাইতে আরম্ভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সদা-উৎফুল্ল মন কবিভাবাপন্ন ছিল। তাঁহার নূতন পিতা ও বহাদুর শা উভয়েই প্রসিদ্ধ কবি জৌকের কাব্যশিষ্য ছিলেন বলিয়া বালক দাঘও এই রাজকবির নিকট হইতেই কাব্যশিক্ষা পাইতে লাগিলেন এবং রাজকবি জৌকের সহিত সংস্কৃতি-সভায় বা মুশাইরাতে যোগদান করিতে থাকেন। বাল্যকালেই তিনি আরবী-ফারসী সাহিত্যেরও বিশেষ চর্চা করেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন প্রসিদ্ধ ঘিয়াসুল্-লুঘাৎ প্রণেতা পারস্য অধিবাসী মৌলবী ঘিয়াসুদ্দীন ও মৌলবী আহমদ্ হুসেন। তাছাড়া ঘোড়দৌড়, নানারূপ কারুকার্য, সুন্দর হস্তাক্ষর ও হাস্যরসিকতায় তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

কিন্তু কবিত্বশক্তি ছিল তাঁহার প্রকৃতিগত, তাই শীঘ্রই দাঘ একজন কবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নূতন পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে অন্যান্য পণ্ডিত ও সাহিত্যিক-বর্গের ন্যায় তাঁহাকেও দিল্লী পরিত্যাগ করিতে হয়। এবং তিনি তাঁহার পরিবারবর্গসহ রামপুর দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথাকার নবাব ইয়ূসুফ আলী খান পূর্ব হইতেই দাঘকে জানিতেন। তথায় দাঘ প্রথমে ভাবী নবাব কলব আলী খানের মুসাহিব বা বয়স্য-পদে নিযুক্ত হইলেন। এইসঙ্গে আস্তাবলের দারোঘা বা তত্ত্বাবধায়কের চাকরীও তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। তিনি নবাব বাহাদুরের সাহচর্য প্রায় ২৪ বৎসর লাভ করিয়াছিলেন এবং এই দীর্ঘকাল তিনি এত সুখ সমৃদ্ধির মধ্যে যাপন করিয়াছিলেন যে দাঘ অনেক সময়েই রামপুরকে 'আরামপুর' বলিয়া অভিহিত করিতেন। তিনি কলব আলীর সঙ্গে যেমন হজ যাত্রা করিয়াছেন, তেমনি দেশবিদেশের নানা স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি নবাব বাহাদুরের সঙ্গে কলিকাতায়ও আসিয়াছিলেন; এবং তথায় তাঁহাদের ৩।৪ মাস কাল অবস্থানের বর্ণনা দাঘ লিখিত 'ফরিয়াদে-দাঘ' হইতে সবিস্তারে জানিতে পারি। কিন্তু শীঘ্রই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পরম পৃষ্ঠপোষক নবাব বাহাদুরের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভাগ্যলিপিও অন্যান্য সভাসদবর্গের ন্যায় পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং ভাগ্য-অন্বেষণে তিনি অন্যত্র যাত্রা করেন।

রামপুর হইতে দাঘ সর্বপ্রথমে দিল্লী গমন করেন। তথায় কিছুকাল

অবস্থানের পর লাহোর, অমৃতসর, কিশনকূট (কৃষ্ণকুট), আগ্রা, আলিগড়, মথুরা, জয়পুর ও মঙ্গরুল রাজ্য প্রভৃতি হইয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি হয়দরাবাদে পৌছেন। এই সকল স্থানের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি কিছুকাল অবস্থানও করেন এবং তাহার ফলে অনেক সাহিত্যিকই তাঁহার কাব্য-শিষ্য হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথমবারে দাঘ 'বাক্বী'-উপাধিধারী রাজা গিরধারী পরসাদের মাধ্যমে হয়দরাবাদের নিজামের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। অগত্যা তিনি আবার দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুকাল পরে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে দাঘ নিজাম কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া পুনরায় হয়দরাবাদে গমন করেন এবং তথায় ভাবী নিজাম মীর মহব্‌ব আলী খানের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এই নিয়োগের ফলে দাঘ যেমন সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইলেন, তেমনি তাঁহার বেতন ও ভাতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার মাহিনা প্রথমে ৪৫০৲ টাকা নির্দিষ্ট হয়, পরে ইহা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ১০০০৲ হইয়া ১৫০০৲ টাকা মাসিক বেতন হয়। তাছাড়া তাঁহার ভাতা ও সাময়িক উপঢৌকন প্রভৃতি ত ছিলই। বস্তুতঃ হয়দরাবাদেও দাঘ সকল প্রকার সুখ, সমৃদ্ধি ও সম্মান লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন। বোধ হয় কোন উর্দু সাহিত্যিকই রাজদরবার হইতে এত সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইতে পারেন নাই। এইভাবে প্রায় ১৮ বৎসর সুখসমৃদ্ধির মধ্যে কালযাপন করিয়া, এমন কি সময় সময় কাহারো কাহারো ঈর্ষাদৃষ্টির কোপে পড়িয়াও—অবশেষে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

নিজাম বহাদুর ও আমীর-উমরাহ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য জনসাধারণের সকলেই দাঘকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। কবি নিজেও একজন মিশুক ও সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন। তাছাড়া তিনি যেমন নিরহঙ্কার ছিলেন, তেমনি কাহারো নামে কখনো কোন নিন্দা বা কটুবাক্য উচ্চারণ করেন নাই। এইরূপ সম্মানলাভের আর একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে তিনি রাজসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে লিপ্ত বা কোন দলভুক্ত ছিলেন না। কেবল সাহিত্যালোচনাই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। তাই দেখিতে পাই অনেক দিন পর আবার উর্দু সাহিত্য-চর্চা হয়দরাবাদে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত হয় এবং অনেক সাহিত্যিক তাঁহার সান্নিধ্যে দাঘের শিষ্যত্বের অধিকারী হইয়া বিশেষ সম্মান লাভ করেন। তাঁহার কাব্য-শিষ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিগণ উল্লেখযোগ্য :—আসফ্‌ উপাধিধারী নিজাম্‌ বহাদুর নবাব্‌ মীর্‌ মঃহব্‌ব্‌

’অলী খান্, উক্টর স্তার মঃহম্মদ ইক্‌বাল্, সায়িল্ দিহলবী, বেখুদ্ দিহলবী, অঃহসন্ মারূহরবী, বেখুদ বদায়ূনী, নসীম ভরতপুরী, জিগর্ মুরাদাবাদী এবং আঘা শায়ির্ দিহলবী প্রভৃতি। কথিত আছে, দাঘের প্রায় ১৫ শতাধিক কাব্য-শিষ্য ছিলেন।

মসনবী, কাসীদা, কিত্বা প্রভৃতি নানা প্রকার কবিতাই তিনি লিখিয়াছেন, তবে ঘজল কাব্যেই দাঘের বিশেষ প্রসিদ্ধি। তাঁহার নিম্নলিখিত কাব্যসমূহ উল্লেখযোগ্য—

(১) চারিটি দেওয়ান: (ক) গুলজারে-দাঘ্, (খ) আফ্‌তাবে-দাঘ্, (গ) মিহতাবে-দাঘ্ ও (ঘ) ইয়াদগারে-দাঘ্। ইহাদের প্রথম দুইটি রামপুরেই লিখিত ও প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কাব্যদ্বয় হয়দরাবাদে লিখিত। এবং এইগুলি প্রৌঢ় বয়সের রচিত বলিয়া কতকটা গভীর চিন্তা-ধারায় পূর্ণ এবং ইহাতে প্রথম যুগের কাব্যদ্বয়ের ন্যায় যৌবনসুলভ চপলতা দৃষ্ট হয় না।

(২) ফরিয়াদে-দাঘ্: একটি মসনবী কাব্য। দাঘের কলিকাতা অবস্থানকালে তাঁহার সহিত তথাকার হিজাব্ উপাধিধারী প্রসিদ্ধ মুন্নী-বাই-এর পরিচয় হয় ও তাঁহারা উভয়ে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এবং পরে আবার রামপুরের মেলা দর্শন উপলক্ষে তাঁহাদের উভয়ের প্রেমবিনিময় ও চিত্তবিনোদন ঘটে। এই সকল ঘটনারই মধুর রূপটি বেশ সরসতার সহিত ফরিয়াদে-দাঘে বিবৃত হইয়াছে। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম-বিনিময়ের রূপটি বেশ সফলতার সহিত চিত্রিত হইলেও ইহার ভাবধারা কোন উচ্চস্তরের নয় বলিয়া এই কাব্য সুধী-সমাজকে কখনই বিশেষ মুগ্ধ করিতে পারে নাই।

(৩) দাঘের কয়েকটি কাসীদা ও রুবায়ী কবিতারও উল্লেখ আছে। কিন্তু কোন উচ্চ ভাবধারার সমাবেশ নাই বলিয়া এই সকল কবিতায় তিনি কখনই কোন সফলতা অর্জন করিতে পারেন নাই।

দাঘ তাঁহার যুগের একজন অতি বিখ্যাত কবি। সরল, সহজ চিন্তাধারার সহিত বাকপটু ও চিত্তচাঞ্চল্যকর শব্দবিন্যাসের জন্য তিনি সহজেই সকল লোকের নিকট হইতে বাহবা পাইয়াছেন। তিনি কখনও কোন কঠিন বেখাপ আরবী ফারসী শব্দ বা কোন জটিল ছন্দের ব্যবহার তাঁহার কাব্যে করেন নাই। সকল সময়েই অতি সাধারণ ও মামুলী শব্দের ব্যবহার দ্বারা তিনি তাঁহার কাব্যে মাধুর্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার কাব্যে অলঙ্কারের বাহুল্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহা যেন সুলভ ফুলের তৈয়ারী মালা।

দাঘের চিন্তাধারার মধ্যে সাধারণ পাঠককে খুশী করার সকল মাল-মসল্লাই থাকিলেও আমরা দেখিতে পাই যে তাহাতে গভীর ভাবের যেমন কোন সমাবেশ নাই, তেমনি মৌলিকতারও বিশেষ অভাব। তাঁহার কাব্য-রসে গভীর প্রেমের কোন নিদর্শন নাই, তাহা যেন বাজারী। কোন উচ্চ ভাবধারা নিহিত না থাকিলেও সহজ, সরস ও সুরময় শব্দ ও অলঙ্কারের প্রয়োগদ্বারা তাঁহার ঘজল কাব্যকে তিনি চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। আর এইসকল গুণের জন্যই তিনি সকল সমসাময়িক কাব্য-রসিকদের নিকট হইতে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক হালী তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

দাঘ ও মজরূহ কো সুন্ লো কি ফির্ ইস্ গুল্সন্ মেঁ ;
না সুনেগা কোয়ী বুল্বুল্ কা তরানা হরগিজ।

داغ و مجروح کو سن لو کہ پھر اس گلشن میں —
نہ سنیگا کوئی بلبل کا ترانہ هرگز

অর্থাৎ, দাঘ আর মজরূহ-র কবিতা (এখনই) শুনিয়া লও, (কারণ) পরে আর এই (কাব্য-) বাগানে কোন বুলবুলের গান শুনিতে পাইবে না।

নিদর্শনস্বরূপ দাঘের একটি প্রসিদ্ধ ঘজলের কতকাংশ উদ্ধৃত হইল।

খুদা করিম্ হৈ ইয়ূন্ তো মগর্ হৈ ইৎনা রশ্ক্ ;
কি মেরে 'ইশক সে পহলে তুঝে জমাল্ দিয়া।
আজ রাহী জহান্ সে দাঘ হোআ ;
খানহ্-ই-'ইশ্ক্ বে-চিরাঘ হোআ।
জো 'আশিকী মেঁ খাক্ হোআ কীমিয়া হোআ ;
কহতা থা আজ খাক্ মেঁ কোয়ী মিলা হোআ।

... ...

মৈ পী তো সহী তৌবহ ভী হো জায়েগী জাহিদ্ ;
কম্বখৎ ক্বিয়ামৎ অভী আয়ী নহীঁ জাতী।
ইয়াদ্ সব্ কুছ্ হৈঁ মুঝে হিজর্ কে স্বদমে-জালিম্ ;
ভূল্ জাতা হোঁ মগর্ দেখ কে স্ব রৎ তেরী।

অর্থাৎ, ভগবান দয়ালু ঠিকই, কিন্তু তিনি এমনি হিংসুক যে আমার প্রেমের (সৃষ্টির) পূর্বে তোমাকে সৌন্দর্য দান করিয়াছেন। (তাই) সংসারে দাঘ নগণ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে—(আর) প্রেমের গৃহ আলোহীন হইয়াছে। যে প্রেমের মধ্যে (নিজকে বিলাইয়া) মাটিতে রূপান্তর লাভ করিয়াছে, সে

(বস্তুতঃ) পরশপাথর হইয়া গিয়াছে।—যদিও (লোকে) বলে যে মাটিতে মিশিয়া কি লাভ হইয়াছে?...মদ্যপান করিলে সাধুও সব প্রায়শ্চিত্ত ভুলিয়া যায়। (ভয় কী?)—হতভাগ্য কিয়ামত তো আর এখনি চলিয়া আসিতেছে না? নিষ্ঠুর বিরহের কথা আমার সবই মনে আছে, কিন্তু তোমার চেহারা দেখিলে আমি সকল ভুলিরা যাই।

হকীম সৈয়দ জামিন্ আলী জলাল হকীম আস্‌ঘর্ আলী দাস্তান্ গো-র পুত্র। তিনি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি আরবী-ফারসীতে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার পিতৃ-ব্যবসা চিকিৎসা-শাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু বাল্যকালেই তাঁহার কাব্যের প্রতি এত অনুরাগ ছিল যে তিনি শীঘ্রই কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত হইলেন। প্রথমে তিনি হিলালের নিকট কাব্যশিক্ষা লাভ করেন, পরে তাঁহারই মাধ্যমে প্রসিদ্ধ নাসিখের কবিশিষ্য রশক্-এর সহিত পরিচিত হন এবং ক্রমে তাঁহার একজন শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন। আর রশক্ ইরাক ভ্রমণে বাহির হইলে তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে তখনকার সুবিখ্যাত কবি নবাব ফতহ-উদ্দৌলা বর্‌ক্-এর হস্তে ন্যস্ত করিয়া দিয়া যান। সেই সময়ে লক্ষ্ণৌ শহর কাব্য-চর্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং আমাদের কবিবরও তাঁহার কবি-গুরু বর্কের সহিত সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের সমাগমে অলঙ্কৃত মুশায়িরাতে যোগদান করিবার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের দুর্যোগে তাঁহাকেও কাব্যচর্চায় ইস্তাফা দিয়া লক্ষ্ণৌ শহরে একটি দাওয়াখানা বা চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া তাঁহার স্বকীয় ব্যবসায়ে আবার মনোনিবেশ করিতে হয়। তাহা হইলেও কাব্য-সাধনা হইতে তিনি কখনই বিরত হইতে পারেন নাই। এবং যখন রামপুরের নবাব ইয়ুসুফ আলী খানের সুখ্যাতির কথা অবগত হইলেন, তৎমুহূর্তে লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিয়া রামপুরে রওয়ানা হইলেন। কিছুকাল পরেই পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কলব আলী খান রামপুরের অধিপতি হইলে, নবাব সাহেব আমাদের কবিবর হেকিম সাহেবের ১০০৲ টাকা মাসিক বেতন নির্দিষ্ট করেন। তিনি তথায় প্রায় বিশ বৎসর বাস করেন। এবং তাঁহার সমসাময়িক সভাকবি দাঘ, মীনায়ী ও তস্‌লীমের সহিত মুশায়িরা বা সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করিয়া উর্দু কাব্য চর্চার যথেষ্ট প্রসার করেন। নবাব কলব আলীর মৃত্যুর পর কৌন্সিল অব রিজেন্সী নিযুক্ত হইলে রামপুরে উর্দু-চর্চার ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। আমাদের হেকিম সাহেব তাই তখনকার উর্দু-চর্চার আর একটি ক্ষুদ্র অথচ বেশ প্রসিদ্ধ কেন্দ্রস্থল মঙ্গরূলে

তথাকার অধিপতি নবাব হুসেন মিয়াঁ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। কিন্তু তাঁহার নিজ জন্মভূমি হইতে একান্ত দূরবর্তী এবং ইহার জলবায়ুও পছন্দ না হওয়ায় শীঘ্রই তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ জন্মভূমি লক্ষ্ণৌতে ফিরিয়া আসেন। মঙ্গরুলের রয়িস্ বা অধিপতি ছিলেন একজন গুণী ব্যক্তি। আমাদের কবিবর নিজদেশে ফিরিয়া আসিলেও তিনি তাঁহাকে পূর্বের মত তাঁহার শেষজীবন পর্যন্ত ২৫৲ টাকা মাসিক ভাতা ও কবিতা পিছু ১০০৲ টাকা উপহার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাই আজীবন কাব্য-চর্চায় মনোনিবেশ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া অবশেষে জলাল তাঁহার ৭৬ বৎসর বয়সে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতেই প্রাণত্যাগ করেন।

জলালের নিম্নলিখিত কাব্য ও গ্রন্থাদির উল্লেখ আছে।

(১-৪) তাঁহার কাব্য সম্বলিত চারিটি দেওয়ান।

(৫) সর্মায়ায়ে-জবানে-উর্দু: ইহা উর্দু শব্দবিন্যাস ও বাগ্‌ধারার (মহাওরহ ও ইস্‌তলাহ) একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থ।

(৬) আফাদায়ে-তারীখ: তারীখ-কবিতা সম্বন্ধীয় আলোচনা।

(৭) মুন্তিখবুল্-কওয়াইদ: ইহাতে নানা হিন্দী শব্দের মূল ও আরবী-ফারসী হইতে উদ্ভূত উর্দু শব্দাদির প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৮-৯) দুইটি উর্দু অভিধান: ইহাদের নাম যথাক্রমে তন্‌কীহ্-উল্-লুঘাৎ ও গুল্‌শনে-ফয়েজ্। (১০) রিসালায়ে-দস্তূরুল্-ফুস্‌হা: ছন্দ-সম্বন্ধীয় একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

(১১) মুফিদুশ্-শুঅরা: সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থ।

উপরি-উল্লিখিত গ্রন্থাদি হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে জলাল যেমন ছিলেন একজন কবি, তেমনি ছিলেন কাব্যের একজন সূক্ষ্ম সমঝদার ব্যক্তি। তবে দুঃখের বিষয় নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ-ধারণা এবং আত্মম্ভরি-ভাব ছিল বলিয়া তাঁহার কাব্যে তিনি কখনও সহজ ও সরস সুর ও ভাবধারার প্রবর্তন করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ তিনি কাব্যের অন্তর-প্রকৃতি হইতে বাহ্যিক রূপের প্রতিই বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। এবং এই বিষয়ে তিনি এই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন।

জলালের অন্যান্য শিষ্যবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিগণ উল্লেখযোগ্য :— তাঁহারই পুত্র কমাল্, মীর্ জাকির হুসেন ইয়াস্ এবং তৎপুত্র আর্জু, আহসন শাজহান-পুরী এবং সর্দার উধম্ সিংহ।

মুন্‌শী আমীরুল্লা তস্‌লীম্ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ফয়জাবাদের নিকটবর্তী মঙ্গলসী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মৌলবী আব্দুস্-স্বমদ্ মহম্মদ আলী শা-র রাজত্বকালে ৩০৲ টাকা বেতনে লক্ষ্ণৌ শহরেরই সৈন্য-বিভাগের এক চাকরীতে যোগদান করেন। এবং পরবর্তীকালে তাঁহার পুত্রও এই চাকরীতেই যোগদান করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি কবি স্বভাব ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রাথমিক আরবী-ফারসী শিক্ষা মৌলবী সলামৎ উল্লা রামপুরী হইতে প্রাপ্ত হন। তাছাড়া বাল্যকাল হইতেই সুন্দর হস্তাক্ষরে তিনি বেশ সুনিপুণ ছিলেন। এবং শীঘ্রই তাঁহার পূর্ববর্তী সৈন্য-বিভাগের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া মুন্সী নবল কিশোর প্রেসে মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে এক চাকরী গ্রহণ করেন। কবি-হিসাবে তিনি দিহ্‌লবী-পন্থী ছিলেন এবং তাঁহার কবি-গুরু ছিলেন নসীম্-দিহ্‌লবী। তস্‌লীম্ নিজেই গাহিয়াছেন,

মৈঁ হোঁ অয় তস্‌লীম্ শাগ্‌রিদে-নসীম্ দিহ্‌লবী ;
মুঝ্‌কো ত্বর্জে-শায়িরানে-লখনৌ সে কিয়া ঘরজ্।

میں ہوں اے تسلیم شاگرد نسیم دہلوی —
مجھکو طرز شاعران لکھنؤ سے کیا غرض

অর্থাৎ, হে তসলীম্, আমি নসীম দিহলবীর শিষ্য—আমার লখনোয়ী-কবিদের রীতি অনুসরণের কি দরকার ?

তসলীম্ প্রথমে উআজিদ আলী শা-র একজন দরবারী-কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পদচ্যুতির পর কবিবর নিজ ভাগ্যান্বষণে লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিয়া রামপুর রওনা হন। যুবরাজ কলব আলী খানের সহিত কতকটা পরিচিত হইলেও তথায় বিশেষ কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া আসেন এবং নবল কিশোর প্রেসেই আবার একটি চাকরী গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নবাব কলব আলী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তস্‌লীমকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগে কোন রাজকীয় পদে নিযুক্ত করেন। কলব আলীর মৃত্যুর পর তিনি উর্দু চর্চার কেন্দ্রস্থল টোঙ্ক ও মঙ্গরুল গমন করেন। এই উভয় স্থানেই কিছুকাল অবস্থিতির পর রামপুরের পরবর্তী নবাব সৈয়দ হামিদ্ আলী খান তস্‌লিমকে ফিরাইয়া আনেন এবং শিক্ষা ও কর্ম-দক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে মাসিক ৪০৲ টাকা পেন্সন জীবৎকাল নির্দিষ্ট করেন। তাঁহার ৯১ বৎসর বয়সে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তসলীম্ প্রাণত্যাগ করেন।

তস্‌লীম বিশেষ করিয়া মস্‌নবী-কাব্য লিখিয়াই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার নিম্নলিখিত কাব্য ও গ্রন্থাদির উল্লেখ আছে। তিনি ঘজল সম্বলিত চারিটি দেওয়ান লিখিয়াছেন। কথিত আছে, ইহাদের মধ্যে সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে লিখিত প্রথম দেওয়ানটি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় নষ্ট হইয়া যায়। অন্যগুলির নাম যথাক্রমে—(১) নজমে-আর্জুমন্দ, (২) নজমে-দিল্-আফরূজ ও (৩) দফতরে-খয়াল্।

তাঁহার মস্‌নবী-কাব্যসমূহের নাম যথাক্রমে—(১) নালায়ে-তস্‌লীম্, (২) সামে-ঘরীবান্, (৩) সুব্‌হে-খন্‌দান্, (৪) দিল্ ও জান্, (৫) নঘমায়ে-বুল্‌বুল্, (৬) শৌকতে-শাজহানী, (৭) গৌহরে-ইন্তিখাব, (৮) তারীখে-রামপুর্ ও (৯) সফর্‌নামায়ে-ইউরূপ—ইহাতে রামপুরের নবাব সাহেবের ইউরোপ ভ্রমণ বৃত্তান্ত কাব্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে।

তস্‌লিমের প্রসিদ্ধির তিনটি কারণ উল্লিখিত হইয়া থাকে। প্রথম, তাঁহার মসনবী ও ঘজল কবিতা; দ্বিতীয়, মৌমিনকে অনুসরণপূর্বক তাঁহার সহজ ও সরস কবিতা; আর তৃতীয়, পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ কবি হসরৎ মোহানীর কবিগুরু। বস্তুতঃ তাঁহার আরো অনেক প্রসিদ্ধ কবি-শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গয়াবাসী আরশ এবং বুল্‌বুল্ নামে বিখ্যাত স্ববর্ অন্যতম।

হয়দরাবাদ উর্দু-কাব্য চর্চার জন্য চিরকাল প্রসিদ্ধ। প্রথম নিজামুল্-মুল্‌ক্ আসফ্‌জাহ যেমন বীজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তেমনি সেই সকল রাজাদের সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ও অন্যান্য সাহিত্যোচিত গুণাবলীরও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। হয়দরাবাদের নিজাম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কমরুদ্দীন খান নিজামুল্-মুল্ক্ আসফজায়ে-আউঅল্ ১৬৭১ হইতে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার ফারসী কাব্যে বিশেষ অধিকার ছিল এবং কথিত আছে, তিনি উর্দু কবিতাও লিখিতে পারিতেন।

এই রাজ্যের রাজা ও উমরাহদের গৌরব ও অন্যান্য গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া দেশবিদেশ হইতে অনেক মুসলিম্ পণ্ডিত ও সাহিত্যিক তাঁহাদের রাজদরবারে আসিয়া সমবেত হন এবং তাঁহারা বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া একান্তচিত্তে কাব্যসাধনাদ্বারা দেশের ও দশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। পূর্বযুগে বিশেষ করিয়া ফারসী সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, আর এই যুগে উর্দু সাহিত্যের চর্চা ও বিকাশ হয়।

প্রথম আসফ্‌জায়ের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ষষ্ঠ নিজামুল্‌-মুল্ক্‌ আসফ্‌জাহ নামে প্রসিদ্ধ হিজ হাইনেস্‌ মুজফর্‌ উল্‌-মুল্‌ক্‌ ফতহ জঙ্গ নবাব মীর মহব্‌ূব আলী খান বহাদুর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আর প্রায় তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি বাল্যকাল হইতে উপযুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষকের গুণে যেমন আরবী ও ফারসীতে অশেষ জ্ঞান লাভ করিলেন, তেমনি উর্দু ও ইংরেজী ভাষায়ও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, সাহিত্যানুরাগ ও উর্দু পৃষ্ঠপোষকতার সংবাদে মুগ্ধ হইয়া যে সকল কবি ও সাহিত্যিক দূরদেশান্তর হইতে তাঁহার রাজদরবারে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে—কিরামৎ আলী, হয়দর আলী, আমীনুদ্দীন্‌ খান্‌, ওহীদুল্‌-জমান্‌ খান্‌, মিহদী আলী, মুশ্‌তাক্‌ হুসেন, সৈয়দ হুসেন বিল্‌গরামী, সৈয়দ আলী বিল্‌গরামী, নজীর আহমদ্‌ ও সৈয়দ আজিজ্‌ মীর্জা অন্যতম।

এই সকল গুণীব্যক্তিদের ছাড়া অনেক সাহিত্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থও এই মহান মীর মহব্‌ূব আলী খান বহাদুরের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহার দরবার হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সৈয়দ আহমদ দিহলবীর প্রসিদ্ধ উর্দু অভিধান লুঘাতে-ফরহঙ্গে-আস্বফিয়া এই সময়কার এক অপূর্ব কীর্তি। খানবহাদুর এই গ্রন্থ প্রণেতাকে কেবল ইহার যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই, তাঁহার আজীবন ৫০৲ টাকা মাসিক পেন্সন মঞ্জুর করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে (সৈয়দ আলী বিলগরামী কর্তৃক অনূদিত) তমদ্দ্‌ুনে-আরব এবং তারীখে-দিকন অন্যতম। তাঁহারই উৎসাহ ও সৌজন্যে এই যুগের অন্যান্য আরো অনেক ভারতীয় উর্দু কবি ও সাহিত্যিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে হালী, শিব্‌লী নুমানী, (তফ্‌সীরে-হক্কানীর সম্পাদক) আব্দ্‌ুল হক্‌, রতননাথ সরশার্‌, আব্দ্‌ুল হলীম্‌ শরর ও অধ্যাপক শাহবাজ্‌ অতি বিখ্যাত। তাছাড়া হয়দরাবাদের দরবারে বিখ্যত উর্দু কবি দাঘের প্রসিদ্ধি ও প্রতিপত্তির কথা ইতিপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

মীর মহবুব আলী নিজেও একজন কবি ছিলেন এবং তাঁহার কবি-নাম আস্বফ। তাঁহার কবি-গুরু ছিলেন দাঘ। আর তাঁহার কাব্যধারায় তিনি অনেকটা তাঁহার কবিগুরুকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার ঘজল-সম্বলিত দুইটি দেওয়ানের উল্লেখ আছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

দরবারের উজীরে-আজম্ বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন উর্দু সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক, তেমনি নিজেও একজন উর্দু কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁহার কবি-নাম শাদান্। তিনি জাতিতে হিন্দু এবং ক্ষত্রিয় বংশ-সম্ভূত। তিনি ফারসী ও উর্দু এই উভয় ভাষায়ই বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার দুইটি উর্দু দেওয়ান এবং একটি ফারসী দেওয়ানের উল্লেখ আছে। তাছাড়া তিনি ইশ্‌রৎ কাদায়ে-আফাক্ নামক একটি আলোচনা-গ্রন্থও লিখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নিজের বংশ-পরিচয় ও জীবন-ইতিহাস ছাড়া তিনি সমসাময়িক অন্যান্য অনেক বিষয়েরও আলোচনা করিয়াছেন।

রাজা গিরিধারী পরশাদ বাকী (১৮৪০-১৯০০ খৃষ্টাব্দ) হয়দরাবাদ দরবারের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি জাতিতে কায়স্থ হইলেও যেমন ছিল তাঁহার আরবী-ফারসীতে জ্ঞান, তেমনি সংস্কৃতেও তিনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তিনি একজন উর্দু কবি এবং তাঁহার উর্দু সাহিত্যের প্রতি উদার অনুরাগ ও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। তাঁহার নিম্নলিখিত কাব্য ও গ্রন্থাদি উল্লেখযোগ্য :—ভগবৎ গীতার ফারসী কাব্যানুবাদ, কুল্লিয়াতে-বাকী, কসায়িদে-বাকী, কুন্‌জুল-তারীখ, পীরায়ায়ে-আরুজ্ ও আয়নায়ে-সুখুন। তিনি যেমন সুফী-জীবন যাপন করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার কাব্যের ভাব-সামগ্রীও বেশ গভীর ও সুফী-চিন্তাধারায় পূর্ণ। তিনি শম্‌সুদ্দীন্ ফয়েজের কবি-শিষ্য ছিলেন।

মহারাজা স্যার কিশন পরশাদ শাদ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উচ্চ-বংশ-সম্ভূত এবং পূর্বে উল্লিখিত মহারাজা কবিবর শাদান তাঁহার একজন নিকট আত্মীয়। তাঁহার পূর্বপুরুষগণও দীর্ঘকাল হইতেই বংশ পরম্পরায় হয়দরাবাদের দরবারে সম্মানিত পদসমূহ অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ঠাকুরদাদা নিরন্দর পরশাদ নাবালক নিজামুল্-মুল্ক মহবুব খানের কৌন্সিল্ অব রিজেন্সীর একজন সভ্য ছিলেন। এই নিরন্দর পরশাদ হইতেই আমাদের মহারাজা বহাদুর আরবী, ফারসী, ইংরেজী, মারাঠী, তেলঙ্গী প্রভৃতি যাবতীয় ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি বিশেষ করিয়া আরবী, ফারসী ও উর্দুতে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আর তিনি উর্দু ভাষায় অনেক কাব্য ও আলোচনাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার কবি-নাম শাদ্। তাঁহার ৪০-এর অধিক সাহিত্যগ্রন্থের উল্লেখ আছে।

(১) (নিয়মতিয়া-কবিতা সম্বলিত) খম্‌কদায়ে-রহমৎ ; (২) বুজ্‌মে-খয়াল্‌ (তিনভাগে বিভক্ত) ; (৩) রুবায়িয়াতে-শাদ্‌ ; (৪) ফরিয়াদে-শাদ্‌ ; (৫) হুদয়ায়ে-শাদ্‌ ; (৬) ইমানে-শাদ্‌ ; (৭) খমারে-শাদ্‌ ; (৮) নঘ্‌মায়ে-শাদ্‌ ; (৯) মৎলায়ে-খুর্শীদ্‌ ; (১০) আর্মঘানে-উজ্জারৎ ; (১১) মখজমুল্‌-কওয়াফী ; এবং (১২) মসনবীয়ে-আয়নায়ে-উজ্‌দ্‌।

শাদ্‌ নিজামুল্‌-মুল্‌ক মহবুব খানের কবি-শিষ্য ছিলেন। এবং তাঁহার কাব্যে তাঁহার কবি-গুরু আসফের ভাবধারাই লক্ষিত হয়। ভাষা সরল, সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়াও শাদের কাব্য গভীর ভাবপূর্ণ ও সুফী চিন্তাধারায় সমুজ্জল। আরবী ফারসী হইতে অনূদিত তাঁহার উর্দু কবিতাসমূহ এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি উজীর বা মন্ত্রী-পদ লাভ করেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রধানমন্ত্রী বা উজীরে-আজম্‌ নির্বাচিত হন। তিনি যেমন নিজামীদরবার হইতে রাজায়ে-রাজগানে-মহারাজ বহাদুর ও ইয়মীমুস্‌-সুল্‌তানৎ প্রভৃতি সম্মানজনক উপাধি লাভ করিয়াছেন, তেমনি ইংরেজ সরকার হইতে সি. আই. ঈ. এবং জি. সি. আই. ঈ. উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

সপ্তম আসফজাহী নিজামুল্‌-মুল্‌ক স্যার উস্‌মান আলী খান বহাদুরও তাঁহার পিতার ন্যায়ই যেমন ছিলেন উর্দু সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক, তেমনি একজন উর্দু কাব্যকার এবং কাব্য ও সাহিত্যের অতি সমঝদার ব্যক্তি। আমীর মিনায়ীর কবি-শিষ্য তাঁহার দরবারী-কবি জলীলের নিকট হইতে তিনি কাব্যে দীক্ষালাভ করেন। তিনি বিশেষ করিয়া ঘজল কবিতা লিখিয়াই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এবং তাঁহার একটি উর্দু-দেওয়ানেরও উল্লেখ আছে। তাঁহার কবি-নাম উস্‌মান্‌। তিনি আরবী এবং ফারসী ভাষায়ও বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন।

এই উর্দু সাহিত্যের একান্ত পৃষ্ঠপোষক উস্‌মান্‌ আলী খান বহাদুরের নামানুসারেই উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (১৯১৯ খৃষ্টাব্দ) হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষা উর্দুভাষার মাধ্যমে প্রবর্তিত হওয়ায় উর্দুভাষা প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্তর্ভুক্ত দারুল-তর্জমার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় অনেক বিদেশী ভাষা-গ্রন্থেরই অনুবাদ হইয়াছে।

এই সঙ্গে আঞ্জুমানে-তরকীয়ে-উর্দু-র উল্লেখও করা যাইতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানটি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের আর একটি শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে

পরিগণিত হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে পৃথকভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রচেষ্টা হয় এবং যাহাতে উর্দু ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের মধ্যে স্থান পাইতে পারে তাহার সর্বপ্রকার আগ্রহ ও যত্ন লওয়া হইয়া থাকে।

(ঝ) মধ্যযুগের গদ্য-সাহিত্য

মধ্যযুগের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য গদ্য-রচনা নৃ-ত্বর্জে- মুরস্বা। তহসীন্ কবি নামধারী মীর মহম্মদ ইসা হুসেন খান ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহাকে সুপ্রসিদ্ধ ফারসী কবি আমীর খস্রুর কিস্‌সয়ে-চহার্ দরবেশ হইতে উর্দুতে অনুবাদ করেন। মুরস্বা (=মুরস্ব'অ বা শব্দালঙ্কার বাহুল্য)-রীতিতে রচিত বলিয়া ইহার গ্রন্থকার 'মুরস্বা-রকম্' উপাধিতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি সর্বপ্রথম আবুল্-মনসুর খান স্বফ্‌দর জঙ্গের দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে জেনারেল স্মিথের মীর মুন্সী নিযুক্ত হন। জেনারেল সাহেবের সহিত তিনি কলিকাতায়ও গিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহার প্রভু নিজদেশে চলিয়া গেলে তহসীন তাঁহার মাতৃভূমি পাটনায় ফিরিয়া আসেন এবং তথায় আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। তথায় তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর পাটনা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ফয়জাবাদ আসেন এবং তথাকার নবাব শুজাউদ্দৌলার দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। তাঁহার প্রসিদ্ধ নৃ ত্বর্জে-মুরস্বা উক্ত নবাবের নামে উৎসর্গ করা হয়। ইহা ছাড়া তাঁহার কয়েকটি ফারসী গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে। আর এই গ্রন্থও আরবী-ফারসীর বাহুল্যযুক্ত ছন্দিত ভাষায় রচিত। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই ডক্টর গিল্‌ক্রিষ্ট সাধারণের উপযোগী করিয়া সহজ, সরল উর্দু ভাষায় ইহার পুনরানুবাদ করিয়া ইহার নামকরণ করেন বাঘ ও বহার্।

উর্দু-কাব্যে ইংরেজ শাসন ও তাহার সাহিত্যের প্রভাব আরো পরে লক্ষিত হইলেও উর্দু-গদ্যে ইহার প্রভাব এই সময় হইতেই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসক-বর্গ বুঝিতে পারিলেন যে দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে হইলে জনসাধারণের সহিত সহজ, সরলভাবে মিশিতে হইবে এবং ইহার জন্য সর্ব-প্রথম প্রয়োজন দেশীয় ভাষায় জ্ঞান। তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিনায়কগণ

পরস্পরকে জানিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে একদিকে ইংরেজদের দেশীয় ভাষাসমূহ, বিশেষ করিয়া হিন্দুস্তানী ভাষা শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করা হইল; আবার দেশীয় লোকদের ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ সুবিধা করা হয়। এই ভাষা জ্ঞানের সহিত ক্রমশঃ ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব উর্দু কাব্যে ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই প্রভাব পরবর্তী যুগেই আরো বিশেষ করিয়া লক্ষিত হয়।

ডক্টর জোন গিলক্রেষ্ট এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সর্বপ্রথম অধিকর্তা নিযুক্ত হইলেন। তিনি লণ্ডনের অধিবাসী ও ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন সরকারী চিকিৎসকরূপে ভারতবর্ষে আসেন। কথিত আছে, তিনি হিন্দুস্তানী ভাষা শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় পোষাক পরিধান করিয়া হিন্দুস্তানী উপভাষা সমূহের সকল কেন্দ্রস্থল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। এবং এইরূপে হিন্দুস্তানী ছাড়া অন্যান্য দেশী ভাষায়ও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তদুপরি সংস্কৃত, আরবী-ফারসী এবং অন্যান্য প্রাচ্যভাষাসমূহেও তাঁহার বেশ দখল ছিল। ভারতীয় দেশীয় ভাষাসমূহের প্রতি এতাদৃশ আকর্ষণ দেখিয়া তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলিস্‌লি দেশীয় ভাষার শিক্ষা ও প্রচারার্থে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করেন এবং তদুপরি তাঁহাকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্তানী শিক্ষার প্রধান অধিকর্তা নিযুক্ত করেন। এখানে লক্ষণীয় যে হিন্দুস্তানী ভাষার এইরূপ প্রচারের ফলেই এই সময়ে ফারসীর স্থলে উর্দু ভাষা সরকারী ভাষায় পরিগণিত হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ কলিকাতায় স্থাপিত হয়।

কিন্তু গিলক্রেষ্ট বেশীদিন এখানে চাকরী করিতে পারেন নাই। শীঘ্রই ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে পেন্‌শন বা কার্যাবসর-ভাতা গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুকাল নিজ জন্মভূমিতে অবস্থান করার পরে তিনি লণ্ডনে আসিয়া ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের ভারতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে ওরিয়েণ্টেল ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ স্থাপিত হইলে তিনি তথাকার উর্দু অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল পর ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ উঠিয়া গেলেও তিনি নিজের তত্ত্বাবধানেই অনেক উৎসাহী যুবককে উর্দু শিখাইতে থাকেন। ১৮৪১ খৃটাব্দে তাঁহার ৮২ বৎসর বয়সে গিলক্রেষ্ট প্রাণত্যাগ করেন।

গিলক্রেষ্ট হিন্দুস্তানী ভাষা বিষয়ক নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ডক্টর

গ্রিয়ারসন তাঁহার লিঙ্গুয়িস্টিক্ সার্ভে অব ইণ্ডিয়া Linguistic Survey of India নামক বিরাট গ্রন্থের নবম খণ্ডে গিলক্রষ্টের লিখিত গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) ইংলিশ-হিন্দুস্তানী অভিধান (২ খণ্ডে—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে রচিত) ;

(২) ওরিয়েণ্টেল্ লিঙ্গুয়িষ্ট (বা প্রাচ্য ভাষাবিদ)—১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে রচিত ; (৩) হিন্দুস্তানী গ্রামার (১৭৯৬) ; ও

(৪) হিন্দুস্তানী ফিললজী (বা ভাষাতত্ত্ব)।

তাছাড়া তাঁহারই উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে অনেক ইংরেজ কর্মচারী ও উর্দু বিদ্বজ্জন উর্দু সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা করিয়াছেন এবং নানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তদন্তর্ভুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য :— কাপ্তান রোবাক, কাপ্তান টেলার ও ডাক্তার হণ্টার।

যে সকল হিন্দুস্তানী যুবক তাঁহার অধীনে শিক্ষকতা করিয়াছেন ও তৎসঙ্গে উর্দু সাহিত্যের বিশেষ চর্চা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেন—মীর্ অম্মান, অফ্সোস্, হুসেনী, লুৎফ্, হয়দরী, জোওয়ান্, লল্লুলাল্ জী, নিহাল্ চন্দ, ইক্রাম আলী ওইলা, সৈয়দ মহম্মদ মুনীর্ এবং মুরারীলাল গুজরাতী।

'লুৎফ' কবিনামধারী মীর্ অম্মান দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন। আহমদ শা দুর্রানীর ভারত আক্রমনের ফলে তাঁহার বাড়ীঘর লুটপাট হইয়া গেলে তিনি প্রথমে আসিয়া পাটনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরে তথা হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। কিছুকাল নবাব দিলাওর জঙ্গ বহাদুরের ছোট ভাই মীর মহম্মদ কাজিম্ খানের শিক্ষকতা-পদে কাজ করার পর ডাক্তার গিলক্রষ্টের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এবং ইহারই ফলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়াতে প্রসিদ্ধ আমীর খস্রুর চহার্-দরবেশের উর্দু তর্জমা করিবার ভার তাঁহার উপরে অর্পিত হয়। আর ইহার তারীখী (অর্থাৎ প্রকাশনার দিন-নির্দেশক)-নাম হয় বাঘ ও বহার্। ইহা হিজরী ১২১৭ বা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। মূল ফারসী গ্রন্থে কবি আমীর খসরু তাঁহার পীর বা গুরুর অসুখের সময় তাঁহার রোগের দুঃখ-যন্ত্রণার উপশমার্থে এই সকল আনন্দদায়ক কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। ইহা অন্যান্য ভাষায়ও তর্জমা হইয়াছে এবং আর একটি উর্দু তর্জমারও উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। মূল ফারসী গ্রন্থের ন্যায় এই অনুবাদ-গ্রন্থও বেশ জনপ্রিয়তা

লাভ করে। মীর অম্মানের এই তর্জমা-গ্রন্থ সম্বন্ধে স্যার সৈয়দ আহমদ সত্যই বলিয়াছেন, জো মর্তবা মীর্ তকী মীর্ কো নজম্ মেঁ হাসিল হৈ ওহী মীর্ অম্মন্ কো নসর্ মেঁ হৈ—

(جو مرتبہ میر تقی میر کو نظم میں حاصل ہے وہی میر امن کو نثر میں ہے)

অর্থাৎ মীর তকী মীর কাব্য জগতে যেরূপ সম্মানলাভ করিয়াছেন, গদ্য-সাহিত্যে মীর অম্মান সেইরূপ সম্মানলাভের উপযুক্ত। এই অম্মন-লিখিত অনুবাদ গ্রন্থই আবার ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া গঞ্জীনায়ে-খুবী নামে তাঁহার আর একটি উপদেশ সংগ্রহেরও উল্লেখ আছে। ইহা মুল্লা হুসেন ওয়ায়িজ কাশিফীর অখ্‌লাকে-মুহ্‌সিনীর অনুকরণে রচিত।

'আফ্‌সোস্' কবিনামধারী মীর শের আলীর জন্মভূমি দিল্লী হইলেও তাঁহার পিতার পূর্ব বাসস্থান ছিল আগ্রায়। তথা হইতে বাদশা মহম্মদ শা-র রাজত্বকালে তাঁহার পিতা মীর আলী মুজফর খান দিল্লী আসেন এবং তথায় উম্‌দতুল-মুলক্ নবাব আমীর খানের অধীনে এক চাকরীতে নিযুক্ত হন। দিল্লীতেই ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে আফসোসের জন্ম হয়। নবাব আমীর খানের মৃত্যুর পরে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে আফসোসের পিতা পাটনায় আসেন এবং তথায় প্রথমে নবাব মীর কাসিম্ ও পরে নবাব মীর্ জাফরের অধীনে কার্যে নিযুক্ত হন। তথায়ও তাঁহার চাকরীর ইস্তফা হইলে আফসোসের পিতা লক্ষ্ণৌ গমন করেন। আফসোস তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তথা হইতে তিনি হয়দরাবাদে গমন করেন এবং তথায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু কাব্যসাধনার প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ হেতু আফসোস লক্ষ্ণৌতেই থাকিয়া যান। বস্তুতঃ সেই সময়ে লক্ষ্ণৌ উর্দু কাব্যসাধনার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল।

আফসোসের কাব্যসাধনায় বিশেষ করিয়া সাহায্য করেন কবি মীর হয়দর আলী হয়রান। কথিত আছে, মীর হসন্, মীর তকী ও মীর সোজ হইতেও তিনি তাঁহার কাব্যানুশীলনে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌতে তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নবাব সালার জঙ্গ ও তাঁহার পুত্র নবাব নওয়াজিশ্ আলী খান্। তথায় অবস্থানকালেই নবাব আসফুদ্দৌলার নায়েব নবাব হসন রিজাদাদের মাধ্যমে তিনি কর্ণেল স্কটের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার সুপারিশে আফ্‌সোস ২০০্ টাকা বেতনে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থাদির উল্লেখ আছে :—

(১) বাঘে-উর্দু : ইহা সুপ্রসিদ্ধ ফারসী কবি শেখ সাদীর গত্যগ্রন্থ গুলিস্তানের উর্দু অনুবাদমাত্র ; এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইহা রচিত হয়।

(২) আরায়িশে-মহফিল্ : ইহা ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রচিত। ইহাতে হিন্দুস্তানের ভৌগোলিক বিবরণ ও ইসলাম আধিপত্যের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু-রাজাদের ঐতিহাসিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আফ্সোস বিশেষ করিয়া এই আরায়িশে-মহফিল্ লিখিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহা শব্দালঙ্কারে পূর্ণ ছন্দিত গদ্যে লিখিত। ইহার ইংরেজী অনুবাদও হইয়াছে।

(৩) কুল্লিয়াতে-সৌদার বিশুদ্ধ সংস্করণ। এবং (৪) উর্দু দেওয়ান।

আফসোস ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

কলিকাতায় উর্দু শিক্ষার্থে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হওয়ায় এবং তথায় উর্দু শিক্ষকের চাহিদার খবর জানিতে পারিয়া দিল্লী হইতে আগত বেনারসের বাসিন্দা সৈয়দ হয়দর বখশ হয়দরী তাঁহার কিস্সায়ে-মিহর ও মাহ (১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রচিত) সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে গিলক্রষ্ট সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহার উর্দু জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া গিলক্রষ্ট হয়দরীকে কলেজের একজন শিক্ষক মনোনীত করেন। হয়দরীর নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই ফারসী সাহিত্যের অনুবাদমাত্র :—

(১) কিস্সায়ে-লয়লামজনুঁ : ইহা আমীর খসরুর কাব্যের উর্দু গদ্যানুবাদ। ইহা হায়দরীর কলিকাতায় চাকরী হওয়ার পূর্বেই রচিত হয়।

(২) তূতা-কহানী : ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রচিত। ইহা সৈয়দ মহম্মদ কাদিরীর ফারসী তূতী-নামাহ-র উর্দু অনুবাদ মাত্র। ইহা আসলে সংস্কৃত শুক সপ্ততির আংশিক অনুবাদ। ইহা দেশী বিদেশী অনেক ভাষায়ই অনূদিত হইয়াছে। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীচরণ তোতা ইতিহাস নামে ইহারই বাঙলা অনুবাদ করেন।

(৩) আরায়িশে-মহফিল্ : ইহা ফারসী কিস্সায়ে-হাতিম্-তায়ির উর্দু অনুবাদ।

(৪) তারীখে-নাদিরী : মুন্সী মির্জা মহদীকৃত নাদির-নামা-র অনুবাদ।

(৫) গুলে-মঘফিরৎ : ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহা তাঁহারই গুলে-শহীদান্-এর সংক্ষিপ্তানুসার। মূল ফারসী গ্রন্থ রৌজতুস্-শুহদা-র রচয়িতা ছিলেন মুল্লা হুসেন ওয়াইজ কাশিফী।

(৬) গুলজারে-দানিশ : ইহা শেখ এনায়েৎ উল্লার ফারসী গ্রন্থ বহারে-দানিশ্-এর অনুবাদ।

(৭) হফ্ৎ-পয়কর্ : সুপ্রসিদ্ধ ফারসী কবি নিজামীর কাব্যের গদ্যানুবাদ। এবং (৮) উর্দু দেওয়ান্।

হয়দরী ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

অন্যান্য যে সকল অনূদিত বা উপদেশমূলক গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আনুকূল্যে বা তত্ত্বাবধানে রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য :—

(১) অখ্লাকে-হিন্দী : মূল সংস্কৃত হিতোপদেশের ফারসী অনুবাদের উর্দু তর্জমা করেন মীর বহাদুর আলী হুসেনী।

(২) মীর হুসেনীর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল নস্‌রে-বেনজীর। ইহা উর্দু কবি মীর হুসেনের বিখ্যাত মসনবী কাব্যের গদ্যানুবাদ। মূল কাব্য রচিত হওয়ার বৎসর দুই পরে আমাদের গ্রন্থকার কর্তৃক ইহা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে অনূদিত হয়।

(৩) শকুন্তলা-নাটক : কালিদাস রচিত মূল সংস্কৃত কাব্যের ব্রজ ভাষায় অনূদিত নাটক হইতে এই উর্দু তর্জমা করেন মীর্জা কাজিম্ আলী জোওয়ান। লল্লূ লালজী কর্তৃক অনূদিত আর একটি শকুন্তলা নাটকেরও উল্লেখ আছে।

(৪) সিংহাসন-বত্তীসী রচিত হয় জোওয়ান ও লল্লূ লালজীর মিলিত প্রচেষ্টায়।

(৫) গুলে-বকাওলী : নিহাল চন্দ লাহোরী কর্তৃক রচিত। ইহার তারীখী নাম মজহবে-ইশ্ক্ (অর্থাৎ ইহা হিজরী ১২১৭ বা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই অনূদিত গ্রন্থের মূল ফারসী শেখ ইজ্জৎ-উল্লা নামক এক বাঙ্গালী ১৭১২ খৃষ্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন।

(৬) গুলশনে-হিন্দ : ইহা জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় এবং মীর্জা আলী লুৎফ কর্তৃক রচিত।

উল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়া কয়েকটি কোরান-অনুবাদও এই সময়ে রচিত হয়। গিলক্রষ্টের আদেশানুযায়ী জোওয়ান কর্তৃক রচিত কোরানের অনুবাদ ছাড়া আরো কয়েকজন অনুবাদকই এই সময়ে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে শাহ ওয়ালী আল্লা ও তৎপুত্র শাহ আব্দুল আজিজ, শাহ রফী-উদ্দীন্ ও শাহ আব্দুল কাদির অন্যতম। পুত্রগণ বস্তুতঃ তাঁহাদের পিতার তর্জমারই বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া তাঁহাদের নিজ অনুবাদসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভাষাবিজ্ঞানের চর্চাও এই যুগে বিশেষভাবে হয়। ইহাতে দেশী-বিদেশী উভয় দলের পণ্ডিতবর্গই সমভাবে যোগদান করেন; বরং বিদেশীয় প্রচেষ্টাই আমাদের সবিশেষ আকর্ষণ করে।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম একজন ইংরাজ কর্তৃক একটি 'হিন্দুস্তানী গ্রামার' রচিত হয়। ইতিপূর্বেই তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া এই গ্রন্থ রচনার সামর্থ্য অর্জন করেন। তাঁহার একটি হিন্দুস্তানী অভিধানেরও উল্লেখ আছে। এবং ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে অন্য একজন ইংরেজ কর্তৃক ইহা সম্পাদিত হয়। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে 'গ্রামটিকা-হিন্দুস্তানীকা' নামক আর একটি ব্যাকরণ এক জার্মন কর্তৃক লাটিন ভাষায় রচিত হয়। ইহাতে বিভিন্ন ভাষার বর্ণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই এই সময়ে আরো কয়েকটি হিন্দুস্তানী ব্যাকরণ বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ ভাষায় 'গ্রামটিকা ইন্তোস্তানা' নামক একটি উর্দু-ব্যাকরণ রচিত হয়। তারপরই ডক্টর গিলক্রুষ্টের যুগ। তিনি নিজে এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে হিন্দুস্তানী পণ্ডিতবর্গদ্বারা যে সকল ভাষাবিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখিয়াছেন বা লিখিত হইয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। এই যুগের কতক ভাষাবিজ্ঞানের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে রচিত আমানৎ-উল্লা খানের স্বরফে-উর্দু, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত সেক্সপিয়র-রচিত 'হিন্দুস্তানী গ্রামার' ও ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই সম্পাদিত 'হিন্দুস্তানী-ইংলিশ ডিক্সিনারী' উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বিদেশীয়দের মধ্যে গার্‌সন্ ডি টাসী, ডাঙ্কন্ ফর্ব্‌স্, কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়ম জোন্স্ ও ডক্টর ফিলনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রচিত প্লেটের 'হিন্দুস্তানী গ্রামার' এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই সম্পাদিত 'হিন্দুস্তানী ডিক্সিনারী'-ও বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

স্বাধীনভাবেও ভারতীয়গণ উর্দু-ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত ইন্‌শা ও কতীলের যুগ্ম-সম্পাদনায় রচিত 'দরিয়ায়ে-লত্তাফৎ'। ইহা ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয় এবং মুর্শিদাবাদ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মুন্সী মহম্মদ ইব্রাহীম কর্তৃক রচিত তুহ্‌ফয়ে-অলফনষ্টিন্, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে আহমদ আলী দিহলবী কর্তৃক লিখিত চশ্‌ময়ে-ফয়েজ এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মুন্সী করীমুদ্দীন-রচিত কওয়ায়িদুল-মুব্‌তদা-র উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মধ্যযুগের শেষদিকে সম্পাদিত কয়েকটি অভিধান-গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গুলশনে-ফয়েজ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন জলাল। তিনি ইহাতে হিন্দী ও উর্দুর সকল শব্দ ও প্রবচনাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে মুন্সী আমীর আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রসিদ্ধ (যদিও অসম্পূর্ণ) আমীরুল-লুঘাৎ, দীর্ঘকাল অধ্যবসায়ের প্রচেষ্টায় সৈয়দ আহমদ দিহলবী কর্তৃক রচিত ফরহঙ্গে-আসফিয়া (চারি খণ্ড) ও নূরুল-হসন্ নৈয়র্ কর্তৃক সম্পাদিত নূরুল-লুঘাৎ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বিদেশীয় শাসকদের উৎসাহ ও প্ররোচনায়ই উর্দু গদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হইলেও ভারতীয়গণও স্বাধীনভাবে এই যুগে গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ফকীর মহম্মদ খান গোইয়া-র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বুস্তানে-হিক্‌মৎ লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। গোইয়ার মৃত্যুর (১৮৫০ খৃষ্টাব্দ) এক বৎসর পূর্বে ইহা লক্ষ্ণৌর নবল কিশোর প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রসিদ্ধ ফারসী-গ্রন্থ আনোয়ারে-সুহয়লীর অনুবাদ মাত্র। গ্রন্থখানি সেইযুগে বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও ইহা কোন সুপাঠ্য পুস্তক নহে। বেশ সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত হইলেও আরবী-ফারসী শব্দ ও বাক্যাংশ পূরামাত্রায়ই ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে।

মীর্জা রজব আলী বেগ সর্‌ওয়ার মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত গদ্যকার। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেমন ছিলেন আরবী-ফারসীতে পণ্ডিত, তেমনি সুন্দর হস্তাক্ষরবিশারদ এবং গায়ক ও তৎসঙ্গে গানের সমঝদার ব্যক্তি। তিনি অনেক কবিতাও লিখিয়াছেন এবং তাঁহার কবি-নাম সরওয়ার (বা সর্‌বর্)। তাছাড়া তিনি বেশ হাস্য-রসিক ও মিশুক ব্যক্তি। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রসিদ্ধ কবি শরফুদ্দীন মীরঠী উল্লেখযোগ্য।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সরওয়ারের স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং প্রায় সেই সময়েই মাসিক ৫০ টাকায় তিনি উআজিদ আলী শার দরবারী কবি নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব-জীবন সম্বন্ধে সবিশেষ না জানিলেও অন্ততঃ এইটুকু জানা যায় যে তিনি ইহার পূর্বে অনেক দিন কানপুরে ছিলেন এবং কতকটা অভাবের তাড়নায় কানপুরেই তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ফসানায়ে-অজায়েব' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে উআজিদ আলী শার

শম্‌শীরে-খানীর উর্দু-গদ্যানুবাদ করেন। আর তাহার নামকরণ হয় সরূরে-সুলতানী। ফসানায়ে-অজায়েবের অনুকরণে ইহাও তিনি অলঙ্কৃত ছন্দিত গদ্যে রূপান্তর করেন। ইতিহাসে এইরূপ রূপান্তরে তিনি মোটেই সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। পরবর্তী কয়েক বৎসর রজব আলী আরো কয়েকটি 'কিস্বা' রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে শররে-ইশ্‌ক্ ও শগূফয়ে-মহব্বৎ উল্লেখযোগ্য।

শররে-ইশ্‌ক্ ভূপালের মহারাজের আদেশে লিখিত হয়। ইহাতে ভূপালের জঙ্গলের বর্ণনা ও তথাকার দুইটি সারস পাখীর ভালবাসার কাহিনী বেশ মনোরমভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আর শগূফয়ে-মহব্বৎ-এ মিহর্ চন্দ্ খৎরীর কয়েকটি প্রাচীন গল্প নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে রচিত হইয়াছে। ইহাতে উআজিদ আলী শার লখ্‌নো হইতে কলিকাতা ভ্রমণের দুঃখদুর্দশার কাহিনীও বিবৃত করা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে উআজিদ আলী শার সিংহাসনচ্যুতির ফলে আবার সরওয়ার দুরবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তায় পতিত হন। কার্নেগীর সরিশ্‌তাদার সৈয়দ কুর্বান্ আলী ও কমিশরিয়টের কর্মচারী মুন্সী শিও পরশাদের আনুকূল্যে এই দুরবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেও সেই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে শীঘ্রই আবার তিনি নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন। কিছুকাল পরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বেনারস হইতে আহূত হইয়া তিনি তথায় মহারাজা ঈশ্বরী প্রসাদ নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বেনারসে তিনি বেশ সম্মানের সহিত পরম সুখশান্তিতে বাস করিয়া গিয়াছেন। তথায়ও তিনি কয়েকটি কাব্য ও গদ্য-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে গুলজারে-সরওয়ার ও শবিস্তানে-সরওয়ার উল্লেখযোগ্য।

গুলজারে-সরওয়ার ফারসী হদায়িকুল-উশ্‌শাকের অনুবাদ হইলেও ইহাতে রজব আলী আপন মাধুরী মিশাইয়া গল্পাকারে মূলগ্রন্থে বর্ণিত আত্মা ও প্রেমের জীবন-রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। শবিস্তানে-সরওয়ারে প্রসিদ্ধ আরবী-গ্রন্থ আলিফ লয়লার কয়েকটি গল্প বেশ সুন্দরভাবে মধ্যে মধ্যে নিজ কবিতার উদ্ধৃতিসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই আলিফ-লয়লার তর্জমা এই যুগে উর্দু সাহিত্যে কয়েক জনই করিয়াছেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মুন্সী শম্‌সুদ্দীন আহমদ হকায়াৎ-উল্-জলীলা নামে ইহার সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ফারিষ্টার সাহেবের ইংরেজীতে অনূদিত গ্রন্থ হইতে উর্দু অনুবাদ করেন মুন্সী আব্দুল করীম।

ইহা বেশ সহজ সরল ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে রচিত হইয়াছে। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে চারিখণ্ডে নবল কিশোর প্রেস হইতে কাব্যাকারে এই আলিফ-লয়লার উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহারই এক খণ্ডের আবার গদ্যানুবাদ করেন মুন্সী তুতারাম আশিয়ান ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে।

রজব আলী আলোয়ার ও রাজপুতনার মহারাজদ্বয় কর্তৃকও আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনে বন্ধুবান্ধবদের নিকট অনেক পত্রালাপ করিয়াছেন। ইন্‌শায়ে-সরূওয়ার (অর্থাৎ তাঁহার পত্রসংগ্রহ) হইতে আমরা তাঁহার দুঃখপূর্ণ জীবনের অনেক কাহিনী জানিতে পারি। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চক্ষুরোগের চিকিৎসার জন্য তিনি কলিকাতায়ও আসিয়াছিলেন এবং তথায় মাটিয়াবুরুজে অন্তরীন উআজিদ আলী শা-র সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফলকাম না হইয়া লখনৌতেই চিকিৎসাদ্বারা চক্ষুরোগ হইতে আরোগ্যলাভ করেন। লক্ষ্ণৌ হইতে তিনি আবার বেনারসে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথায়ই ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

অন্যান্য অনেক গ্রন্থ ও কাব্য লিখিলেও রজব আলী ফসানায়ে-অজায়িব দ্বারাই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইহা আরবী-ফারসী শব্দ ও বাক্যাংশের বাহুল্যযুক্ত অলঙ্কৃত ও ছন্দিত গদ্যগ্রন্থ। ইহাতে যেমন মামুলী প্রেমকথা বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি কোন সত্য ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া ইহা রচিত নহে। ইহাতে অনেক দৈত্য-দানবের সহিত যুদ্ধের বর্ণনা ও নানা আজগুবি ভ্রমণ বৃত্তান্তের কাহিনীই স্থানলাভ করিয়াছে। তাহাতে নানা চিত্রই প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক উপন্যাসের ন্যায় কোন চরিত্র-চিত্রণই মানবতাপূর্ণ খাঁটি চরিত্রে রূপান্তর লাভ করে নাই। কাহিনীর উপক্রমণিকায়ও লখনোর যে চিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে শব্দ ও ভাবের আড়ম্বর যথেষ্টই আছে, কিন্তু ইহা কখনই স্বাভাবিকতায় পৌঁছায় নাই। মোটকথা, ফসনায়ে-অজায়িবে প্রকাশের চাকচিক্য ও মনোহারিত্ব খুবই আছে, কিন্তু ভাবের সহৃদয়তা ও গাম্ভীর্য কিছুই নাই। সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে যে যুগের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহা সর্বজন সমাদর লাভ করিয়াছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে ইহা কখনই সমাদর পাইবে না।

কবি হিসাবে ঘালিবের স্থান উর্দু সাহিত্যে অতুলনীয়। গদ্য-সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট না হইলেও তিনি অবসর বিনোদনের জন্য বন্ধুবান্ধবদের নিকট সে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছেন তাহার মাধ্যমেই উর্দু গদ্যসাহিত্যের

যে বিকাশ হইয়াছে তাহার তুলনা হয় না। তাঁহার চিঠিপত্রের প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব, পত্রের পাঠ অর্থাৎ মূল চিঠির সূচনা বা উপসংহারে মামুলী প্রথা ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিকভাবে তিনি বক্তব্য বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যেন পত্র-প্রাপকের সামনে বসিয়া তিনি কথাবার্তা বলিতেছেন। তাই ভাব প্রকাশের মধ্যে শব্দের কোন আড়ম্বর বা ভাষার কোন জটিলতা নাই। আধুনিক যুগের সাহিত্যে প্রধান যে বিশেষত্ব সহজ ও স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গী, তাহা যেন তাঁহার চিঠিপত্রেই প্রথম সাহিত্য-রূপ পায়। তাঁহার চিঠিপত্রের সংগ্রহ উর্দুয়ে-মুঅল্লা ও উদে-হিন্দী নামে সুপরিচিত।

চিঠি-পত্র ছাড়াও ঘালিব কয়েকটি সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ও অন্যান্য গ্রন্থের ভূমিকা বা সমালোচনা লিখিয়াছেন। এই সকল সমালোচনায় আবার আমাদের কবিবর প্রাচীন ধারার অনুসরণ করিয়াছেন অর্থাৎ যেমন আরবী ফারসী শব্দের বাহুল্য তেমনি শব্দালঙ্কার ও ছন্দিত গদ্যের আমদানী। ঘালিবের গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস তাঁহার কবি-জীবন আলোচনা প্রসঙ্গেই অনেকটা বর্ণিত হইয়াছে।

এই যুগেই (১৮৩২ খৃষ্টাব্দে) উর্দু ভাষা সরকারী ভাষারূপে পরিগণিত হয়। আর ছাপাখানার বহুল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থাদি উর্দুতে অনূদিত হইতে থাকে, তেমনি অনেক মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা, সমাচার বা নানা সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নিবন্ধের প্রকাশ হইতে লাগিল। এইরূপে সংবাদ-সাহিত্যও ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এবং এই সংবাদ-সাহিত্যকে উর্দু ভাষায় যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহার নাম স্যার সৈয়দ আহমদ খান।

জওয়াদু-দৌলা আরিফে-জঙ্গ স্যার সৈয়দ আহমদ খান বহাদুর কে. সি. এস্. আই. ভারতের বিশেষ করিয়া মুস্লিম সমাজের একজন বড় নেতা, চিন্তাশীল দার্শনিক, বহুল গ্রন্থ প্রণেতা ও সংবাদ-সাহিত্যিক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তাঁহারই সমাজ ও সাহিত্য প্রেরণার ফলে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবর্গ তাঁহাদের সাহিত্য-জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

সৈয়দ আহমদ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণের আদিম নিবাস ছিল আরবে। তথা হইতে দামঘান, হমদান ও হিরাতে কিছুকাল বসবাস করিয়া তাঁহারা শাজহানের রাজত্বকালে ভারতে

আগমন করেন। ভারতে তাঁহারা বেশ সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিতই বাস করিতে থাকেন। দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বকালে সৈয়দ আহমদের ঠাকুরদাদা রাজদরবার হইতে জওয়াদ্-দৌলা উপাধি প্রথমে লাভ করেন। তাঁহার পিতা মীর তকী বিশেষ নিরভিমান ও শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কথিত আছে, সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শা তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। সৈয়দ আহমদ তাঁহার বাল্যশিক্ষা তাঁহার পরম গুণবতী মার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাহারই ফলে তিনি সহৃদয়, সমাজসেবী ও সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাছাড়া তাঁহার পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনে একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহার ফলে তিনি সেই সময়কার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকবর্গ, যথা ঘালিব, আজর্দহ্, শীফ্‌তহ ও মৌমিন প্রমুখ ব্যক্তিদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কথিত আছে, উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ঘালিবকে তিনি 'চাচা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ দিল্লীতেই সিরিস্তদার-পদ লাভ করিয়া তাঁহার চাকরী জীবন আরম্ভ করেন। পরবর্তী বৎসরই তিনি 'নায়িবে-মীর মুন্সী'-পদ লাভ করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মুন্সেফী পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি মুন্সেফী-পদে উন্নীত হইলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ হজরৎ মহম্মদের জন্মবিষয়ক 'জলা-উল কুলুব্' রচনা করেন। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তুহফয়ে-হসন্, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে (মইয়ারুল-উকুলের অনুবাদ গ্রন্থ) তহসীল ফী জরহ অল-সায়িল, ১৮৪৬ সনে ফুআয়িদুল-অফ্‌কার ও কৌলে-মতীন্, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিমতুল্-হক্, ১৮৫০ সনে রাহে সুন্নৎ, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে দিল্লীর সম্রাটদের বর্ণনামূলক সিল্‌সিলয়ে-মুলুকে-হিন্দ্ ও ১৮৫৩ সনে প্রসিদ্ধ ফারসী কীমীয়ায়ে-সাদতের অনুবাদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৪৬ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দিল্লীতেই স্বদর্-আমীন্ (বা প্রধান বিচারক) পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সুযোগে তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত দিল্লীর ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ 'অসারুল্-স্বনাদীদ্' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ বিজনূরে বদলী হইলেন। তথায় অবস্থানকালীন তিনি তারীখে-বিজনূর রচনা করেন। এই সময়ে তিনি আইনে-আকবরীর একটি বিশুদ্ধ সংস্করণও প্রকাশিত করেন। আইনে-আকবরীর ইংরেজী অনুবাদক ব্লাকমেন সাহেব ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতি

করিয়াছেন। এই সময়েই সিপাহী-বিদ্রোহের কালে ইংরেজ শাসকদের তিনি অনেক সহায়তায় আসেন, কিন্তু সেইজন্য তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে কোন পুরস্কার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেই তিনি বিদ্রোহের কারণ আলোচনা করিয়া 'আস্‌বাবে-বঘাওতে-হিন্দ' নামক এক পুস্তিকা রচনা করেন—ইহা পরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সময়েই শাসকদের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য সূচক তাঁহার 'ওফাদারে-মুসলমানানে-হিন্দ' প্রকাশিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধে বরনী-কৃত তারীখে-ফীরূজশাহীর একটি বিশুদ্ধ সংস্করণও তিনি এই সময়ে সম্পাদনা করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার (বাইবেলের অনুবাদগ্রন্থ) বয়তীন্ অল-কলাম্ প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামের গোঁড়া-পন্থীরা তাঁহার প্রতি বিরূপ হইলেও ইংরেজদের নিকট তাঁহার সুখ্যাতি আরো বিশেষভাবে প্রচারিত হয়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ বদলী হইয়া গাজীপুরে যান। তাঁহারই উদ্যমে তথায় Scientific Society বা এক বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার উদ্দেশ্য ইংরেজী ভাষার প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের উর্দু অনুবাদ করা। আর ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ব্রিটিশ শাসকবর্গের প্রধান প্রধান রাজ-কর্মচারী। এবং ইহার মাধ্যমে অনেক ইংরেজী প্রসিদ্ধ গ্রন্থই উর্দুতে অনূদিত হয়। তৎপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আলিগড়ে বদলী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মসংস্থাও আলিগড়েই স্থানান্তরিত হইয়া আসে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মুরাদাবাদে এবং ১৮৬৪ খ্রাষ্টব্দে গাজীপুরে তিনি ইংরেজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে ইংরেজী শিক্ষার সুফল সম্বন্ধে তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিতে থাকেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই উদ্যমে British Indian Association বা ব্রিটিশ-ভারতীয়-সম্মিলন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সাইন্টিফিক সোসাইটির মাধ্যমে আলিগড় ইন্‌ষ্টিটিউট গেজেট নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা-ভার তিনি গ্রহণ করেন। ইহাতে সৈয়দ আহমদ নিজেও ইংরেজী পত্রিকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুবাদ করেন। এই সময়েই 'অহকামে-ত্বাম্ ইয়া অহলে-কিতাব' নামক একটি পুস্তিকা লিখিয়া গোঁড়া মুসলমানদের নিকট হইতে তাঁহাকে অনেক কটূক্তি ও বেশ দুর্নাম অর্জন করিতে হয়।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ বদলী হইয়া বেনারসে আসেন। বেনারসে আসিয়াই তাঁহার মনে একটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প হয়

এবং তাহার জন্য চেষ্টা-চরিত্র করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পুত্র মামুদ-কে—যিনি পরে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছিলেন—বিদেশীয় আদবকায়দায় উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য সঙ্গে করিয়া লণ্ডনে লইয়া যান। তথায়ই তিনি এই সময়ে স্যার উইলিয়ম মইয়ার-এর বিখ্যাত Life of Muhammad (বা হজরৎ মহম্মদের জীবন চরিত)-এর নিন্দার্থক সমালোচনার উপযুক্ত 'জবাব' লিখেন। তখনই তাঁহার মনে অক্স্‌ফোর্ডের অনুকরণে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা হয় এবং ইহাই পরে ফলপ্রসূ হইয়া আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় রূপ গ্রহণ করে। এই সময়ে লণ্ডনে অবস্থানকালীনই তিনি অতি গৌরবজনক সি. এস. আই. উপাধি লাভ করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ভারতে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিয়াই তিনি 'রসালয়ে-তহজীবুল্‌-অখলাক্‌' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশনায় মনোনিবেশ করেন। ইহার মাধ্যমে তিনি ইস্‌লামীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা যে কোনরূপেই বিঘ্ন নহে, বরং সময়োপযোগী একান্তভাবে সহায়ক ইহাই প্রচার করিতে সচেষ্ট হইলেন। স্যার সৈয়দ ছাড়া সমসাময়িক সকল প্রসিদ্ধ মুসলিম সাহিত্যিক, যথা নবাব মহসিনুল্‌-মুল্‌ক্‌, নবাব উইকারুল-মুলক ও মৌলবী চিরাঘ্‌ আলী—ইহার নিয়মিত লেখক ছিলেন।

এই সময়েই স্যার সৈয়দ আহমদ আধুনিক চিন্তাধারানুযায়ী কোরান শরীফের উর্দু অনুবাদ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এই বিশাল কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। ছয় খণ্ডে কোরানের প্রায় অর্ধেক মাত্র বিশ্লেষাত্মক অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদে অনেকটা আমাদের বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত 'কৃষ্ণ-চরিত্র'-র ন্যায় কোরানকে তিনি কোন ভগবৎ প্রেরিত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই। তাই ইহার সমালোচনা বিশ্লেষণে তিনি ধর্মপ্রবণ মুসলমানদের মাত্রেই কতকটা বিরাগভাজন হইয়াছেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হয়।

শেষজীবনে স্যার সৈয়দ তাঁহার প্রিয় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের চিন্তায়ই বিশেষ করিয়া লিপ্ত ছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি চাকরী-জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এবং তাঁহার পরবর্তী জীবনে তিনি সাহিত্য সাধনায়ই কালাতিপাত করিয়াছেন। অবশেষে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্যার সৈয়দ আহমদ উর্দু সাহিত্য জগতে, বিশেষ করিয়া উর্দু সংবাদ-সাহিত্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তাঁহার ভাষা বেশ সহজ ও সরল হইলেও খুব জোরালো। সময় সময় ভাষায় ব্যাকরণগত ভুলত্রুটি থাকিলেও ভাব ও ভাষার স্বাভাবিকতা ও উজ্জ্বলতা ইহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার সাহিত্যে ভাব ও ভাষায় বিলাসের কোন স্থান নাই—সোজাসুজি বক্তব্য বিষয় বলিয়া যাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, মজমূন্ কো দেখো আওর ইবাদৎ আরায়ি সে ঘরজ না রাখো। সংবাদ-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভে তাঁহার ইহাই মূল কারণ। হালী তাঁহাকে উর্দু গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। বস্তুতঃ আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ের যে সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন পথে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই যেমন তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার অনুকরণে সাহিত্যাদি লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

সৈয়দ আহমদ ও তাঁহার প্রিয় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় যেমন আধুনিক গদ্য সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তেমনি দিল্লী কলেজের প্রতিষ্ঠা ও ইহার তত্ত্বাবধায়কগণের উৎসাহ এবং প্রচেষ্টায়ও আধুনিক গদ্য সাহিত্য বিশেষভাবে পুষ্ট হইয়াছে। তাই সংক্ষেপে এই কলেজ ও ইহার নেতৃমণ্ডলীর ইতিবৃত্ত বিবৃত হইল।

দিল্লী কলেজে প্রথমে ইসলামীয় কৃষ্টি ও ভাষা সমূহেরই চর্চা হইত; পরে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ইংরেজী ডিপার্টমেণ্টও খোলা হয়। এবং ক্রমে ইংরেজী ভাষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যধারায় শিক্ষা দেওয়া হইতে থাকে। এই সময়ে যে সকল বিশিষ্ট পণ্ডিত উর্দু ভাষার পুষ্টিসাধনে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রিন্সিপাল মিষ্টার টেইলার, প্রফেসার রামচন্দ্র এবং মৌলবী ইমাম বখ্শ্ সহবায়ী উল্লেখযোগ্য। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ফারসী, ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহ বিশেষ করিয়া অধ্যাপক রামচন্দ্র ও মৌলবী সহবায়ীর উদ্যোগেই উর্দুভাষার তর্জমা হইতে থাকে। আর ইহার অনুকরণেই উর্দু-কৃষ্টির অন্যান্য স্থান সমূহেও তথা আগ্রা, লক্ষ্ণৌ ও বেনারসে অনুবাদ-চর্চা আরম্ভ হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রায়বাহাদুর পিয়ারীলাল আস্থব দিল্লীতে একটি উর্দু সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা করেন। তথা হইতেও উর্দু সাহিত্যের চর্চা ও অনুবাদ গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতে থাকে। আর এই আস্থবের যত্ন ও উদ্যোগেই আধুনিক

যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্যকার আজাদ ও হালী অনেক মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

অধ্যাপক রামচন্দ্র পুরাতন দিল্লী কলেজের একজন কৃতী ছাত্র এবং পরে ইহার অঙ্কের একজন প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের অনেকেই, তথা আজাদ, হালী, নজীর আহমদ ও মৌলবী জকা-উল্লা, তাঁহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে তিনি দিল্লী হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং পরে পাতিয়ালা-রাষ্ট্রের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য:— তজকিরতুল্-কামিলীন্, অজায়িবে-রোজগার্ ও উসূলে-ইলমে-হয়াৎ। তজকিরতুল্ কামিলীনে প্রাচীন সভা-জগতের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও পণ্ডিতবর্গের সাহিত্য-জীবনের বিবরণ রহিয়াছে। আধুনিক গদ্য-সাহিত্যের পুরোধা হিসাবে অধ্যাপক রামচন্দ্রও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম্ বখ্শ্ স্হবায়ী দিল্লী কলেজের আরবী ও ফারসী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি একজন দরদী কবি। তিনি ছাত্রদের একজন দরদী বন্ধু ও উপদেষ্টা। স্যার সৈয়দ সম্পাদিত আসারুল্-সনাদীদের তিনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে তিনি নির্দয়ভাবে নিহত হন।

মুন্সী ঘুলাম্ ঘউস্ বে-খবর্ কতকটা আধুনিক যুগের হইয়াও, তাহার সাহিত্যে প্রাচীন গদ্যধারারই নিদর্শন বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অতি বৃদ্ধ বয়সে বেখবর প্রাণত্যাগ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ গালিবের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার ফিঘানে-বেখবর এবং খুন্নাবয়ে-জিগর্ বেশ সরল ও সরস ভাষায়ই লিখিত। কিন্তু তাঁহার পূর্ব-সূরী ঘুলাম্ ইমাম্ শহীদের সাহিত্য সমালোচনামূলক যে বহারে-বেখজান্ তিনি লিখিয়াছেন, তাহা অবাস্তর প্রশংসায় পূর্ণ ও শব্দালঙ্কার পূর্ণ ছন্দিত গদ্যে রচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক যুগ—কাব্যের প্রথম পর্যায়

ইংরেজ-সরকারী আধিপত্য : হালী ও আজাদের যুগ

ইংরেজ আবির্ভাব ও তাঁহাদের ক্রম আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে দরবারী-পৃষ্ঠপোষকতা এবং ইহার প্রভাবও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। দরবারী যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল একক মনোরঞ্জন ; আর দরবারী প্রাধান্য হইতে মুক্ত কবিগণ সাধারণের মনোরঞ্জনের প্রয়াস করিয়াছেন। তাছাড়া আধুনিক যুগেরই প্রকৃতি অনুযায়ী কবি-চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যায় স্বাভাবিকতা ও বস্তুস্বাতন্ত্র্য। এবং মধ্যযুগের কবিগণের মধ্যে তুলনায় কৃত্রিমতা ও কল্পনা-বিলাসের প্রাবল্যই বিশেষ লক্ষিত হয়। এই ভাবধারা পূর্ব হইতেই কতকটা মরসিয়া কবিদের এবং বিশেষ করিয়া নজীর আকবরাবাদীর কাব্যসমূহে দৃষ্ট হইতেছিল। মধ্যযুগের কবিগণের মধ্যে আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সকল ক্লাসিকেল কাব্যের ন্যায় একঘেয়ে সুফীচিন্তাধারানুযায়ী ঘজল কবিতা বা (পরবর্তী যুগে) ইহার বিকৃত অনুকরণ এবং প্রশংসাসূচক কাসীদা কবিতা। এই প্রশস্তি ভগবানকেও হইতে পারে, অথবা নিজ পৃষ্ঠপোষকদের লক্ষ্য করিয়াও গীত হইতে পারে। অন্যান্য যে সকল কবিতা, যথা মসনবী, রুবায়ি, তাঁহারা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যেও প্রায়ই একঘেয়ে সুফীচিন্তাধারাই লক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যেও কিন্তু আমরা দেখিতে পাই সেই আরবী ও ফারসী কাব্যের অন্তর ও বহিরানুবৃত্তি। আর আধুনিক যুগে ইংরেজ ও তৎসঙ্গে তাঁহাদের সাহিত্যের প্রভাবে চিন্তাধারার যেমন প্রসার হইয়াছে, তেমনি কাব্যের গঠনপ্রণালীও কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশপ্রেম কবিতা, প্রকৃতি বর্ণনার কবিতা ও গদ্য-প্রভাবে গদ্য-কবিতা এবং Blank Verse এর প্রচলন। আরো বিশেষ লক্ষণীয় যে উর্দু সাহিত্যে তথা ভারতীয় সকল ভাষা সাহিত্যেই গদ্যের সূচনা ও বিকাশ বিশেষ করিয়া ইংরেজ সরকারের আগ্রহ ও ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবেই পরিপুষ্টতা লাভ করে।

এই ইংরেজ প্রভাবান্বিত নূতন যুগে তিনটি ধারা বিশেষ লক্ষণীয়।

ইহাদের মধ্যে প্রথমটি সকল নূতন ভাবধারাকেই পরিত্যাগ করিয়াছে এবং পূর্ববর্তী রীতি ও নীতিকেই সকল সময়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে সচেষ্ট। ইহার মধ্যে যেমন নাই নূতন নূতন ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাস, তেমনি দেখিতে পাওয়া যায় না স্বাভাবিক মনের প্রকাশ। আর দ্বিতীয় ধারা নূতনের প্রতি এত বেশী আগ্রহশীল যে তাহা প্রাচীনকে সকল সময়েই হেয় ও অবহেলা করিয়াছে। কিন্তু তৃতীয় ধারার পরিবেশকগণ এই দুই ধারার সম্মিলন দ্বারা বস্তুতঃ সুস্থ মন এবং স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাপ্রবাহের যোগান দিয়াছে। তাঁহারাই যথার্থ সাহিত্যিক এবং ইঁহাদের প্রভাবেই এক নূতন সাহিত্য জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন এই যুগের সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক—হালী, আজাদ, শরর, সরশার, আকবর ইলাহাবাদী, মহম্মদ ইকবাল ও হসরৎ মোহানী প্রভৃতি। ইঁহারা যেমন প্রাচীন ও নূতন ভাবধারার সমন্বয় করিয়াছেন, তেমনি আরবী-ফারসী শব্দ, বাক্যাংশ ও অলঙ্কারাদির অযথা বাহুল্য পরিত্যাগ করিয়া খাঁটি উর্দু শব্দের সহিত প্রয়োজনীয় ইংরেজী শব্দের সংযোগ দ্বারা নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছেন।

শম্‌সুল্‌-উলিমা আলতাফ হোসেন হালী ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে পানিপথে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি উচ্চ-বংশ সম্ভূত। তাঁহারই এক পূর্বপুরুষ সুলতান গিয়াসুদ্দীন বল্‌বনের রাজত্বকালে তাঁহাদের আদি বাসস্থান হিরাৎ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায়ই পানিপথের নিকটবর্তী কোন স্থানে বিশেষ সম্মানজনক পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। হালীর পিতা ছিলেন একজন দুঃস্থ ব্যক্তি এবং তিনি তাঁহার পুত্রের প্রায় ৯ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনীর তত্ত্বাবধানেই হালী তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং কোরান-পাঠ সমাপ্ত করিয়া আরবী ফারসীতে পাণ্ডিত্য-অর্জনে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রায় ১৭ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। হালীর উচ্চশিক্ষার প্রতি ছিল প্রবল আকর্ষণ। তাই তাঁহার স্ত্রীর ভরণপোষণের কোন অব্যবস্থা দেখিতে না পাইয়া শীঘ্রই আরো শিক্ষালাভের জন্য চুপে-চুপে দিল্লী গমন করেন। তথায় প্রায় দেড় বৎসর কাল সেই সময়কার বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলবী নোয়াজিশ আলী হইতে আরবীতে শিক্ষালাভ করার পরে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের তাগিদে তিনি আবার তাঁহার নিজ জন্মভূমিতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ফিরিয়া আসেন। বৎসর খানেক পরেই কলেক্টরী বিভাগের এক চাকরী

পাইয়া তাঁহাকে আবার জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ আবার তাঁহাকে নিজ জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করে। ৩৷৪ বৎসর পানিপথে অবস্থানের পর বুলন্দর শহরের নবাব মুসতফা খান শীফ্‌তার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। মুসতফা খান উর্দু ও ফারসীর একজন প্রসিদ্ধ কবিও ছিলেন। এই পরিচয়ের ফলে হালী তাঁহার একজন মুসাহিব বা বয়স্য হইবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি যে কাব্যেও নবাব সাহেবের নিকট হইতে অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিজেই গাহিয়া গিয়াছেন।

হালী সুখন মেঁ শীফতা সে মুস্তফীজ্‌ হুঁ ;
শাগ্‌রিদ্‌ মীর্জা কা মুকল্লিদ্‌ হুঁ মীর্‌ কা।

حالی سخن میں شیفتہ سے مستفیض ہوں —
شاگرد میرزا کا مقلد ہوں میر کا

অর্থাৎ, হে হালী, আমি শীফ্‌তা হইতে (কাব্যে) যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি—(যদিও) আমি মীর্জা (ঘালিব)-এর শিষ্য এবং (তকী) মীরের অনুসরণকারী।

বস্তুতঃ নবাব সাহেবের কাব্যোচিত উদার মন এবং তাঁহার সাহচর্য হালীকে তাঁহার কাব্য সাধনায় যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার ঘজলসমূহ শুদ্ধির জন্য দিল্লীতে মীর্জা ঘালিবের নিকট পাঠাইতেন। দিল্লীতে অবস্থানকালেই সর্বপ্রথম মীর্জা সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তখনই তাঁহাকে তাঁহার কাব্যগুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নবাব সাহেবের সঙ্গী ও তাঁহার ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষকরূপে প্রায় আট বৎসরকাল বুলন্দর শহরের জহাঙ্গীরাবাদে বসবাস করায় পর হালী নূতন চাকরী অন্বেষণে লাহোর গমন করেন। এবং তথায় গভর্ণমেণ্ট বুক ডিপোতে শিক্ষাবিভাগের ইংরেজী হইতে উর্দু অনুবাদক-পদে নিযুক্ত হন। এই সুযোগে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বিশেষভাবে ইহার চর্চা করেন। কলেজের শিক্ষক হিসাবেও কিছুকাল তথায় তিনি কাজ করিয়াছিলেন। চারি বৎসর তথায় অবস্থান করার পর তিনি দিল্লীর এঙ্গলো-এরাবিক স্কুলের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত হইলেন। দিল্লীতেই তাঁহার সর্বপ্রথম স্যার সৈয়দ আহমদের সহিত পরিচয় হয়। তাঁহারই উপদেশানুযায়ী তিনি তাঁহার বিখ্যাত 'মুসদ্দসে-হালী' প্রণয়ন করেন। এবং এই সৈয়দ সাহেবের সুপারিশেই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হালী নিজাম গভর্ণমেণ্টের সাহিত্য-বিভাগে চাকরী-লাভের সুযোগ পান। পরে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার

নিজ জন্মভূমি পানিপথে সাহিত্য আলোচনা ও গ্রন্থাদি সম্পাদনায় সময় নিয়োগ করেন ! আর এই সাহিত্য সাধনারই পুরস্কারস্বরূপ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরেজ সরকার হইতে 'শমসুল্ উলিমা' নামক গৌরবজনক উপাধিতে ভূষিত হন। অবশেষে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

হালী গদ্য ও পদ্য এই উভয়প্রকার সাহিত্যই লিখিয়াছেন। তাঁহার গদ্য-সাহিত্য এই যুগেরই গদ্যগ্রন্থসমূহের পৃথক আলোচনায় বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার নিম্নলিখিত কাব্যের উল্লেখ আছে:—

(১) মসনবী কাব্য: (ক) মুনাজিরয়ে-তঅস্সুব্ ও ইন্স্বাফ্; (খ) রহম্ ও ইন্স্বাফ্; (গ) বর্খারুৎ; (ঘ) নিশাত্বে-উম্মীদ্ ও (ঙ) হুব্বে-উঅত্বন্ প্রভৃতি। হালীর মসনবী কাব্যসমূহ ভাব ও ভাষার সরলতা ও সরসতার জন্য বেশ প্রসিদ্ধ। ইহাদের অনেক কবিতাংশ, যেমন উপদেশাত্মক ও ভাবপূর্ণ কবিতা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্কলন গ্রন্থাদিতে নির্বাচিত হইয়াছে।

(২) মুসদ্দসে-হালী: ইহার আসল নাম 'মুসদ্দসে-মদ্দ্ ও জজরে-ইস্লাম'।[১] ইহা হালীর সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। জাতীয়-ভাবে উদ্বুদ্ধ ইহা একটি দেশপ্রেম কাব্য। মুসলিম-কৃষ্টির গৌরবান্বিত ইতিহাস সবিশেষ বর্ণনাপূর্বক ইহাতে মুসলিম নবজাগরণের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। স্যার সৈয়দ এই কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইস্ কী ইবারৎ কী খুবী আওর্ স্বফায়ি আওর্ রোয়ানী কী জিস্ ক্বদর্ তারীফ কী জায়ে কম হায়।

اسکی عبارت کی خوبی اور صفائی اور روانی کی جس قدر تعریف
کی جائے کم ہے -

অর্থাৎ এই কাব্যের সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য ও সরসতা সম্বন্ধে যত প্রশংসাই করা হউক তাহা কম বলিয়া অনুভূত হয়।

ইহা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলপ্রকার লোকের নিকটই সবিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। এই কাব্যের অনুকরণ যথেষ্টই হইয়াছে, কিন্তু হালীর কাব্যের ন্যায় সমাদর আর কোন কাব্যই পায় নাই।

(৩) শিকোয়য়ে-হিন্দ্: ইহাও অনেকটা মুসদ্দসে-হালীর অনুকরণেই লিখিত।

১। অর্থাৎ ছয় পংক্তিতে গঠিত কবিতায় লিখিত ইসলামের উত্থান-পতন বর্ণিত কাব্য।

(৪) মরাসীয়ে-ঘালিব ও হকীম্ মামুদ্ খান্ ও তবাহীয়ে-দিহ্‌লী ও অন্যান্য মরসিয়া কাব্য। এই শোকগাথাগুলির প্রত্যেকটিই বেশ প্রাণস্পর্শী ও দরদপূর্ণ, বিশেষ করিয়া ঘালিবের উদ্দেশ্যে লিখিত শোকগাথাটি। ইহাতে কাব্য-গুরুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাঁহার মরমের ব্যথা যেন ভাব ও ভাষার মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

(৫) মুনাজাতে-বেওয়া: বিধবার বিলাপ সম্বন্ধীয় এই পারিবারিক ও সামাজিক দরদপূর্ণ প্রাণস্পর্শী ছোট কাব্যটি সকলেরই হৃদয় অভিভূত করে। এই কাব্যের স্বর-যোজনাও অপূর্ব। তাই অনেক সময় এই সুরভঙ্গিকে 'স্বৌতুল্-নাক্‌স্' বলা হয়। এই কাব্যের অনুবাদও হইয়াছে ভারতের বিভিন্ন ভাষায়।

(৬) চুপ্‌কী দাদ্: ভারতীয় স্ত্রীলোকদের সহিষ্ণুতা ও সহৃদয়তার এক মাধুর্যভরা দরদ-পূর্ণ কাব্য।

(৭) দেওয়ানে-হালী: ইহাতে হালীর প্রথম জীবন ও পরবর্তী জীবনের প্রাচীন ও আধুনিক উভয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীরই নানাপ্রকার কবিতা সংযোজিত হইয়াছে। ঘজল কবিতা ছাড়া রুবায়ী, ক্বসীদা, তর্কীব্-বন্দ, তারীখ ও ক্বীতহ প্রভৃতি কাব্য-রূপের সমাবেশও ইহাতে রহিয়াছে। তাঁহার ক্বীতা অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' কাব্যের অনুকরণে রচিত। বস্তুতঃ হালীর সকল কবিতাই বেশ উপদেশপূর্ণ। ইহাতে কোন কৃত্রিমতার আভাস নাই—কি ভাব, কি ভাষায়।

দেওয়ানে-হালীর ভূমিকা হিসাবে লিখিত তাঁহার 'মুক্বদ্দময়ে-শঅর্ ও শায়েরী' একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে উর্দু কাব্যাদির বিভিন্ন রূপ ও ভাবধারা প্রকাশপূর্বক ইহার আদর্শের স্বরূপটি প্রকাশ করিতে হালী সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন, তাই ইংরেজী কাব্যাদর্শ হালীকে এই বিষয়ে কতকটা প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

হালী ও আজাদকে এই আধুনিক ভাবধারার যুগ-প্রবর্তক রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আধুনিক কাব্যের ভাব ও ভাষা এই উভয়ের মধ্যেই অকৃত্রিমতা ইঁহাদের কাব্যেই সর্বপ্রথম লক্ষিত হয়। তাছাড়া ইংরেজী কাব্যাদর্শে গঠিত পরিবার, সমাজ, স্বদেশ, প্রকৃতি ও মানব মনের সকলপ্রকার চিন্তাধারাই ইঁহারা সর্বপ্রথম তাঁহাদের কাব্যে প্রকাশ করিতে যত্নবান হইয়াছেন। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে ইঁহাদের হইতেই কাব্যের নূতন জীবন ও তৎসঙ্গে ইহার সতেজতা সর্বপ্রথম ব্যক্ত হয়। কিন্তু হালীর কয়েকটি

কাব্যই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও ইহা একবাক্যে স্বীকার্য যে তিনি উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্তর্ভুক্ত কখনই হইতে পারেন নাই। উর্দু সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি না হইলেও তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর দরদী সমালোচক। এবং উর্দু সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির নানা পথ দেখাইয়া আমাদের ধন্য করিয়াছেন।

শমসুল্-উলিমা মহম্মদ হুসেন আজাদ আধুনিক সাহিত্যের যুগ-প্রবর্তক। তিনি একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, প্রসিদ্ধ সমালোচক, বিজ্ঞ ভাষাবিদ এবং অতি সুরসিক ও কাব্য-সমঝদার ব্যক্তি। আজাদ নিজে কাব্য হইতে গদ্য সাহিত্যকেই বিশেষ মূল্য দিয়া থাকিলেও, তিনি একজন খাঁটি কবি ছিলেন। কাব্য-রস তাঁহার ছিল প্রকৃতিগত। তাঁহার প্রসিদ্ধ উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস 'আবে-হায়াৎ' একটি ইতিহাস হইয়াও যেন কাব্যরসে ভরপূর।

আজাদের পিতা প্রসিদ্ধ উর্দু কবি জৌকের বিশেষ বন্ধু ছিলেন বলিয়া বাল্যকাল হইতেই আজাদ তাঁহার ভাবী কাব্য-গুরুর সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি জৌকের সহিত দিল্লীর বড় বড় সাহিত্য সংস্কৃতি সভায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। জৌকের মৃত্যুর পর আজাদ হকীম্ আথা খান্ আয়িশ হইতে কাব্যানুশীলনে যত্নবান হন। কিন্তু শীঘ্রই সিপাহী বিদ্রোহের ফলে তাঁহাকেও দিল্লী পরিত্যাগ করিতে হয়। সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময়ে উর্দু সাহিত্যের আরো কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির সহিত আজাদও পাঞ্জাবে একসঙ্গে মিলিত হন। তাঁহাদের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত হালী ছাড়া রায় বহাদুর মুন্সী পিয়ারীলাল, ফরহঙ্গে-আস্বফিয়ার সম্পাদক মৌলবী সৈয়দ আহমদ্ ও মৌলবী করীমুদ্দীন্ প্রভৃতি আরো অনেকেই ছিলেন। তাঁহারা ও বিশেষ করিয়া তখনকার পাঞ্জাবের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বা অধিকর্তার উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় তথায় আঞ্জুমানে-পঞ্জাব নামক একটি উর্দু সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা হয় এবং আজাদের উপর ইহার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়। এই আঞ্জুমানের মাধ্যমেই তিনি উর্দু সাহিত্যের নূতন ধারা প্রবর্তনের সুযোগ লাভ করিলেন। তিনি তথায়ই সর্বসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার সুযোগ লাভ করিলেন যে প্রাচীন একঘেয়ে প্রেমের কবিতা আর বর্তমান যুগে চলিবে না—আধুনিক মনের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক সাহিত্যের ভাষা ও ভাবধারারও প্রবর্তন করিতে হইবে। তাহা হইলেই উর্দু সাহিত্যের অগ্রগতি সুনিশ্চিত এবং এই নব প্রচেষ্টায় আজাদ সর্বতোভাবেই সফলকাম হইয়াছেন।

আজাদ-কাব্যেও হালীর কাব্যের ন্যায় প্রাচীন ও নব্য এই দুই কাব্যধারারই চর্চা দেখিতে পাওয়া যায়। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রাচীন কাব্যধারারই চর্চা করিয়াছেন; আর তাহার পরে পাঞ্জাবে আসিয়া আঞ্জুমানের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে যে কাব্যধারার আলোচনা ও চর্চা করিয়াছেন তাহাতে নবীন কাব্যধারার বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার প্রাচীন ধারার অধিকাংশ কবিতাই দিল্লীর অরাজকতার যুগে বিনষ্ট হইয়া গেলেও আমরা দেখিতে পাই যে, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মৌলবী মহম্মদ ইব্রাহীম কর্তৃক 'নজ্‌মে-আজাদ্' নামক প্রকাশিত কাব্যে আজাদের প্রাচীন ধারার কয়েকটি কবিতাও স্থান-লাভ করিয়াছে।

নবীন ভাবধারার পথপ্রদর্শকরূপে আজাদ নিজেও কয়েকটি ছোট ছোট মস্‌নবী ও অন্যান্য কবিতা লিখিয়াছেন। তাছাড়া অনেক ইংরেজী কবিতারও তিনি উর্দু-রূপ দান করিয়াছেন। তাঁহার এই উর্দু-রূপায়িত কবিতাগুলির বিশেষত্ব এই যে ইহা মোটেই অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের প্রত্যেকটিই যেন মৌলিক কবিতা। আজাদের নূতন কাব্যধারার মধ্য হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি কাব্যের নাম করা যাইতে পারে:—

(১) মসনবীয়ে-শবে-ক্বদর্: ইহার মধ্যে ত্বালিবে-ইল্‌ম্, মহাজন্ ও চূর্ প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা বেশ উল্লেখযোগ্য।

(২) মস্‌নবীয়ে-হুব্বে-উঅত্বন্; (৩) আবরে-করম্; (৪) খ্বাব্-ই-অমন্; ও (৫) সুব্‌হে-উমীদ্।

নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার 'ত্বালিবে-ইল্‌ম্' নামক কবিতাটি উদ্ধৃত হইল:—

হায়ঁ মদ্রসে কে ত্বালিবে-ইল্‌ম্ অপ্‌নে হাল মেঁ;
কল সুবহ ইম্‌তিহান্ হায় সো ইস্‌কে খয়াল মেঁ।
মিল মিল কে ইয়াদ্ করতে হায়ঁ অপস্ মেঁ দৌর্ সে;
পঢ়তে জুদা জুদা ভী হায়ঁ কুছ্ ফিকর্ ও ঘৌর্ সে।
করলেঁ জো কুছ্ কি করনা হায় শব্ দরমিয়ান্ হায়;
কল সুবহ অপনী জান্ হায় অওর্ ইম্‌তিহান্ হায়।
জী ছোড়্ বৈঠে মর্দ্ ইয় হিম্মৎ সে দূর্ হায়,
কিস্‌মৎ তো হর্ ত্বরহ হায় পহ মিহনৎ জরুর্ হায়।

ہیں مدرسے کے طالب علم اپنے خیال میں —
کل صبح امتحان ہے سو اس کے حال میں

مل مل کے یاد کرتے ہیں آپس میں دور سے —
پڑھتے جدا جدا بھی ہیں کچھ فکر و غور سے
کر لیں جو کچھ کہ کرنا ہے شب درمیان ہے —
کل صبح اپنی جان ہے اور امتحان ہے
جی چھوڑ بیٹھے مرد یہ ہمت سے دور ہے —
قسمت تو ہر طرح ہے پہ محنت ضرور ہے

অর্থাৎ মাদ্রাসার ছাত্ররা তাদের পরীক্ষা কাল—এই চিন্তাতেই মগ্ন আছে। তারা একত্র সারি বেঁধে মিল দিয়া তাদের পড়া মুখস্ত করে; আবার, পৃথক-ভাবে মন দিয়াও তাদের পড়া শিখে। যা করবার এখনি করে ফেল, কারণ রাত্রি মাত্র আছে। কাল যে নিজের প্রাণসম পরীক্ষা! অন্যমনস্ক হয়ে বসা এখন সাহসের বাহিরে—অদৃষ্টকে তো স্বীকার্য, সঙ্গে সঙ্গে অধ্যবসায়ও চাই।

মুন্সী দুর্গা সহায় সুরুর্-ও এই আধুনিক যুগের নব-কাব্য-রীতি প্রবর্তনের একজন স্রষ্টা। তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নব-কাব্যধারার একজন প্রধানতম বাহক হইলেও তিনি প্রাচীন কাব্যধারাকে মোটেই অবহেলা করেন নাই। তিনি ছিলেন বস্তুতঃ প্রসিদ্ধ আরবী প্রবাদ—'খুধ্ মা স্বফা ব্ দ'অমা কদর' (অর্থাৎ যাহা উৎকৃষ্ট তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা অপকৃষ্ট তাহা ফেলিয়া দাও)-বাক্যের অনুসরণকারী।

সুরুর বাল্যকাল হইতেই কবি-স্বভাব ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি, তেমনি নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াও আনন্দের সহিত সময় অতিবাহিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। আবার, ঘালিবের ন্যায় মদ্যপানাসক্ত হইলেও ইহা তাঁহার কাব্য সৃজনশক্তির একটি শ্রেষ্ঠ পরিপোষক ছিল মনে করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় নব নব কাব্যধারার একজন উদীয়মান পরিবেশক অকালেই মাত্র তাঁহার ৩৭ বৎসর বয়সে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে অস্তমিত হইয়া যায়।

সুরুরের কাব্যধারায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্যই বিশেষ লক্ষণীয়। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সুরুরের আত্মসমাহিত ভাব, অনন্যমনস্কতা, সহৃদয়তা ও প্রতীতিযুক্ত ধারণা। এই বিষয়ে এই যুগের আর কোন কবিই তাঁহার তুল্য নহেন। এই বৈশিষ্ট্য উর্দু কবিদের মধ্যে কেবলমাত্র মীর তকী মীরের কাব্য ধারায়ই বিশেষ লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ এই উভয় কবির জীবনধারাও অনেকটা একই প্রকার ছিল। তাই দুঃখ, বিষাদ ও নৈরাশ্যের ছায়া আমাদের

আলোচ্যমান কবির কাব্যে বিশেষভাবে বিদ্যমান। সুরূরের নিম্নলিখিত কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—দেওয়ারে-কুহন্, হসরতে-শবাব্, আন্দুহে-ঘুর্বৎ, মুর্গানে-কফস্, ইয়াদে-ত্বিফ্লী, বুল্বুল্ কা ফসানহ, হসরৎ দীদার্ ও মাতুম্ আর্জু প্রভৃতি।

সুরূর-কাব্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দেশপ্রেম। তাঁহার এই উদার দেশপ্রেমের মধ্যে কোন সম্প্রদায় বা ধর্মের গোঁড়ামি নাই। ইহা লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে যে তিনি সম্পূর্ণভাবে একজন ভারতীয় কবি। বাঙলার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দেশবরেণ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' কবিতার উর্দু রূপায়ন তিনি 'মাদরে-হিন্দ্' নামে করিয়াছেন। অন্যান্য দেশপ্রেম কবিতার মধ্যে তাঁহার নিম্নলিখিত কবিতা প্রসিদ্ধ :—খাক্ ও উমত্বন্, আরূসে-হব্বে-উমত্বন্, হস্রতে-উমত্বন্ ও ইয়াদে-উমত্বন্। এই প্রসঙ্গে দেশাত্মবোধের সহিত যুক্ত তাঁহার কয়েকটি প্রেম-কবিতারও উল্লেখ করা যাইতে পারে :—ফসানায়ে গুল্ ও বুল্বুল্ এবং শমা ও পরওয়ানা।

সুরূর-কাব্যধারার তৃতীয় পর্যায়ে তাঁহার ঐতিহাসিক ধর্মসম্বন্ধীয় কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল কবিতার মধ্যেও কাব্যোচিত সকল লক্ষণই সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। যেমন উদার ভাব, তেমনি সহৃদয়, অকৃত্রিম চিন্তাধারা তাঁহার এই কবিতাগুলিকেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকটই মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'জম্না' (যমুনা) ও 'গঙ্গা' কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উভয় কাব্যেই ঐতিহাসিক ভিত্তির কোন খেলাফ না করিয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সহৃদয়তার সহিত হিন্দু-চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এই প্রকার তাঁহার অন্যান্য কবিতার মধ্যে পদ্মিনী, পদ্মিনী কী চীতা, সীতা জী কী গিরিয়হ ও জারী, মহারাজ দশরথ কী বে-করারী, সতী ও নূরজহান্ কা মজার্ উল্লেখযোগ্য।

সুরূরের কয়েকটি উপদেশপূর্ণ কবিতারও উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা কখনই নীতিবাগীশ শিক্ষকের নীরস উপদেশের মধ্যেই ব্যাপ্ত নহে ; তাহার মধ্যেও কাব্য-রসের প্রাচুর্য যথেষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় কবিতার মধ্যে তাঁহার জনে-খুশ্বু, বে-সবাতী দুনিয়া ও আদায়ে-শরম্ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

অন্যান্য আধুনিক কবির ন্যায় সুরূরও অনেক ইংরেজী কবিতার উর্দু কাব্যানুবাদ করিয়াছেন। এই সকল কবিতা অনুবাদ হইয়াও উর্দু সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়াছে—কারণ, ভাব ধার করা হইলেও ভাষার ছন্দে ও

লালিত্যে ইহা ঠিক আহরণ বলিয়া মনে হয় না; গ্রহণের বৈশিষ্ট্যে এই কবিতাসকলও মৌলিকতারই দাবী করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিতা উল্লেখযোগ্য:—মুর্ধাবী, তরানায়ে-খ্বাব্, বচ্চহ আওর হিলাল, কার্জারে-হাস্তী, উমিদ্ ও ত্বিফলী, মৌসিমে-সুর্মা কা আখিরী গুলাব্ এবং কৃয়িল্।

সুরূর-কাব্যের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি অনেক হিন্দী শব্দের সু-ব্যবহার দ্বারা উর্দু কাব্যের সমৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে ইহার মাধুর্যও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তাঁহার ধর্মমূলক কবিতাসমূহে তিনি অনেক খাঁটি হিন্দী শব্দ ব্যবহার করার সুযোগও পাইয়াছেন, কিন্তু এই ব্যবহারে কোন পক্ষপাতিত্বের দোষ পাওয়া যায় না—শব্দবিন্যাস ও অলঙ্কারাদির প্রয়োগ যেমন হইয়াছে সুসংবদ্ধ, তেমনি রহিয়াছে তাহাতে লালিত্য ও মাধুর্যের অপূর্ব বিকাশ।

সুরূরের এই সকল বিভিন্ন কবিতা 'খম্খানায়ে-সুরূর্' ও 'জামে-সুরূর্' নামক দুইটি কাব্য-সংগ্রহের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। কবিতা সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি সকল সময়েই উদাসীন ছিলেন বলিয়া তাঁহার অনেক কবিতা সময়ের বিপর্যয়ে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইতেও বড় দুঃখের কথা, তাঁহার লিখিত অনেক কবিতা বর্তমানে অন্যের নামে প্রচারিত হইতেছে। তাঁহার দারিদ্র্য ও উদাসীনতার সুযোগ নিয়া কোন ধনী প্রকাশক এই সুনামের সুযোগ লাভ করিয়াছেন। কবির মৃত্যুর পরে তাঁহার লিখিত কোন পত্র হইতে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। জানিনা কোন সেই অধম পামর সুকবি বলিয়া সম্মান পাইয়া আসিতেছেন।

আকবর ইলাহাবাদী আধুনিকযুগের কাব্যধারায় এক নূতন বৈশিষ্ট্যের স্জনকারী। এই বৈশিষ্ট্য আপন প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। তিনি একাই ইহার ধারক ও বাহক। আকবরের ভাবধারার তুলনা হয় অনেকটা বাঙলার সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা গদ্যে, আর ইলাহাবাদী তাঁহার সাধনা কবিতার মাধ্যমে করিয়া গিয়াছেন।

সৈয়দ আকবর হুসেন রিজ্বী ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন না। তাই সরকারী স্কুল ও দাতব্য মাদ্রাসায় তাঁহার বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মুক্তারী (বা মুখ্তারী) পরীক্ষা পাশ করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী তহশীলদার-পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের (উর্দু) নথীপত্র পাঠক বা মিসল্-খ্বানী পদ লাভ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ওকালতী

পাশ করিয়া তিনি সরকারী উকিল হিসাবে চাকরী আরম্ভ করেন। এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি মুন্‌স্বিফ্‌ পদে উন্নীত হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সাবর্ডিনেট জজ এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সেই পদ হইতে উন্নীত হইয়া ছোট আদালতের জজ-পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই পদে থাকাকালীনই তিনি সরকার হইতে 'খানবাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। এবং শীঘ্রই চাকরী হইতে অবসর লাভ করিয়া পেন্‌শন পাইতে থাকেন। এই অবসর-কালীন তিনি কেবল কাব্যসাধনাই করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

আকবর স্বভাবতঃই শিষ্ট ও ভদ্র এবং সদা-আনন্দময়, প্রফুল্লচিত্ত ও রসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি সহৃদয়, সামাজিক ও মিশুক ব্যক্তি এবং বন্ধুবান্ধবদের গল্প ও হাস্যকৌতুকে আপ্যায়িত করিতে বিশেষ পটু ছিলেন। তাছাড়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের নিকট লিখিত চিঠিপত্র হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি বিশেষ ন্যায়নিষ্ঠ এবং সরল ও অকপট ব্যক্তি ছিলেন। ধর্ম হিসাবে তিনি সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাঁহার মধ্যে ধর্মের কোন গোঁড়ামীই ছিল না। এই সদা প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তিও তাঁহার শেষ বয়সে তাঁহার অতি আদরের পুত্র হাশিমের অকাল মৃত্যুতে খুব ম্রিয়মান হইয়া পড়েন। তাঁহার এই পুত্রের উদ্দেশ্যে লিখিত নিম্নলিখিত দুইটি বয়ৎ হইতেই ইহা স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইতেছে.

উও চমন্ হী মিট্ গিয়া জিস্ মেঁ কি আয়ী থী বহার্ ;
আব্ তুঝে পাকর্ মায়ঁ আয় বাদে-বহারী কিয়া করোঁ।
বুজ্ মে-ইশ্ রৎ মেঁ বঠানা থা জিসে উও উঠ গিয়া ;
আব্ মায়ঁ আয় ফর্দা তিরী উমীদ্ওয়ারী কিয়া করোঁ।

وہ چمن ہی مٹ گیا جس میں کہ آئی تھی بہار
اب تجھے پا کر میں اے باد بہاری کیا کروں
بزم عشرت میں بٹھانا تھا جسے وہ اٹھ گیا —
اب میں اے فردا تری امیدواری کیا کروں

অর্থাৎ, যাহার মধ্যে বসন্ত বিরাজমান ছিল, সেই বাগানই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ; হে বসন্তের হাওয়া, তোমাকে পাইয়া এখন আমি কি করিব? যাহাকে আনন্দ-উৎসবে বসানোর কথা ছিল, সে চলিয়া গিয়াছে—এখন হে ভবিষ্যৎ, তোমাকে আর কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব ?

আকবর ছিলেন স্বভাব-কবি এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিতা লেখার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। এবং আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার কোন কোন বাল্য কবিতাও তাঁহার 'কুল্লিয়াৎ'-এ স্থানলাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ আতিশের শাগ্রিদ্ ঘুলাম হুসেন ওঅহীদ তাঁহার বাল্য-কবিতাসমূহ পরিশুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই সময়ে তিনি আরবী ও ফারসী সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা করেন। আর পরবর্তীকালে চাকরীর সুযোগে তিনি ইংরেজী সাহিত্যেরও বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শ্রেণীর সাহিত্যই তাঁহার কাব্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আকবরের কাব্যচর্চার কাল সুবিস্তৃত এবং কবিবর নিজেই ইহাকে পাঁচ পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন।

আকবরের প্রথম পর্যায়ের বাল্যকবিতাকে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে। এই কাব্যধারায় দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ কবিদের অনুসরণে তিনি মামুলীভাবে প্রাচীন ধারারই প্রবর্তন করিয়াছেন। এই সময়ে তিনি অনেক ঘজলই লিখিয়াছেন এবং মুশাঅরা বা সংস্কৃতিসভায় অনেক প্রেমগীতিও আবৃত্তি করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে আকবরের বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষিত হয় না।

দ্বিতীয় কাব্যযুগ হইতেই আকবরের নিজস্ব কাব্য-বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ লক্ষিত হয়। এই যুগ ১৮৬৬ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ে তাঁহার কাব্যধারায় যেমন নূতনত্ব ও মৌলিকতার উন্মেষ হয়, তেমনি ইহার ভাবপ্রকাশ ও আবেদনেও যথেষ্ট অকপটতা ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মামুলী, গতানুগতিক কাব্যানুশীলনে কবিবর সময় সময় মনোনিবেশ করিলেও ইহার মধ্যে একটা বিশেষ গতিভঙ্গীর ছাপ দৃষ্ট হয়। এই সময়েই শব্দ, অলঙ্কার ও ছন্দ বিন্যাসেও তাঁহার কাব্যে সৃজনীশক্তির বিকাশ অনুভূত হয়।

তৃতীয় যুগের কাব্যে আকবর একজন ভারত-বিখ্যাত কবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই যুগকে ১৮৮৪ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়। এই সময়ের কাব্যে যেমন তাঁহার স্বভাব-কবির সকল পরিচয়ই উদ্ঘাটিত হইতে থাকে, তেমনি ইহার বিশ্বজনীন আবেদনও বিশেষরূপে প্রকট হয়। এই যুগেই সর্বপ্রথম লক্ষিত হয় যে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্যকর ঘজলসমূহ ক্রমশঃ উপদেশপূর্ণ কবিতায় রূপান্তর লাভ করিয়াছে। আমাদের আকবর সকল সময়েই সুরসিক কবি ও হাস্যকৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি। কিন্তু এই

যুগের কৌতুকপূর্ণ কবিতা যেমন গভীর অর্থপূর্ণ, তেমনি বিশেষ ইঙ্গিতযুক্ত ও ব্যঞ্জনাময়। এই যুগের অধিকাংশ কবিতাই তাঁহার কুল্লিয়াতের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই যুগেই প্রথম তাঁহার আধ্যাত্মিক ও সুফীতত্ত্বপূর্ণ কবিতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

আকবরের কাব্য-ইতিহাসের চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়কে যথাক্রমে ১৯০৯ হইতে ১৯১২ এবং ১৯১২ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই দুই পর্যায় তাঁহার তৃতীয় যুগের কাব্য সাধনারই আরো উন্নত সংস্করণ মাত্র। তৃতীয় যুগে যে কাব্যধারার উন্মেষ হয়, তাহাই পরবর্তীকালে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে। কাব্যের ছন্দ-রীতির বিশালতা ও ভাবধারার গভীরতা ও রসানুগ্রাহিতায় এই যুগ দুইটি বিশেষভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই যুগদ্বয়ের অধিকাংশ কবিতা তাঁহার কুল্লিয়াতের ৩য় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

আকবর-কাব্যের সমষ্টিযুক্ত সমগ্র কুল্লিয়াৎ তিনখণ্ডে বিভক্ত। ইহার প্রথম দুইটি তাঁহার জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হয়। আর ইহার তৃতীয় খণ্ড আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র কর্তৃক প্রকাশ লাভ করে। কথিত আছে, এই সকল কবিতা ছাড়া অসহযোগ আন্দোলনের (Non Co-operation Movement) ইতিহাসরূপে তিনি 'গান্ধীনামা' নামে একটি কাব্যও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকীয় পরিস্থিতির চাপে তিনি ইহা প্রকাশ করিতে বিশেষ ভরসা পান নাই। এইরূপ আরো অনেক কবিতা তাঁহার কবিমনের সন্তুষ্টি বিধানার্থেই লিখিয়াছিলেন—যাহা তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখিয়াছেন।

আকবর বিশেষ করিয়া কবি বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তাঁহার গদ্য সাহিত্যেরও উল্লেখ আছে। এবং ঘালিবের ন্যায় নানা বন্ধুবান্ধবের নিকট লিখিত চিঠি-পত্রের মাধ্যমেই আমরা কবির ব্যক্তি-মানসের খাঁটি পরিচয়টি পাই। যে সকল ব্যক্তির সহিত তিনি চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সুহৃদ-ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য—খাজা হসন নিজামী, মুন্সী দিয়ানরায়ন নিগম্, আহসন্ মারূহরবী, মীর্জা মহম্মদ হাদী আজীজ্ ও মৌলবী আব্দুল মাজিদ্ দরিয়াবাদী।

আকবর বিশেষ করিয়া ঘজল কাব্যই লিখিয়াছেন। এবং এই কাব্যধারার মাধ্যমেই তিনি সকলপ্রকার ভাবের বিনিময় সাধারণভাবে করিয়া গিয়াছেন। ঘজলের নিজস্বরূপ প্রেমগীতি ছাড়া সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি

এবং রস ও কৌতূকপূর্ণ সকল প্রকার কবিতারই সমাবেশ ইহাতে দেখিতে পাই।

আকবরের কাব্যধারা বিবর্তনের তিনটি রূপ সাধারণভাবে প্রকাশের চেষ্টা করা হইল। তাঁহার প্রথমযুগের কাব্যধারার নিদর্শনস্বরূপ নিম্নলিখিত কবিতাংশটি উল্লেখযোগ্য।

কহীঁ দিল্ হোঁ কহী মৈঁ বায়িসে-বেতাবীয়ে-দিল্ হোঁ।
কহীঁ আন্দাজে-বিস্‌মিল্ হোঁ কহীঁ মৈঁ নাজে-কাত্বিল্ হোঁ॥
কহীঁ জলূঅ হোঁ স্যুরৎ কা কহীঁ হোঁ শাহিদে-মানী।
কহীঁ হোঁ মহ্‌মিলে-লয়লা কহীঁ লয়লায়ে-মহ্‌মিল্ হোঁ॥
কহীঁ আশিক্ কা মৎলব্ হোঁ কহীঁ মাশুক্ কী খাহিশ।
কহীঁ মজবূরে-মৎলব্ হোঁ কহীঁ মুখতারে-কামিল্ হোঁ॥
কহীঁ তস্‌বীরে-হায়রৎ হোঁ কহীঁ মহবে-পরীশানী।
কহীঁ হোঁ শীফতা রুখ্ কা কহীঁ জুল্‌ফুন্ কা মায়িল্ হোঁ॥
কহীঁ হোঁ উঅল্‌উঅলা দিল্ কা কহীঁ হোঁ জব্‌ৎ আকিল কা।
রওয়ানী মেঁ কহীঁ দরিয়া কহীঁ রুক্‌নে মেঁ সাহিল্ হোঁ॥

کہیں دل ہوں کہیں میں باعث بیتابیٔ دل ہوں —
کہیں انداز بسمل ہوں کہیں میں ناز قاتل ہوں
کہیں جلوہ ہوں صورت کا کہیں ہوں شاہد معنی —
کہیں ہوں محمل لیلی کہیں لیلائی محمل ہوں
کہیں عاشق کا مطلب ہوں کہیں معشوق کی خواهش —
کہیں مجبور مطلق ہوں کہیں مختار کامل ہوں
کہیں تصویر حیرت ہوں کہیں محو پریشانی —
کہیں ہوں شیفتہ رخ کا کہیں زلفوں کا مائل ہوں
کہیں ہوں ولولہ دل کا کہیں ہوں ضبط عاقل کا —
روانی میں کہیں دریا کہیں رکنے میں ساحل ہوں

অর্থাৎ, কখনও আমি মন, আবার সময়ে সময়ে মনের অশান্তির কারণ; কখনও নিজে উৎসর্গীকৃত রূপে (প্রস্তুত) হই, আবার সময়ে (উৎসর্গের) হন্তারূপে গর্বানুভব করি। কখনও আমি রূপের গুণগ্রাহী, আবার কখনও আমি (অরূপ) অর্থের পূজারী; কখনও আমি লায়লার বাহক, আবার সময়ে

নিজেই লায়লায় রূপান্তর লাভ করি। কখনও আমি প্রেমিক বা ভক্ত, আবার সময়ে নিজেই প্রেমের স্বরূপে রূপান্তর লাভ করি ; কখনও আমি নিজেকে একান্তভাবে (অনিচ্ছাসত্ত্বে) বাধ্য মনে করি, আবার সময়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও পরিপূর্ণ মনে করি। কখনও আমি নিজে মহাবিস্ময়ে রূপান্তর লাভ করি, আবার সময়ে দুঃখ সমুদ্রে মিলিত হই ; কখনও আমি (তাঁহার) শ্রী-মুখের প্রতি আকর্ষিত হই, আবার সময়ে (তাঁহার চাঞ্চল্যকর) কেশদামের প্রতি লালায়িত হই। কখনও আমি অনুভূতিকে মান্য করি, আবার সময়ে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করি ; কখনও আমি স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহমান, আবার সময়ে তীরের ন্যায় নিশ্চল।

কবির মধ্যযুগের চিন্তাধারার নিদর্শনস্বরূপ নিম্নলিখিত কয়েকটি বয়ৎ উদ্ধৃত হইল :—

হর্ ইরাদে মেঁ নজর্ আতী হৈ অক স্বরতে-ইয়াস্।
শঘল্ অব কুছ্ ভী নহীঁ ফস্‌খে-আজীমৎ কে সিওআ॥
মুত্বমইন্ হো কে লগাতা হোঁ লহদ্ মেঁ বস্‌তর্।
অব উঠাতা হৈ মুঝে কৌন্ ক্বিয়ামৎ কে সিওআ॥

هر ارادے میں نظر آتی ہے اک صورت یاس —
شغل اب کچھ بھی نہیں فسخ عزیمت کے سوا
مطمئن ہو کے لگاتا ہوں لحد میں بستر —
اب اٹھاتا ہے مجھے کون قیامت کے سوا

অর্থাৎ, সব কামনার মধ্যে কেবল নিরাশের প্রতিমূর্তিই দৃষ্টিগোচর হইতেছে ; স্থির-প্রতিজ্ঞার ব্যতিক্রম করা ছাড়া আর আমার কোন কাজ নাই। নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আমি মৃত্যুশয্যার পোষাকেরই আয়োজন করিতেছি ;—কিয়ামত ছাড়া এখন আর আমাকে কে উঠাইতে পারে ?

অথবা,

দুনিয়া কা দীদনী উঅ তমাশা নিকল্ গয়া।
অব গর্দ রহ গয়ী হৈ উঅ মেলা নিকল্ গয়া॥

অর্থাৎ, পৃথিবীর দ্রষ্টব্য সকল রং তামাশা (আমা হইতে) মুছিয়া গিয়াছে ; এখন কেবল ইহার ধূলা রহিয়া গিয়াছে, ইহার সকল জনসংখ্যা মুছিয়া গিয়াছে।

তাঁহার শেষজীবনের কাব্যধারার নিদর্শনরূপে আমরা পাই,

যে তাল্লুক্ মন্‌জিলে হাস্তী সে গুজরা দিলে-মরা।
ইস্ কী নজরূন্ মেঁ সজাওআর তমন্না কুছ ন থা॥
নহীঁ হৈ কাম্ জবান্ কা কুছ অব্ দুয়া কি সিওআ।
নজর্ কিসী পহ নহীঁ হৈ মেরী খুদা কে সিওআ॥

بے تعلق منزل ہستی سے گذرا دل میرا —
اس کی نظروں میں سزاوار تمنا کچھہ نہ تھا
نہیں ہے کام زبان کا کچھہ دعا کے سوا —
نظر کسی پہ نہیں ہے میری خدا کے سوا

অর্থাৎ, এই অসংবদ্ধ অস্তিত্বের আবাস হইতে আমার মন নিবৃত্ত হইয়াছে—ইহার দৃষ্টিপথে দর্শনীয় আর কিছুই নাই। এখন আর 'প্রার্থনা' ছাড়া আর আমার কিছুই বলিবার নাই—খুদা বা ভগবান ছাড়া আর কিছুই আমার লক্ষ্য নয়।

অথবা,

নবী কো সমঝা নহীঁ হোঁ অব তক্ অগর্চি উঅ অস্বল্ মুদ্'আ হৈ।
খুদা কো অল্‌বত্ত জান্‌তা হোঁ খুদা য়হী হৈ জো হো রহা হৈ॥
জুদায়ী নে হী বনাইয়া মুঝ্ কো জুদা নহ্ হোতা তো মৈঁ নহ হোতা।
খুদা কী হস্তী হৈ মুঝ্ সে সাবৎ খুদা নহ্ হোতা তো মৈঁ নহ্ হোতা॥

অর্থাৎ, যদিও নবী (পয়ঘম্বর বা অবতার)-ই আমাদের আদর্শ পুরুষ, তাহা হইলেও আমরা এখনও তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই। আমরা নিশ্চিত জানি যে তিনিই খুদা যিনি আদর্শের পথে চলিয়াছেন। (খুদা-) বিচ্ছেদই আমার সৃষ্টির কারণ ; যদি বিচ্ছেদ না থাকিত, তাহা হইলে আমার অস্তিত্বই থাকিত না। আমার অস্তিত্ব হইতেই খুদার অস্তিত্বের প্রমাণ হয়—যদি খুদা না থাকিত, তাহা হইলে আমারও কোন অস্তিত্ব থাকিত না।

আকবর-কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হাস্যরসের সৃষ্টি ও এই হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে বেশ তত্ত্বপূর্ণ ভাবের সমাবেশ। বাহ্যিকভাবে অনেক সময় মনে হয় তিনি বুঝি হালকা কবিতাই লিখিতেছেন, কিন্তু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাঁহার কি সমাজ, কি রাজনীতি, বা ধর্ম সম্বন্ধীয় সকল প্রকার কাব্যধারায়ই হাস্যরসের মধ্যদিয়া তিনি গভীর চিন্তাধারার পরিবেষণ করিয়াছেন। তাছাড়া তাঁহার কাব্যে বিদ্রূপাত্মক

শ্লেষসূচক অনেক কবিতাই দৃষ্ট হইলেও, ইহাদের মধ্যে কোন ক্রুর কটাক্ষ নাই। তিনি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সামাজিক সকল প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি ও গ্লানিকে দূর করিবার উদ্দেশ্যেই বিশেষ করিয়া এই সকল হাস্যকৌতুকপূর্ণ বিদ্রূপাত্মক কাব্যধারার সমাবেশ করিয়াছেন। আকবর মনে প্রাণে খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিলেন—তাই তাঁহার কাব্যে বিদেশী হালফ্যাসান ও কৃত্রিম ভাবধারার প্রতি কটাক্ষপাত বিশেষ করিয়া দৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্বতঃই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর কথা মনে হয়। তবে কমলাকান্তের দপ্তর বা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য হাস্যকৌতুকপূর্ণ গ্রন্থ গদ্যে লিখিত, কিন্তু আকবরের রসভাণ্ডার কাব্যাকারে গ্রথিত।

ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি বা সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক আকবরের কয়েকটি বিদ্রূপাত্মক কাব্যধারার নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইল। ধর্ম বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে কি কঠোর বিদ্রূপ!

মস্বীবৎ মেঁ ভী অব্ ইয়াদে-খুদা আতী নহীঁ উন্‌কো।
দু'আ মুহঁ সে ন নিক্‌লী পাকটোঁ সে আর্জিয়ান্ নিক্‌লী॥

অর্থাৎ, দুঃখের সময়েও আর তাহার 'খুদা'-নাম মনে আসে না। মুখ হইতে (খুদার নিকট) প্রার্থনা বাহির হয় না—পকেট হইতে (বিদেশী শাসকের নিকট) আবেদন বাহির হয়।

স্বাভাবিক শিক্ষার কোন মূল্য না দিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণ প্রিয়তাকে বিদ্রূপ করিয়া কবি বলিয়াছেন,

ন তীর্-অফ্‌গানী হৈ ন অব্ হুকুম্‌রানী ;
ন উও উজায়ে-মিল্লৎ ন কুরান্‌খ্বানী।
ন বাহম্ আদব্ হৈ ন উও মিহর্‌বানী ;
য়হী কহতী ফিতী হৈ লড়কে কী নানী।
হর্ অক্ শাখ্ মেঁ পাস য়হ অয় বুআ হৈ ;
মেরা লাল্ কালজ্ কা কাকাতুআ হৈ।

نہ تیر افگنی ہے نہ اب حکمرانی —
نہ وہ وضع ملت نہ قرآنخوانی
نہ باہم ادب ہے نہ وہ مہربانی —
یہی کہتی پھرتی ہے لڑکے کی نانی
ہر اک شاخ میں پاس یہ اے بوا ہے —
میرا لال کالج کا کاکاتوا ہے

অর্থাৎ, এখন আর তীর ছোঁড়া, পরিচালন-স্পৃহা, দেশপ্রেম বা কোরান-পাঠের চর্চা নাই। সৌজন্য বা অনুরাগ (চর্চা)-ও নাই : ইহাই বলিতেছিলেন বালকদের দিদিমা। ও পিশিমা, (এখন) প্রত্যেক বিভাগে (পরীক্ষা) পাশ-ই একমাত্র সাধনা—আমার ছেলে কলেজের কাকাতুয়া।

পরাধীনতার নাগপাশ কেমনভাবে আমাদের অমানুষ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বিদ্রূপ করিয়া রসের জোগান দিয়াছেন,

বাবূ কহনে লগে বজিট্ পহ লড়ো ;
মুল্ক্ কো দেখো অপনে :হক্ পহ আড়ো।
কহ দিয়া স্বাফ্ হম্‌নে অয় মহরাজ ;
হো মুবারক্ তুম্‌হেঁ ইয় কাম্ ইয় কাজ।
মা মকীমানে-কোয়ে দিল্‌দারীম্ ;
ইয়া ডিপূটেশন্ অস্ত্ ইয়া ঘমে-মেম্।
খেঁচো ন কমানোঁ কো ন তল্‌বার্ নিকালো ;
জব তোপ মুকাবিল্ হৈ তো অখ্‌বার্ নিকালো।

অর্থাৎ, বাবু কহিতে লাগিলেন, বাজেট নিয়া লড়াই কর, নিজের দেশের প্রতি খেয়াল কর, আর নিজ দাবীর পক্ষ সমর্থন কর। (কিন্তু) আমরা পরিষ্কার বলিয়া দিলাম, হে মহারাজ এই কাজ ও কর্তব্য তোমারই সাজে—আমরা শান্তির নির্জন কোনে বেশ সুখেই আছি। ডিপুটেশান (অর্থাৎ নিজ দুঃখের আর্জি পেশ করা)-ই হউক বা স্ত্রীজাতির দুঃখব্যথাই হউক, তীর ছোঁড়া বা তলোয়ার উঠানোর দরকার নাই। যখন কামানের গুলি আসিয়া সম্মুখে পড়িবে, তখন 'পত্রিকা' বাহির কর।

শব্দের বিচিত্র ব্যবহার দ্বারা অন্যের কাব্যকে কি সুন্দরভাবে আকবর নিজের কাব্য করিয়া নিয়াছেন এবং এই সঙ্গে হাস্যরস ভাণ্ডারের সমৃদ্ধিও লক্ষণীয়।

করীমা ব-বখ্‌শায়ে বর্ হালে-কৌম্ ;
স্বলউঅৎ অস্ত্ রায়েজ্ দরীশান্ না স্বৌম্।
করীমা ব-বখ্‌শায়ে বর্ হালে-বন্দা ;
কি হস্তম্ আসীরে-কমীটি ও চন্দা।
রিশ্‌তয়ি দর্ গর্দনম্ আফ্‌গন্দা পেট্ ;
মী বুরদ্ হর্ জা কি কেক্ অস্ত ও প্লেট্।

کریما بہ بخشائے بر حال قوم —
صلوٰۃ ست رائج در ایشان نہ صوم
کریما بہ بخشائے بر حال بندہ —
کہ ہستم اسیر کمیٹی و چندہ
رشتۂ در گردنم افگندہ پیٹ —
می برد ہر جا کہ کیک ست و پلیٹ

অর্থাৎ, হে দয়ালু আমাদের জাতির প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর; তাহাদের প্রার্থনা এখন অবশ্যই দরকার, কিন্তু উপবাস নহে। হে দয়ালু, বান্দার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, কারণ আমরা 'কমিটি' ও 'চান্দা'-র বন্দী। (আমরা) পেটের বশ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ—ইহা যেখানেই 'কেক' ও 'প্লেট' আছে, (আমাদের) তথায় চালিত করে।

আকবর একান্তভাবে হাস্যরসের কবি হইলেও তিনি চিন্তাশীল দার্শনিক কবিও বটে। তাঁহার মতে বিদেশী শিক্ষা ও অধীনতার মধ্যে থাকিতে বাধ্য হইলেও আমাদের নিজেদের আদর্শ ও ভারতীয় কৃষ্টি কখনই ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। বস্তুতঃ তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার মধ্যে কোন স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না; তিনি যেমন বিদেশী শাসকবর্গের নিন্দা করিয়াছেন, তেমনি তাঁহাদের শিক্ষা প্রসারের সুখ্যাতিও করিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া তিনি শেষজীবনে এই বিদেশী শাসকবর্গ হইতেই 'খানবহাদুর' উপাধিদ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন।

শিক্ষা, সংস্কৃতি বা ধর্ম সম্পর্কে আকবর কিছুটা গোঁড়া পন্থী ছিলেন। তাহা হইলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি তিনি একেবারে ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন না। তাঁহার মনে সততই ভয় ছিল যে ইহার খাঁটি রূপটি গ্রহণ না করিয়া বাহ্যিকরূপে ভুলিয়াই হয়তঃ ভারতবাসী নিজেদের যাহা ভাল আছে তাহাও হারাইবে। তাঁহার অন্তরের কথা ছিল খাঁটি মানুষ হওয়া। তাই তাঁহাকে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে গাহিতে শুনি,

দো উসে শৌহির্ ও আৎফাল্ কী খাতির তালীম্;
কৌম্ কে ওআস্তে না দো নালীম আওরৎ কো।

دو اسے شوہر و اطفال کے خاطر تعلیم —
قوم کے واسطے تعلیم نہ دو عورت کو

অর্থাৎ, স্বামী ও সন্তানের জন্য তাহাকে শিক্ষা দাও; (কেবল) দেশের জন্য মেয়েদের শিক্ষা দিও না।

ধর্ম ব্যাপারেও ইসলাম ধর্মের সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেও তিনি কোন সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন না। ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বরকে তিনি কখনই পছন্দ করিতেন না।

নজর লখ্‌নোয়ী নামে প্রসিদ্ধ নৌবৎ রায় নজর কায়স্থ বংশীয় সকসেনা পরিবার অন্তর্ভুক্ত। এই সকসেনা পরিবার নবাবী আমলে লক্ষ্ণৌতে বেশ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নজর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লখনোতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ লক্ষিত হয় এবং উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী ভাষার আবশ্যকীয় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শীঘ্রই সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি খদঙ্গে-নজর্ নামক একটি পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। ইহাতে প্রথম প্রথম কেবল ঘজল কবিতাই প্রকাশ হইত, পরে অন্যান্য কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গদ্য-সাহিত্যেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু শীঘ্রই (১৯০০ খৃষ্টাব্দে) ইহার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নজর 'জমানা' (=জমানহ) নামক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা 'আদীব'-এর সম্পাদনাভার প্রাপ্ত হইলেন। বৎসর দুই তথায় কার্য করার পরে তিনি কানপুরে ফিরিয়া আসেন এবং তথায় 'জমানা' পত্রিকার সহিত আবার সংশ্লিষ্ট হইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সাপ্তাহিক 'আজাদ' পত্রিকারও একজন পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রসিদ্ধ উর্দু পণ্ডিত ও ব্যারিষ্টার হামিদ্ আলী খানের পরিচিতিতে লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত নবলকিশোর প্রেস ও উধ্-আখ্‌বারের মালিক রায়বহাদুর মুন্সী প্রাগনরায়ন ভার্গব্ কর্তৃক তাঁহার পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসাবে রঙমহল সম্পাদনার কার্যভার গ্রহণ করেন। শীঘ্রই তিনি এই প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন পত্রিকার সম্পাদক পদে উন্নীত হইলেন। এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে অত্যধিক পরিশ্রম করার ফলে তাঁহার দেহ ও মন ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে। তদুপরি এই সময়ে তাঁহার একমাত্র কন্যা ও দৌহিত্রীর মৃত্যুতে তিনি অতিমাত্রায় মর্মাহত ও সংসারের প্রতি একেবারে নিরাশ হইয়া পড়েন। তাহারই ফলে তিনি সম্পাদনা কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন এবং তাঁহার শেষ বয়সে রোগশোক ও দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করিয়া তিনি তাঁহার ৫৬ বৎসর বয়সে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে প্রাণত্যাগ করেন।

নজর একজন স্বভাব-কবি। যদিও শেষবয়সে তিনি নব্য-চিন্তাধারায়

কবিতা লিখিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, কিন্তু আসলে তিনি প্রাচীনপন্থী। তিনি ঘজল লিখিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'মুসদ্দস' কবিতারও অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। কাব্য ছাড়া সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ছিল। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার যুগের অনেক সাহিত্য-গ্রন্থেরই 'রিভিউ' লিখিয়া সাহিত্য-সাধনার বিশেষ উৎসাহ বর্ধন করিয়াছেন।

নজরের কবি-শিষ্যদের মধ্যে বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ মনওয়ার লক্ষ্ণৌ শহরে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। নজরের কাব্যের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার একটি মুসদ্দস নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা তাঁহার একান্ত প্রিয় দৌহিত্রীর মৃত্যু উপলক্ষে শোকগাথারূপে কথিত হইয়াছিল।

হুয়া তমাম্ উমিদুন্ কা খাতিমা তুম্ পর্ ;
কিসী সে অব্ না তরাক্ না হৈ কিসী পহ নজর্।
জহান্ মেঁ অপনা হো অন্জাম্ কিয়া নহীঁ হৈ খবর্ ;
মেরে পহ দেখিয়ে মিলতা হৈ অব্ কুফন্ কিয়োঁ কর।
কহাঁ গিয়ে মেরী বিগ্ড়ী সনবারনে ওয়ালে ;
পুকার লো মুঝে লালা পুকারনে ওয়ালে।

ھوا تمام اُمیدوں کا خاتمہ تم پر —
کسی سے اب نہ توقع نہ ہے کسی پہ نظر
جہاں میں اپنا ھو انجام کیا نہیں ہے خبر —
مرے پہ دیکھئے ملتا ہے اب کفن کیونکر
کہاں گئے میری بگڑی سنوارنے والے —
پکار لو مجھے لالہ پکارنے والے

অর্থাৎ, তোমা হইতে আমার সকল আশার সমাপ্তি হইয়াছে—আর কিছুতেই আমার আর আশা আকাঙ্ক্ষা বা দৃষ্টিপাত নাই। যাহা কিছু আপন ছিল—সমূলে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছ—তোমার কি লক্ষ্য নাই ? আমার রোগের প্রতি লক্ষ্য কর—কেমন করিয়া মৃত্যু-শয্যা সজ্জিত হইতেছে। আমার সকল দুঃখযন্ত্রণার মোচনকারী কোথায় গেল ?—হে আমার বৎস, (অবশ্যই) আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া নিতে পার।

—

(খ) আধুনিক কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায়

পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও ভাষাসমূহের প্রভাব ও ইংরেজী শিক্ষার ফলে পাশ্চাত্য ধারানুযায়ী অন্যান্য আধুনিক আর্য ভাষাসমূহের ন্যায় আধুনিক উর্দু সাহিত্য ও কাব্যধারায়ও বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ-প্রকৃতি ও মানব সমস্যার নানা বিশ্লেষণই আলোচিত হইয়াছে। কাব্যের প্রকৃতি ও গড়নও সেই অনুযায়ী নূতন ছাঁদে গঠিত হইয়াছে। ছন্দের কাঠিণ্য, অলঙ্কারের বাহুল্য ও ভাবপ্রকাশের বাঁধাধরা নিয়ম সমূহ দূরীভূত হইয়া সহজ, সরল প্রাণের উচ্ছল প্রকাশই আধুনিক যুগের কাব্যধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অনুবাদ-সাহিত্যের প্রসার এই যুগেই বিশেষ করিয়া পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের সাহিত্যভাণ্ডার হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে দেশবাসীকে সেই সকল ভাবসমৃদ্ধ রত্নের উপহার দেওয়া আধুনিক যুগের প্রত্যেক ভাষারই একটি বিশেষ প্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উর্দু সাহিত্যও এই বিষয়ে তাহার শক্তি অনুযায়ী পশ্চাতে থাকে নাই। যেমন উর্দু সাহিত্যের অন্ততঃ ২।৪টি গ্রন্থ (যথা ঘালিব, মীর্ বা ইক্বালের) অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, তেমনি অন্যান্য ভাষার অনেক সাহিত্যই উর্দু ভাষায় রূপান্তর লাভ করিতেছে। ইংরেজ কবি টমাস গ্রে-র উর্দু অনুবাদ কাব্য 'গোরে-ঘরীবান' উপহার দিয়া কবিবর ত্বাবাত্বাবায়ি ধন্য হইয়াছেন। সলীম পানীপতী-কৃত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 'সাগর সঙ্গীতে'র কাব্যানুবাদ 'বহরে-তরন্নম্' আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা বিশেষ করিয়া 'গীতাঞ্জলি' উর্দু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক উর্দু রূপান্তরই দৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ গীতার অনুবাদ ও কালিদাসের 'ঋতু-সংহার' ও মেঘদূতের কাব্যানুবাদ 'অব্রূসে-সুখুন্' ও 'পৈকে-অবর্' উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল ছাড়া আরো অনেক উর্দু কাব্যানুবাদই হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কাব্যানুবাদে সফলকাম হইতে হইলে যেমন নিজভাষায় এক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হইতে হইবে, তেমনি মূলভাষা ও সাহিত্যেরও যথেষ্ট দখল থাকা চাই।

আধুনিক যুগে সংস্কৃতি ও সাহিত্যমূলক অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি। ইহা

যেমন সাহিত্য-উন্নতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অপেক্ষা করিতে পারে, তেমনি বাহ্যাড়ম্বরের পেছনে যদি মূল ভিত্তি দৃঢ় না হয়, তাহা হইলে অচিরেই ইহার ভূমিতে ধূলিসাৎ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। তবে আশার কথা এই যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জাতীয় দেশনেতাগণও এইদিকে বিশেষ লক্ষ্য করিতেছেন।

ডক্টর স্যার শেখ্ মহম্মদ্ ইক্‌বাল উর্দু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি না হইলেও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবি। তাঁহার প্রসিদ্ধি কেবল পাক-ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। সকল ইসলামীয় দেশসমূহ এবং সুদূর ইংলণ্ড ও আমেরিকায়ও তাঁহার সুনাম প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ তাঁহার সাহিত্যের গণ্ডী কেবল উর্দুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না—তিনি পারস্য সাহিত্যেও প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থ এবং ইংরেজী ভাষায়ও গভীর তত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া মুসলিম জগতের ঐহিক ও পারত্রিক সংঘবদ্ধতার জন্য সর্বপ্রকার প্রযত্নই তিনি কিরিয়াছেন। আর পাকিস্তান সৃষ্টির মুল উদ্বোধক যদি কেহ হইয়া থাকেন—তাহা সেই কবি-দার্শনিক ইকবাল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়ালকোট নামক স্থানে মহম্মদ ইক্‌বালের জন্ম হয়। পঞ্জাব তাঁহার জন্মভূমি হইলেও তাঁহার পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল কাশ্মীর। কবি নিজেই গাহিয়া গিয়াছেন,

হিন্দুস্তান মেঁ আয়ে হায়ঁ কাশ্মীর ছোড়্‌কর্;
বুল্‌বুল্ নে আশিয়ানা বনায়া চমন্ সে দূর।

هندوستان میں آئے هیں کشمیر چھوڑ کر —
بلبل نے آشیانه بنایا چمن سے دور

অর্থাৎ, (তাঁহারা) কাশ্মীর ছাড়িয়া হিন্দুস্তানে আসিয়াছেন, (আর) বুলবুল তাহার বাসা বাগান হইতে অনেক দূরে নির্মাণ করিয়াছে।

ইক্‌বাল বাল্যকাল হইতেই মেধাবী ছাত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শিয়ালকোট স্কটিশ মিশন হইতে এফ্. এ. পাশ করিয়া দর্শনে অনার্স (Honours) সহ ইংরেজী ও আরবী ভাষা নিয়া লাহোর গভর্নমেণ্ট কলেজের বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। তাহা হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। পাঠ-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লাহোর অরিয়েণ্টেল কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এবং শীঘ্রই তিনি লাহোর গভর্নমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক হইবার সুযোগ লাভ করেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আরো উচ্চশিক্ষা লাভার্থে ইক্‌বাল ইংলণ্ড গমন করেন। তথাকার কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Ethics বা নীতিশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি জার্মান গমন করেন এবং তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পারস্য দেশের দর্শন-ইতিহাস নামক গবেষণামূলক গ্রন্থের মাধ্যমে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। এই গ্রন্থই পরে লণ্ডন হইতে টমাস আর্নল্ডের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়া Metaphysics of Persia নামে প্রকাশিত হয়। লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইক্‌বাল তথা হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। এই সময়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক উল্লিখিত টমাস আর্নল্ড কিছুকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলে, ডক্টর ইকবাল সেই সময়ে তথায় আরবীভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন।

ইউরোপ হইতে ফিরিয়া ইক্‌বাল লাহোরেই তাঁহার আইনব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি 'নাইট' (Knight) উপাধি লাভ করেন। জন্মগত কাব্যসাধনায় সুগভীর পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণ হওয়ায় তাঁহার কাব্যসমূহ সহজেই সুধী ভাবুক চিত্তকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাছাড়া তাঁহার জীবনের শেষ বয়সে একটা বড় গুজব উঠিয়াছিল যে তিনি সাহিত্যে 'নবলপ্রাইজ'-ও পাইতে পারেন। কিন্তু পাক-ভারতের বিশেষ দুর্ভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত তাহা তিনি ইহা লাভ করিতে পারেন নাই।

ইক্‌বালের নিম্নলিখিত সাহিত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) ইল্‌মুল্‌-ইক্‌তিসাদ্ :—মিতব্যয়িতা বিষয়ে উর্দু সাহিত্যে ইহাই বোধহয় সর্বপ্রথম গ্রন্থ। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইহা রচিত হয়। (২) ঈরানের দর্শন :—ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

(৩) আস্‌রারে-খুদী : একটি সুচিন্তিত ফারসী মস্‌নবী-কাব্য। ইহারই ইংরেজী তর্জমা করিয়াছেন প্রসিদ্ধ সুফী-ধর্ম গবেষক ডক্টর নিকলসন।

(৪) রমুজে-বেখুদী : ইহাও ফারসী মস্‌নবী-কাব্য। ইহাতেই সমগ্র মুসলিম জাতির মূলগত ঐক্য যে 'কাবা' হইতে উদ্ভূত তাহা প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই কারণে পাকিস্তানের ভাব-জন্মদাতা বলিয়া ইক্‌বাল অনেক সময়ে উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

(৫) ফারসীতে তাঁহার আর একটি প্রসিদ্ধ কাব্যের নাম পইয়ামে-মশ্‌রিক্। (৬) বঙ্গে-দরা কবির উর্দু কাব্যের সঙ্কলন। ইহা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

(৭) কুল্লিয়াতে-ইক্‌বাল্ : সুদীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপক্রমণিকা সহকারে

এই উর্দু কবিতাসমূহের সঙ্কলন করিয়াছেন মহম্মদ আবদুর রজাক্। তাঁহার ফারসী কাব্যের সমালোচনা মৎ-লিখিত 'পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এখানে আমরা তাঁহার উর্দু-কাব্য সমালোচনায়েই সীমাবদ্ধ রহিলাম।

ইক্‌বালের কবিত্বশক্তির উদ্ভব ও বিকাশ তাঁহার বাল্যকালেই পরিলক্ষিত হয়। শিয়ালকোটের স্কুলে পাঠকালীন স্ব-লিখিত কবিতার আবৃত্তি করিয়া বালক ইক্‌বাল তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে পরিতৃপ্ত করিতেন। তাঁহাদের মধ্য হইতেই বিখ্যাত সাহিত্যিক মীর্জা আর্শাদ্ গুর্‌গানী তাঁহার কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ইক্‌বালের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বালক ইক্‌বালও এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতেই সর্বপ্রথম কাব্যে দীক্ষালাভ করেন। কিন্তু শীঘ্রই প্রসিদ্ধ উর্দু কবি দাঘের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহাকেই আমাদের কবিবর কাব্য-গুরুরূপে গ্রহণ করেন। ইক্‌বালের কাব্যেও তাঁহার এই স্বীকৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন,

মুঝে ভী ফখর্ হৈ শাগ্‌রিদীয়ে-দাঘে-সুখুন্‌দার্ পর্।

অর্থাৎ, কবিবর দাঘের শিষ্যত্বে আমিও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।

ইক্‌বালের কাব্যধারাকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম পর্যায়ে বাল্যকাল হইতে তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের পূর্ব পর্যন্ত। ইহা বস্তুতঃ তাঁহার কাব্যধারার প্রস্তুতিযুগ। এই সময়ে বিশেষ করিয়া তাঁহার উর্দু ঘজল ও অন্যান্য কবিতায় দেশপ্রেম ও দেশহিতৈষণার উদ্দামতাই প্রকাশ পায়। তাঁহার বিখ্যাত কবিতা হিমালহ (বা হিমালয়), তরানাহ্-ই-হিন্দী, হিন্দুস্তানী বচ্চোঁ কা কৌমী-গীৎ ও নয়া-শিবালহ (বা নব-শিবালয়) এই সময়কারই লিখিত কবিতা।

তাঁহার ইউরোপবাস কালীন সময়কে ইক্‌বাল্-কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায় হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সময়ে ইক্‌বাল তাঁহার কাব্যচর্চা অনেকটা পরিত্যাগই করিয়াছিলেন, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সানুরোধে তিনি আবার লেখনী ধারণ করেন। এবারের কাব্যপ্রবাহের ভাষাস্রোত সঙ্কীর্ণ উর্দুকে গ্রহণ না করিয়া ঈরানী ভাষাকে গ্রহণ করে। বস্তুতঃ তাঁহার প্রায় সকল ফারসী কাব্যই এই সময়কার লেখা। তাঁহার নিজ মনের সুগভীর চিন্তাধারা, দার্শনিক তত্ত্বসমূহ ও তৎসঙ্গে ইসলামীয় রাষ্ট্রসমূহের একাত্মবোধ এই যুগের কাব্যসমূহে বিশেষ লক্ষণীয়। এই যুগের উল্লেখযোগ্য উর্দু কাব্য তরানায়ে-মিল্লী।

ইক্‌বাল-কাব্যধারায় তৃতীয় পর্যায় ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনকাল হইতে সূচিত হইয়া তাঁহার জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত চলিতে থাকে। এবং ফারসী ও উর্দু কবিতার মাধ্যমে মুসলিম জগতের কবিগুরুরূপে ইসলামীয় একাত্মবোধের মহিমাই তিনি গাহিয়া গিয়াছেন। কাব্যের সুচারু উন্মেষ হইলেও আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য যে ইক্‌বাল এই যুগে ভারতীয় কবি না হইয়া নিজকে ইস্‌লাম-জগতের কবি বলিয়া পরিচিত করিতেই শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য কবিতা শিক্‌ওহ ও জবাবে-শিক্‌ওহ।

ইক্‌বাল-কাব্যের প্রথম যুগের কবিতার মধ্যে ভারতীয় চিন্তাধারাই তাঁহাকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তরানায়ে-হিন্দ্‌ কবিতায় কবিবর যে দেশাত্মবোধ দেখাইয়াছেন, তাহা অনেক সময় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্‌' বা রবীন্দ্রনাথের জাতীয়সঙ্গীতের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। তাঁহার নয়া-শিয়ালা যেন ভারতীয় ধর্ম প্রবর্তকদের হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিধায়ক ঐশ্বরিক বাণী বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতের প্রত্যেকটি বালিকণার প্রতি তাঁহার সুগভীর অনুপ্রেরণা এই কবিতাটিকে বস্তুতঃই সুমহান করিয়া তুলিয়াছে। সম্পূর্ণ কবিতাটিই এখানে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইল।

সচ্‌ কহদোঁ অয় বর্‌হমন্‌ গর্‌ তো বুরা নে মানে ;
তেরে সনম্‌কদোঁ কে বুৎ হো গয়ে পুরানে।
অপ্‌নোঁ সে বৈর্‌ রখ্‌না বুতোঁ সে সীখা ;
জঙ্গ্‌ ও জদল্‌ সিখায়া ওয়াইজ্‌ কো ভী খুদা নে।
তঙ্গ্‌ আকে মৈঁনে আখির্‌ দয়র্‌ ও হরম্‌ কো ছোড়া ;
ওয়াইজ্‌ কা ওয়জ ছোড়া ছোড়ে তেরে ফসানে।
পৎথর্‌ কী মুরতোঁ মেঁ সমঝা হৈ তু খুদা হৈ ;
খাক্‌ ওঅতন্‌ কা মুঝ্‌কো হর্‌জর্রা দেওতা হৈ।
আ ঘয়রিয়ৎ কে পর্দে ফির অক্‌বার্‌ উঠা দেঁ ;
বছড়োঁ কো ফির্‌ মিলা দেঁ নক্‌শে-দুয়ি মিটা দেঁ।
সুনী পড়ী হোয়ি হৈ মুদ্দৎ সে দিল্‌কী বস্তী ;
আ অক্‌ নয়া-শিওয়ালা ইস্‌ দেস্‌ মেঁ বনা দেঁ।
দুনিয়া কে তীর্থোঁ সে উচাঁ হো অপ্‌না তীর্থ ;
দামানে-আস্‌মান্‌ সে ইস্‌ কা কলস্‌ মিলা দেঁ।
হর্‌ সুব্‌হ্‌ উঠ্‌কে গায়েঁ মন্তর্‌ উঅ মীঠে মীঠে ;
সারে পূজারিয়োঁ কো ময়ে-পীৎ কী পিলা দেঁ।

শক্তী ভী শান্তী ভী ভগতোঁ কে গীৎ মেঁ হৈ ;
ধর্তী কে বাসীয়োঁ কী মুক্তী প্রীৎ মেঁ হৈ।

سچ کہدوں اے برهمن گر تو برا نه مانے —
تیرے صنمکدوں کے بت هو گئے پرانے
اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا —
جنگ و جدل سکھایا واعظ کو بھی خدا نے
تنگ آکے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا —
واعظ کا واعظ چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے
پتھر کی مورتوں میں سمجھا تو خدا هے —
خاک وطن کا مجھه کو هر ذره دیوتا هے
آ غیرت کے پردے اک بار پھر اٹھادیں —
بچھڑوں کو پھر ملا دیں نقش دوئی مٹا دیں
سونی پڑی هوئی هے مدت سے دل کی بستی —
آ اک نیا شیواله اس دیس میں بنا دیں
دنیا کے تیرتھوں سے اونچا هو اپنا تیرتهه —
دامان آسمان سے اس کا کلس ملادیں
هر صبح اٹھه کے گائیں منتر وه میٹھے میٹھے —
سارے پجاریوں کو مے پیت کی پلا دیں
شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں هے —
دھرتی کے باشیوں کی مکتی پریت میں هے

অর্থাৎ, যদি তুমি কোন অন্যায় মনে না কর, তাহা হইলে আমি বলি যে, হে ব্রাহ্মণ, তোমার মন্দিরের প্রতিমা পুরাতন হইয়া গিয়াছে। নিজেদের মধ্যে বৈরীভাব রাখা প্রতিমা হইতেই শিখিয়াছ—(এই) খুদাই ধর্ম প্রচারককে ঝগড়া বিবাদ শিখাইয়াছে। বিরক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত আমি মন্দির ও মসজিদকে পরিত্যাগ করিয়াছি ; ধর্মপ্রবর্তকদের উপদেশ (ও সঙ্গে সঙ্গে) তোমাদের এই (বিবাদ-বিসংবাদপূর্ণ ধর্ম) কাহিনী হইতে বিরত রহিয়াছি। প্রস্তরের মূর্তিকেই তোমরা খুদা বলিয়া মনে করিয়া নিয়াছ—(কিন্তু) আমার নিকট নিজ জন্মভূমির প্রত্যেকটি বালিকণা দেবতা বলিয়া অনুভূত হয়। এস, শত্রুতার পর্দা আবার উঠাইয়া ফেলি (এবং) শিশুদের মধ্যে মিলনবোধ

জাগাইয়া দ্বৈতভাব মুছিয়া ফেলি। অন্তর-মন্দির অনেকদিন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে ; এস, এই (অন্তর-) দেশে নব-শিবালয়ের প্রতিষ্ঠা করি। পৃথিবীর সকল তীর্থ হইতে এই তীর্থ উঁচা হউক— এস, আকাশের সহিত ইহার চূঁড়া মিলাইয়া দেই। প্রতি প্রাতঃকালে আমরা সুমধুর মন্ত্র গাহিব ও সকল পূজারীকে প্রেমের মদ পান করাইব। ভক্তদের গানে শক্তি ও শান্তির বাণীই উত্থিত হইতেছে—(বস্তুতঃ) পৃথিবীবাসীদের মুক্তি প্রেমের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

ইকবালের ইসলামীয় ভ্রাতৃ-বোধের মূল সূত্র, সকল মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজকে এক ভ্রাতৃ-সঙ্ঘবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। এবং সেই ইসলাম-সঙ্ঘবদ্ধতার খাতিরে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের দলীয় ও সমাজগত প্রথা এবং ধর্ম ও রাজনীতিকে বিসর্জন দিতে হইবে। তাহা হইলে কবিবরের মতে সারা বিশ্বের উপর ইসলামের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত। ইকবাল গাহিয়াছেন,

য়হী মক্‌সূদে-ফিৎরৎ হৈ য়হী রম্‌জে-মুসল্‌মানী ;
আখুওৎ কী জহান্‌গীরী মহব্বৎ কী ফরাওনী।
বুতানে-রঙ্গ্‌ ও খূন্‌ কো তোড়্‌ কর্‌ মিল্লৎ মেঁ গম্‌ হোজা ;
না তূরানী রহে বাকী না ঈরানী না অফ্‌ঘানী।

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی —
اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی —
بتاں رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہوجا —
نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

অর্থাৎ, ইসলামবোধের ইহাই আসল উদ্দেশ্য ও রহস্য যে ইহার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা ও প্রেমের প্রভুত্ব (স্থাপিত হইবে)। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও রক্তের মূর্তির বিভেদ ভুলিয়া এক জাতির মধ্যে মিলিত হইয়া যাও—(তাহা হইলে) তুরানী, ইরানী বা আফগানীর (প্রভেদ) আর থাকিবে না।

ইকবাল-দর্শনের মূল রহস্য অনুধাবন করিলে দুইটী তত্ত্বের খোঁজ পাওয়া যায়। নিজকে জান ও নিজ-অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা কর। এই নিজ-অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে জাতি ও ধর্মের উন্নতি চাই। এবং তাহার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে একতাবদ্ধ হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

ইকবাল ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রাণত্যাগ করেন।

উর্দু সাহিত্যে আধুনিক রুচির প্রসিদ্ধ উদ্যোক্তা পণ্ডিত ব্রজনরায়ন

চিক্‌বস্ত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ফয়জাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি তাঁহার নিজ পিতৃভূমি লখনোতে চলিয়া আসেন এবং তথায়ই তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আইনে ডিগ্রি লাভ করেন। লক্ষ্ণৌতেই তাঁহার আইন ব্যবসা আরম্ভ করিয়া শীঘ্রই তিনি একজন প্রসিদ্ধ উকিলরূপে সম্মান লাভ করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবি-উচিত উদার মন ও সদব্যবহার দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। কিন্তু আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়া তিনি দেশবাসীকে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কোন মোকদ্দমা পরিচালনার্থে তিনি বেরিলী যান এবং তথা হইতে ফিরিবার পথে হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া রেল ষ্টেশনেই প্রাণত্যাগ করেন।

বাল্যকাল হইতেই চিক্‌বস্তের কাব্যসাধনার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল; এবং কথিত আছে ৯ বৎসর বয়সে তিনি সর্বপ্রথম একটি ঘজল-কবিতা রচনা করেন। পাঠ্যকালেই তিনি যেমন কাব্যালোচনা করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন, তেমনি সময় সময় পুরস্কার ও পদকপ্রাপ্তির সম্মানও অর্জন করিয়াছেন।

চিক্‌বস্ত্ কোন কবি-উপাধি (তখল্লুস্) গ্রহণ করেন নাই ও তাঁহার কোন কবি-গুরুও ছিলেন না। তিনি সাধারণভাবে উর্দুর শ্রেষ্ঠ কবি তথা মীর্, ঘালিব, আনীস্ ও আতিশের কাব্যধারা অনুশীলন করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। আর গদ্যে তিনি প্রসিদ্ধ উর্দু গদ্যকার মৌলানা মহম্মদ হুসেন আজাদের অনুকারী ছিলেন।

প্রথম প্রথম কেবল মামুলী ঘজল-কবিতা লিখিলেও পরবর্তী কাব্য-সাধনায় চিক্‌বস্ত পুরাতন কাব্যধারা মুসদ্দস্ ছাড়া আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত সকল প্রকার—সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও প্রকৃতি-পরিবেশের কবিতাই লিখিয়াছেন। তাছাড়া যেমন ভাবের সমাবেশ, তেমনি ভাবের উপযুক্ত জোরালো শব্দদ্বারা তাঁহার কাব্যধারার মাধুর্য সম্পাদন করিয়াছেন। সরলতা ও সরসতার মাধ্যমে নূতন নূতন ভাবধারা ও রসসৃষ্টির যোগানই তাঁহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এবং চিকবস্ত নিজেও গাহিয়াছেন,

নয়া মস্‌লক্ নয়া রঙ্গ্ স্থখুন্ ঈজাদ্ করতে হৈঁ;
আরূসে-শঅর্ কো হম্ কয়েদ্ সে আজাদ্ করতে হৈঁ।

نیا مسلک نیا رنگ ایجاد کرتے ہیں —
عروس شعر کو ہم قید سے آزاد کرتے ہیں

অর্থাৎ, নব নব ভাবের উন্মেষ ও সৃজনী-শক্তি দ্বারা কাব্যরসের সৃষ্টি হয়—(এইরূপেই) আমরা কাব্য-বধূকে বন্দী অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে পারি।

শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁহার নিজ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায়, এবং তদুপরি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমাদের কবিবরের কাব্য-সাধনার কাল বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। তাহা হইলেও পণ্ডিতপ্রবর স্যার তেজবহাদুর সপ্রূ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত চিকবস্তের কাব্যসমষ্টি ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাছাড়া ১৯১৮ হইতে স্যারভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি (Servant of India Society) কর্তৃক পরিচালিত 'সুবহে-উম্মিদ্'-এর সম্পাদনাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও কবিতাদির উল্লেখই বিশেষ দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন ধারানুযায়ী ঘজল কবিতা লিখিলেও চিক্‌বস্ত আধুনিক রুচি অনুযায়ী ঘজলের ভাবধারা একেবারে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ ঘজলই আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ উপদেশাদির সমষ্টি। নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার নিম্নলিখিত ঘজলটি উদ্ধৃত হইল।

জিন্দগী কিয়া হৈ অনাসির্ মেঁ জহুরে-তরতীব্;
মৌৎ কিয়া হৈ উন্হীঁ অজ্জা কা পরীশান্ হোনা।
ফনা কা হুশ্ আনা জিন্দগী কা দর্দ-সর্ জানা;
আজল্ কিয়া হৈ খুমারে-বাদায়ে হাস্তী উতর্ জানা।
আক্ল কিয়া হৈ তমন্নায়ে-ওফা মেঁ মর্না;
দীন্ কিয়া হৈ কিসী কামিল্ কী পরস্তিশ্ কর্না।
কমালে-বুজদিলী হৈ পস্ত হোনা অপনী আখোঁ মেঁ;
অগর্ থোড়ী সে হিম্মৎ হো তো ফির্ কিয়া হো নহীঁ সক্তা।
উভরনে হী নহীঁ দেতী হমেঁ বে মায়েগী দিল কী;
নহীঁ তো কৌন কৎরা হৈ জো দরিয়া হো নহীঁ সক্তা?
অগর্ দর্দে-মহব্বৎ সে ন ইন্সান্ আশ্না হোতা;
ন মর্নে-কা আলম্ হোতা ন জিনে কা মজা হোতা।
দিলে-অহবাব মেঁ ঘর হৈ শিগুফ্তা রহতী হৈ খাতির্;
য়হী জিন্নৎ হৈ মেরী আওর্ য়হী বাঘে-আরম্ মেরা।
উম্ম সৌদা জিন্দগী কা হৈ ঘম্ ইন্সান্ সহতা হৈ:
নহীঁ তো হৈ বহুৎ আসান্ ইস্ জিনে সে মর্ জানা।

জহাঁ মেঁ রহ কে ইয়োন্ কায়িম্ হোঁ অপ্‌নী বে-সবাতী পর্ ;
কি জৈসে অক্‌সে-গুল্ রহতা হৈ আবে-জুয়ে গুল্‌শন্ মেঁ ।
দিল্ মেঁ ইস্ তরহ সে অর্‌মান্ হৈঁ আজাদী কে ;
জৈসে গঙ্গা মেঁ ঝলকতী হৈ চমক্ তারোঁ কী ।

হমারে আওর্ উআয়িজোঁ কে মজহব্ মেঁ ফরক্ অগর্
হৈ তো ইস্ কদর্ হৈ ;
কহেঙ্গে হম্ জিন্ কো পাসে-ইন্‌সান্ উঅ উস্ কো
খৌফে-খুদা কহেঙ্গে ।

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب —
موت کیا ہے انہیں اجزا کا پریشاں ہونا
فنا کا ہوش آنا زندگی کا درد سر جانا —
اجل کیا ہے خمار بادۂ ہستی اتر جانا
آبرو کیا ہے تمنائے وفا میں مرنا —
دین کیا ہے کسی کامل کی پرستش کرنا
کمال بزدلی ہے پست ہونا اپنی آنکھوں میں —
اگر تھوڑی سے ہمت ہو تو پھر کیا ہو نہیں سکتا
ابھرنے ہی نہیں دیتی ہمیں بے مائگی دل کی —
نہیں تو کون قطرہ ہے جو دریا ہو نہیں سکتا
اگر درد محبت سے نہ انسان آشنا ہوتا —
نہ مرنے کا الم ہوتا نہ جینے کا مزا ہوتا
دل احباب میں گھر ہے شگفتہ رہتی ہے خاطر —
یہی جنت ہے میری اور یہی باغ ارم میرا
وہ سودا زندگی کا ہے کہ غم انسان سہتا ہے —
نہیں تو ہے بہت آسان اس جینے سے مرجانا
جہاں میں رہ کے یوں قائم ہوں اپنی بے ثباتی پر —
کہ جیسے عکس گل رہتا ہے آب جوئے گلشن میں
دل میں اسطرح سے ارماں ہیں آزادی کے —
جیسے گنگا میں جھلکتی ہے چمک تاروں کی

ھمارے اور واعظوں کے مذھب میں فرق اگر ھے تو اس قدر ھے
کہینگے ھم جس کو پاس انسان وہ اس کو خوف خدا کہینگے

অর্থাৎ, জীবন কি ? উপাদান সমূহের সুসামঞ্জস প্রকাশ। মৃত্যু কি ? উহাদেরই অংশ বিশেষের বিনাশ।

জীবনের অশান্তি দূর হওয়াই 'ফনা'-র উপলব্ধি। অন্তিম-কাল কি ? অস্তিত্বের নেশার মাদকতা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া।

সম্মান কি ? নিজস্ব স্থির-বিশ্বাসের অনুকরণ করিয়া প্রাণত্যাগ। ধর্ম কি ? কোন মহান পুরুষ বা আদর্শকে শ্রদ্ধা করা।

নিজের চক্ষে হেয় বিবেচিত হওয়াই চরম কাপুরুষতা ; যদি কিছুমাত্রও মনুষ্যত্ব থাকে, তাহা হইলে কি না হইতে পারে ?

আমাদের নীরস প্রাণে কোন উত্তেজনাই নাই—না হইলে এমন কোন জলবিন্দু আছে, যাহা সমুদ্র না হইতে পারে ?

যদি প্রেম-যন্ত্রনার সহিত মানুষের পরিচয় না হইত—মরিতেও কোন কষ্ট থাকিত না, বা বাঁচিতেও কোন আনন্দানুভব হইত না।

বন্ধুদের হৃদয়ই আমার ঘর, (এবং তথায়ই) আমি শান্তিলাভ করি —ইহাই আমার রম্যস্থান, এবং ইহাই আমার স্বর্গোদ্যান।

জীবনের এই মাদকাতেই মানুষ দুঃখ সহ্য করে—না হইলে মানুষের পক্ষে বাঁচার চেয়ে মরাই সহজ হইত।

যেখানেই যাও, আপন ক্ষণস্থায়িত্ব নিয়াই স্থির থাকিতে হইবে—যেমন ভাবে ফুলের প্রতিবিম্ব বাগানের জলধারায় (স্থির থাকে)।

গঙ্গায় যেমন তারকাসকল শোভা পায়, তেমনি স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস আমার মনে বিরাজ করিতেছে।

ধর্মোপদেষ্টা ও আমাদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে যদি কোন পার্থক্য থাকে তবে তাহা এই—আমরা যাহাকে মানুষের অবলম্বন বলিয়া থাকি, তাহাকে তাঁহারা খুদার ভয় বলিয়া থাকেন।

ঘজল ছাড়া আধুনিক ভাব ও রুচি অনুযায়ী যে সকল নূতন ভাবধারার বিকাশ চিকবস্ত করিয়াছেন, তাহাদিগকে নিম্নলিখিত কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—

(১) ভারতীয় প্রসিদ্ধ দেশনায়কদের উদ্দেশ্যে বিয়োগব্যথাপূর্ণ মরাসী-কাব্য। (২) জাতীয় কবিতা—এখানে আমরা কবিবরের রাজনৈতিক

চিন্তাধারার স্বরূপটি লক্ষ্য করিতে পারি। (৩) সামাজিক কবিতা। (৪) ধর্মসম্বন্ধীয় কবিতা। এবং (৫) প্রকৃতির কবিতা।

মরাসী-কাব্যের নিদর্শনরূপে গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের উদ্দেশ্যে লিখিত 'মরসিয়া'-টি বেশ উল্লেখযোগ্য।

আজল্ কে দাম্ মেঁ আনা হৈ য়ূন্ তো আলম্ কো ;
মগর্ ইয় দিল নহীঁ তৈয়ার্ তেরে মাতম্ কো।
পহাড় কহতে হৈঁ দুনিয়া মেঁ অইসে হী ঘম্ কো ;
মিটা কে তুঝ্ কো আজল্‌নে মিটা দিয়া হম্ কো।
জনাজা হিন্দে-কাদর্ সে তেরে নিকল্‌তা হৈ ;
সুহাগ্ কৌম্ কা তেরী চিতা মেঁ জল্‌তা হৈ।

اجل کے دام میں آنا ہے یوں تو عالم کو —
مگر یہ دل نہیں تیار تیرے ماتم کو
پہاڑ کہتے ہیں دنیا میں ایسے ہی غم کو —
مٹا کے تجھ کو اجل نے مٹا دیا ہم کو
جنازہ ہند کا در سے تیرے نکلتا ہے —
سہاگ قوم کا تیری چتا میں جلتا ہے

অর্থাৎ, মৃত্যুর জালে তো সকলকেই আবদ্ধ হইতে হইবে, কিন্তু তোমার মৃত্যুর জন্য এই মন (মোটেই) প্রস্তুত ছিল না। এইরূপ দুঃখকে পাহাড় (সদৃশ দুঃখ) বলা যাইতে পারে—তোমার ধ্বংস দ্বারা মৃত্যু আমাদেরও বিনাশ সাধন করিয়াছে। ভীরু ভারত হইতে তোমার মৃতদেহ বাহির হইয়া যাইতেছে, (কিন্তু) তোমার চিতার মধ্যে জাতির সৌভাগ্য জলজল করিতেছে।

মরাসীর ন্যায় মুসদ্দস্-ছন্দে লিখিত তাঁহার অন্যান্য অনেক কবিতার মধ্য হইতে চিক্‌বস্তের একটি জাতীয়-কবিতাও এখানে উদ্ধৃত হইল।

ইয় জোশে-পাক জমানা দবা নহীঁ সক্‌তা ;
রগোঁ মেঁ খূন্ কী হরারৎ মিটা নহীঁ সকৃতা।
ইয় আগ উঅ হৈ জো পানী বুঝা নহীঁ সক্‌তা ;
দিলোঁ মেঁ আকে ইয় আর্মান্ জা নহীঁ সকৃতা।
তলব্ ফজূল হৈ কাঁটে কী ফল কে বদ্‌লে ;
না লেঁ বহিশ্‌ৎ ভী হম্ হোম্-রোল কে বদ্‌লে।

یہ جوش پاک زمانہ دبا نہیں سکتا —
رگوں میں خون کی حرارت مٹا نہیں سکتا
یہ آگ وہ ہے جو پانی بجھا نہیں سکتا —
دلوں میں آکے یہ ارمان جا نہیں سکتا
طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے —
نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے

অর্থাৎ, এই খাঁটি উদ্দীপনাকে কাল ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না ; শিরায় শিরায় রক্তের শিহরণ কখনই দাবাইয়া রাখা যাইবে না। এই আগুন এরূপ যে ইহাকে জলও নিবাইতে পারে না ; যে আগ্রহ ও উৎসাহ মানুষের মনে দেখা দিয়াছে তাহা (সহজেই) মুছিয়া যাইবে না। কাঁটাফুলের বদলে অন্য কোন দাবীই গ্রহণীয় নহে ; হোম-রোল (বা স্বকীয় শাসন) ছাড়া স্বর্গ (সুখ) ও আমরা গ্রহণ করিব না।

চিকবস্তের ধর্মসম্বন্ধীয় কবিতাগুলিই মনের উদারতা, উচ্চ ভাবধারা এবং তৎসঙ্গে শব্দ ও অর্থের ব্যাপকতায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। রামায়ণের ঘটনাসমূহকে গ্রহণ করিয়া খণ্ড খণ্ড চিত্র ও চরিত্র চিত্রণে আনীসের ন্যায় যে পারদর্শিতা তিনি দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই অতুলনীয়। এইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, উন্ত আনীস্ কে কলাম্ কে শয়দা থে।

প্রকৃতি বর্ণনার কবিতা একান্ত আধুনিক যুগের সৃষ্টি। আধুনিকতার একজন শ্রেষ্ঠ পরিপোষক চিকবস্তও এই ধারায় অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তাঁহার নিম্নলিখিত কবিতা উল্লেখযোগ্য :—ফূল, কশ্মীর্, জলুঅয়ে-স্বুবহ ও সয়রে-দেরাদূন্।

চিকবস্ত কয়েকটি রুবায়ী কবিতাও লিখিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার একটি রুবায়ী এখানে উদ্ধৃত হইল :—

বেকার্ তাঅল্লা সে হৈ নফরৎ মুঝ্ কো ;
লোন্ দাদে-স্থুন্ নহীঁ ইয় আদৎ মুঝ্ কো।
কিস্ ওয়াস্তে জুস্তজু করোঁ শহরৎ কী ;
অক্ দিন্ খুদ্ ঢুন্‌ঢ লে গী শহরৎ মুঝ্ কো।

بیکار تعلی سے ہے نفرت مجھکو —
لوں داد سخن نہیں یہ عادت مجھکو

کس واسطے جستجو کروں شہرت کی —
اک دن خود ڈھونڈھ لے گی شہرت مجھکو

অর্থাৎ, বেকার সর্বশক্তিমান (ভগবানের কল্পনায়) আমার (নিজেরই) দুঃখ লাগে ; তাঁহার নিকট হইতে বিচারের প্রার্থনা করিব এরূপ স্বভাব আমার নয়। কিজন্য সুখ্যাতির অনুসন্ধান করিব ? (সময় হইলে) সুখ্যাতিই আমার অনুসরণ করিবে।

প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যেও চিকবস্তের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আছে। সুবহে-উম্মিদ নামক পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়া তখনকার অন্যান্য অনেক পত্রিকায়ই তাঁহার নানা প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। আরবী, ফারসী ও হিন্দী ছাড়া ইংরেজী সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়া সমালোচনা সাহিত্যকে তিনি রসপর্যায়ে উন্নীত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি বা সাহিত্যের সমালোচনায় তিনি যেমন ছিলেন নিরপেক্ষ, তেমনি তাঁহার চরিত্রের উদারতা ও মাধুর্য দ্বারা সমালোচনা-বিষয়ের গুণাবলীর পর্যালোচনা করিয়া তিনি উহাকে রসসিক্ত করিয়া তুলিতেই সচেষ্ট হইতেন। কবি-সমালোচক নিজেই গাহিয়াছেন,

উলঝ্ পড়ে়ঁা কিসী দামন্ সে মৈঁ উঅ খার্ নহীঁ ;
উঅ ফুল্ হোঁ জো কিসী কে গলে কা হার্ নহীঁ।

الجھہ پڑوں کسی دامن سے میں وہ خار نہیں —
وہ پھول ھوں جو کسی کے گلے کا ھار نہیں

অর্থাৎ কোন বিষয় নিয়া বাদবিতণ্ডা করিব, আমি এমন কাঁটা নহি ; আমি এরূপ ফুল যাহা কোন ব্যক্তি বিশেষের গলার মালা নহে।

রওআন্ নামে প্রসিদ্ধ চৌধুরী জগৎ মোহনলাল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সাত বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা চৌধুরী গঙ্গাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। তাহার পর তিনি তাঁহার বড় ভাই বাবু কন্হিয়া লাল কর্তৃক লালিত পালিত হন। রওয়ান বাল্যকাল হইতেই বেশ মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এম. এ. এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ওকালতী পাশ করিয়া আইন ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন এবং শীঘ্রই লক্ষ্ণৌ সহরে একজন প্রসিদ্ধ উকিলরূপে সুনাম অর্জন করেন। বাল্যকালেই তাঁহার কবিত্বের উন্মেষ হয় এবং আজীবন কাব্যসাধনা করিয়া ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

আজীজ্ লখনোয়ী হইতে রওয়ান্ কাব্যে দীক্ষালাভ করেন এবং তাঁহার

কবি-গুরুর প্রভাবই তাঁহার কাব্যে বিশেষ লক্ষিত হয়। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ রূহ্-রওয়ান্ ঘজল, কিত্অহ্, রুবায়ী ও অন্যান্য কবিতার সমষ্টিমাত্র। ঘজল-কাব্যেই তিনি বিশেষ নিপুণতা লাভ করেন। ইহাতে যেমন আছে শব্দার্থের সরলতা ও সরসতা, তেমনি ভাবের রসগ্রাহিতা তাঁহার কাব্যকে সুমধুর করিয়া তুলিয়াছে। উচ্চ ভাবধারারও কোন অভাব তাঁহার কাব্যে দৃষ্ট হয় না—তবে ফারসী ভাষার অপটুতা সময় সময় তাঁহার কাব্যের রসবিঘ্ন ঘটাইয়াছে। রুবায়ী কবিতায়ও তিনি বেশ সিদ্ধহস্ত ছিলেন ও গভীর ভাবের সমাবেশ দ্বারা চৌপদীকে বস্তুতঃই তিনি বিশেষভাবে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

হসরৎ মোহানী একজন উঁচুদরের কবি হইয়াও রাজনীতিজ্ঞ হিসাবেই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার আসল নাম ফজ্লুল-হসন্। তাহা হইলেও তিনি তাঁহার কবি-নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই সম্পর্কে হসরৎ নিজেই গাহিয়াছেন,

জব্ সে কহা ইশ্ক নে হসরৎ মুঝে ;
কোয়ী ভী কহতা নহীঁ ফজলুল্-হসন।

جب سے کہا عشق نے حسرت مجھے —
کوئی بھی کہتا نہیں فضل الحسن

অর্থাৎ, যখন হইতে প্রেম আমাকে হসরৎ বলিয়া সম্বোধন করিল, কেহই আমাকে আর ফজলুল্-হসন রূপে অভিহিত করে না।

হসরৎ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে অনাও জিলার অন্তর্গত মোহান্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নিজগ্রামেই তাঁহার বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আলিগড় হইতে বি. এ. পাশ করেন। আলিগড়েই তাঁহার কাব্যচর্চার বিকাশলাভ হয়, কিন্তু পরবর্তী জীবনে কাব্যসাধনা পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন।

মোহানী আধুনিক যুগের ঘজল-কবিতার একজন সুপ্রসিদ্ধ কাব্যকার। নসীম্ দিহলবী তাঁহার কবি-গুরু হইলেও কাব্য সাধনায় অনেকাংশে তিনি ঘালিবকেই অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহার ঘজলে গতানুগতিক প্রেম ও বিরহের কথা ব্যক্ত হয় নাই—সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকলপ্রকার চিন্তাধারাই তাহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। তাঁহার কবি-প্রকৃতির আর একটি বিশেষত্ব এই যে রাজনীতির চর্চা করিলেও তিনি

কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন না, বা রাজনৈতিক চাপের গুরু পেষণে তাঁহার বিদগ্ধ মনকে সঙ্কীর্ণ হইতে দেন নাই।

মোহানী ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

নাসিরী লখনোয়ী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসাধারণ ধীসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই নাসিরী আরবী, ফারসী ও উর্দুভাষায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তৎপর ইংরেজী ভাষাও বাড়ীতেই শিক্ষালাভ করিয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার আরবী ও ফারসী সাহিত্যের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া লক্ষ্ণৌ কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে উক্ত কলেজের ফারসী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই কলেজেই অধ্যাপনাকালীন তিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বৎসরই তিনি মুল্লা উপাধিও লাভ করেন। পরবর্তী বৎসরই তিনি ফাজিল্ (বা ফাদ্বিল্ অর্থাৎ অসাধারণ পণ্ডিত) উপাধি লাভ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি বি. এ. পাশ করেন এবং পরবর্তী বৎসর এলাহাবাদ মেয়ার সেণ্ট্রল কলেজের এসিস্টেণ্ট্ প্রফেসার-পদ লাভ করেন। এখানে অধ্যাপনাকালীন তিনি এম. এ. উপাধিও লাভ করেন। ছয় বৎসর এলাহাবাদে অবস্থানকালীন তিনি কেবল আরবী-ফারসীরই চর্চা করেন নাই, উর্দু সাহিত্যেরও চর্চা করিয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজ্নূরের গভর্নমেণ্ট হাইস্কুলের হেডমাষ্টার পদে নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর বিজনূর ও অন্যান্য হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আবার তিনি এলাহাবাদ কলেজে বদলী হন। স্কুল ও কলেজের শিক্ষকতা ও অধ্যাপনাকালীন তিনি ছাত্রদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই মিশিয়াছেন ও ছাত্র-মণ্ডলীও তাঁহার নিকট হইতে কাব্যসাধনায় দীক্ষালাভ করিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন।

পণ্ডিত হইয়াও তাঁহার সরল, উদার স্বভাবের জন্য নাসিরী সকলের নিকট হইতেই শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন। তাছাড়া তাঁহার সরস আলাপ-আলোচনার জন্য বিদগ্ধজনমাত্রেই মুগ্ধ চিত্তে তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন। আর ধর্মের কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না বলিয়া হিন্দু মুসলমান সকলেই জাতিনির্বিশেষে তাঁহার সাহচর্যলাভে নিজেদের ধন্য মনে করিতেন। এইসকল কারণে এলহাবাদ, লখ্নো ও আলিগড়ের সংস্কৃতিমূলক প্রায় সকল

সভাসমিতিতেই তিনি একজন অন্যতম সভ্যরূপে গণ্য হইতেন। আর ভাষা-জ্ঞান কেবল ইসলামীয় ভাষাসমূহেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইংরেজীতে পাণ্ডিত্য ছাড়া জর্মন, ফরাসী এবং হিব্রু ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল।

নাসিরী প্রাচীন কাব্যধারার সহিত আধুনিক ভাবধারার সংমিশ্রণে এক নূতন কাব্য-সাহিত্যের সূচনা করেন। শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত থাকিয়াও কাব্য সাধনায় প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি হইতেই বিশেষভাবে উপলব্ধ হইবে :— (১) সরূরে-আম্বিয়া ; (২) মখজনুল্-কুয়াইদ্ ; (৩) হরারৎ ; (৪) (জীবজন্তু বিষয়ক) জীনাতে-ওঅহ্‌শ ও তয়ের্ ; (৫) (ফারসী সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধীয়) স্বনাদিদে-আজম্ : (৬) মন্‌স্থূর্ কী সর্-গুজশৎ ; (৭) দেওয়ান্ (১ম ভাগ); (৮) দেওয়ান্ (২য় ভাগ); এবং (৯) মজমুয়য়ে-কসায়িদ্।

নাসিরী পণ্ডিত হইয়াও যেমন ছিলেন নিরহঙ্কার তেমনি তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্যও বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। এমন কি তাঁহার কাব্যসমূহ প্রকাশের জন্যও তিনি কখনও উৎসাহী ছিলেন না। তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব ও উৎসাহী ছাত্রবৃন্দই তাঁহার সাহিত্যাদি সযত্নে রক্ষা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

নাসিরী-কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব, সাধারণ শব্দের ব্যবহারদ্বারা তিনি গভীরভাব ও কাব্য-ব্যঞ্জনার সমাবেশ করিয়াছেন। আরবী-ফারসীতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি কখনও গুরুভার আরবী শব্দ বা ছন্দালঙ্কারাদির ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে জাফর্ আলী খান আসর্ সত্যই বলিয়াছেন, দর্দভরে আল্‌ফাজ মেঁ মাজরায়ে-ইশক্ বয়ান্ করনা উন্ কী শায়িরী কা নস্‌বুল্-আঈন্ থা আওর্ বেশতর হিস্বায়ে-কলাম্ তাসীর কা তিলিসম্ হৈ।

درد بھرے الفاظ میں ماجرائے عشق بیان کرنا ان کی شاعری کا نصب العین تھا اور بیشتر کلام کا طلسم ہے —

অর্থাৎ, তাঁহার কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব সহৃদয় শব্দের ব্যবহারদ্বারা প্রেমের কার্যাবলী বর্ণনা করা ; আর তাহার বেশীর ভাগ শব্দই যাদুর পরশমাখা।

নাসিরী তাঁহার অকালমৃত্যুর বহু পূর্বেই পার্থিব সম্পদের অসারতা এবং মৃত্যুর গভীরতা ও অসীমতা সম্বন্ধে তাঁহার ঘজল ও বিশেষ করিয়া রুবায়ী কবিতায় গাহিয়া গিয়াছেন। মাত্র তাঁহার ৪৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পক্ষাঘাতে

আক্রান্ত হইয়া তিনি এলহাবাদে প্রাণত্যাগ করেন। ডক্টর ইজাজ হুসেন তাঁহার সম্বন্ধে তারীখ লিখিয়াছেন, নাসিরী খুল্দে বরীন্ কো পহুন্চে—

ناصری خلد بریں کو پہنچے –

অর্থাৎ, নাসিরী সর্বশ্রেষ্ঠ নন্দনকাননে পৌছিয়াছেন। ইহা হইতে তাঁহার মৃত্যু তারীখ হিজরী ১৩৪০ বা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পাই।

জোশ মলীহাবাদী আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তিনি লক্ষ্ণৌর এক প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত বংশের একটি উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার প্রপিতামহ ফকীর মহম্মদ খান গোয়া সৈন্য বিভাগের একজন উচ্চ কর্মচারী হইয়াও তাঁহার একটি দেওয়ান এবং বুস্তানে-হিকমত নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ আছে। জোশের পিতামহ মহম্মদ খান আহমদও একজন কবি ছিলেন এবং তাঁহার একটি দেওয়ানের উল্লেখ আছে।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বশীর্ হসন খান্ জোশ মলীহাবাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই জোশের প্রতিভা ও ধীশক্তির বিকাশ লক্ষিত হয়। এবং ক্রমে ইহা কবিত্বশক্তিতে রূপান্তরলাভ করে। ১৯২৪ হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হয়দরাবাদ উস্মানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুবাদ-বিভাগের একজন উপযুক্ত সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। তথা হইতে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিয়া তথায় 'কলীম্' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। উক্ত পত্রিকা বেশীদিন চালু না থাকিলেও এই স্বল্পকালীন সম্পাদনার মধ্য দিয়াই তাঁহার কবি-প্রতিভা ও সাহিত্য-রসজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রমাণ সাধারণের হস্তগত হয়।

জোশের কাব্যকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ঘজল ও আধুনিক কবিতা। ঘজলে মামুলী প্রেম-কবিতার বর্ণনা ও আধুনিক কবিতায় সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয় ও প্রাকৃতিক কবিতার সমাবেশ রহিয়াছে। ভাবের গভীরতা ও দেশের এবং সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি তাঁহার কাব্যকে সহজেই সকলের আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। শব্দার্থের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং শব্দালঙ্কারের ভারসাম্যই তাঁহার কবিতার আর একটি প্রধান বিশেষত্ব। অর্থের সুসামঞ্জস গতানুগতিক রোজমরহ্ বা মামুলী কথাবার্তা ও প্রবাদ বাক্যের ব্যবহারদ্বারা তাঁহার কাব্যকে সকলসময়েই সুসমৃদ্ধ ও রসাল করিতে তিনি বিশেষ সচেষ্ট। বস্তুতঃ অর্থের সঙ্গতিযুক্ত জোরালো বাক্যের ব্যবহারে আধুনিক যুগে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার কাব্যের প্রধান বাণী হইয়াছে কর্মপ্রচেষ্টা। ইহারই মধ্য দিয়া তিনি দেশবাসীকে

উদ্দীপ্ত করিয়া পরাধীনতার বন্ধন হইতে উন্মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। এবিষয়ে তাঁহাকে অনেকটা সুপ্রসিদ্ধ কবি ইকবালের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

মলীহাবাদী আশাবাদী কবি। তাঁহার কবিতায় নৈরাশ্যের ছাপ মোটেই লক্ষিত হয় না। প্রতিটি দুঃখের পেছনে সুখ অবশ্যম্ভাবী অপেক্ষমান —ইহাই তাঁহার বড় কথা। তাছাড়া তিনি স্পষ্টবাদী। সামাজিক ও ধর্মীয় যে কোন ত্রুটিই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট আলোচনায় তিনি কাহাকেও ভয় করেন না।

জোশ মানবের কবি হইলেও তাঁহার ঘজলসমূহে ঐশ্বরিক প্রেমের গানই ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা হইলেও এইসকল কবিতার মধ্য দিয়াও যেন তাঁহার মনের আকুতিই রসসিক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নিম্ন-লিখিত কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য :— রূহে-আদব, নক্‌শ ও নিগার্‌, শুলা ও শবনম্‌, হর্ফ ও হিকায়েৎ, জনূন্‌ ও হিকমৎ, ফিকর্‌ ও নিশাৎ এবং সম্বল ও সলাসিল্‌।

জোশ তাঁহার কাব্যে অনেক সময় নিজকে মরহুম (বা মৃত ও ভগবৎ দয়ায় আশ্রিত) বলিয়া উল্লেখ করিলেও তিনি এখনো সশরীরে সরকারী পত্রিকা 'আজ-কল্‌'-এর প্রধান সম্পাদক হিসাবে কাজ করিতেছেন।

স্বফী কবিনামধারী আলী নকী হজরৎ আলীর বংশোদ্ভূত ইমাম জয়নুল্‌-আবিদীনের বংশধর বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ সুলতান শম্‌সুদ্দীন্‌ ইল্‌তমিশ্‌-এর রাজত্বকালে তাঁহাদের আদি বাসস্থান ঘজনী পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। আবার, জাটদের অত্যাচারে স্বফীর প্রপিতামহ সৈয়দ আহসন্‌ আলী দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া ফয়জাবাদে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। স্বফীর পিতা সৈয়দ ফজল হুসেন্‌ আমজাদ্‌ আলী শা-র একজন প্রধান বয়স্য ছিলেন। এই লক্ষ্ণৌ শহরেই ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমাদের কবিবর জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকালেই স্বফী উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলীর অধীনে আরবী ও ফারসী শিক্ষালাভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীও পড়াশুনা করেন। এই বিষয়ে তাঁহার শ্বশুর মৌলবী আহমদ আলী এবং কাকা সৈয়দ মহম্মদ হুসেন তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। পরে তাঁহাদেরই সুপারিশে তিনি মহকুমা দেওয়ানী বিভাগে একটি চাকরী লাভ করেন। এবং এই সরকারী কাজে প্রায় ৪০ বৎসর চাকরী করার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে পেন্‌শন্‌ বা কর্মাবসর-ভাতা লাভ করেন।

স্বফীর প্রধান কীর্তি বাজারী বা সাধারণ কথাবার্তায় চালু উর্দুকে সাহিত্যে গ্রহণ করিয়া কবিতা রচনা করা। সেই জন্য তাঁহার কবিতা স্বভাবতঃই সরল হইলেও কাব্যের সরসতা ও ভাবের স্বচ্ছতার জন্য সর্বজন আকর্ষণীয় হইয়াছে। তিনি মসনবী, কাসীদা ও রুবায়ী প্রভৃতি কবিতা লিখিলেও বিশেষ করিয়া তাঁহার সুখ্যাতির অন্যতম কারণ ঘজল ও নজম্ বা আধুনিক কবিতা। তাঁহার ঘজল বা প্রেমগীতি স্বভাব-প্রেমের যে মাধুর্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহা উর্দু সাহিত্যে খুব কমই দৃষ্ট হয়। তাঁহার আধুনিক কবিতায় সকল প্রকার ভাবধারাই বর্ণিত হইয়াছে—বিশেষ করিয়া তাঁহার বর্ণনামূলক এলহাবাদ, বোম্বাই বা জোন্‌পুর সম্বন্ধীয় কবিতা কয়েকটি উর্দু সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রকৃতি-কবিতা। স্বফীর অনেক কবিতাই শীয়া সম্মিলনের বাৎসরিক অধিবেশনে গীত হইয়াছে। ইহাদের একত্রে নামকরণ হইয়াছে—লখ তে-জিগর্। শীয়া সম্মিলনে পঠিত হইলেও এইগুলি কোন সাম্প্রদায়িক ভাব-ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশ, সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যের উপকার বিধায়ক অনেক কবিতাই ইহাতে আছে। তাছাড়া তাঁহার অনেক কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়াইয়া রহিয়াছে।

স্বফী ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে প্রাণত্যাগ করেন।

জরীফ নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ মক্‌বুল্ হুসেন আমাদের উল্লিখিত কবিবর স্বফীরই ছোট ভাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি লখনো শহরেই জন্মগ্রহণ করেন। স্বফীর সাহচর্যেই তাঁহার কাব্যের প্রতি উৎসাহ ও আকর্ষণ হয়। তিনিও তাঁহার ভাইয়ের ন্যায় বাজারী উর্দুর উৎকর্ষের জন্য যথেষ্ট উদ্যম প্রকাশ করিয়াছেন।

জরীফ বস্তুত: সুবিখ্যাত কবি আকবরের ভাবশিষ্য। তাঁহার কাব্যে হাসি ও হৈ-উল্লাসের মধ্যে গভীর চিন্তাধারার বীজও নিহিত রহিয়াছে। সাধারণভাবে অনেক সময় মনে হয় যে তিনি বুঝি কেবল হাসাইবার জন্যই কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এই হাস্যরাশির মধ্য দিয়াই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যেকটি ত্রুটির জন্যই তিনি আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের বিশেষত্ব—শব্দের দ্ব্যর্থ ব্যবহারদ্বারা সাধারণ অর্থকে হাস্যরসে পূর্ণ করা।

জরীফ আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক কবি। তাঁহার সম্বন্ধে ডক্টর ইজাজ হুসেন বলিয়াছেন, জবান্ উন্‌কী কাফির্ থী, দিল্ মৌমিন্ থা

زبان ان کی کافر تھی دل مومن تھا —

অর্থাৎ, দ্ব্যর্থ শব্দের স্বরূপটি যখন প্রকাশিত হইয়া যায়, তাহার গূঢ় কথাটি আমাদের মনের হাসির খোরাক দিয়া আমাদের প্রকৃতই প্রতারিত করে।

তাঁহার ছোট ছোট কথাগুলি যে কত গভীর হাস্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, তাহা কেবল জরীফের সমঝদার ব্যক্তিই সঠিক উপলব্ধি করিতে পারে।

জরীফ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর লখনৌ শহরেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার লিখিত কবিতাসমূহ তাঁহার মৃত্যুর অনেক পরে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে 'দেওয়ানে-জী' নামে সম্পাদিত হইয়াছে।

রঘুপতি সহায় ফিরাক্ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে গোরখপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুন্সী গোরখ পরশাদ্ ইবরৎ একজন নামজাদা উকিল এবং প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।

ফিরাকের বাল্যশিক্ষা উর্দুর মাধ্যমেই সূচিত হয়। পরে ইংরেজী শিক্ষার জন্য স্কুলে ভর্তি হন এবং বেশ কৃতিত্বের সহিত সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে মেয়ার সেণ্ট্রাল কলেজ হইতে সসম্মানে বি. এ. পাশ করেন। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডিপুটি-কলেক্টর পদে মনোনীত হন। কিন্তু সেই সম্মানীয় পদে নিযুক্ত হইবার পূর্বেই কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত হইয়া কোথায় অন্যকে তিনি জেলে পাঠাইবেন, না নিজেই স্বেচ্ছায় কারাবাস বরণ করিয়া লইলেন।

কারাবাস-কালে ফিরাক কাব্য-সাধনায় বিশেষ সুযোগ লাভ করেন। কলেজে পাঠকালীনই তাঁহার সর্বপ্রথম কাব্যসাধনায় উৎসাহ হয়। অধ্যাপক সুসাহিত্যিক নাসিরীর সাহচর্যেই তিনি সর্বপ্রথম ঘজল-কবিতা প্রণয়ন করেন। জেলখানায় পঠন-পাঠনের সুযোগে অনেক রাজনৈতিক নেতাই তাঁহাদের অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবনের ইতিহাস দ্বারা সাহিত্যের রসভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ফিরাকও তাঁহাদের একজন। আর কংগ্রেস-রাজনৈতিক আন্দোলনের যোগে কারাবাসই অনেকের পক্ষে সাহিত্য সাধনার কেন্দ্রস্থল ছিল। তাই আমাদের কবিবর কারাবাস-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন,

আহলে-জিন্দান্ কী ইয় মজলিশ্ হৈ সুবূৎ ইস্ কা ফিরাক ;
কি বিখর্ কর্ ভী ইয় শীরাজা পরীশান ন হোআ।

اهل زندان کی یہ مجلس ہے ثبوت اس کا فراق —
کہ بکھر کر بھی یہ شیرازہ پریشاں نہ ہوا

অর্থাৎ, হে ফিরাক্, কারাবাসীদের এই সম্মিলনের মহান সুযোগ এই যে (কারাবাস হইতে) বাহির হইয়াও তাঁহাদের আত্মীয়তাবন্ধন ছিন্ন হয় নাই।

কারাবাসকালীন আমাদের কবিবর যে সকল মহান ব্যক্তির সাহচর্য লাভের সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেন—মদাহ, আরিফ, হকীম্ আশফ্তহ, মৌলনা মহম্মদ্ আলী, হসরৎ মোহানী ও মৌলানা আবুল্-কলাম্ আজাদ্।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জেল হইতে বাহির হইয়া প্রথমে ফিরাক্ লখনোর এক কলেজেই চাকরী লাভ করেন। পরে কানপুর সনাতন ধর্ম কলেজের উর্দু অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এই সুযোগে তিনি এম. এ. পাশ করেন। তৎপর এলহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এইসঙ্গে এলহাবাদেই তিনি তাঁহার বসবাস নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছেন।

ফিরাক উর্দু সাহিত্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান ঘজল কাব্যকার। অন্যান্য অনেক আধুনিক কবিতা লিখিলেও গীতিকবিতার জন্যই তাঁহার আসন উর্দু সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। প্রথম জীবনের ঘজল-কবিতায় তিনি আমীর মীনায়ীকে অনুসরণ করিয়াছেন। পরে তাঁহার সমসাময়িক স্বফীকেই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অনেক দিন হয় তিনি প্রসিদ্ধ উর্দু কবি মীরের অনুকরণে কবিতা লিখিতে সচেষ্ট হন। তাঁহার শেষ জীবনের কবিতার মধ্যে কিন্তু কোন অনুকরণপ্রিয়তার প্রচেষ্টা নাই। স্বাধীনভাবে নিজ অনুভূতির মাধ্যমে জীবন-রহস্যের যে সকল কাব্য তিনি গাহিয়াছেন, তাহার দান উর্দু সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কবিবর একজন ইংরেজীর অধ্যাপক—তাই তাঁহার কাব্যে পাশ্চাত্যপ্রভাব সহজেই আসিয়া পড়িয়াছে।

হফীজ্ জালন্ধরী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই কবি হিসাবে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়ে। 'শাহনামায়ে-ইস্লাম্' কাব্য তাঁহার প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ। ফির্দৌসী ফারসী ভাষায় তাঁহার অমর কাব্য লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সেই অনুপ্রেরণা নিয়াই জালন্ধরী সাহেব তাঁহার কাব্য লিখিয়াছেন। তবে ফির্দৌসী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন, আর আমাদের কবিবর ইসলাম ধর্মের প্রতি পরম নিষ্ঠা ও আকর্ষণে এই কাব্য রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক কাব্যও ভাবব্যঞ্জনা ও প্রকাশভঙ্গীর সরসতার জন্য একটি উচ্চ শ্রেণীর কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

শাহনাময়ে-ইসলাম ছাড়া কবিবর হফীজ অনেক আধুনিক কবিতাও লিখিয়াছেন, যেমন, নঘময়ে-জার্ এবং সুজ ও সাজ। ভাবের সামঞ্জস্যানুযায়ী শব্দ ও ছন্দের ব্যবহারে তিনি এখানেও সার্থকতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার ঘজল-কাব্যের অনেক উল্লেখ আছে। তথায় তিনি বেশ লালিত্যসহকারে প্রেমকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এছাড়া হফীজ অনেক গীতও গাহিয়াছেন, যেমন, কিশ্‌তী কা মাল্লাহ অথবা শাহসওআরে-কর্‌বলা। এখানে প্রকৃতির বর্ণনা ও ভাবের প্রকাশ এত সুসামঞ্জস হইয়াছে যে আমরা সহজেই কবিবরকে একজন খাঁটি কবি বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারি।

মজাজ্ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের সংস্কৃতিমূলক আলাপ-আলোচনার (১৯৩৪-৩৬) একজন উৎসাহী যুবক ছিলেন এবং অবশেষে তথা হইতে বি. এ. পাশ করিয়া কিছুদিন দিল্লী অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে ও তারপরে বোম্বাই সরকারের সংবাদ পরিবাহক বিভাগে কিছুকাল চাকরী করেন। সেই সময়ে লখনো শহরে নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে 'নয়া-আদব' পত্রিকা চালু হইলে, তিনি উক্ত পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে কাজ পাইলেন। তৎপর হার্ডিং লাইব্রেরীতে চাকরীলাভ করিয়া তিনি আবার দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

নৌকরী-পেশা কবিবর মজাজ মধ্যবিত্ত জীবনের জয়গানই গাহিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে ভাবের কোন বিলাস নাই—সহজ চক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহারই প্রকাশ সরস ও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কাব্য ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে 'আহঙ্' নামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা বেশ সমাদর লাভ করে। ইহার কয়েকটি কবিতা—রাৎ অওর্ রেল, অওয়ারহ্, আন্ধেরী রাৎ কা মুসাফির্—যুবকদের বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে এই 'আহঙ্' কাব্যই আরো কয়েকটি কবিতার সংযোগে বর্দ্ধিতাকারে 'শবে-তাব' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার আর একটি কাব্য-গ্রন্থের নাম 'নাজে-নৌ'।

আহসন্ দানিশ নামে প্রসিদ্ধ আহসনুল্-হক্-এর আদি বাসস্থান মীরাট হইলেও তাঁহার পিতা কাজী দানিশ আলী তথা হইতে মুজফরনগর জিলায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তথায়ই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আহসনের জন্ম হয়। তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় লাহোরেই অতিবাহিত করেন। তিনি দারিদ্র্যের কোলেই লালিতপালিত হইয়া বড় হন এবং জীবনের পেশাও ছিল তাঁহার জন-মুজুরীর কাজ। তাহা হইলেও তাঁহার মনোবল,

অর্থাৎ উন্নামিকের কবিত্ব ক্রম-উন্নতির পথে ধাবমান; জীবন সমস্যার অনুভূতি ও তাহার প্রকাশনা এবং ভাবের প্রসারতা ও গভীরতা যেন কবিমনে ক্রমবর্দ্ধমান।

আহমদ নদীম কাসিমী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের শাহপুর জিলার অন্তর্গত কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আহমদের বংশ কোন সময় বেশ সমৃদ্ধশালীই ছিল, কিন্তু তাঁহার জন্মসময়ে তাঁহার পরিবারের অবস্থা খুব দুঃখকষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হয়। বাল্যকালেই তাঁহার পিতা মারা যান, এবং তাঁহার চাচার তত্ত্বাবধানে আহসন লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তাঁহার চাচার সাহিত্যের প্রতি বেশ অনুরাগ ছিল বলিয়া বাল্যকাল হইতে নদীমও সেইদিকে আকৃষ্ট হন।

নদীম বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। কথিত আছে, তাঁহার ১২ বৎসর বয়সের সময়েই তিনি প্রায় ৮০ পৃষ্ঠার একখানি উপন্যাস রচনা করেন; এবং ইতিমধ্যে অনেক কবিতাও লিখিয়া ফেলেন। কাব্যসাধনায় তাঁহার একাগ্রতা ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে এবং এইরূপে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বি. এ. পাশ করেন। পাশ করার পরেই চাকরীর অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতে থাকেন এবং যে কোন চাকরীতে যোগদান করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। অবশেষে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মুলতানে আবগারী বিভাগে এক চাকরী লাভ করেন। বৎসর তিনেক কাজ করার পরে এই চাকরী হইতেও ইস্তাফা হয়। তখন ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ফূল্ নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সেই সময় হইতেই তাঁহার সাহিত-সাধনার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরবর্তী বৎসরই আদবে-লত্বীফ পত্রিকার প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে এই পত্রিকার সহিতও সংযোগ ত্যাগ করেন এবং সেই সময় হইতে পণ্ডিত ও সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমশঃই পঞ্জাবের সর্বপ্রকার সাহিত্য ও কৃষ্টিসম্পন্ন কার্যাবলীর সহিত জড়িত হইতে থাকেন। এবং এই সময়ে কিছুকাল সর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সভার সম্পাদক হিসাবেও কাজ করেন।

নদীম তাঁহার সাহিত্য-সাধনাদ্বারা উর্দু ভাষার যথেষ্ট শ্রীবর্দ্ধন করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহার কাব্য ও সাহিত্য রচনাবলী একসঙ্গে 'জলাল্ ও জমাল্' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী ও সহৃদয় শব্দার্থের দ্বারা মানবসমস্যার যে বিধিনিধি তাঁহার কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা উর্দু সাহিত্যের আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা করিতে পারি।

ইঁহাদের ছাড়া আরো অনেক নবীন ও প্রবীন কবি তাঁহাদের কাব্য-সাধনাদ্বারা উর্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এইসকল আধুনিক কাব্যকারদের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য: মীর্জা হাদী আজীজ (মৃত্যু ১৯৩৫), সাকিব লখনোয়ী (জন্ম ১৮৬৯), আর্জু (১৮৭২), ফানী বদাইয়ূনী (১৮৭৯), জামিন্ (১৮৯৪), জলীল্, আস্গর্ (১৮৮৪), জিগর্ (১৮৯০), সায়িল্ দিহ্লবী (মৃত্যু ১৯৪৫), ইয়াস্ ও এগানহ্ (জন্ম ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ), মহরূম, আনন্দ নারায়ন্ মুল্লা (জন্ম ১৯০১), সীমার্ (জন্ম ১৮৮০ ও মৃত্যু ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ), আখতর্ শীরাজী (১৯০৫), রোশ (১৯১১), ফয়জ্ এবং আলী সর্দার্ জাফরী (১৯১৩ খৃষ্টাব্দ)।

পঞ্চম অধ্যায়

আধুনিক যুগের গদ্য-সাহিত্য

(১) জীবনী ও সমালোচনা-সাহিত্য

পৃথিবীর সকল সাহিত্য-ইতিহাসেই প্রাচীনকালে গদ্য হইতে পদ্যের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক যুগে সেই ধারা পরিবর্তিত হইয়া কবিতা হইতে গদ্য প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ আধুনিক যুগের বিশেষ প্রকাশভঙ্গি—সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বক্তব্য বিষয়ের বর্ণনা। একজন সাহিত্য-সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন, পদ্য জ্যেষ্ঠাধিকারের সুবিধা লইয়া গদ্যের যে সমস্ত রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিল, 'বয়ঃপ্রাপ্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া এখন জ্যেষ্ঠের খাসতালুকে অভিযান চালাইয়াছে। প্রকৃতির প্রতিশোধের মত সাহিত্যেরও একটা প্রতিশোধ আছে।'

তাছাড়া এই গদ্য-প্রাধান্যের আর একটি কারণ, পাশ্চাত্য-প্রভাব। বিদেশীয় ভাব ও ভাষা গদ্যকে যেমন সহজভাবে আকর্ষণ করিতে পারে, পদ্যকে তেমন করিয়া পারে না। তাই দেখিতে পাই ইংরেজী ভাব ও ভাষা যেমন বাঙলা তেমনি উর্দুকে তাহাদের গদ্য-সাহিত্যে যেরূপ সহজভাবে আগাইয়া তুলিয়াছে, তেমন করিয়া কাব্যকে পারে নাই। আর পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলেই আধুনিক যুগে কতকগুলি নবধারা—যথা, গদ্য-কবিতা, ছোট-গল্প, উপন্যাস, নাটক, সমালোচনা ও সংবাদ-সাহিত্য প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহারা ক্রমশঃ উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত আধুনিক যুগের কর্ণধার হিসাবে আজাদ ও হালীকেই যদিও উর্দু কাব্য জগতে স্থান দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু গদ্য-সাহিত্যে আধুনিক যুগ-প্রভাব আরো পূর্বেই অনুভূত হয়। গদ্যকার ঘালিব ও স্যার সৈয়দকে আধুনিক যুগপ্রভাব কেমনভাবে প্রভাবান্বিত করে তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। মধ্যযুগের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আনুকূল্যে যে সকল গদ্য-সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেই পাশ্চাত্য

আধুনিক প্রভাব কতকটা সুস্পষ্ট। তথাপি গতানুগতিকভাবে আমরা কাব্যের ন্যায় গদ্যেও হালী ও আজাদকেই সর্বপ্রথম স্থান নির্দেশ করিয়াছি।

গদ্যকার হালী :—হালীর কাব্য-পরিচিতির সঙ্গেই তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে। গদ্যকার হালী নিম্নলিখিত গ্রন্থ লিখিয়াছেন :—

(১) তিরিয়াকে-মস্‌মূম্ (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রচিত); (২) ইল্‌মুল্-ত্ববকাতুল্-আরজ্; (৩) মজলিসুন্-নিসা—দুই খণ্ডে (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ); (৪) হয়াতে-সাদী (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ); (৫) মুকদ্দময়ে-শঅর ও শাইরী; (৬) ইয়াদ্‌গারে-ঘালিব (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ); (৭) হয়াতে-জাওয়িদ্ (১৯০১ খৃষ্টাব্দ) এবং (৮) মুজামিনে-হালী।

হালীর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগের গ্রন্থসমূহে সাহিত্য-সমাবেশের বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভাষার সরলতা ও সরসতা এবং ভাবের গাম্ভীর্য ও সহৃদয়তা ক্রমশঃ তাঁহার সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহার তিরিয়াকে-মস্‌মূম্ এক মুসলমান ধর্মান্তরকারীর ইসলাম-ধর্মের বিরুদ্ধ-সমালোচনার প্রত্যুত্তরমাত্র। ইহাতে হালীর রসজ্ঞানের বিশেষ কোন পরিচয় না থাকিলেও পাণ্ডিত্যের ছাপ যথেষ্টই আছে। ইল্‌মুল্-ত্ববকাতুল-আরজ একটি আরবী গ্রন্থের অনুবাদমাত্র। তাহাও আবার ফারসী তরজমার পুনরানুবাদ এবং ইহা পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে অনূদিত হয়।

মজ্‌লিসুন্-নিসা একটি পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানার্থে তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক ঘোষিত পুরস্কারের উত্তরে এই গ্রন্থ লিখিয়া তিনি ৪০০৲ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইহা স্ত্রীসমাজে ও মেয়েদের স্কুল পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে বেশ সমাদরলাভ করিয়াছে। তাঁহার হয়াতে-সাদী বা প্রসিদ্ধ ফারসী কবি সাদীর জীবন-ইতিহাস লিখিয়াই হালী সর্বপ্রথম একজন উঁচুদরের গদ্যকার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

মুকদ্দময়ে-শঅর্ ও শাইরী তাঁহার দেওয়ানের উপক্রমণিকা হিসাবে রচিত হইলেও ইহার সহিত হালীর কাব্যের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। উর্দু-সাহিত্য বিচার সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া তুলনামূলক বিচার ও সূক্ষ্ম পর্যালোচনা উর্দু-সাহিত্য জগতে আর বিশেষ কেহ করেন নাই। তবে ইহাতে বিশেষভাবে আরবী, ফারসী ও উর্দু সাহিত্যেরই পর্যালোচনা করিয়া আধুনিক ভাবধারানুযায়ী সাহিত্যকে কাজে লাগাইতে হালী উপদেশ দিয়াছেন। আধুনিক যুগের ইংরেজী সাহিত্য বা প্রাচীন যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ কোন জ্ঞান না থাকায়, এই উভয় ভাষার

কাব্য-ভাণ্ডারের সুযোগ লইয়া কোন সুষ্ঠু মত প্রকাশ করিতে তিনি সমর্থ হন নাই।

ইয়াদ্‌গারে-ঘালিব উর্দু সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির অন্যতম। ইহাই বোধ হয় হালীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক তাঁহার কবি-গুরু ঘালিবের প্রতি অসীম শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে হালী তাঁহার গুরুর সাহিত্য-প্রতিভার যে সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করিয়াছেন তাহার তুলনা উর্দু সাহিত্যে বিরল। সূক্ষ্ম-সাহিত্যানুভূতি ও রসজ্ঞান না থাকিলে এরূপ সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

হয়াতে-জাওয়িদ্‌ রচনা করিয়া হালী বস্তুতঃ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক স্যার সৈয়দ আহমদের জীবনকে মুসলিম সুধী জগতে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। জীবন-চরিত হিসাবে যে কোন সাহিত্যে এইরূপ গ্রন্থ সম্মানীয় আসনলাভ করিতে পারে। ধৈর্য সহকারে লেখক খাঁটি গবেষণামূলক আলোচনাদ্বারা স্যার সৈয়দের জীবনকে আমাদের নিকট 'জাওয়িদ্‌' করিয়া তুলিয়াছেন। তাহা হইলেও সকল সময় ইহাই কেবল মনে হয় যে ইহাতে ভক্তের প্রশংসা ও সুখ্যাতিই যেন গীত হইয়াছে—সমালোচকের বিপক্ষ মতবাদ যেন ইহাতে মোটেই স্থানলাভ করে নাই।

মুজামিনে-হালী হালীর বিভিন্ন সময়ে আলোচিত নানা প্রবন্ধ ও সাহিত্য-সমালোচনার একত্র সংগ্রহমাত্র।

হালী উর্দু-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গদ্যকারদের পুরোধা। তাঁহার সাহিত্যে সরলতা, সরসতা ও স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গির সহিত সাহিত্যানুভূতি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও পাণ্ডিত্যের গুরু গাম্ভীর্য যেন সকলকে উপচাইয়া গিয়াছে। তাঁহার সাহিত্যে ভাষা বা ভাব-বিলাসের কোন স্থান নাই। সমসাময়িক আজাদ যেমন উজ্জ্বল হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার তাঁহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যেও ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, বা নজীর আহমদে যেমন সূক্ষ্ম সাহিত্যিক অনুভূতি ও রসজ্ঞান পাইতে পারি, তাহা হালীতে না পাইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুপরিমিত ও সুশৃঙ্খল পর্যালোচনা ও গদ্যকার-স্বভাব মর্যাদা তাঁহাকে উর্দু সাহিত্যে একটি সম্মানীয় আসন প্রদান করিয়াছে।

বাঙ্গালী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় আজাদের কবি-প্রতিভা যথেষ্ট থাকিলেও তিনি নিজকে গদ্যকার মনে করিয়াই বেশী গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছেন। তাঁহার জীবন-ইতিহাস আজাদের কাব্য-প্রতিভা বর্ণনা প্রসঙ্গেই কতকটা আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার গদ্য-গ্রন্থাদির আলোচনা

প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের অন্যান্য তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। আজাদ নিম্নলিখিত গদ্য গ্রন্থাদি লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন :—

(১) ফারসী রীডর (দুই ভাগে); (২) কদীম্ উর্দু রীডর (৩ খণ্ডে); (৩) উর্দু কা কাইদা এবং কওআয়িদে-উর্দু; (৪) কিস্সয়ে-উর্দু; (৫) নয়ী-উর্দু রীডর (৩ খণ্ডে); (৬) আবে-হয়াৎ; (৭) নৈরঙ্গে-খয়াল্; (৮) সুখুন্দানে-ফারস্; (৯) কন্দে-ফারসী; (১০) নসীহৎ কা করনফুল্; (১১) দেওয়ানে জোক্; (১২) দরবারে-আক্বরী; (১৩) নিগারিস্তানে-ফারস্; (১৪) সপাক ও নমাক; এবং (১৫) জানওয়ারিস্তান্।

ফারসী, প্রাচীন ও নব্য উর্দু রীডর, ইহাদের কাইদা বা ব্যাকরণ, উর্দু কিস্সা বা গল্প প্রভৃতি স্কুল পাঠ্য পুস্তক। এই সকল গ্রন্থ শীঘ্রই ছাত্রমহলে বিশেষ সুখ্যাতি পাইলেও ইহাতে সাহিত্য-প্রকাশের সুযোগ কোথায়? তবে কিস্সায়ে-উর্দুতে সহজ, সরস ও উপাদেয় ছোট ছোট গল্প বা কাহিনীর মাধ্যমে কিশোর মনকে যেভাবে উদ্দীপ্ত করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির কতকটা আভাস পাওয়া যায়। আজাদ তাঁহার চাকরী জীবনের প্রথম ভাগে প্রথমে লখনো ও পরে পঞ্জাবে কিছুদিন স্কুল-শিক্ষক হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। তাহারই সুযোগে এই গ্রন্থসকল লিখিবার প্রয়াস পান।

আবে-হয়াৎ আজাদের সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। একটি ইতিহাস-গ্রন্থ যে এইরূপ রসমাধুর্যে ভরপুর হইতে পারে, তাহা আবে-হয়াৎ না পড়িলে কল্পনা করা যায় না। সরল, স্বাভাবিক ও চটুল প্রকাশভঙ্গিই ইহার মূল কারণ। কিন্তু ইতিহাস-গ্রন্থ প্রণয়নে যে গাম্ভীর্য থাকা দরকার, তাহা না থাকার জন্য ইতিহাসের মূলীভূত কারণ তথ্য-নির্ণয়ে অনেক সময় তিনি খাঁটি হইতে পারেন নাই। তাছাড়া তাঁহার যথেষ্ট রসজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি যে কোন কোন কবির সাহিত্য সম্বন্ধে সঠিক মূল্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তাহা বড়ই আশ্চর্যজনক। তাঁহার কবিগুরু জোকের প্রশংসায় তিনি যেন একেবারে অজ্ঞান। আবার উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ঘালিবের সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয়ে অক্ষমতার স্বীকারুক্তি বস্তুতঃ আজাদের সূক্ষ্ম-সাহিত্যিক অনুভূতির অক্ষমতাই প্রকাশ করে। তাহা হইলেও আবে-হয়াতের অননুকরণীয় প্রকাশভঙ্গির জন্য ইহা চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে।

নৈরঙ্গে-খয়াল দুই খণ্ডে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহা সুন্দর সুন্দর উপদেশপূর্ণ রূপকথার বর্ণনায় ভরপুর। আজাদের প্রকাশভঙ্গির চটুল

সরসতা ইহাকেও রসমাধুর্যে পূর্ণ করিয়াছে। ইহাও তাঁহার আর একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কোন সরকারী কাজে আজাদ কলিকাতায় আসেন ও তথা হইতে পরে কাবুল ও বুখারা যান। সরকারী কাজেই তিনি ঈরানে দুইবার গিয়াছিলেন। প্রথমবার ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়বার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। ফারসী ভাষার প্রতি অনুরাগ তাঁহার প্রথম হইতেই ছিল। তারপর ঈরান ঘুরিয়া আসিয়া আধুনিক ফারসী ভাষা সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট বু্যৎপত্তিলাভ করেন। ইহারই ফলে তিনি সুখুন্‌দানে-ফারস্ ও কন্‌দে-ফারসী রচনা করেন।

সুখুন্‌দানে-ফারস পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধীয় রচনা হইলেও ইহাতে সংস্কৃত ও ফারসীর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও যথেষ্ট রহিয়াছে। কন্‌দে-ফারসীতে আধুনিক ফারসী সাহিত্যের আলোচনা করা হইয়াছে। তাছাড়া ইহাতে গ্রন্থকারের পারস্য ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ইতিহাসও রহিয়াছে। নসীহতে-করণফূল্ বা উপদেশের পুষ্পমাল্য ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত আর একটি উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ।

দেওয়ানে-জোক্ বস্তুতঃ আজাদের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে গ্রন্থকার তাঁহার কবিগুরুর কাব্য-সম্পাদনার মাধ্যমে যেমন তাঁহার কবিগুরুর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার গবেষণামূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য-রসেরও বিশেষ পরিচয় দান করিয়াছেন।

দরবারে-আকবরীতে আকবরের দরবারের পরিচয় প্রসঙ্গে বাদশার সাংস্কৃতিক চরিত্রের যে পরিচয় দান করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই সুখপাঠ্য।

আজাদ শেষজীবনে কতকটা মাথার বিকৃতিতে ভুগিয়াছিলেন। তাহা হইলেও সাহিত্য-সাধনার অভ্যাস তিনি কখনই ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই সময়েই তাঁহার 'সপাক ও নমাক' এবং 'জানওয়ারিস্তান্' রচিত হয়। এই উভয় গ্রন্থেই কতকটা অসংলগ্নতা থাকিলেও তাঁহার সাহিত্যিক পরিচয় যথেষ্টই পাওয়া যায়। প্রথমটিতে তাঁহার সুফীতত্ত্বপূর্ণ চিন্তাধারার প্রকাশ আর দ্বিতীয়টিতে পশুপাখীর জীবন বৃত্তান্ত ও ইহাদের চারিত্রিক বিশ্লেষণ রহিয়াছে। নিগারিস্তানে-ফারস্ তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইলেও ইহা রচিত হয় আজাদের মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বেই। ইহাতে ঈরানীয় ও ভারতীয় কবিদের কাব্যের উদ্ধৃতি সহকারে তাঁহাদের কাব্য-জীবনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

আজাদ আধুনিক যুগ-সাহিত্যের একজন প্রধান পরিপোষক। সমসাময়িক সকল সাহিত্যিকই তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রখরতা বা অনুভূতির গভীরতা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলেও তিনি অতিশয় সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন ও সাহিত্যরস তাঁহার অন্তরের কাণায় কাণায় পূর্ণ ছিল।

বিজনুর-বাসী শমস্থল-উলিমা খান বহাদুর মৌলানা নজীর আহম্মদ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি দিল্লী কলেজ হইতে আরবী, দর্শন ও গণিতশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। তদানীন্তন অধ্যক্ষ টেলারের উৎসাহে তিনি কতকদিন ইংরেজীও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাঁহার পিতার বিদ্বেষভাব বশতঃ তিনি ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করার সুযোগ পান নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন হালী, আজাদ, মুন্সী করীমুদ্দীম্, মৌলবী জকাউল্লা এবং পিয়ারীলাল আশূব। আরো উল্লেখযোগ্য যে তদানীন্তন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ন্যায় তিনিও তাঁহার চাকরী জীবন পঞ্জাবের কোন স্কুলের সাধারণ শিক্ষক হিসাবে সুরু করিয়াছিলেন।

কিছুকাল পরেই নজীব আহম্মদ শিক্ষকতা হইতে মাদ্রাসা বিভাগের ডিপুটি ইনস্‌পেক্টর পদে উন্নীত হইলেন। এই সময়ে সিপাহী-বিদ্রোহের কালে কোন ইংরেজ মহিলার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার পুরস্কারস্বরূপ কিছু নগদ টাকা লাভ করেন এবং মাদ্রাসা বিভাগেরই ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হইলেন। তৎপর পঞ্জাব হইতে এলাহাবাদে আসেন। তথায় নিজের চেষ্টায়ই ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়া ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডের উর্দু-তরজমা মুজমুয়ায়ে-তাজীরাতে-হিন্দ প্রণয়ন করেন। এই অনূদিত গ্রন্থের জন্য তিনি বিশেষ প্রশংসালাভ করেন এবং ইহার ফলস্বরূপ তহসীলদার এবং ক্রমে সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি জ্যোতিবিদ্যা বিষয়ক একটি ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ করেন এবং এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ এক হাজার টাকা লাভ করেন। তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া তদানীন্তন স্যার্ সলারজঙ্গ তাঁহাকে হয়দরাবাদে আহ্বান করেন এবং ৮০০৲ টাকা মাসিক বেতনে তথাকার সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত করেন। এই সময়েই তিনি কোরানপাঠে বিশেষ মনোনিবেশ করেন এবং কোরান শরীফের অনুবাদ করেন। ইহার পর ইংরেজ সরকারী কাজ পরিত্যাগ

করিয়া হয়দরাবাদ দরবারে ১৭০০৲ বেতনে অর্থ বিভাগের এক দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত হন। এইরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত কাজ করিয়া শেষ জীবনে অবসর গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট জীবন সাহিত্য-সাধনায় নিজকে নিয়োজিত করিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

নজীর আহম্মদ বিভিন্ন প্রকারের বহুল গ্রন্থের প্রণেতা। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য :—

১। গল্প ও উপন্যাস সংক্রান্ত :—(ক) মিরাতুল-আরূস্; (খ) বনাতুল-নাশ; (গ) তৌবতুন্-নসুহ; (ঘ) ইব্নুল-উঅক্ৎ; (ঙ) মহস্বিনাৎ; (চ) আইয়ামী; (ছ) রূইয়ায়ে-স্বাদিকহ্ এবং (জ) মুনতিখাবুল-হিকায়ৎ।

২। উপদেশমূলক ও ধর্মসংক্রান্ত :—(ক) তরজময়ে-কুরানশরীফ; (খ) আদিয়াতুল-কুরান্; (গ) দহ স্বরহ; (ঘ) অল-হকূক ও অল ফরায়িজ; (ঙ) মৎলবুল-কুরান; (চ) অম্মহাতুল-উম্মতহ; এবং (ছ) ইজতিহাদ্।

৩। বিভিন্ন বিষয়ক :—স্বর্ফে-স্বঘীর; রস্মুল-খত; মুআজ্জে-হস্নহ; আফসানায়ে-ঘদর্; নস্বাবে-খস্রূ; চন্দ পন্দ; মবাদী অল হিকমৎ এবং আইন বিষয়ক অনুবাদ গ্রন্থ তথা তাজীরাতে-হিন্দ ও কানুনে-শহাদৎ (Evidence Act এর অনুবাদ) প্রভৃতি।

বিভিন্ন গ্রন্থে নিবদ্ধ উপদেশমূলক ও ভাষা, অক্ষর বা ব্যাকরণ বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাদি স্কুল পাঠ্যপুস্তক হিসাবে রচিত হয়। ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু না থাকিলেও ছাত্রমহলে ইহাদের বেশ সুখ্যাতি হয়। আর আইন সংক্রান্ত গ্রন্থাদি গভর্ণমেণ্টের আদেশ ও অনুরোধে ইংরেজী হইতে উর্দুতে অনূদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদে নজীর আহম্মদ খুবই সাফল্যলাভ করেন এবং আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে সু-অনুবাদের ফলেই তাঁহার কর্মজীবনের উন্নতি ও সুখ্যাতি।

ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে নজীর আহমদের কোরানের অনুবাদই সুপ্রসিদ্ধ। ইহা ঠিক অনুবাদ নয়, অনেকটা আলোচনামূলক কোরানের তফসীর বলা যাইতে পারে। ইহা বেশ সরল ও সরস ভাষায় লিখিত হইলেও আলোচনামূলক গ্রন্থমাত্রেরই সমালোচনা হওয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনি আমাদের আলোচ্য তফসীর খানিও ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। কিন্তু তাঁহার অম্মহাতুল-উম্মতহ-ই বোধ হয় সবচেয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে। ইহা আহমদশাহ নামে ধর্মান্তরিত খৃষ্টান কর্তৃক

লিখিত অম্মহাতুল-মৌমিনীন-এর প্রত্যুত্তর মাত্র। অল-হুকুক ও অল ফরায়িজ তাঁহার আর একটি প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

মৌলানা সাহেব সবচেয়ে সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহার উপদেশাত্মক উপন্যাস রচনা করিয়া। কাহারো কাহারো মতে তিনিই উর্দু সাহিত্যের আদি ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। আধুনিক যুগের উপন্যাসের সূচনা ও বিকাশ প্রসঙ্গেই ঔপন্যাসিক নজীরের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

শেষজীবনে নজীর আহমদ মুসলিম কৃষ্টি ও উর্দু সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক সংস্কৃতিমূলক সমিতিতে বক্তৃতা বা আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে আঞ্জুমানে-হমায়েতুল্-ইস্‌লাহে-লাহোর, মদরসায়ে-ত্বিব্বিয়ায়ে-দিহলী এবং মহম্মডেন্ এডুকেশান্ কন্‌ফরেন্স প্রভৃতির বাৎসরিক অনুষ্ঠানে তাঁহার সভাপতির ভাষণ উল্লেখযোগ্য। স্যার সৈয়দের ন্যায় তিনিও বিশেষ করিয়া তাঁহার শেষজীবনে এই সকল আলোচনায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার এইসব ধর্ম, সাহিত্য, কৃষ্টি ও শিক্ষামূলক আলোচনার একত্র সংগ্রহও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাছাড়া তাঁহার সাহিত্য সাধনার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট হইতে শম্‌সুল্-উলিমা উপাধি, এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. ও. এল্. প্রভৃতি বিশেষ সম্মানজনক ডিগ্রী লাভ করিয়াছিলেন।

নজীর আহমদের উপন্যাসের ভাষা সহজ, সরল ও সাহিত্যানুভূতিপূর্ণ। কিন্তু বিভিন্ন অনূদিত গ্রন্থের ও ধর্মসম্বন্ধীয় সাহিত্যাদির ভাষায় আমাদের গ্রন্থকার তেমন সরসতা ও স্বাভাবিকতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য ইহাতে অনেক সময় শব্দার্থের সামঞ্জস্য করিতে পারে নাই। তবে ইহাও ঠিক যে ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তক বা অনুবাদ-গ্রন্থ সাহিত্য-রসবাচ্য করিয়া তোলাও অনেকটা কষ্টসাধ্য। তাঁহার আলোচনা-সংগ্রহ আবার বেশ সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ। ইহাতে যেমন আছে শব্দার্থের সুসামঞ্জস ব্যবহার, তেমনি তাঁহার অনুভূতিপূর্ণ সময়োপযোগী হাস্যরসের উদ্ভাবন তাঁহার আলোচনা সাহিত্যকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।

বিলগিরামের অধিবাসী শম্‌সুল্-উলিমা ডক্টর সৈয়দ আলী বিলগিরামী অতি সম্ভ্রান্ত বংশ-সম্ভূত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা জয়নুদ্দীন্ খানও অতি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। ডিপুটি-কলেক্টরী চাকরী

হইতে অবসর প্রাপ্তির পর তিনি হয়দরাবাদে তাঁহার অবসর-জীবনের স্থান নির্দেশ করেন এবং তথায়ই তাঁহার প্রিয় পুত্রকে সুশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। ১৫ বৎসর কাল ইসলামীয় ধারামতে আরবী ও ফারসীতে শিক্ষালাভ করিয়া পরে তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংরেজীতে পারদর্শী হইয়া তিনি বি. এ. পাশ করেন এবং এখানে উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার বি. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃত একটি প্রধান ভাষা ছিল। তৎপর আরো উচ্চশিক্ষা লাভার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সহিত তথাকার উচ্চশিক্ষায় সফলতা লাভ করেন। এই সময়ে তিনি বিদেশীয় অনেক ভাষায়ই পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বস্তুতঃ বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক আগ্রহ ছিল এবং কথিত আছে নিম্নলিখিত ভাষাসমূহে তাঁহার দখল ছিল—যথা, আরবী, ফারসী, উর্দু, ইংরেজী, জর্মনী, ফরাসী, লেটিন, সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙ্‌লা, মরাঠি, গুজরাটি ও তেলেগু।

বিল্‌গিরামীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া হয়দরাবাদের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী মুখ্‌তারুল্‌-মুল্ক্‌ স্যার সলার জঙ্গ্‌ বহাদুর তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগের একজন বিশিষ্ট অধিকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত বড় পণ্ডিত হইয়াও তিনি মৌলিক গ্রন্থ বিশেষ লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই অন্যান্য ভাষার উর্দু-অনুবাদ মাত্র। তাঁহার যে দুইটি গ্রন্থ তাঁহার সুখ্যাতির অন্যতম কারণ তাহাও বস্তুতঃ ফারসী গ্রন্থেরই অনুবাদ। এই দুইটি গ্রন্থ যথাক্রমে তমদ্দুনে-আরব্‌ এবং তমদ্দুনে-হিন্দ্‌। অনুবাদ হইলেও এই দুইটি গ্রন্থের ভাষার যে সরলতা ও সরসতা আছে, তাহাতে তাঁহাকে উর্দু সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ গদ্যকার হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার অনূদিত গ্রন্থসমূহে কোন ইংরাজী শব্দের ব্যবহার নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনারেবল নবাব ইমদাদুল্‌-মুল্‌ক্‌ সৈয়দ্‌ হুসেন বিল্‌গিরামী, সি. আই. ই.-ও একজন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি এবং উর্দু সাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমাদের সাহিত্যিক আলী বিল্‌গিরামী ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

মৌলবী আজীজ মীর্জা একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং পরে রাজনৈতিক আন্দোলনেই বিশেষভাবে লিপ্ত থাকিলেও তিনি উর্দু সাহিত্যের সাধনা যথেষ্ট করিয়াছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আলিগড় কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করিয়া হয়দরাবাদ সরকারের কোন এক বিশেষ উচ্চপদ গ্রহণ করেন

এবং কয়েক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরে অতি সম্মানীয় হোম সেক্রেটারীর পদলাভ করেন। এইরূপ উচ্চপদে থাকিয়াও তিনি অবসর সময়ে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য :—

(১) গুল্‌গশ্‌তে-ফরন্‌গ্‌: ইহা ইংরেজীতে লিখিত নবাব মহদী হুসনের ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনীর উর্দু অনুবাদ মাত্র। (২) সীরতুল্‌-মহমূদ্‌: বহমনী রাজ্যের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী মহমূদ্‌ গাওয়ানের জীবন-চরিত। (৩) বিক্রম উর্বশী: ইহা মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত নাটকের উর্দু অনুবাদ। ইহার উপক্রমণিকাতে ভারত-নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস বেশ পাণ্ডিত্য সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। (৪) খিয়ালাতে-আজীজ্‌: আজীজের নানা প্রবন্ধের সমষ্টি। ইহাতে সাধারণভাবে প্রত্নবিদ্যার ঐতিহাসিক আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্নবিদ্যায় বিশেষ করিয়া মুদ্রা-লিপি আলোচনায় তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আজীজ তাঁহার চাকরী পরিত্যাগ করিয়া অল্‌ ইণ্ডিয়া মুসলিম্‌ লীগের জেনারেল সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি বেশ কৃতিত্বের সহিতই সম্পাদন করিতেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অকাল মৃত্যু হয়। সাহিত্য-সাধনা ছাড়া উর্দু সাহিত্যের তিনি একজন পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন।

শিব্‌লী নুমানী আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গদ্যকার। তিনি একাধারে মুসলিম জগতের একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, দার্শনিক, জীবন-চরিতকার, সাংবাদিক, সাহিত্য-সমালোচক, কবি, বক্তা, সংস্কারক ও ধর্মবেত্তা। এক কথায় তিনি মুসলিম কৃষ্টি ও সাহিত্য-জগতের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশেষ করিয়া উর্দু গদ্য-সাহিত্যের একজন প্রধানতম স্রষ্টা ও সাহিত্য-সাধক পুরুষ।

নুমানী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহর করেন। তিনি আজমগড়ের অধিবাসী এবং তাঁহার পিতা শেখ হবীবুল্লাহ তথাকারই একজন উকিল ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই নুমানীর সাহিত্য-সাধনায় একান্ত মনোনিবেশ ছিল এবং সমসাময়িক সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও ধর্মবেত্তা হইতেই তিনি তাঁহার সাধনায় সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যথাক্রমে আজমগড়, রামপুর, লাহোর এবং সহারণপুর প্রভৃতি সাহিত্য-সাধন-তীর্থ পরিক্রমা করিয়া মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে হজ্জ ভ্রমণে বহির্গত হন। মক্কা হইতে ফিরিয়া আবার তিনি সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেন।

কথিত আছে, নুমানী ওকালতী পাশ করিয়া আইন ব্যবসায়েও যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় শীঘ্রই পরিত্যাগ করিয়া সরকারী আমীনের চাকরী গ্রহণ করেন। এই চাকরীও তাঁহার ভাল না লাগায়, ইহা পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার তাঁহার নিজ সাহিত্য-সাধনায়ই যত্নপরবশ হইলেন। এই সময়েই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আলিগড় কলেজে পাঠরত তাঁহার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করিবার উদ্দেশ্যে তথায় গমন করেন। সেখানে খান বহাদুর মহম্মদ করীম্ এবং তথাকার ডেপুটী কলেক্টর সমীউল্লা খানের মধ্যস্থতায় স্যার সৈয়দের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের সুযোগ হয়। এবং এই সুযোগের ফলে শীঘ্রই সাহিত্যিক সমঝ্দার স্যার সৈয়দেরই সুপারিশে নুমানীর আলীগড় কলেজে ফারসী সাহিত্যের অধ্যাপক-পদ লাভ হয়।

বস্তুতঃ আলীগড় কলেজের অধ্যাপনা চাকরী নুমানীর নিকট একটি সুবর্ণ-সুযোগরূপে পরিগণিত হয়। এখানেই তাঁহার পূর্ব-সূরী হালীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইস্লাম ধর্ম ও সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ গবেষক Preaching of Islam-এর প্রণেতা প্রফেসার আর্নল্ডের সহিতও তাঁহার এইখানেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। কথিত আছে, তিনি প্রফেসর আর্নল্ডের নিকট হইতে ফারসী ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। আর আর্নল্ড তাঁহার নিকট হইতে আরবী শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আরো কথিত আছে প্রিচিং অব্ ইস্লামের অনেক মালমসল্লাই তিনি আমাদের নুমানী হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। এবং ইহার পরিবর্তে তিনি আর্নল্ড হইতে শিক্ষালাভ করেন আধুনিক চিন্তাধারানুযায়ী ইংরেজী সাহিত্য সমালোচনার বিশিষ্ট পদ্ধতি।

ইসলাম ঐতিহ্য ও গৌরবের যে সাধনা তিনি এতদিন করিয়াছেন, সুশৃঙ্খলরূপে আধুনিক গবেষকদের ন্যায় পড়াশুনা করিয়া তাহা প্রকাশের সুযোগ আলীগড়েই প্রথম নুমানী লাভ করিলেন। স্যার সৈয়দের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এবং বহু যত্নে সংরক্ষিত দেশবিদেশের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি-পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাগারের সহায়তায় সাহিত্য প্রকাশনায় নুমানী এখন যত্নশীল হইলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম কাব্য মস্নবীয়ে-সুবহে-উম্মিদ্ রচিত হয়। ইহাতে ইস্লামের ঐতিহ্য এবং গৌরব যেমন ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তেমনি তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্যার সৈয়দের গুণগরিমাও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ

'মুসল্‌মানূন্‌ কী গুজশতহ তালীম্‌' ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মুসলিম এডুকেশনেল কন্‌ফারেন্সের ভাষণ হিসাবে প্রথমে রচিত হইয়াছিল। এই ঐতিহাসিক তথ্যমূলক নিবন্ধটিতে তিনি যে গবেষণা মূলক পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ধীশক্তি ও সাহিত্য চর্চার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রসিদ্ধি সাহিত্য জগতে বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে।

এই সময়েই নুমানী ইংরেজী ধারানুযায়ী Heroes of Islam (বা ইসলামের বীর নেতা)—সিরিজ লিখিবার প্রয়াস পান। এবং সঙ্গে সঙ্গেই অল-মামুন্‌ এবং সীরতুন্‌-নুমান্‌ প্রণয়ন করেন। তারপরে অল-ফারূক লিখিতে যত্নবান হন। এবং এই বীর চরিতের সকল তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মুসলিমপ্রাচ্য দেশসমূহে ভ্রমণের সুযোগ লাভ করেন। আর্নল্ড সাহেব তাঁহার এই ভ্রমণের প্রধানতম সঙ্গী ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মিশর, তুরস্ক, শ্যাম, কন্‌ষ্টন্টিনপল ও এশিয়ামাইনর প্রভৃতি মধ্যযুগের ইসলাম গৌরবোজ্জ্বল দেশসমূহ ভ্রমণ করেন। এই দেশপরিদর্শনের উপহারস্বরূপ নুমানী আমাদিগকে 'সফর্‌নামায়ে-রূম্‌ ও শাম্‌' প্রদান করেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্যার সৈয়দের মৃত্যু হয়। নুমানীর এই প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতার মৃত্যুর ফলে তিনি যেন নিজকে আলিগড়ে খুবই অসহায় ও নিঃসম্বল মনে করিতে লাগিলেন। তাছাড়া তাঁহার দেহ ও মনেও যেন কতকটা অবসাদ আসে। তাই আলিগড়ের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া নিজ জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু এখানে তিনি নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। কিছুকাল পূর্বে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই চেষ্টা ও আগ্রহে তথায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ইংরেজী স্কুলের তত্ত্বাবধান ও উন্নতির প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। শীঘ্রই ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কাশ্মীর ভ্রমণের সুযোগ লাভ হয়—কিন্তু তথায় গিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই রুগ্ন অবস্থায়ই তিনি পূর্বে-উল্লিখিত অল-ফারূক্‌ সমাপ্ত করেন।

কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সৈয়দ আলী বিলগিরামীর যত্ন ও উদ্যমে নুমানী হয়দরাবাদে আমন্ত্রিত হন এবং তথাকার শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক (নাজিমে-মহকুমে-তালীম্‌) নিযুক্ত হইলেন। তিনি চারি বৎসর তথায় ছিলেন এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তথাকার শিক্ষাবিভাগের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তাছাড়া তাঁহার নিজ সাহিত্য-সাধনা হইতেও তিনি বিরত থাকেন নাই। এই সময়েই তাঁহার বিখ্যাত অল-ঘজালী,

সওআনিহে-মৌলানারুমী, অল-কলাম্, ইলমুল-কলাম্ এবং মুওআজিনতে-আনীস্ ও দবীর প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়।

হয়দরাবাদ হইতে নুমানী লক্ষ্ণৌ আসেন এবং তথাকার নদ্‌অতুল-উলমা (বা পণ্ডিত সম্মেলন)-র তত্ত্বধায়ক নিযুক্ত হইলেন। এই পণ্ডিত-সম্মেলন মূলতঃ ইসলামধর্ম ও সাহিত্য-সাধনার প্রধান কেন্দ্রস্থল। ভারতের ইসলাম কৃষ্টির সকল প্রসিদ্ধ পৃষ্ঠপোষকের সহায়তায় এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে গবর্ণমেন্টের কুনজরে পড়িয়া ইহার সুপরিচালনা ব্যাহত হয়। তৎপর নুমানী আসিয়া ইহাকে নূতন করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং গভর্ণমেণ্টও ইহাকে সাহায্য করিতে যত্নবান হইলেন। নুমানীর চেষ্টায়ই এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি মুসলিম জগতের একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-গবেষণাগাররূপে পরিচায়িত হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত ইহার অধিনায়কদের সহিত তাঁহার মতের মিল না হওয়ায় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইহার কর্মভার পরিত্যাগ করেন। লখনো থাকাকালীন নুমানী এই সম্মিলনেরই পরিচায়ক 'নদ্‌অহ' নামক পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণপূর্বক মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতার গবেষণামূলক আলোচনাদ্বারা তাঁহার পাণ্ডিত্যকে আমাদের নিকট সমুজ্জ্বল করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ হইতে নুমানী আজম্‌গড় প্রত্যাবর্তন করেন। এবং তথায় দারুল-মুসন্নফীন্-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়েই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁহার পায়ে গুলির আঘাত লাগে এবং শেষপর্যন্ত তাঁহার পা-টিকে কাটিয়া ফেলিতে হয়। এই দারুল-মুসন্নফীন্ নুমানীর বড় আদরের বস্তু ছিল। ইহার উন্নতি সাধনে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহার নিজ ব্যবহৃত সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এই গ্রন্থাগারেই দান করিয়া গিয়াছেন। আর এইখানেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় সীরতুন্-নবী (যদিও অসম্পূর্ণ) এবং শঅরুল-আজম্ (বা পারস্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক সামালোচনা) রচিত হয়।

নুমানী একজন খাঁটি সাহিত্য-সাধক পুরুষ। সাহিত্য-সাধনায়ই তাঁহার জীবনকে তিনি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। নিজ অর্থাগমের দিকে নুমানীর মোটেই খেয়াল ছিল না। তিনি নিরহঙ্কার হইলেও ছিলেন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। আর ধর্মবেত্তা হইয়াও ধর্মের গোঁড়ামিকে তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। হিন্দু-মুসলিম মিলনের তিনি ছিলেন একজন অগ্রদূত।

আজাদের সাহিত্যের তুলনায় নুমানীর সাহিত্যকে অনেক সময় নীরস মনে হইলেও বস্তুতঃ তিনি একজন উঁচুদরের সাহিত্যিক। এবং গদ্যকার হিসাবে তাঁহার নাম উর্দু সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। তাঁহার ভাষার সরলতা ও প্রকাশভঙ্গির স্পষ্টতাই এই চিরস্থায়িত্বের অন্যতম কারণ। জীবনচরিতকার ও ঐতিহাসিক হিসাবেই তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি। পাশ্চাত্য আধুনিক গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি তাঁহার ইতিহাস, জীবনচরিত ও দর্শনবিষয়ক গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন। সাহিত্য-সমালোচনামূলক গ্রন্থাদিতে কিন্তু আবার তিনি ভাষার সরসতা ও অনুভূতির প্রখরতার দিকে অনেকটা খেয়াল করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার ফাঁরসী-সাহিত্যের সমালোচনামূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং আনীস ও দবীর-সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার ও সমালোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এইসকল ছাড়া তিনি আরো অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং তাঁহার অনেক প্রবন্ধও নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আলমগীর, অল্-জিজিয়হ, তারীখে-ইস্‌লাম্, ফিলসফায়ে-ইস্‌লাম্, হয়াতে-খসরু, তন্‌কীদে-জর্জিজয়দান্, মকালাতে-শিবলী, মকাতিবে-শিবলী এবং রিসায়িলে-শিবলী উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কয়েকটি কাব্য-গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে :—দেওয়ানে-শিবলী, দস্তয়ে-গুল এবং মজমূঅয়ে-নজমে-উর্দু।

শিবলী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

সুলেমান্ নদ্‌বীকে মৌলনা শিবলীর ভাবশিষ্য বলা যাইতে পারে। শিবলীর মৃত্যুর পর নদ্‌বীই তাঁহার অসম্পন্ন কাজ সমাধা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন এবং তাঁহারই উপর দারুল-মুসন্নিফের কার্যভার ন্যস্ত হয়। শিবলীও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ ও আদর করিতেন। দারুল-মুসন্নিফের কার্যভার ছাড়া অল-মআরিফের সম্পাদনাভারও তিনি গ্রহণ করেন। ইহাদের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে আরবী ফারসী গ্রন্থের উর্দু তরজমা করিয়া তিনি মুসলিম কৃষ্টি-জগতের যে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। এইসকল গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ :—শিবলীর অসম্পূর্ণ সীরতুন্-নবীর সমাপ্তিকরণ, সীরতুল-আয়েশা, অরজুল-কুরান্ ও লুঘাতে-জদীদ্।

শিবলীর ন্যায় নদ্‌বীও ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থসমূহ কেবল শুষ্কতা ও কাঠিন্যে ভরপূর নহে—তাঁহার মধ্যে সরসতা ও আন্তরিকতার প্রভাব হেতু তিনি এইগুলিকে সাহিত্যে

রূপান্তরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আরবী ফারসী শব্দের বাহুল্যদ্বারা তিনি তাঁহার সাহিত্যকে কখনই ভারাক্রান্ত করেন নাই। আবার, যে সকল আরবী ফারসী শব্দ ভারতের মাটিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহাদের তিনি তাঁহার সাহিত্যে গ্রহণ করিতে মোটেই অবহেলা করেন নাই। তাঁহার শেষজীবনে রচিত তন্‌নীকে-খইয়াম্ একটি উচ্চদরের সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থ। উর্দু সাহিত্যে বস্তুতঃ এইরূপ সমালোচনা গ্রন্থ খুবই বিরল। তাঁহার সাধনার পুরস্কারস্বরূপ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে যে 'ডক্টর' উপাধিদান করিয়াছেন তাহাদ্বারা যথার্থ পাত্রকেই সম্মান করা হইয়াছে।

সুলেমন্ নদ্‌বী ছাড়া আর যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি দারুল-মুসন্নিফের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেন—মৌলানা হমীদুদ্দীন্, মৌলানা আব্দুল বারী, আব্দল মাজিদ্ দরিয়াবাদী ও আব্দুস্ সলাম্ নদ্‌বী।

লালা শ্রীরাম প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহার সুবিখ্যাত খম্‌খানায়ে-জাওয়িদ্ রচনা করিয়া। তিনি উচ্চ-বংশসম্ভূত এবং প্রসিদ্ধ টোডরমলের বংশধর হিসাবে দিল্লীতে এই বংশের এখনো বিশেষ খ্যাতি। তাঁহার পিতা রায় বহাদুর ব্যারিষ্টার মদনগোপাল আজাদ, হালী ও পিয়ারীলাল আশূবের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

লালা শ্রীরাম ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতেই জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এম. এ. ও মুন্সেফী পরীক্ষা পাশ করিয়া লাহোর, অমৃতসর ও দিল্লী প্রভৃতি নানা স্থানে কয়েক বৎসর মুন্সেফী চাকরী করেন। তাঁহার হাঁপানী রোগের জন্য ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাহিত্য-সাধনায়ই নিজকে নিয়োজিত করেন। তাঁহার পরিবারটিই পণ্ডিত-পরিবার এবং সেইজন্য ইতিপূর্বেই অনেক প্রাচীন-পুঁথির বিশেষ সংগ্রহ তাঁহাদের গৃহে ছিল। ইহাদের সুযোগ গ্রহণ পূর্বক তাঁহার গবেষণা দৃষ্টিসম্পন্ন বহুল বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত সমালোচনামূলক উর্দু সাহিত্যের ঐতিহাসিক গ্রন্থ খম্‌খানায়ে-জাওয়িদ্ প্রণয়ন করেন। অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কারের জন্য ইহা একদিকে যেমন বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে, তেমনি আবার প্রমাদপূর্ণ তথ্যসমূহের জোরালো আলোচনাদ্বারা তিনি অনেকের নিন্দাভাজনও হইয়াছেন। তা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের সরল, সরস ও সাহিত্যিক-দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচনা সাহিত্যিক মাত্রেই চমক লাগাইবার ক্ষমতা রাখে।

উর্দু সাহিত্যে হসন্ নিজামীই বোধ হয় সর্বপ্রথম সাহিত্যিক, যিনি নিজ-আত্মচরিত লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই আত্মচরিতের নাম

'আপ্-বয়তী'। ইহা হইতেই তাঁহার জীবনের অনেক মাল-মসল্লা গ্রহণ করা যাইতে পারে। আলী হসন্ নিজামী ১২৯৬ হিজরী (বা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে) -তে পুরানা দিল্লীর নিকটেই অবস্থিত হজরৎ খাজা নিজামুদ্দীন্ আউলিয়ার দরগার পার্শ্ববর্তী বস্তীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিশেষ ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন—তাই মামুলী লেখাপড়া তাঁহার বিশেষ হয় নাই। তাহা হইলেও আরবী-ফারসীতে তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি লিখিয়াছেন, ১৯০৮ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবনকাল তাঁহার সাহিত্য-সাধনা ও শিষ্য-সেবায় নিয়োজিত হইয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁহার শিষ্যবর্গের সংখ্যা ৬০ হাজারের অধিক এবং গ্রন্থাদি ৪০ এর অধিক লিখিত হয়। 'আপ্-বয়তী' ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রচিত। তাই উপরি-উক্ত সংখ্যার পরিমাণ নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ হসনের ন্যায় বহুল গ্রন্থ প্রণেতা উর্দু সাহিত্যে খুব কমই দৃষ্ট হয়।

হসন একজন খাঁটি সাহিত্যিক। প্রবন্ধই হউক বা ছোটগল্পই হউক —ইহার প্রত্যেকটি বিষয় বা চিন্তাধারা নিজ অনুভূতির দ্বারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। তাছাড়া সহজ, সরল ও অলঙ্কৃত শব্দাদির ব্যবহারদ্বারা তিনি তাঁহার সাহিত্যেকে সর্বজনবোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যে দিল্লী টাকশালী ভাষা দৃষ্ট হয়। ইহাতে যেমন ঠেট্ হিন্দীর ব্যবহার আছে, তেমনি সব সময় ব্যবহৃত অনেক আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগও রহিয়াছে। কিন্তু তাহা কানে খটকা না লাগিয়া তাঁহার লেখনীর গুণে মাধুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ছোটগল্প সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধাদি বেশ গভীর ও চিন্তাপূর্ণ হইয়াও তাহাতে কোন পাণ্ডিত্য বা দর্শনের নীরস আলোচনার কোন অবকাশ নাই। তাঁহার কিবৃশন্-বয়তী বা সী পারায়ে-দিল্ লক্ষ্য করিলেই তাহা সহজে উপলব্ধি হইবে। তাঁহার সাহিত্য সুফী চিন্তাধারা সম্পন্ন পাঠকমাত্রেই বিশেষভাবে অভিভূত করে। তাঁহার নিম্ন-লিখিত গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—মিলাদ-নামা, মহরম্-নামা, ইয়জীদ্-নামা, বীবী কী তালিম্ এবং আউলাদ্ কী শাদী।

মৌলবী আব্দুল হক্ আধুনিক উর্দু সাহিত্যের একজন প্রভাবশালী গ্রন্থকার। তাঁহার প্রভাবের অন্যতম কারণ, শক্তিশালী উর্দু পত্রিকার সম্পাদনা এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃতি-সম্মেলন আঞ্জুমানে-তরকীয়ে-উর্দু-র সেক্রেটারী পদাধিকার। এই পদাধিকারের সুযোগে উর্দু সাহিত্যের অতি প্রাচীন

গ্রন্থাদির গবেষণামূলক সম্পাদনাদ্বারা তিনি যে গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করিয়াছেন, তাহার জন্য উর্দু সাহিত্য সমাজ চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। এই দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ বা কঠিন কঠিন শব্দের টিপ্পনীসহ তিনি যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা ইহাদের সহিত সংযোগ করিয়াছেন, তাহার জন্য বিদ্বজ্জন তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। বস্তুতঃ তাঁহার সাহিত্য-সাধনার প্রতিফলনেই আমাদের উর্দু প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস নবরূপ ধারণ করিয়াছে। তাছাড়া সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখিয়া এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিসভায় নানা ভাষণ দিয়া তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এইগুলির গ্রন্থে প্রকাশিত রূপের যথাক্রমে নামকরণ হইয়াছে 'তনকিদাতে-আব্দুল-হক্' এবং 'খুতবাতে-আব্দুল-হক্।' আর তাঁহার সাহিত্য সাধনার পুরস্কার স্বরূপ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি দান করিয়া উপযুক্ত পাত্রেরই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। আজাদের সাহিত্যিক রসভঙ্গি যাঁহারা পছন্দ করেন, তাঁহারা তাঁহার সাহিত্যালোচনায় কতকটা নিরাশ হইলেও তাঁহার বাগাড়ম্বরহীন পাণ্ডিত্য-পূর্ণ প্রবন্ধাদির জন্য বা গবেষণাপূর্ণ সাহিত্য-সাধনার নিমিত্ত চিরদিন তিনি উর্দু সাহিত্যিক সমাজে সমাদৃত থাকিবেন। তাঁহাকে অনেকটা প্রসিদ্ধ হালীর উত্তরসাধক বলা যাইতে পারে। তিনি সকল সময়েই সহজ, সরলভাবে বক্তব্য বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার আরবী-ফারসী শব্দের প্রতি কোন অতি-আকর্ষণ ছিল না; এবং অতি-ব্যবহৃত হিন্দী শব্দের সমাদর দ্বারা উর্দু সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তেমনি আধুনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকতাকে মোটেই অগ্রাহ্য করেন নাই।

নিয়াজ মহম্মদ খান ফতেপুরী (বা ফতঃহপূরী) আধুনিক উর্দু সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক, সাংবাদিক এবং ছোটগল্প লেখক। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইউ. পি-র অন্তর্গত ফতেহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আরবী-ফারসীতে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং ইংরেজী শিক্ষাও তিনি এফ. এ. পর্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। সম্পাদকতাই তাঁহার পেশা এবং প্রথম জীবনে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি প্রসিদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা 'নিগার'-এর কর্মকর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহা প্রথমে ভূপালে অবস্থিত ছিল, বর্তমানে লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত।

নিয়াজ-সাহিত্যের ভাষা যেমন সহজ ও সরল, তেমনি আবার বেশ

বেগবতী ও মাধুর্যপূর্ণ। একটি কাব্যিক ছন্দ যেন ইহার প্রতিটি ছত্রকে দোলাইয়া দেয়। তিনি একজন গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি ; এবং যেমন তাঁহার সাহিত্য সমালোচনা, তেমনি তাঁহার ছোটগল্পের মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও গভীর অনুভূতির প্রকাশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তুর্কী ভাষা ছাড়া, গ্রীক ও লেটিন ভাষায়ও তাঁহার বেশ পাণ্ডিত্য আছে এবং এই সকল ভাষা জ্ঞানের সুযোগ তাঁহার সাহিত্যিক রসবোধকে তিনি আরো গভীর করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহার 'জুজবাতে-ভাষা' এবং 'তর্ঘীবাতে-জিন্স' ইহারই সাক্ষ্য দিতেছে। 'গহওআরয়ে-তমদ্দুন্'-এ তাঁহার তুর্কী সভ্যতা ও কৃষ্টির গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার 'কিউপিড অওর্ সাইকী' এবং 'মির্‌রীথ সিয়াহ কা ডাইরী'-কে ছোটগল্প না বলিয়া তাঁহার মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাশীলতার অপূর্ব প্রকাশ বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি। স্বহবিয়াৎ, শিহাব্ কী সরগুজাশ্ৎ, মস্‌লতুল্-শর্‌কীয়হ, আর্জে-নঘমা, তারীখুল-দৌলতীন বা ফরাসতুল-ইয়দ্ তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতার তথ্যপূর্ণ তত্ত্বমূলক গ্রন্থাদির নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির উর্দু অনুবাদ করিয়াও তিনি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাছাড়া তাঁহার ছোটগল্পের সঙ্কলনরূপে নিগারিস্তান ও জমালিস্তান প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সংক্ষেপে তিনি আধুনিক যুগের একজন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি।

আধুনিক ভারতের কংগ্রেস পন্থী রাজনীতিজ্ঞ হিসাবেই আবুল কালাম আজাদের বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকিলেও তিনি উর্দু সাহিত্যের একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। এবং বস্তুতঃ তাঁহার এই সাহিত্যের প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপই তিনি বর্তমান ভারতের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার শিক্ষা-মন্ত্রী পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন।[১] ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং কায়রোর প্রসিদ্ধ অল-অজহর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁহার কর্মজীবনের প্রথমভাগে অনেককাল তিনি কলিকাতায় বসবাস করিয়াছেন এবং তথা হইতেই তাঁহার প্রসিদ্ধ উর্দু অল-হিলাল পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এখানে ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিম বাঙলায় প্রতিনিধিরূপেই তিনি প্রথমবারে পার্লামেন্টের সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য-গ্রন্থ না থাকিলেও আজাদ তাঁহার অল-হিলালের সম্পাদনার মাধ্যমেই সাহিত্যিক প্রতিভার যে নিদর্শন রাখিয়া

১। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক গমনে এই শূন্যপদ (আংশিকভাবে) দখল করিয়াছেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর।

গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাকে একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিকরূপে গ্রহণ করিতে পারি। তাঁহার সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য শব্দের সুপরিমিত ও সুসামঞ্জস ব্যবহার—গদ্য হইয়াও শব্দের এইরূপ সুশৃঙ্খলা যে মনে হয় একটি শব্দের এদিক-ওদিক হইলে যেন কানে বেতালা লাগিবে। তাই স্বভাবতই ভাষা যেমন জোরালো, তেমনি ভাবের প্রকাশে একটি শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যের শব্দভাণ্ডারে মৌলানা আজাদ যে পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আধুনিক যুগের দুইটি বিশিষ্ট ধারার একটির পুরোধা হিসাবে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিনি সাধারণতঃ তাঁহার সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দেরই বহুল ব্যবহার করিয়াছেন, এমনকি অলঙ্কারাদি বা অনেক বাক্যাংশ পর্যন্ত ফারসী শব্দভাণ্ডার হইতে গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইলেও তাঁহার সাহিত্য কোন নীরস পাণ্ডিত্যে পূর্ণ নহে—ভাবানুযায়ী শব্দের ব্যবহার তাঁহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া বেশ গভীর ভাবকেও তিনি এত সহজ সরলভাবে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন যে তাহা সহজেই আমাদের মুগ্ধ করে।

সাহিত্য হইতে রাজনীতির আলোচনাই আজাদ বিশেষভাবে করিয়াছেন। সাহিত্যই হউক, আর রাজনীতিই হউক, তিনি একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি। এবং তাঁহার ভাবতন্ময়তার মধ্যে আশাবাদ বা মঙ্গলবাদের প্রাধান্যই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। আজাদ যেমন আশাবাদী ভাবুক, তেমনি উদ্দীপ্ত বক্তা এবং সুরসিক গল্পপটু। আর যেমন তাঁহার সাহিত্য, তেমনি তাঁহার বক্তৃতা ও গল্পের মধ্যে আরবী-ফারসী শব্দবহুল সাধু উর্দু শব্দেরই ব্যবহার বিশেষ দৃষ্ট হয়।

আজাদের উর্দু সাহিত্য আলোচনার একটি প্রধান কীর্তি তাঁহার কোরানের অনুবাদ। কোরানের গভীর ভাবকেও অতি সহজ, সরল উর্দুতে অনুবাদ করিয়া তিনি ইহা সকলের সহজ-বোধ্য করিয়াছেন। তাছাড়া অল্-হিলালে লিখিত তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি ২ খণ্ডে 'মকালাতে-আজাদ্' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে বন্ধুবর হবীবুর রহমান্ খান শিরওআনীর নামে জেলখানা হইতে লিখিত পত্রালাপের সমষ্টিও 'ঘব্ বারে-খাতির্' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

আব্দুল-মাজিদ্ দরিয়াবাদী উর্দু সাহিত্যে দর্শনের আলোচনায়ই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তিনি একজন খাঁটি সাহিত্যিক এবং সকল প্রকার

সাহিত্য-চর্চায়ই নিজকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন। আর সকল প্রকার সাহিত্যেই তাঁহার সফলতা আমাদিগকে সহজেই মুগ্ধ করে।

আব্দুল মাজিদ প্রসিদ্ধ ডিপুটি কলেক্টর আব্দুল কাদিরের সুযোগ্য পুত্র। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যজীবন ঘরেই আরবী ফারসী শিক্ষালাভ করিয়া পরে ইংরেজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ হইতে বি. এ. পাশ করেন। তারপর আরো উচ্চশিক্ষার জন্য আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার পিতার অকাল মৃত্যুতে তিনি লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া আসেন এবং তখন হইতে সাহিত্য সাধনায়ই নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তরজমা বিভাগে চাকরী পাইয়া তিনি হয়দরাবাদে গমন করেন। কিছুকাল পরে তিনি এই চাকরী পরিত্যাগ করিলেও বরাবরের জন্যই তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে ভাতা পাইতে থাকেন। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনেও কিছুকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এবং ইহারই সংযোগফলে সাপ্তাহিক 'সচ্' পত্রিকা তাহার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়।

মৌলানা দরিয়াবাদীর নিম্নলিখিত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য :

(১) ফিলসফয়ে-জজ্বাৎ ; (২) ফিলসফয়ে-ইজ্তিমা ; (৩) তারীখে-অখলাকে-ইয়োরূপ ; (৪) মুকালমাতে-বর্কলে (অর্থাৎ Barkley-র প্রসিদ্ধ Dialogues-এর অনুবাদ) ; (৫) বহরুল-মহব্বৎ (অর্থাৎ উর্দু কবি মুস্‌হফীর মসনবী কাব্য সম্পাদনা) ; (৬) জুদ্-পশীমান্ ; (৭) পইয়ামে-আমন্ ; (৮) সাইকলজী অব লিডরশিপ (Psychology of Leadership) ; (৯) তসওঅফে-ইস্‌লাম ; (১০) ফিলসফিয়ানা মুজামিন্ এবং (১১) মলফুজাতে-মৌলানা রূমী।

দরিয়াবাদীর দার্শনিক গ্রন্থসমূহ যেমন গভীর তত্ত্বপূর্ণ, তেমনি বিশ্লেষণাত্মক। এই সব গ্রন্থ যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি বেশ সরসতার সহিত রচিত। তবে আব্দুল মাজিদ বস্তুতঃ অনুবাদ গ্রন্থেই বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার সহজ, সরস ও স্বাভাবিক শব্দার্থ ব্যবহারের গুণে অনূদিত গ্রন্থসমূহও অনেক সময় মৌলিক গ্রন্থ বলিয়াই মনে হয়। সম্পাদনামূলক গ্রন্থসমূহে তিনি যেমন অদম্য উৎসাহ এবং গবেষক মনোবৃত্তি দেখাইয়াছেন, তেমনি ইহাদের সহিত সংযুক্ত বিস্তৃত উপক্রমণিকাসমূহও বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছে। 'জুদ্-পশীমান্' একটি নাটক। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়ার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত না হইলেও ইহা অনুভূতিপূর্ণ, রসাল ভাষায় বেশ মাধুর্য

সহকারে রচিত হইয়াছে। অনেক কবিতা না লিখিলেও কবিরূপে তাঁহার সুখ্যাতি আছে এবং তাঁহার সকল কবিতাই গভীর ভাবপূর্ণ।

আমাদের দরিয়াবাদী যেমন একজন উঁচুদরের সাহিত্যিক, তেমনি তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমঝদার ব্যক্তি। তাঁহার সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ, বিষয় অনুযায়ী শব্দার্থের ভারসাম্য। ডক্টর ইজাজ হুসেন সত্যই বলিয়াছেন, তাঁহার প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বক্তব্য বিষয়ানুযায়ী ভাষা ও শব্দের ব্যবহার। বক্তব্য দর্শন বিষয়ক হইলে প্রকাশভঙ্গি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ এবং কঠিন আরবী ফারসীযুক্ত বাক্যের ব্যবহার হইবে। আর মীর্জা রসওআ-র জীবনী বা কোন কাব্যের সমালোচনা হইলে ইহার প্রকাশভঙ্গি হইবে অন্যপ্রকার এবং শব্দের ব্যবহারে গাম্ভীর্যের কিছু লাঘব হইবে। কিন্তু যদি মীর্জা শৌকের মস্‌নবী কাব্য (জহরে-ইশক ও অন্যান্য কবিতা) সমূহের কবিত্বশক্তির আলোচনা হয়, তাহা হইলে শব্দার্থের ব্যবহার এরূপ সুসামঞ্জস হইবে যাহাতে তাঁহাকে তাঁহার খাঁটি সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, অর্থাৎ সর্বগ্রাহ্য ভাব ও চিত্তাকর্ষক শব্দের ব্যবহারদ্বারা আপ্যায়িত করা হইবে। তাঁহার প্রকাশভঙ্গির ইহাই বৈশিষ্ট্য যে সাধারণ বিষয়কে যেমন তিনি একেবারে গেঁয়ো ভাষায় রূপান্তরিত করেন নাই, তেমনি তিনি এরূপ গাম্ভীর্যপূর্ণও করেন নাই যাহাতে গভীর চিন্তাসহকারে ইহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে হয়।

উদাহরণস্বরূপ, রসওআর জীবনচরিত আলোচনায় নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইতেই তাঁহার রসগ্রাহী সাহিত্যের অন্ততঃ একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যাইবে :—কইসে কইসে আফসনা-গো আফসনা-নবীশ আয়ে অওর্ কইসী কইসী মজেদার কহানিয়ান্ সুনানে বইঠে মগর 'হা' দেখতে হী দেখতে খুদ্ উন্‌হী জিন্দগী আফসানা বন্ গয়ী।

অর্থাৎ, তিনি কী সুন্দর গল্প-কথক বা গল্প লেখক, আর কী মজা মজা কাহিনীর বর্ণনাই না তিনি করিয়াছেন! কিন্তু 'হাঁ', দেখিতে দেখিতে তাঁহার জীবনীই যেন কাহিনীতে রূপান্তর লাভ করিল।

মস্‌উদ্ হসন্ লখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফারসী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। হসন একজন কবি হইলেও সাহিত্য সমালোচক হিসাবেই তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি। তাঁহার কবি নাম আদীব। তাঁহার সাহিত্য সমালোচনা-মূলক 'হমারী-শাইরী' ইতিমধ্যেই বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং আঞ্জুমানে-তরক্কীয়ে-উর্দু ইহার প্রকাশনা দ্বারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ইহা ছাড়া উর্দু প্রাচীন কবিদের কাব্য-সম্পাদনও তিনি করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জিক্‌রে-মীর এবং রূহে শাহকারে-আনীস উল্লেখযোগ্য। এই উভয়ের সহিত সংযুক্ত ইহাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাও হসনের সাহিত্য-রসজ্ঞানেরই প্রমাণ করে।

হসন অতি সহজ ও সরস ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। পাণ্ডিত্যের কোন বাগাড়ম্বর নাই, অথচ বেশ গভীর চিন্তাপূর্ণ বিষয়সমূহও অনাবিল সরসতা ও মাধুর্যসহকারে বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে তাঁহার ভাবের গভীরতা বিশেষ নাই ; তাহা হইলে বলিতে হয় উর্দু সাহিত্যেই এইরূপ গভীর ভাবের সমাবেশ কেহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার চিন্তাধারার মধ্যে কতকটা প্রাচীনতা গন্ধ অনুভূত হয় এবং আধুনিক যুগের সর্ব বিষয়ে—কি ভাব, ভাষা ও গঠনপ্রকৃতির—পরিবর্তনশীলতায় যে একটা উন্মাদনা লক্ষিত হয়, তাহাতে তিনি কখনই সায় দিতে না পারিলেও তাঁহাকে অতি আধুনিক যুগের একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসমালোচক বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

ডক্টর মহীউদ্দীন জোর উস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ভাষার অধ্যাপক। হসন যেমন প্রাচীন পন্থী, তেমনি ডক্টর জোর অতিমাত্রায় আধুনিক পন্থী। এবং আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতার সকল প্রকার সাহিত্যিক উন্মেষণকে তিনি উর্দু সাহিত্যে স্থান দিবার বিশেষ পক্ষপাতি। ইতিমধ্যেই তাঁহার ১২।১৩ খানি সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি মনে করেন যে উর্দু সমালোচনা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শ অবশ্যই অনুকরণীয়। এবং এই আদর্শ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে অনেক ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যের গুণাবলী উল্লেখ করিয়া আমাদের পথ দেখাইতেও চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তথাকথিত শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট যে কোন সাহিত্যই তাহার নিজের বিশেষ ভাবভঙ্গি ও গভীর অনুভূতির প্রাণস্পর্শ ব্যতীত সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে না।

জোরের ভাষা বেশ সহজ ও সরল এবং ইহার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে বেশ সরসতা ও মাধুর্য বর্তমান। কিন্তু সাহিত্যের প্রাণ গভীর অনুভূতির ছোঁয়াচ তাঁহার সাহিত্যে বিশেষ লক্ষিত হয় না। সেইজন্য তাঁহার সাহিত্য অনেক সময় নীরস বোল-চালেই পর্যবেসিত হইয়াছে, সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে নাই। তাহা হইলেও তাঁহার উর্দু সাহিত্যের উন্নতির প্রচেষ্টা

বিশেষ প্রশংসনীয় এবং ইদারায়ে-আদবিয়াতে-উর্দু তাঁহার এক প্রধান কীর্তি। এই সংস্কৃতি সম্মেলনের মধ্য দিয়া তিনি উর্দু সাহিত্যের ক্রমোন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রন্থাদির উদ্ধার বা সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনাও করিয়াছেন—ইহাদের মধ্যে কুল্লিয়াতে-সিরাজ এবং কুল্লিয়াতে-কুতুবশাহ উল্লেখযোগ্য।

ইহতিশাম হুসেন আজমগড়ের অধিবাসী এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি তথায় জন্মগ্রহণ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পাশ করিয়া ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি লখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ছাত্রজীবন হইতেই তিনি নিজেকে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন—তবে তাঁহার চাকরীলাভের পর হইতেই তাঁহার সার্থক সাহিত্য সাধনার উদ্যম বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সাহিত্যসমালোচনা ও ছোটগল্পেই তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি এবং আধুনিক প্রায় সকল উর্দু-সাহিত্য পত্রিকায়ই তাঁহার রচনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ইহতিশাম হুসেন একজন স্বভাব-সাহিত্যিক। পাশ্চাত্য প্রভাবের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক হইলেও স্বকীয়তা ও মৌলিকত্বকেই তিনি সাহিত্যে সকলের উর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন। নূতনত্বের আবাহনকে সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই মান্য করেন, আর তাছাড়া বস্তুতঃ নূতনত্বের স্বকীয়তাই মৌলিকতায় রূপান্তর লাভ করে। তাঁহার সাহিত্যেও এইগুণ লক্ষণীয়—তাই সাহিত্য-সমাজে তিনি ইতিমধ্যেই বেশ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীবন ও সাহিত্য মূলতঃ অবিচ্ছেদ্য এবং জীবনের জয়গানই সাহিত্যের পরম সম্পদ। 'ফানী' বা মৃত্যুর উপর তিনি যে সমালোচনা লিখিয়াছেন, তাহা উর্দু সাহিত্য-সমাজকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান দিতে সমর্থ হইয়াছে। 'তন্‌কীদে-জায়িজে' তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থ। তাঁহার নিম্নলিখিত সাহিত্য গ্রন্থও বেশ উল্লেখযোগ্য: রওআইয়ৎ ও বঘাওঅৎ, আদব ও সমাজ', উর্দু লিসানিয়ৎ কা খাকহ (ভাষা সম্বন্ধীয় একটি অনুবাদ গ্রন্থ), ওয়েরানে (ছোটগল্পের সমষ্টি) এবং তন্‌কীদ্ অওর্ আমলী তন্‌কীদ্।

---

(২) উর্দু উপন্যাসের সূচনা ও বিকাশ

উর্দু উপন্যাস তথা উর্দু গদ্যের উৎপত্তি ও বিকাশ মূলতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবেই। পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ বা রিয়েলিজমের আওতায়েই ভারতীয় গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব হইলেও উর্দু গদ্য সাহিত্যে এই প্রভাব আরো সুস্পষ্ট। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর হইতেই উর্দু গদ্যের সূচনা হয় এবং ক্রমে ক্রমে ইহার বিভিন্ন শাখার বিকাশ লাভ হয়।

গিল্‌ক্রাইষ্ট Gilchrist সাহেবের পূর্ববর্তীকালে উর্দু ভাষায় যে সকল গদ্য সাহিত্যের উল্লেখ আছে, তাহা ছিল সাধারণত ধর্ম-নিবন্ধ। ১৪ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই ধর্মসম্বন্ধীয় উপদেশ, সাধুমহাত্মাদের জীবনচরিত বা কর্মধারা উর্দু গদ্যে রচিত হইতে দৃষ্ট হয়। ইহাদের ভাষা অপ্রচলিত হইলেও এই সকল গ্রন্থাদি এখনও প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে মিরাজুল্-আশিকীন্, হিদায়ৎ-নামা, কলিমাতুল্-হকায়িক্, মিফ্‌তাহুল্-খয়রাৎ, অহকামুস্-সলওআৎ এবং প্রসিদ্ধ দহ-মজলিস্ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এইসকল প্রাচীন গদ্য সাহিত্য আধুনিক গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের কোন প্রেরণাই দিতে পারে নাই। উর্দু কাব্যের ক্রমশঃ বিকাশ হইতে থাকিলেও উর্দু-গদ্যের কোন বিকাশ সেই যুগে লক্ষিত হয় নাই। সেই যুগে গদ্যাকারে কোন কিছু—যথা, চিঠিপত্র, সমালোচনা বা কোন গ্রন্থের পরিচিতি—লিখিতে হইলেই তাহা ফারসী ভাষায় রচিত হইত। কেবল দুইটি গ্রন্থ-পরিচিতির উল্লেখ পাওয়া যায় যাহা উর্দু গদ্যে রচিত হইয়াছে—ইহাদের একজন গ্রন্থকার সৌদা ও অন্যজন ইন্‌শা। এই সকল গ্রন্থ-পরিচিতির উর্দু ভাষাও বেশ উৎকট, অলঙ্কার-বহুল এবং ফারসী শব্দে পরিপূর্ণ। এই সকল নিদর্শন সহজভাবে উর্দু গদ্যে কাজে লাগানোর পক্ষে কোন সাহায্যই করিতে পারে নাই। কথায় ও সাহিত্যে কাজে লাগানোর মত উর্দু গদ্যের উদ্ভব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই হইতে থাকে।

ফোর্ট উইলিয়মের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই উপদেশাবলী, ঐতিহাসিক নিবন্ধ বা গল্প ও কাহিনী। শেষোক্ত গল্প ও কাহিনীর মধ্যে মীর্ অম্মন্ রচিত বাঘ ও বহার্, শের আলী

অফসোস্ রচিত আরায়েশে-মহফিল্, হয়দর বখশের তোতা-কহানী, বহাদুর আলী হুসেইনীর নসরে-বেনজীর, নিহাল্ চন্দ লাহোরীর মজহবে-ইশ্‌ক্ এবং কাজিম্ আলী ও লল্লুলাল কর্তৃক সম্মিলিতভাবে রচিত শকুন্তলা ও সিংহাসন্ বত্তীসী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সকল গ্রন্থের প্রত্যেকটিই অনুবাদ-গ্রন্থ হইলেও উর্দু গদ্য সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে ইহাদের গুরুত্ব যথেষ্ট। বস্তুতঃ ইহাদের মাধ্যমেই উর্দুগদ্যের পরিচয় লাভ হয় এবং ক্রমে উর্দু সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পের সূচনা হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃক অনূদিত উর্দু গ্রন্থাদি ছাড়া অন্যান্য অনেক গ্রন্থও ক্রমশঃ অনুবাদিত হইতে থাকে। ১৯ শতাব্দীর মধ্যভাগে লক্ষ্ণৌতে প্রতিষ্ঠিত নবল কিশোর প্রেসও উর্দু সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশে কম সাহায্য করে নাই। এই নবল কিশোর প্রেস হইতেই সম্পাদিত গল্প ও কাহিনীতে সমৃদ্ধ দাস্তানে-আমীর্ হম্‌জা এবং বোস্তানে-খয়াল্ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

দাস্তানে-আমীর হম্‌জা বস্তুতঃ উর্দু ও পারস্য সাহিত্যের সকল রোমাঞ্চকর কাহিনী ও রূপকথার মূলভাণ্ডার। ইহাতে আছে আমীর হম্‌জার জীবনের বিচিত্র ঘটনা সমূহের ইতিবৃত্ত; আর তাহার সহিত জড়িত রহিয়াছে নানাপ্রকার রোমাঞ্চকর কাহিনী। কথিত আছে, আবুল্ ফজল ফয়জী আকবরের সন্তোষ বিধানার্থে সর্বপ্রথম ফারসী ভাষায় ইহার সম্পাদনা করেন। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ইহা কোন একজন ব্যক্তির কাজ নয়।

বোস্তানে-খয়াল-ও প্রথমে ফারসীতে রচিত হয় এবং ইহা রচনা করেন মীর তকী খয়াল। আর নবলকিশোর প্রেস হইতে ইহার উর্দু-অনুবাদ-প্রকরণে সাহায্য করেন খাজা বদরুদ্দীন্ অমান এবং মীর্জা মহম্মদ আস্করী। ইহা সাত খণ্ডে বিভক্ত।

প্রসিদ্ধ আলিফ লয়লা বা আরব্য-উপন্যাসের উর্দু তরজমাও এই সময়েই রচিত হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মুন্সী আব্দুল করীম কর্তৃক সর্বপ্রথম ইহার যে অনুবাদ হয় তাহা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। পরবর্তীকালে নবলকিশোর প্রেসের আনুকূল্যে তোতারাম আশিয়ান কর্তৃক অনূদিত আলিফ্-লয়লাই বিশেষ জনপ্রিয়তা ও সাফল্য লাভ করিয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ত্বিল্‌সিমে-হোশরুবা এবং নৌশিরুআন্-নামার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমটি ৭ খণ্ডে ও দ্বিতীয়টি ২ খণ্ডে বিভক্ত।

এইরূপে উর্দু গদ্যের জনপ্রিয়তা ও প্রাধান্য লক্ষিত হইতে থাকে এবং ক্রমে মৌলিক গ্রন্থাদিরও আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। রজব্ আলী সুরূর্ কর্তৃক

রচিত প্রসিদ্ধ ফসানায়ে-অজায়িব ইহাদের অন্যতম। ইহা ছন্দিত গদ্যে বিশেষ জমকালো ভাষায় রচিত। আধুনিক যুগে ইহার আদর অনেকটা কমিয়া গেলেও সেইযুগে ইহা খুবই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এবং উর্দুভাষিগণ তাঁহাদের নিজেদের একটি সাহিত্য এতদিনে লাভ করিতে পারিলেন বলিয়া গর্বানুভব করিতেন। ইহাতে আধুনিক উপন্যাসের ছায়া বর্তমান থাকিলেও ইহাও রূপকাহিনী পর্যায়ভুক্তই বলা যাইতে পারে।

সরশার রচিত ফসানায়ে-আজাদেই বোধ হয় আধুনিক উপন্যাসের মূল বিষয় বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ সর্বপ্রথম লক্ষিত হয়। এক উচ্চ কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত সরশার নামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রতন নাথ দর ১৮৪৬ বা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আরবী, ফারসী এবং ইংরেজী এই তিন ভাষায়ই তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। তাঁহার প্রথম জীবনে তিনি একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন এবং সেই সময় হইতেই মরাসিলে-কশ্মিরী এবং অউধ-পঞ্চ-এ তাঁহার গল্প ও উপন্যাসসমূহ ধারাবাহিকভাবে লিখিতে আরম্ভ করেন। তাছাড়া মিরাতুল্-হিন্দ এবং রিয়াজুল্-আখবারেও তাঁহার রচনা সময় সময় প্রকাশিত হইত। এই সময়েই ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি গ্রন্থেরও অনুবাদ করেন। এই অনূদিত শম্সুজ্-জুহায় তিনি বেশ নিপুণতার সহিত অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দের সরল ও স্বাভাবিক উর্দু প্রতিশব্দের ব্যবহারদ্বারা বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেন। ইহারই ফলে তাঁহার রসগ্রাহিতা ও পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ মুন্সী নবলকিশোর পোষিত অউধ-অখবারের সম্পাদক নিযুক্ত হন। এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ ফসানায়ে-আজাদ্ এই পত্রিকায়ই ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের একজন সভ্য হিসাবে তিনি মাদ্রাজে গমন করেন। তথায় হয়দরাবাদের দরবারে মহারাজা স্যার কিশন্-পরশাদ্ কর্তৃক তিনি বিশেষ আপ্যায়িত হন এবং পরে তাঁহারই শিক্ষা গুরুরূপে বেশ সম্মানের সহিত তথায় বসবাস করিতে লাগিলেন। শেষজীবনে আসফিয়ার সম্পাদনাভারও কিছুকাল তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরশার পূর্ব হইতেই মদ্যপায়ী ছিলেন, তবে শেষজীবনে ইহার কিছুটা বাড়াবাড়ি হওয়ায় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে হয়দরাবাদেই তাঁহার অকাল মৃত্যু হয়।

সরশার ঔপন্যাসিক হিসাবেই প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও তিনি একজন কবিও ছিলেন। আমীর ছিলেন তাঁহার কাব্য-গুরু। তাঁহার কসীদা ও অন্যান্য কবিতা ছাড়া তুহফয়ে-সরশার নামক একটি মসনবী-কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি একাধারে কবি, সাংবাদিক, প্রবন্ধকার, ভাষাবিদ ও

সর্বোপরি ঔপন্যাসিক। তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজী ধারানুযায়ী উপন্যাস লিখিবার প্রয়াস পান। ফসনায়ে-আজাদ ছাড়া তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য :—সয়রে-কোহসার্, জামে-সর্শার্, কামিনী, খুদায়ি-ফৌজদার্, বিছড়ী-দুল্হন্, হুশশূ, স্তোকানে-বেতমীজ এবং রঙ্গে-সিয়ার। শমসুজ-জুহা ছাড়া তাঁহার আরো কয়েকটি ইংরেজী সাহিত্যের উর্দু-অনুবাদ-গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে।

ফসানায়ে-আজাদ-এর চরিত্রসমূহ যেমন লক্ষ্ণৌ-সমাজ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তেমনি ইহার ঘটনাসকলও কোন রূপকথার কাহিনী নয়—সাধারণ জনসমাজের ইতিবৃত্ত। তবু ইহাকে ঠিক উপন্যাস বলা যায় না। কারণ, ইহাতে কেন্দ্রীভূত প্লট বা আখ্যানবস্তুর বিশেষ কোন নির্দেশ নাই। রূপকাহিনী না হইয়া ইহা জনসমাজেরই কতকগুলি বিচিত্র কাহিনীর একত্র সমাবেশ মাত্র। তাহা হইলেও এই সকল বেশ উপাদেয় এবং উপন্যাস চরিত্রের ন্যায় বিচিত্র এই কাহিনীগুলিই পাঠকের মনকে সহজেই উদ্বেলিত করিয়া তোলে। মোটকথা, চরিত্রসৃষ্টির নিপুণতা আমাদের উর্দু সাহিত্যের সর্বপ্রথম উপন্যাসে বিশেষ কিছুই লক্ষিত হয় না।

ফসানায়ে-আজাদ চারি খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রত্যেক খণ্ডই বেশ বৃহদাকার। ইহার মধ্যে ৬৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ১ম খণ্ডই সবচেয়ে উপাদেয়। এবং মূলকাহিনীর বেশী অংশটাই এই খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। তাছাড়া লক্ষ্ণৌর সামাজিক জীবনের বিস্তৃত কাহিনী এখানেই সবিশেষ দৃষ্ট হয়।

ফসানায়ে-আজাদের দ্বিতীয় খণ্ডই সবচেয়ে ক্ষুদ্র এবং ইহা ৪২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১ম খণ্ডে আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আজাদ তাঁহার প্রেমিকা হুসন্-আরার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন এবং সেই প্রেমিকার ইচ্ছানুসারেই তুর্কীদের পক্ষ হইয়া রুশিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় প্রস্তুত হইয়াছেন। আর দ্বিতীয় খণ্ডে পথিমধ্যে আজাদ তাঁহার বিপদ-সঙ্কুল কার্যাদির মধ্য দিয়া কনষ্টান্টিনপল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তুর্কী রাজপুরুষগণ কর্তৃক বেশ সাদরেই অভ্যর্থিত হন, কিন্তু শীঘ্রই মিস মিদার সুচাতুরীতে একজন গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী হইলেন। মিস মিদাও আজাদেরই একজন প্রণয়-প্রার্থিনী ছিলেন, কিন্তু নিরাশ হইয়া এই কারসাজীর উদ্ভাবন করেন। অবশেষে বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া তুর্কী সৈন্য-বিভাগে এক বিশেষ উচ্চ পদ লাভ করেন।

এই দিকে অপেক্ষমান হুসন্-আরার ঠাকুরমা বড়ী বেগম তাঁহাকে

আজাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া অন্য সৎপাত্রের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করেন। সহজেই এই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়ায়, তাঁহাকে বিবাহাবদ্ধ হইতে বাধ্য করেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ অসুস্থ হইয়া পড়ায়, ঠিক অবধারিত সময়ে এই সমূহ বিপদ হইতে হুসন্-আরা অব্যাহতি লাভ করেন। হতাশ হুসনের নিকট আজাদের নামে অনেক গুজব রটাইতেও তিনি চেষ্টা করেন। কিন্তু স্থির-হৃদয় হুসনের নিকট তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ফসানায়ে-আজাদের সবচেয়ে বৃহৎ তৃতীয় খণ্ড ১১৪৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে আজাদের বিপদসঙ্কুল কার্যাদি ও প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। পোলাণ্ডের রাজকন্যা তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হন, কিন্তু বিফল মনোরথ হওয়ায় আজাদকে আবার কারাবাস বরণ করিতে হয়। মিস মিদা এখন আজাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং তাঁহার সহায়তায়ই তিনি কারাবাস হইতে মুক্তিলাভের সুযোগ পাইলেন। ক্লারিসস্ নাম্নী আর একটি হতাশ প্রেমিকার প্রেমকাহিনীর বর্ণনাও এখানে বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডের অধিকাংশই অল্লা রক্খী ওরফে যোগন ওরফে শববো জান্ বা সুরাইয়া বেগমের চমকপ্রদ কাহিনীর কথাই বর্ণিত হইয়াছে—ইহার সহিত মূল বিষয়ের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

আজাদের ভারতে প্রত্যাবর্তন হইতে চতুর্থ খণ্ড আরম্ভ। পথে তাঁহাকে অনেক লোমহর্ষণ কাণ্ডের সম্মুখীন হইতে হয় এবং অনেক সুন্দরীর সহিতই তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাহাদের রঙ্গরসে আপ্যায়িতও করেন—যদিও শেষপর্যন্ত সকল মুগ্ধাদেরই বিফল মনোরথ হইতে হয়। আজাদ ও হুসন্ আরার মিলনে এই বৃহদায়তন গ্রন্থের সমাপ্তি হয়।

সরশারের যুগে তাঁহার ফসনায়ে-আজাদ খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ইহার ক্রম-প্রকাশ্য পৃষ্ঠার জন্য পাঠকচিত্ত আগ্রহসহকারে অপেক্ষা করিত। সমসাময়িক পণ্ডিত কিশন্ নরায়ন দর্ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—কিস্সা কা প্লাট্ তো বহুৎ সাদা বল্‌কি হদ্ দর্জা বে মজা হৈ মগর চাঈ হজার গুঞ্জান স্বফহে পঢ়তে চলে জায়ে জরা বদ্‌মজা নহীঁ হোজিয়ে গা। বল্‌কি সতর্ সতর্ পুর অশ্‌তিয়াক বঢ়তা জায়ে গা। মহজ ইস্ ওজহ সে কি ইবারৎ-আরায়ি ঘজব কী হৈ। তর্জ-আদা নিহায়ৎ বে তকল্লুফ আওর আসান্, তাজা অওর নিচারেল, তম্‌সিলী অওর-ওআজিহ। ফির ইস্ কে সাথ জা-বজা পুর লুত্ফ জরাফৎ, ফড়কৃতে হোয়ে ফিকরে, মজেদার

শোখিয়ান্ তুর্কী ব-তুর্কী জবাব, হমাকৎ আমীজ মজহক বাতীন্ জিন্ কো পঢ় কর হঁসতে হঁসতে পেট্ মেঁ বিল পড় জায়েঙ্গে।

قصه کا پلاٹ تو بہت ساده بلکه حد درجه بے مزه ہے - مگر ڈھائی هزار گنجان صفحے پڑھتے چلے جائے ذرا بد مزه نویں هوجئے گا - بلکه سطر سطر پر اشتیاق بڑھتا جائےگا - محض اس وجه سے که عبارت آرائی غضب کی ہے - طرز ادا نہایت بے تکلف اور آسان - تازه اور نیچرل - تمثیلی اور واضح - پھر اس کے ساتھه جابجا پر لطف ظرافت - پھرکتے هوئے فقرے - مزیدار شوخیاں ترکی به ترکی جواب حماقت آمیز مضحک باتیں جن کو پڑھه کر هنستے هنستے پیٹ میں بل پڑ جائینگے -

অর্থাৎ, কাহিনীর প্লট বা মূল বিষয় বেশ সরল হইলেও খুবই নীরস। তথাপি পূর্ণ আড়াই হাজার পৃষ্ঠা সমানে পড়িয়া যান একটুও নীরস মনে হইবে না—বরং ক্রমে ক্রমে পড়িবার আগ্রহ বাড়িতে থাকিবে। ইহার মূল কারণ তাঁহার প্রকাশভঙ্গির আশ্চর্য রকম ক্ষমতা। তাঁহার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে কোন কষ্ট-কল্পিত প্রচেষ্টা নাই; সহজ, সরস ও স্বাভাবিকভাবে নানা উপমার মাধ্যমে বক্তব্য বিষয়ের স্পষ্ট প্রকাশ। তদুপরি নানা সুন্দর হাস্যরসের অবতারণা, চটুল ভাব ও ভাষার সমাহার এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা উপাদেয় কৌতুকপূর্ণ কথোপকথন। এইসব স্থুলবুদ্ধি হাস্যকৌতুকপূর্ণ আলাপ-আলোচনা পড়িলে হাসিতে হাসিতে পেটে মোচড় ধরিয়া যায়।

বিষয়-বর্ণনায় সরশার রজব আলী বেগের ন্যায় কষ্টকল্পিত ভাব ও কেবল ঝঙ্কৃত ও অলঙ্কৃত ভাষার ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার প্রকাশনায় সমাজ-ছবি যেন চিত্রের ন্যায় আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে। সরূরের ন্যায় ইহাতে লুকোচুরির অবকাশ নাই; কিন্তু এখানে চরিত্র সৃষ্টির কোন প্রচেষ্টা না থাকিলেও তাহারা সজীব মানুষ—কোন ছায়া-চিত্র নহে।

যদিও ফসানায়ে-আজাদের প্রধান পুরুষ বা হিরো সর্বগুণে গুণান্বিত—তিনি একাধারে বীর, সাহসী, তেজোদীপ্ত ও হৃদয়-হরণকারী, একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ও মহৎ সৈনিক; কিন্তু সরশার তাঁহার এই প্রসিদ্ধ উপন্যাসের মধ্যে কোন চরিত্র সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেন নাই। যদি এই উপন্যাসে কোন চরিত্র সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা খোজী-চরিত্র। রামবাবু সক্সেনার মতে এই খোজী-চরিত্র উর্দু সাহিত্যে হাস্যরসের একটি অনুপম চরিত্র-চিত্র। সকল সময়

অবহেলিত, তবু উদ্ধত ও অহংকারী আফিংখুর খোজী তাহার প্রভু আজাদের ন্যায় সর্বদাই প্রেমে পতিত হয়, কিন্তু পরিণামে কেবল তাহাকে দুঃখই ভোগ করিতে হয়। তাহার নিজের ধারণা সে সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বাপেক্ষা সাহসী। তাহাকে প্রায়ই বলিতে শুনা যায়—নহীঁ হোয়ী ইস্ উঅকৎ করোলী উঅর্নি লাশ ফড়কতী হোতী।

نہیں ہوئی اس وقت قرولی ورنہ لاش پھڑکتی ہوتی -

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ 'করোলী' কখনও তাহার হস্তগত হয় না এবং সে তাহার বীরত্ব দেখাইবার সুযোগ পায় না।

ফসানায়ে-আজাদ ছাড়া সরশারের আরো অনেক উপন্যাস রহিয়াছে, কিন্তু কোনটিই ইহার ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই বা এতটা বৃহদাকারও হয় নাই। আর একটা বিশেষত্ব লক্ষণীয় যে তাঁহার সমাজ-চিত্র অঙ্কনে কামিনী ছাড়া আর কোন গ্রন্থেই হিন্দুসমাজের কোন চিত্রই অঙ্কিত হয় নাই।

নজীর্ আহমদই বোধ হয় উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। গদ্যকার হিসাবে তাঁহার জীবনী পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। নজীর আহমদের অনুসরণকারী অনেকেই রহিয়াছেন, কিন্তু সম্ভবতঃ কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। তাঁহার মিরাতুল্-আরূস্-ই বোধ হয় উর্দু সাহিত্যের আদি খাঁটি উপন্যাস। এবং কাহারো কাহারো মতে ইহা এখনো উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া উক্ত হয়। মিরাতুল্-আরূস্ ছাড়া তাঁহার নিম্নলিখিত উপন্যাস উল্লেখযোগ্য : (২) বনাতুন্-ন্অশ ; (৩) তৌবতুন্-নস্থূহ ; (৪) ফসানায়ে-মুব্তলা ; (৫) ইব্নুল-উঅক্ৎ এবং (৬) অইয়ামা।

মিরাতুল-আরূসে সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত কাল পরের মুসলিম সামাজিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্রোহের ফলে অনেকের আর্থিক স্বচ্ছলতা চলিয়া গিয়াছে—যাহারা পূর্বে নিজেদের সম্পত্তির উপর নির্ভর করিত—তাহাদের এখন চাকরীর অন্বেষণ করিতে হইতেছে। যুবসমাজে কতকটা অধঃপতন লক্ষিত হয়। কলীম্, মুবতলা এমন কি এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র আস্ঘরীর স্বামী কামিলও এই যুবকদের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা অলস এবং আমোদপ্রিয় হইলেও তাহাদের মধ্যে একটা বাহ্যিক সুজনতা ও ভদ্রতার ছাপ রহিয়াছে। সোজাকথায়, মিরাতুল-আরূসে সেই যুগের যে সমাজের রীতিনীতি ও আদবকায়দার বর্ণনা আছে, তাহা ঠিক জীবন্ত বলিলেও কতকটা কম বলা হয়। তাহাদের মধ্যে সেই সময়ের খাঁটি চরিত্রের বিশ্লেষণ

হইয়াছে। আবার, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যেন কেবল নির্দিষ্ট যুগের মানুষ নয়, তাহাদের মধ্যে সর্বযুগের অন্তর্নিহিত মানব চরিত্রের প্রকাশ দেদীপ্যমান।

আস্‌ঘরী ও আকবরীর দুই বিরুদ্ধ চরিত্রের মাধ্যমেই নজীর আহমদ বিশেষ করিয়া তাঁহার চরিত্র-বিশ্লেষণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আস্‌ঘরী একজন খাঁটি গৃহিণী, আর আকবরী গৃহিণী হিসাবে আস্‌ঘরীর সঙ্গে তুলনাই হয় না—যদিও সে মানুষ হিসাবে আস্‌ঘরী হইতে অনেক উচ্চস্তরের। খুব অল্পকথায় কি সুন্দরভাবে নজীর আহমদ আস্‌ঘরীর গৃহিণী-চরিত্র প্রকাশ করিতেছেন—আস্‌ঘরীনে বর্তন্ ভাণ্ডা গিরী পড়ী চীজ সব ঠিকানে সে রখী অওর্ বাহর্ কে দরওআজা কী জিন্‌জীর্ বন্দ কী কোঠরীওন্ কো কুফল লগা কুন্‌জিয়ান্ মাঁকে হওয়ালে কীঁ। বাহর্‌কে দালান্ অওর্ বাওর্‌চীখানে কা চিরাগ গুল কিয়া আওর্ আপা আওর্ ভনোয়ী সবকো পান্ বনা করদিয়ে অওর ফরাঘৎ সে জাকর সো রহী।

اصغری نے برتن بھانڈا گری پڑی چیز سب ٹھکانے سے رکھی اور باہر کے دروازہ کی زنجیر بند کی کوٹھریوں کو قفل لگا کنجیاں ماں کے ھوالے کیں - باھر کے دالان اور باورچی خانے کا چراغ گل کیا اور آپا اور بہنوئی سبکو پان بنا کر دئے اور فراغت سے جاکر سو رھی -

অর্থাৎ, আসঘরী বাসন-কোসন ও টুকরা-টাকরা সব জিনিষ ঠিক ঠিক জায়গায় রেখে, বাহির দরজায় শিকল এবং সব ঘরে তালা দিয়ে চাবির তোড়া এনে মার জিম্মায় রাখল। বাহির দালান এবং রান্নাঘরের আলো নিবিয়ে এবং দিদি ও জামাইবাবু প্রভৃতি সবাইকে পান বানিয়ে দিয়ে সে নিশ্চিত হয়ে তার জায়গায় গিয়ে ঘুমুল।—এই সকল ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়াই আসঘরী তাঁহার সতর্ক ও সুষ্ঠু গৃহিণীপনার পরিচয়টি রাখিয়া গিয়াছে।

কেবল বড় চরিত্র নয়, অনেক ছোট ছোট চরিত্রেরও তিনি দুই এক কথায় এমন সুন্দরভাবে রূপ দান করিয়াছেন, যাহার তুলনা নাই। বেগম ইক্রামুল্লা লিখিয়াছেন, Each and every character introduced in the Miratul-'Arus is a little gem, অর্থাৎ মিরাতুল-আরূসের প্রত্যেকটি চরিত্র যেন একটি হীরার টুকরা।

বনাতুন্-নৃঅশ কেবল স্ত্রী-চরিত্রের সমাবেশ। ইহাকে একটি পৃথক গ্রন্থরূপে গ্রহণ না করিলেও চলে। বস্তুতঃ ইহা মিরাতুল-আরূসেরই পরবর্তী

অংশ। ইহাতে আস্‌ঘরীর তাহার ছাত্রীদের শিক্ষাদানের রূপটাই যেন পৃথক করিয়া দেখান হইয়াছে। কাহারো কাহারো মতে ইহা স্কুলপাঠ্য সাধারণ জ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ মাত্র। কিন্তু এই সকল পাঠের মধ্য দিয়াও নজীর আহমদ হুসন্ আরা, মাহমুদ, হলীম্ ও খইরুল্-নিসার যে চরিত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সত্যই জীবন্ত ও প্রাণস্পর্শী।

তৌবতুন্-নস্যূহ্ এবং ফসানায়ে-মুবতলা-র আখ্যানবস্তু বনাতুন্-নাশ বা মিরাতুল-আরূস হইতে বৃহৎ এবং এই উভয় উপন্যাসই বিয়োগাত্মক বা বিষাদপূর্ণ। তাছাড়া চরিত্র চিত্রণও ইহাদের জটিল।

ইবনুল-উঅকৃৎ-এ নজীর আহমদ তাঁহার উপন্যাস-মনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার আখ্যানবস্তু যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি ইহাতে চরিত্র বিশ্লেষণেও যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। তবু মিরাতুল-আরূস্ যেমন সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে, ইহাতে আমাদের ঔপন্যাসিক সেইরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। সংক্ষেপে কাহিনীটি নিম্নে বর্ণিত হইল :—

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ইবনুল-উঅকৃৎ নামে এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নবেল নামক এক ইংরেজকে আশ্রয় দান করেন। এই আশ্রয়ে থাকাকালীন উভয়ের মধ্যে বেশ সৌহৃদ্য হয়। এবং ইহারই ফলে বিদ্রোহের পরে ইবনুল-উয়কৎ এসিষ্টেণ্ট কমিশনারের পদ লাভ করিলেন। এই নূতন পদ লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন পাকা সাহেব বনিয়া গেলেন এবং পাশ্চাত্য ধারা মতে জীবন যাপনের প্রয়াস করিলেন। এই নূতন জীবনধারায় তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে এমনি করিয়া বিদেশীদের প্রতি জাতক্রোধরূপ একটি দেশীয় কুসংস্কার দূরীভূত হইবে এবং তাহাদের রীতিনীতি ও আদব কায়দা অনুসরণ করিয়া মুসলিম সমাজ ক্রমশঃ উন্নতির পথেই ধাবিত হইবে। কিন্তু ক্রমে তাঁহার এই আদর্শ অনেক দূরে সরিয়া গেল, এবং ইহার স্থলে নিছক দাসোচিত মনোবৃত্তিই উবছাইয়া উঠিল।

নবেল যতদিন ভারতে ছিলেন, ইংরেজদের সহিত খানাপিনা ও শিকারযাত্রা প্রভৃতির মধ্য দিয়া তাহাদের মনস্তুষ্টি বেশ ভালভাবেই হইতেছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে নবেলের অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার স্থলে ভারতীয় বিদ্বেষী শার্পের আগমনে ইবনুল-উঅকৎ সমূহ বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহার দেশীয় বন্ধুগণের প্রতিও তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না ; আবার তাঁহার দাসসুলভ মনোবৃত্তিও তাঁহাকে নিজ কার্যে

কোন সুবিধা দান করিতে পারিল না। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার দেশবাসীই কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়—ঠিক স্থানে ইংরেজেরাও বেশ কুসংস্কারাবদ্ধ।

অইয়ামাই বোধ হয় নজীর আহমদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপন্যাস। অতিমাত্র নীতিবাদী হওয়াই এই অসাফল্যের কারণ।

শরর উর্দু ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তাঁহার পূর্ববর্তী সরশার ও নজীর আহমদের গ্রন্থগুলিকে যথাক্রমে ফসানা ও কিস্সা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; কিন্তু শররের গ্রন্থসমূহকে প্রথম হইতেই উপন্যাস বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ঔপন্যাসিক হিসাবেই তাঁহার প্রসিদ্ধি থাকিলেও তিনি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক, নাট্যকার, সাহিত্যরসিক এবং বেশ শক্তিশালী সাংবাদিক।

মৌলবী আব্দুল হলীম্ শরর সিপাহী বিদ্রোহের তিন বৎসর পরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লখনো সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ঠাকুরদাদা অযোধ্যার রাজদরবারের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া নবাব উআজিদ্ আলীর অন্তরীণের সঙ্গে সঙ্গে শররের পিতা হকীম তফজ্জল্ হুসেনও বন্দী হইয়া কলিকাতার মটিয়াবুরুজে আসিলেন। শররের বয়স তখন ৯ বৎসর। তাঁহার পিতা আরবী ফারসীতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। পিতার নিকট হইতেই যেমন তিনি আরবী ফারসী শিখিলেন, তেমনি শরর ঘরে বসিয়া ইংরেজীও শিক্ষা করিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা হইতে লক্ষ্ণৌ প্রত্যাবর্তন করেন। তথায় তাঁহার বিবাহের পরে কিছুকাল তিনি কোরান ও হাদিসে শিক্ষালাভ করিয়া আবার তাঁহার নিজ জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন। এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অউধ আখ্‌বরের সম্পাদনা বিভাগে একটি চাকরী লাভ করেন। এই চাকরীই তাঁহার প্রতিভা বিকাশের পরম সুযোগ আনয়ন করে। এই পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখিয়া বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেন। এই সময়েই প্রায় বৎসরখানেক 'মহশর' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকারও তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন। শীঘ্রই তাঁহাকে অউধে-আখ্‌বরের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে হয়দরাবাদে গমন করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্থান পরিবর্তন মনঃপূত না হওয়ায়, তথায় মাস দুই কাজ করার পরে এই চাকরী ত্যাগ করিয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আবার তিনি লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া আসেন এবং স্বাধীনভাবে তাঁহার সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।

শীঘ্রই শররের প্রথম উপন্যাস 'দিলচস্প' প্রকাশিত হয়। ক্রমে তাঁহার দ্বিতীয় ভাগও তিনি প্রকাশ করেন। তাঁহার এই প্রেমপূর্ণ সামাজিক উপন্যাসটি অচিরেই সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে। এবং উৎসাহের সহিত তিনি তাঁহার অন্যান্য উপন্যাস লিখিয়া যাইতে সুরু করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'র অনুবাদ হইলেও ইহাকে অনেকটা মৌলিক উপন্যাস বলিয়াই অনুভূত হয়। শীঘ্রই তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে বন্ধুবান্ধবদের উপদেশ ও পরামর্শক্রমে তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 'দিলগুদাজ' নামক একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ করেন। ইহা একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা ও ইংরেজী সাহিত্য-পত্রিকার ধারানুযায়ী মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ও উপন্যাসের প্রকাশদ্বারা তিনি যে নূতন দিগদর্শন আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিলেন, তাহার জন্য উর্দু সাহিত্যসমাজ চিরদিন তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে। দিলগুদাজের প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মুহজ্জব' নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন এবং ইহাতে মুসলিম গুণীদের জীবনচরিত আলোচনার সূত্রপাত করেন। দুইটিই বিশেষ করিয়া মুসলিম সমাজে বেশ চালু থাকিলেও শরর হঠাৎ এই উভয় পত্রিকারই প্রকাশনা বন্ধ করিয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে হয়দরাবাদে গমন করেন এবং তথায় নবাব দরবারে দুই শত টাকা বেতনের এক চাকরী যোগাড় করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নবাব পুত্র উঅলী উদ্দীন খানের গৃহশিক্ষক হিসাবে তিনি ইংলণ্ডে যাইবারও সুযোগলাভ করেন। উয়ালীউদ্দীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভার্থে ইংলণ্ডে যান আর প্রাচ্য-শিক্ষার সুবিধার্থে শররের তথায় গমন। তিনি তথায় বৎসর দেড়েক ছিলেন এবং এই সুযোগে শরর ফরাসী ভাষায়ও পারদর্শিতা অর্জন করেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে হয়দরাবাদেই শরর দিলগুদাজের পুনঃপ্রকাশ করেন। কিন্তু দরবারের অধিনায়কদের সহিত মতভেদ জনিত শীঘ্রই তিনি ইহা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। অবশেষে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে হয়দরাবাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া তিনি লখনো ফিরিয়া আসেন এবং তথায় স্বাধীনভাবে পুনরায় সাহিত্যসাধনায় নিবিষ্ট হইয়া দিলগুদাজের পুনঃপ্রকাশ আবার সুরু করেন। ঐই সময়েই ইত্তিহাদ্ নামক একটি পাক্ষিক পত্রিকাও তাঁহার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইতে থাকে। শররের শেষজীবন (অর্থাৎ ১৯০৪ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) কেবল সাহিত্যসাধনায়ই ব্যয়িত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে মুঅর্রিখ নামক তাঁহার আর একটি মাসিক পত্রিকা

সম্পাদনারও উল্লেখ আছে দেখিতে পাই। তাছাড়া আরো কয়েকটি মাসিক, পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক তথা পর্দায়ে-ইস্মৎ, অল-ইর্ফান ও জরীফ প্রভৃতি পত্রিকাও তাঁহার নামে সম্পাদিত হওয়ার উল্লেখ আছে।

শরর ঐতিহাসিক উপন্যাস-কার বলিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বাছাই করা পাত্রপাত্রীকে তাঁহার উপন্যাসের চরিত্র নির্দ্ধারণ করিয়া সহজেই তিনি নাম-কামাই করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের সেই ঐতিহাসিক যুগের সকল সামাজিক খুঁটিনাটি খবর যে সূক্ষ্মভাবে জানা দরকার—তাহার প্রতি শরর মোটেই কোন গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। তাহার ফলে তাঁহার গ্রন্থসমূহ গৌরবময় ইসলাম ঐতিহ্যের দরদপূর্ণ কাহিনী হইয়াছে—খাঁটি উপন্যাস হইতে পারে নাই। কারণ, উপন্যাস চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে হইলে সেই সময়কার সামাজিক অবস্থা ও তখনকার লোকদের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস জানা না থাকিলে সেই চরিত্র বিশ্লেষণ কেবল বাগাড়ম্বর হয়, কখনও অনুভূতি-পূর্ণ জীবন্ত চিত্র হইতে পারে না।

মুসলিম ঐতিহ্যের বিভিন্ন যুগের ইতিহাস লইয়াই শরর তাঁহার উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তবে ক্রুসেড ও মুসলিম-স্পেনের ঐতিহ্য বর্ণনায়ই তিনি বিশেষ গৌরব অনুভব করিয়াছেন এবং তাঁহার কয়েকটি উপন্যাসই এই যুগ সম্বন্ধীয়। মলিক আজীজ অওর উঅর্জনা এবং শৌকীন্ মল্কা ক্রুসেড সম্বন্ধীয় কাহিনী। আর অলফন্সো, ফ্লোরা ফ্লোরেণ্ডা, এবং এমন কি মফতূহ ফাতেহ-কে মুসলিম-স্পেন যুগের কাহিনী বলা যাইতে পারে। 'মুকদ্দস্ নাজনীন্' কাহিনীকে দশম শতাব্দীর এবং মনসুর মোহনা-র ঘটনাবলীকে ভারতে মুসলিম-অভিযান যুগের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি অতি দরদী আমাদের সাহিত্যিক-প্রবর এই সকল ঘটনা বেশ গর্বভরে আমাদের পরিবেশন করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল ঘটনাবলীকে তিনি অনেক সময় সংবদ্ধ কাহিনী আকারেই নিবদ্ধ করিতে পারেন নাই।

অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের তুলনায় ফ্লোরা-ফ্লোরেণ্ডা-র আখ্যান-বস্তুই বোধ হয় সবচেয়ে মনোরম। ধারাবাহিক ঘটনা ও মানসিক চিত্তচাঞ্চল্যের অবস্থা সমাবেশে ইহাকে অনেকটা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলা যাইতে পারে। ফ্লোরা ও জিয়াদ উভয়েই মিশ্র-বিবাহাবদ্ধ পিতামাতার সন্তান। তাহাদের মাতা

হইলেন খৃষ্টানী আর পিতা একজন গোঁড়া মুসলমান। পুত্রদের মধ্যে জিয়াদ ছিল গোঁড়া মুসলমান এবং ফ্লোরার মনে খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবই অনেকটা প্রতিপত্তি স্থাপন করে। তাহার খৃষ্টান ধর্মের প্রতি বেশ দৃঢ়-বিশ্বাস ও আনুগত্য থাকিলেও সমাজভয়ে বাহিক ইসলামীয় আচার-অনুষ্ঠানই পালন করিতে বাধ্য হইত। এদিকে খৃষ্টান পাদ্রীগণ মুসলমানদের ধর্মান্তরের প্রতি সকল সময়েই সচেষ্ট ছিলেন এবং সুযোগ বুঝিয়া ফ্লোরাকে ধর্মান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে ফ্লোরেন্ডা নামক একজন খৃষ্টান নান্ বা দেবদাসীকে একটি মুসলমান বিধবারূপে সজ্জিত করিয়া ফ্লোরাদের প্রতিবেশীরূপে স্থাপন করিল। ফ্লোরেণ্ডা তাহার কর্তব্যে সফলকাম হইল, কিন্তু তাহাকে ফ্লোরার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার এবং তাহার ভাই জিয়াদের বিশ্বাস আনয়ন করিবার জন্য উভয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইল। ফ্লোরা তাহার নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইয়া দেখিতে পায় যে দূর হইতে যাহা অতি সুন্দর মনে হইতেছিল বস্তুতঃ তাহা নয়। খৃষ্টান পুরোহিত ও দেবদাসীদের ভ্রষ্টতা ও পাপাচার তাহাকে বিশেষভাবে আঘাত করে। তাহার অশেষ অন্তর্বেদনা ও অনুশোচনার মধ্যেও সে একজন ফরাসী ডিউকের মেয়ে হেলেনকে দরদী বন্ধু হিসাবে পায়। ঘটনাচক্রে হেলেনের সহিত জিয়াদের পরিচয় হয় এবং তাহারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। তখন তাহারা উভয়ে মিলিয়া ফ্লোরাকে আবার ইস্‌লাম ধর্মে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু তাহারা ঠিক এই কাজে সফলকাম হইবার পূর্বেই ফ্লোরা তাহার এই মানসিক দুঃখের প্রতিশোধরূপে যে পুরোহিত তাহার দুঃখের কারণ হইয়াছিল তাহাকে খুন করে এবং নিজেও এই ব্যাপারে ভীষণ মর্মাঘাত প্রাপ্ত হয়। মুমূর্ষু অবস্থায়ও ফ্লোরা তাহার দুঃখের মর্মান্তিক কাহিনী তাহার ভাই জীয়াদকে বলিবার সুযোগ পায় এবং অবশেষে এই মোহ হইতে মুক্তি-প্রাপ্ত মুসলমানরূপে প্রাণত্যাগ করিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

মক্‌তুহ-ফাতেহ মুসলমানদের ফরাসী দেশ অধিকারের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মুসলমানদের ফরাসী দেশ দখল এবং তথায় অনেক দিন তাহাদের আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তারের পরে (নবম শতাব্দী) অবশেষে যে চার্লস্ মার্টেনের নিকট তাহাদের পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা বস্তুতঃ ঐতিহাসিক কাহিনী। শরর এই কাহিনীকেই মূলতঃ ভিত্তি করিয়াছেন, তবে ইহার সহিত একটি প্রেমঘটিত ব্যাপার জড়িত করিয়া দিয়াছেন। দক্ষিণ ফরাসীর এক ডিউক-কন্যার সহিত মুসলিম সৈন্য-সেনাপতি

প্রেমে পতিত হন। তাহারই ফলে দুই বিরুদ্ধ সৈন্যদলের শত্রুতা অনেকটা উপশমিত হয় এবং শান্তির প্রস্তাব স্থাপিত হয়। কিন্তু এই বিধর্মী খৃষ্টান রমনী মরিনাকে বিবাহের ফলেই মুসলিম-সেনাপতি উস্‌মানকে উভয় দেশের মধ্যে শান্তির প্রস্তাব আনয়ন করিতে হইয়াছিল বলিয়া অন্যান্য মুসলিম সৈন্যগণ এই ঘটনাকে ইসলাম-দ্রোহিতা বলিয়া গ্রহণ করে। তাহারা বিশ্বাস-ঘাতকতার সহিত উসমানকে হত্যা করিয়া পুনরায় ফরাসী আক্রমণ করে। কিন্তু চার্লস্‌ মার্টিনের অধীনে ফরাসী সৈন্যের নিকট তাহাদের পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। ফলে অবস্থা প্রায় একই রহিল—মধ্য হইতে উসমান নিহত হইল এবং বিধবা মরিনার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। এখানে আখ্যানবস্তু যেমন হইয়াছে খাপছাড়া, তেমনি চরিত্র-বিশ্লেষণেও শরর বিশেষ কোন নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই।

শররের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে মুকদ্দস্‌-নাজনীন, ফির্দৌসে-বরীন, মীনাবাজার, হুসন কা ডাকু এবং অস্‌রারে-দরবারে-হরামপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মুকদ্দস-নাজনীন্‌-এ একটি সামান্য স্ত্রীলোক কি ভাবে পোপ-পদে উন্নীত হইয়াছিল তাহার কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাস রচিত হইয়াছে। এখানে চরিত্র-চিত্রণ বা আখ্যান-বস্তুর সমাবেশে শরর আমাদের মোটেই মুগ্ধ করিতে পারেন নাই

ফির্দৌসে-বরীনের কাহিনী একটু ভিন্ন প্রকৃতির। ইহা ঐতিহাসিক উপন্যাস হইলেও ইহাতে যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী কিছুই বর্ণিত হয় নাই। ১৬শ শতাব্দীতে উদ্ভাবিত ইস্‌মাঈলী নামক এক মুসলিম সম্প্রাদায়ের দুর্জ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ অথচ তিরস্কারের উপযুক্ত কার্যকলাপ ও প্রচারের কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে প্রধান চরিত্র ইউসুফের চরিত্র বিশ্লেষণে শরর অনেকটা সফলকাম হইয়াছেন বলা যাইতে পারে। অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসে কেমন ভাবে মানুষ ক্রমে ক্রমে অধঃপতনের চরম সীমায় গিয়া পৌছিতে পারে, তাহার একটি জ্বলন্ত চিত্র ইউসুফ-চরিত্র।

মীনাবাজারে শাহজহানের ভারতশাসন কালকে উপন্যাসের পটভূমিকা হিসাবে স্থাপন করা হইয়াছে। সম্রাট আকবর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উদ্দেশ্যে এই মীনাবাজার প্রতিষ্ঠা করেন। এই মীনাবাজারে সুন্দরী যুবতীরা ছিলেন বিক্রেতা আর সম্রাট ও রাজন্যবর্গ ক্রেতা। শররের মীনাবাজারে শাজহান নিজে এক সুন্দরী বিক্রেতার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করেন ও তিন দিন তথায় সেই সুন্দরী রাজরাণীর সহিত বসবাস করেন।

পরে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহার স্বামী কর্তৃক সেই সুন্দরী পরিত্যক্তা হয়। ইহাতে তাহার চরিত্রের উপর সন্দেহ আরোপ করা হয় বলিয়া শাহজহান বিশেষ ক্রুদ্ধ হন এবং সেই সুন্দরী যুবতীর স্বামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তাহার স্ত্রীর অনুরোধে স্বামী এই সর্তে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় যে তাহাকে সম্রাটপত্নী হইতে হইবে। অগত্যা তাহাই হয় এবং স্বামীও সেই সঙ্গে সম্রাটের অনুগৃহীত হইল। শরর ইহাতে শাজহানকে সমর্থন করিতে গিয়া উপন্যাসের স্বাভাবিক চরিত্র-প্রকাশনকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

হুসন কা ডাকূ এবং অস্ রারে-দরবারে-হরামপুরে সমসাময়িক ঐতি-হাসিক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। এই গুলিকে কতকটা সামাজিক উপন্যাসও বলা যাইতে পারে। ইহাদের কাহিনী কতকটা ঐতিহাসিক হইলেও সমসাময়িক নবাবদের চরিত্র-চিত্রণে তিনি ইতিহাসকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত্রে কলঙ্কের প্রলেপ অতি মাত্রায় পর্যবসিত হইয়াছে।

শরর ঐতিহাসিক উপন্যাসকার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তিনি অনেক সামাজিক উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বদ্রুন-নিসা কী নসীবৎ, আকা স্বাদিক্ কী শাদী, দিল্‌কশ, দিলচস্প্, ত্বাহিরহ, ঘঈব্ দান দুলহন, খৌফনাক মুহব্বৎ এবং ইউসুফ অওর্ নজমা উল্লেখযোগ্য। বদ্রুন্-নিসা কী নসীবৎ এবং আকা স্বাদিক কী সাদী এই উভয় উপন্যাসেই পর্দা প্রথার বিষময় পরিণাম বিবৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াই প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও শরর প্রকৃতপক্ষে সামাজিক উপন্যাসেই সাফল্য অর্জন করিয়াছেন।

শররের সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে বদরুন্-নিসা কী নসীবৎ-ই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার আখ্যানবস্তু যেমন মনোরম, তেমনি চরিত্রসকলও বেশ জীবন্ত। কুব্রা বেগম্, স্বফদর হুসেন, অসঘর হুসেন, বদরুন-নিসা ও তাহার পিতা প্রভৃতি সকলেই পৃথিবীর মানুষ এবং তাহাদের চরিত্র-চিত্রণে কোন দীর্ঘ বিশ্লেষণ না থাকিলেও প্রত্যেকটি চরিত্রই বেশ সহজ ও উপাদেয় হইয়াছে। বদরুন-নিসার সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি নিম্নে বিবৃত হইল।

আস্ঘরের মাতার পিত্রালয়ে গমন জনিত অনুপস্থিতিতে, ৯ বৎসর বয়স্ক আসঘরের সহিত তাঁহার দূরসম্পর্কীয় ৬ বৎসরের বোন বদ্রুন্-নিসার বিবাহ হয়। বদ্রুন-নিসা বড় হইলে পরে তাহার শ্বশুর বদ্রুন্-নিসাকে নিজ

বাড়ীতে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে বদ্‌রুন্‌-নিসার পিত্রালয়ে গমন করেন। ঘটনাক্রমে তাহাদের উভয়েই নূতন শ্বশুর বা নববধূকে পূর্বে কখনও দেখে নাই। আর বিবাহের পরেও 'রু-নুমায়ী' (বা মুখদর্শন)-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় নাই বলিয়া তাহার শ্বশুর নববধূকে নূতন করিয়া দেখিবার কোন সুযোগ পায় নাই। এইরূপ অবস্থায় তাহার অপরিচিত কাকা বা নূতন শ্বশুরের সহিত বদ্‌রুন্‌-নিসা তাহার স্বামীগৃহে যাইতেছে। আর এই যাওয়ার মধ্যে শ্বশুরের তরফ হইতে বিশেষ কোন আগ্রহ, আমোদ-আহ্লাদ বা সাজ-গোজের ব্যবস্থা নাই। তাহার একটি বিশেষ কারণ, এই বিবাহ প্রধানতঃ আসঘরের মাতার আগ্রহেই সম্পন্ন হয় – পিতার এই বিবাহে বিশেষ মত ছিল না, যদিও অবশেষে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সম্মতি দিতে হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি তাঁহার পুত্রবধূকে নেওয়ার সময়ে বিধিমতে আনুসঙ্গিক জাঁকজমকপূর্ণ 'বরাত' আনয়ন করেন নাই এবং একান্ত সাধারণভাবেই তাহাকে তাহার পিত্রালয় হইতে স্বামীগৃহে লইয়া যাইতেছেন। তাহার পিতামাতাও বাধ্য হইয়াই একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহিত কন্যাকে এইরূপভাবে স্বামীগৃহে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন।

ঘটনাক্রমে ঐদিনই আর একটি নববধূ তাহার স্বামীগৃহে যাইতেছিল। আর তাহাকে লইয়া যাইতেছিলেন তাহার ভাসুর। এখানেও অনেকটা একই কারণে স্বামীগৃহে আগমনকালে কোন আনুষ্ঠানিক জাঁকজমকের ব্যবস্থা হয় নাই। তাছাড়া এই সঙ্গীটিও নববধূকে পূর্বে আর কখনই দেখে নাই। এই অবস্থায় ভ্রমণপথে নববধূ দুইটির মধ্যে ওলট-পালট হইয়া যায়। তাহাদের স্বামীগৃহে পৌছার প্রায় দুইদিন পরে এই রহস্য উদ্ঘাটিত হয় এবং অনেক চিঠিপত্র ও তার বিনিময়ের মাধ্যমে বধূ দুইটি তাহাদের যথাস্থানে পৌছে। কিন্তু সমস্যা এখানেই শেষ হয় নাই। ঔপন্যাসিক শরর প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে পর্দা প্রথার বিষময় ফলস্বরূপ তাহার অনিচ্ছাকৃত অসম্মানের প্রতিক্রিয়ারূপে আসঘর অন্য বধূটির স্বামী কর্তৃক নিহত হয় এবং তাহাকেও এই অপরাধের জন্য ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হয়। আর বধূ দুইটি তাহাদের নিজেদের কোন অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও অচিরেই বৈধব্যজীবন পালন করিতে বাধ্য হয়।

আকা স্বাদিক্‌ কী শাদী-তেও পর্দা প্রথার কুফলই বর্ণনা করা হইয়াছে, তবে এখানে ঘটনা-বিশ্লেষণ ভিন্ন প্রকৃতির। দিল্‌চস্প, দিল্‌কশ বা ইউসুফ অওর নজমার কোনটিতেই শরর কোন সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই।

যাহিরা বা যাহির-বেগম তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। ইহাতে অনেকটা শররের আত্মচরিত বিবৃত হইয়াছে।

ঘঈব্দান্ দুল্হন্ বেশ হাস্যকৌতুকপূর্ণ এবং ইহার আখ্যানবস্তুও বেশ মনোরম ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। খৌফনাক্ মুহব্বতে পর্দাপ্রথা ও অশিক্ষার কুফল বিবৃত হইয়াছে।

শরর সর্বশুদ্ধ প্রায় ৩৫টি উপন্যাস লিখিয়াছেন। যদিও তাঁহার অনেক উপন্যাসেই তিনি বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তাহা হইলেও পথিকৃৎ হিসাবে শররের নাম উর্দু সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

উর্দু সাহিত্যে শররের অবদানের তুলনা হয় না। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধসমূহ মুজামিনে-শরর্ নামে ৮ খণ্ডে সম্পাদিত হইয়াছে। ইহাতে মুস্লিম্ ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহার যেমন শ্রদ্ধা, তেমনি তাঁহার পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও সাহিত্যের রসবোধ বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে

শরর প্রায় ১৫টি জীবন-চরিত লিখিয়াছেন ইহাদের মধ্যে— আবুবকর্ শিব্লী, জুনয়দে-বগ্দাদী এবং (হজরৎ ইমাম হুসেনের কন্যা) সকীনহ্-র জীবন-চরিত উল্লেখযোগ্য। তিনি কয়েকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থও লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তারীখে-হিন্দ এবং আম্বরে-কদীম্ প্রসিদ্ধ। তাঁহার আইয়ামে-আরব এবং বাবক্ খুর্মী ঐতিহাসিক উপন্যাস হইয়াও ঐতিহাসিক তথ্যই বিশেষভাবে সরবরাহ করিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার এই সকল জীবন-চরিত বা ঐতিহাসিক গ্রন্থ কেবল তথ্যের আলোচনা নয়—প্রকাশভঙ্গির মাধুর্যবশতঃ ইহাদের প্রত্যেকটি 'সাহিত্য' পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে।

মুস্লিম্ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াও শরর পাশ্চাত্য প্রভাবকে কখনই অবহেলা করেন নাই। ইংরেজী সাহিত্যের সকল গুণরাশিকেই উর্দু সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন বলিয়াই, তিনি তাঁহার ভাব ও ভাষায় নবজীবনের সাড়া দিতে পারিয়াছিলেন। যেমন তিনি পর্দা-প্রথার বিরোধী ছিলেন, তেমনি কেবল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও অলঙ্কারযুক্ত আরবী ফারসীর ব্যবহার ত্যাগ করিয়া নবধারানুযায়ী ইংরেজী শব্দের ব্যবহার বা ইংরেজী শব্দাংশের গঠনপ্রণালী অনুযায়ী নূতন শব্দ ও বাক্যাংশের সৃষ্টি করিয়া উর্দু সাহিত্যকে আধুনিকতার পর্যায়ে উন্নীত করিতে কম সাহায্য

করেন নাই। সংক্ষেপে, ইংরেজী সাহিত্যবোধকে তিনিই সর্বপ্রথমে উর্দু সাহিত্যে প্রবর্তিত করেন। মীর্জা মহম্মদ আস্করী ঠিকই লিখিয়াছেন যে, শররনে ইন্‌সব্‌ লোগান্‌সে আলহিদা হোকে ইয় কমাল্‌ দেখায়া কি অঙ্গরেজী ইন্‌শা-পর্দাজী কী খুব্‌ স্মুরৎ বন্দিশূন্‌কো উর্দুমেঁ দাখিল কিয়া। বস্তুতঃ তাঁহার লেখনীর জোরেই উর্দু সাহিত্য যেন প্রাণের পরশ পাইয়া বিশ্ব-সাহিত্যে স্থানলাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে।

সরশার্, শরর ও নজীর আহমদ উর্দু সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল তারকা। তাঁহারা উর্দু উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তোলেন। কিন্তু ইহাদের পরবর্তী যুগের সকলেই প্রায় এই পথিকৃৎ তিনজনের অন্ধ অনুসরণকারী মাত্র। কেবল রশীতুল্‌-খয়রীই অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির। তিনিও নজীর আহমদেরই অনেকটা অনুসরণকারী, তাহা হইলেও তাঁহার উপন্যাসে মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী-শক্তিও যথেষ্ট লক্ষিত হয়।

সর্‌শারের অনুসরণকারীদের মধ্যে অউধ্‌-পঞ্জ-এর সম্পাদক মুন্সী সজ্জাদ্‌ হোসেনের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। তিনি শরশারেরই সমসাময়িক এবং তাঁহার প্রায় সকল উপন্যাসেই যেন অনেকটা ফসানায়ে-আজাদের বিভিন্ন চরিত্রের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। তাঁহার নিম্নলিখিত উপন্যাস উল্লেখ-যোগ্য :—(১) হাজী বঘলোল্‌; (২) ত্বরহদার্‌-লৌণ্ডী; (৩) ফসানয়ে-খুরশীদী; (৪) নবাব জমীলুশ্‌-শান্‌ এবং (৫) ফর্রুখ্‌ মির্জা।

মুন্সী সজ্জাদ্‌ হুসেন ডিপুটি-কলেক্টর মুন্সী মন্‌স্বুর আলীর পুত্র। তাঁহার পিতা সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া হয়দরাবাদে সালিশী বিচারক হিসাবে জীবন যাপন করিতে থাকেন। সেই সময়ে কাকুরী নামক স্থানে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সজ্জাদের জন্ম হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া লক্ষ্ণৌ কেনিঙ্গ কলেজে কিছুকাল পড়াশুনা করার পর চাকরী অন্বেষণে ফয়জাবাদ আসেন এবং তথায় সৈন্যবিভাগে উর্দু শিক্ষক তথা মুন্সী পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু চাকরীর প্রতি বিতৃষ্ণা বশতঃ শীঘ্রই এই চাকরীতে ইস্তফা দিয়া একটি পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লখনোতে আউধ্‌-পঞ্জ্‌ পত্রিকার প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উর্দু সাহিত্যের সকল প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি তথা পণ্ডিত ত্রিভুবন নাথ হিজর্‌, মির্জা মচ্ছুবেগ সিতম জরীফ্‌, নবাব সৈয়দ মহম্মদ খান আজাদ, সৈয়দ আকবর হুসেন আকবর্‌, মুন্সী আহমদ আলী শোক্‌ এবং মুন্সী জোলা পরশাদ বর্ক মহোদয়গণকে তাঁহার পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার সুযোগ

লাভ করেন। সরশার্-ও প্রথম দুই বৎসর এই পত্রিকার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সজ্জাদ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট হন এবং জীবনের শেষকাল অবধি ইহার সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন এবং ইহাই তাঁহার কাল হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্ণৌতে প্রাণত্যাগ করেন। আর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাও তাঁহার মৃত্যুর বৎসর দুই পূর্বে বন্ধ হইয়া যায়।

সজ্জাদ্ হুসেনই উর্দু সাহিত্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেন। কি উপন্যাস, কি ছোটগল্প—এমন কি কাব্যেও অউধ্-পঞ্চের মাধ্যমেই হাস্য-রসের বিকাশ লাভ হয়। এইদিক দিয়া বিচার করিলে অউধ-পঞ্চ এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতার অবদানের জন্য উর্দু সাহিত্য-রসিকগণ চিরদিন তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে। সজ্জাদ হুসেন একজন স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টবাদী ব্যক্তি। অউধ-পঞ্চের ব্যঙ্গ-চিত্রসকল—কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণে—পাঠকদের অশেষ আনন্দের খোরাক পরিবেশন করিয়াছে। সজ্জাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য উর্দু সাহিত্যে কথ্যভাষার আমদানী ও সর্বজন প্রচলিত বাগ্ধারার প্রবর্তন।

নবাব সৈয়দ মহম্মদ আজাদ পূর্ব-বাঙলার অধিবাসী ও ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ গৃহেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আরবী, ফারসী ও ইংরেজীতে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। রেজিষ্ট্রার হিসাবে তাঁহার চাকরী-জীবন সূচিত হইলেও তিনি শেষপর্যন্ত ইন্স্পেক্টার জেনারেল অব্ রেজিষ্ট্রেশান পদে উন্নীত হন এবং Imperial Service Order বা আই. এস্. ও. উপাধি সরকার হইতে প্রাপ্ত হন। তিনি দুইবারই সরকার-প্রতিনিধি-রূপে বেঙ্গল কৌন্সিলের সভ্য হইয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সমসাময়িক 'দূর্-বীন্' নামক একটি ফারসী পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া নবাব সাহেবের সাহিত্য জীবন সূচিত হয়। তারপরে অউধ্-পঞ্চ, অউধ্-অখবার এবং আগ্রা-অখ্বার্ প্রভৃতি পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তিনি উর্দু সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 'নবাবী-দরবার' নামে বেশ হাস্যরসপূর্ণ তাঁহার একটি উর্দু উপন্যাস প্রকাশিত হয়। আধুনিক কালে ইহার কোন প্রতিষ্ঠা না থাকিলেও সেইযুগে ইহার বেশ প্রসিদ্ধিই ছিল। তিনি ইংলণ্ডেও গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে লিখিত তাঁহার 'পত্র সঙ্কলন' বেশ সাহিত্যরসে পূর্ণ। 'নয়ী-লুঘাৎ' নামে তাঁহার আর একটি গ্রন্থেরও উল্লেখ

আছে। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কলিকাতায়ই অতিবাহিত হয় এবং খুব সম্ভবতঃ তথায়ই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

সরশারের অনুকারীদের মধ্যে কারী সরফরাজ হুসেনও এই যুগে কতকটা প্রসিদ্ধিলাভ করেন। নর্তকী (ত্বোআয়িফ্)-মুগ্ধ নবাবদের অধঃপাতিত অবস্থাই তিনি তাঁহার বিভিন্ন উপন্যাসের আখ্যান-বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—তবে যে সমাজের বা লোকদের অবস্থা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যেন ফসানায়ে-আজাদের সমাজ-বিবৃতিই হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসসমূহের মধ্যে—(১) সজায়ে-আয়েশ্, (২) অঞ্জামে-আয়েশ্, (৩) সুআদৎ, (৪) সুঈদ্ এবং (৫) শহীদে-রঅনা—উল্লেখযোগ্য। এবং ইহাদের প্রত্যেকটিতে একই বিষয়বস্তু বিভিন্ন উপায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চরিত্র বিশ্লেষণ বা সমাজচিত্রে তিনি তাঁহার পথিকৃৎদের অন্ধ অনুসরণকারী হইলেও তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীতে বেশ একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে। তাছাড়া উপন্যাসের ভাষাও বেশ সহজ, সরল ও বেগবতী।

এই যুগের অধিকাংশ উপন্যাসই অন্যান্য ভাষা হইতে সংগৃহীত গ্রন্থাদির সংকলন বা অনুবাদ মাত্র। তাহাও আবার কোন বিখ্যাত বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ নহে—অনেক সময়ে সংবেদনা বা উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনীকেই অনূদিত-গ্রন্থের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ অনেক উর্দু মৌলিক উপন্যাস হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে:—(১) জোরে-ফলক্ (East Lynne হইতে মীর্জা মহম্মদ কর্তৃক অনূদিত); (২) ব্রিজ্ কুমারী-কৃত জরয়ে-আজীম্ (Mighty Atom-এর অনুবাদ) এবং (৩) খুজস্তা আখতর্ সুহরওআর্দী-কৃত আয়নায়ে-ইব্রৎ (Mrs. Halliburton's Trouble-এর অনুবাদ)।

প্রকাশভঙ্গী বা ষ্টাইলের বিশেষত্বরূপে কয়েকটি অনূদিত উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা, তুর্কী ভাষা হইতে গৃহীত সজ্জাদ্ হয়দর-কৃত (১) জোহরা এবং (২) সালিস্ বিল্ খঈর্। ফারসী ভাষা হইতে সংকলিত সৈয়দ মম্তাজ্ আলী-কৃত (৩) শেখ্ হসন্। জফর্ উমর্ Edger Wallace-এর কয়েকটি ডিটেকটিভ কাহিনীই অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাদের হইতে তাঁহার (৪) নীলী ছত্রী, (৫) বহরাম্ কী গিরিফ্তারী এবং (৬) লাল্ কঠোর্ বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। জফর উমরের এই গ্রন্থগুলিকে অনেক সময় মৌলিক উপন্যাস বলিয়াই মনে হয়। তবে এই যুগের অধিকাংশ অনুবাদগ্রন্থই সমসাময়িক মৌলিক উপন্যাসসমূহের ন্যায় সাহিত্যের কোন

সত্যিকার রূপ প্রকাশ করিতে পারে নাই। এই যুগে আব্দুল্ মজীদ্ সালিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি উপন্যাসের অনুবাদ করিয়াছেন।

এই যুগে যে সকল ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেক রচয়িতাকেই শররের অনুকারী বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য:—(১) ইনকিলাবে-সৈমর্না; (২) দুখ্তরে-সৈমর্না; (৩) ফতহে-সৈমর্না; (৪) হূরে-মঘ্রীব্; (৫) হূরে-মশরিক্; (৬) নাজনীনে-মরাকশ এবং (৭) মর্দে-ময়দান্।

আধুনিক যুগে মহম্মদ আলী ত্বীরের কোন প্রতিপত্তি না থাকিলেও তাঁহার যুগে তিনি অনেকটা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি উপন্যাসই লিখিয়াছেন। এই সকল উপন্যাসে—কি ঐতিহাসিক, কি সামাজিক—তিনি শররকেই বিশেষ করিয়া অনুসরণ করিয়াছেন। বর্ণনা বেশ সহজ, সরল এবং জোরালো হইলেও তাঁহার উপন্যাস উপদেশপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক হওয়ায় ইহা কখনই প্রাণস্পর্শী, খাঁটি উপন্যাস হইতে পারে নাই। তাঁহার নিম্নলিখিত উপন্যাসসমূহ উল্লেখযোগ্য:—(১) গৌরা; (২) জাফর্-আব্বাস্; (৩) হুসনে-সরওঅর্; (৪) আখ্তর ও হসীন; (৫) নীল কা সাঁপ।

মহম্মদ আলী ত্বীবের উপন্যাসসমূহের মধ্যে গৌরাই বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট। যদিও পর্দাপ্রথার সমর্থনে এবং বিধবা বিবাহের বিষময় ফল প্রতিপন্ন করিতেই ইহা রচিত হইয়াছে, তথাপি উপন্যাসকার বোধ হয় তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। বিধবা গৌরা তাহার নয় বৎসর বয়সে স্বামীহারা হয় এবং তখন হইতেই নিয়মিত সংযম সহকারে বৈধব্য জীবন পালন করিতে থাকে। ভরা-যৌবনে তাহার প্রস্ফুটিত সৌন্দর্যের আকর্ষণে তাহার প্রতিবেশী চন্দ্রসেন বিশেষ প্রলোভিত হয়। কিন্তু গৌরা মনে মনে তাহাকে কখনই সমর্থন করিতে পারে নাই। সে আকর্ষিত হয় অন্য একটি স্থানীয় মুসলমান যুবকের প্রতি—বস্তুতঃ নিস্বার্ হুসেনও তাহার সৌন্দর্য-প্রেমে মুগ্ধ। গৌরা-মুগ্ধ উভয় যুবকই গৌরাদের চাকরাণীর মাধ্যমে তাহার নিকট তাহাদের বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করে। গৌরা চন্দ্রসেনকে সহজেই নিরাশ করিয়া দেয়—কিন্তু নিস্বার হুসেনকে কোন উত্তর দিতেই সমর্থ হইল না। তথাপি নিস্বারের পীড়াপীড়ির নিকট শীঘ্রই তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। চন্দর সেন সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের গোপন প্রেমের কথা গৌরার শ্বশুরের নিকট পৌছাইয়া দেয় এবং তাহার ফলে গৌরা ধিকৃত হইয়া তাহার পিতৃ-

গৃহে প্রেরিত হয়। নিস্বার ফেরিওয়ালারূপে সেই গ্রামে গিয়া উপস্থিত হয় এবং গোপনে গৌরার সহিত সাক্ষাৎ করে। গৌরার পিতা সন্দেহ করিয়া একটু অনুসন্ধানেই জানিতে পারে যে সে-ই নিস্বার। গৌরা এই অপরাধের জন্য আরো ধিক্কৃত ও অপমানিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গৌরা হয়তঃ ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইয়া যাইতে পারে, এই ভয়ে তাহার পিতা তাহাকে আবার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পাত্র সহজেই মিলিয়া গেল, কিন্তু নিস্বার-মন গৌরা চন্দ্রসেন (বা চন্দর সেন)-কে স্বামী রূপে গ্রহণ করিতে একেবারেই স্বীকৃত হইল না এবং সুযোগ বুঝিয়া নিস্বারের সহিত পলায়ন করে। নিস্বারের পিতা গৌরাকে দেখিয়া খুবই মর্মাহত হয়, কিন্তু তাহার মাতার সনির্বন্ধ অনুরোধে গৌরা তাহাদের বাড়ীতে থাকিবার অনুমতি পায়। অগত্যা গৌরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া নিস্বারকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই দিকে চন্দরসেন কোনক্রমে তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্বেই গৌরার সহিত মিলিত হইবার সুযোগ করিয়া উঠে। বস্তুতঃ শেষ পর্যন্ত গৌরা চন্দ্রসেনের সহিত তাহার ইচ্ছানুসারেই মিলিত হইয়াছিল কিনা সঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। উপন্যাসকার উপদেশের বন্যায় প্লাবিত করিয়া উপন্যাসটিকে অনেকটা ঘোরালো করিয়া ফেলিয়াছেন।

নজীর আহমদের অনুসরণকারীদের মধ্যে রাশীদুল্-খয়রীকে বাদ দিলে সর্বপ্রথম তাঁহার পুত্র বশীরুদ্দীন্ আহমদকেই উল্লেখ করিতে হয়। বশীরুদ্দীন নিজেও তাঁহার ইক্‌বাল্ দুল্‌হনের ভূমিকায় তাঁহার পিতার উপন্যাসসমূহের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার অনেকগুলি সমাজ-সংস্কার বিষয়ক ও নিম্নলিখিত তিনটি পারিবারিক উপন্যাসের উল্লেখ আছে—যথা, ইক্‌বাল্ দুলহন্, হুস্‌নে-ম্‌আশিরৎ এবং ইসলাহে-মৃঈশৎ। এই তিনটি উপন্যাসেই বশীরুদ্দীন বেশ সফলতা লাভ করিয়াছেন এবং ইহাদের প্রত্যেকটিই মিরাতুল্ আরূসের অনুকরণে লিখিত।

দিহলবী নাস্বির নজীর ফিরাক্‌-ই বোধ হয় নজীর আহমদের ষ্টাইল বা বাক্যরীতি অনুকরণকারীদের অন্যতম। তবে ফিরাক বিশেষ করিয়া একজন্ প্রবন্ধকার হিসাবেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার দুইটিমাত্র ক্ষুদ্র উপন্যাস বা বৃহদাকার ছোটগল্পের উল্লেখ আছে—(১) বেগমোঁ কী ছেড়্ ছাড়্ এবং (২) সাত তলাকনোঁ কী কহানী।

ভূপাল অধিবাসী মহম্মদ সঈদ্‌ও যেন কতকটা সংস্কারানুযারী নজীর

আহমদকেই অনুসরণ করিয়াছেন। যদিও তাঁহার প্রসিদ্ধ রঞ্জ ও রাহৎ-এর আখ্যানবস্তু বা বাক্যরীতির সহিত নজীর আহমদের উপন্যাসের কোন সামঞ্জস্য নাই, তথাপি ইহার জমীলা, হমীদা এবং জোহরার পাঠ-দৃশ্য মিরাতুল্-আরূসের 'মক্তব্'-দৃশ্য বা বনাতুন-নাশ্‌কেই স্মরণ করাইয়া দেয়। উপন্যাসকার হিসাবে সাগ্নিদকে নজীরের সহিত কোনক্রমেই তুলনা করিতে না পারিলেও রঞ্জ ও রাহৎ স্কুলপাঠ্য ছেলেমেয়েদের উপাদেয় পুস্তক হিসাবে চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে।

প্রথম যুগের প্রায় সকল মহিলা-ঔপন্যাসিকই অনেকটা নজীর আহমদকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মহম্মদী বেগ অন্যতম। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ শরীফ-বেটী নজীর আহমদের অনুকরণে লিখিত হইলেও পরবর্তী জীবনে তিনিও রাশীদুল্-খয়রীর ন্যায় নিজের বিশেষত্ব ও উদ্ভাবনা শক্তির কতকটা প্রমাণ দেখাইতে পারিয়াছেন। নজীর আহমদের অনুকারিণীদের মধ্যে উমলিদায়ে-মহম্মদ সুলেমানও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নাম ইস্‌লাহ্-উন্-নিসা।

মীর্জা এবং রুস্বা কবি-নামধারী মীর্জা মহম্মদ হাদী আঘা মহম্মদ তকীর পুত্র। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ঈরানের সীমান্তবর্তী মাজন্দরান হইতে দিল্লীতে আসেন এবং তথা হইতে পরে অযোধ্যায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে হাদী রুস্বা লক্ষ্ণৌ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হয় এবং তিনি তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় মামার তত্ত্বাবধানে লালিতপালিত হন। কিন্তু এই মামাও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন না।

অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহ উত্তরাধিকারসূত্রে রুস্বা তাঁহার পিতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। তাছাড়া আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষাও তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি নিজে নিজে পড়াশুনা করিয়া প্রাইভেট এণ্ট্রান্স পাশ করেন এবং রুড়কী কলেজ হইতে ওভারসিয়ারী পাশ করিয়া রেলওয়ে কর্মচারিরূপে কোয়েটা ও বেলুচিস্তানে চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লেখাপড়ার প্রতি একটা জন্মগত আকর্ষণ ছিল। এই সময়ে ঘটনাক্রমে একদিন রসায়নশাস্ত্র-বিষয়ক একটি আরবী গ্রন্থ তাঁহার হাতে আসে, এবং ইহা পাঠে তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে চাকরী পরিত্যাগ করিয়া তখনই তিনি লখনো ফিরিয়া আসেন এবং তথায় এক স্কুলে ফারসী শিক্ষক-পদে

নিযুক্ত হইলেন। সর্বপ্রথমে তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুন্শী আলিম্ উপাধি লাভ করেন। তৎপরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করিয়া আমেরিকার ওরিয়েণ্টাল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ সম্মানজনক পি. এইচ্. ডি. উপাধিলাভ করেন। শিক্ষার প্রতি তাঁহার অসীম আকর্ষণ এবং অদম্য উৎসাহের কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কথিত আছে, এই উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ভার সম্পাদনের জন্য তিনি গৃহশিক্ষক হিসাবেও কাজ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার অনেক রচনায়ও তাঁহার জীবনের এই প্রতিফলিত রূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

রুস্ওয়ার যেমন ছিল বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, তেমনি তাঁহার সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি ছিল পরম শ্রদ্ধা। তাই দেশীয় সাহিত্য ও চিন্তাধারায়ই তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল ভাব ও ভাষায়ই তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ হিসাবে আরবী, হিব্রূ, গ্রীক, ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফারসী প্রভৃতি ভাষায়ও বিশেষ পারদর্শী হইলেন। আর বিশেষ করিয়া ঔপন্যাসিক হিসাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তাঁহার প্রতিভা ছিল সাহিত্যাকাশের সর্বদিগন্ত ব্যাপিয়া। তিনি একাধাধে ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার, সাহিত্যসমালোচক ও খাঁটি সাহিত্য সমঝদার ব্যক্তি। শেষ জীবনে আবার কিছুকাল তিনি উস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুল্-তরজমা বা অনুবাদ-বিভাগে কাজ করিয়াছেন—তাহা হইলেও রুস্ওয়া সাহিত্য-সাধনায়ই বিশেষভাবে লিপ্ত থাকিতেন। এবং উপন্যাস গ্রন্থাদি ছাড়া তাঁহার নিম্নলিখিত সাহিত্য উল্লেখযোগ্য :—অফ্লাতূন্ কী হকূমতে-জমহূরিয়া (বা প্লেটোর রিপাব্লিক বা গণতন্ত্র নীতি), কিতাবুল্-অখ্লাকে-ইরস্তু (বা এরিষ্টটলের নীতিশাস্ত্র), ইব্তালে-অউহাম্ (বা ব্যর্থ কল্পনাবিলাস), তিলিস্মাৎ (বা যাদুবিদ্যা), অফ্শায়ে-রাজ্ (বা রহস্য-ভেদ), মরকয়ে-লয়লামজনূ (গীতিনাট্য), মস্নবীয়ে-লজ্জতে-ফনা, মসনবীয়ে-বহারে-হিন্দ্, মস্নবীয়ে-উম্মীদ্ ও বীম্ এবং কুল্লিয়াতে-উর্দু।

রুস্ওয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

রুস্ওয়া নব্য ঔপন্যাসিকদের পুরোধা। উপন্যাস বিকাশের সূচনায় যে সকল সাহিত্যিক তথা নজীর আহমদ্, শরর্ এবং কতকটা পরবর্তী যুগের রাশীদুল্-খয়রী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হইতে কতকটা ভিন্ন রূপ দান করিয়া রুস্ওয়া আধুনিক উপন্যাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকেই সমুজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখন আর উপন্যাসের নায়ক একজন গতানুগতিক সর্বগুণে গুণান্বিত সুপুরুষ নহেন। তিনি সমাজেরই একজন মানুষ—তাছাড়া অনেক

সময় আপাতদৃষ্টিতে সমাজচক্ষে অবহেলিত হইলেও ঔপন্যাসিকের দরদ-ভরা লেখনীর গুণে তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া সে পাঠক-চিত্তে মহান হইয়া উঠিয়াছে। রুস্বয়ার বিখ্যাত উম্‌রাও জান্ আদা-ই বোধ হয় আধুনিক যুগের সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস।

উমরাও জান্ আদা-র বাগ্‌ধারা কতকটা নজীর আহমদের অনুকরণে হইলেও ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যই ইহাকে সর্ববিষয়ে আধুনিক করিয়া তুলিয়াছে। প্রথমতঃ, ইহার লেখার ভঙ্গীই ভিন্ন প্রকৃতির। ইহার বেশীর ভাগই যেন আত্ম-পরিচয়, তাহা হইলেও ইহাতে নিজ জীবন আলোচিত না হইয়া কথোপকথনের মাধ্যমে নানা চরিত্রের বিকাশ হইয়াছে। সূচনায় লেখক তাঁহার নিজের কথাই যেন বলিয়া যাইতেছেন এবং অনেক দিন পরে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার লখনো যাওয়ার সুযোগ হয়। তথায় লখনো নবাবী যুগের একজন প্রসিদ্ধ ত্বোয়ায়িফ্ বা নর্তকী উপন্যাসের প্রধান নায়িকা উম্‌রাও জান্ আদার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। প্রাচীন ধারানুযায়ী এক মুশায়িরা বা সংস্কৃতিসভায় লেখক তাঁহার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিলেন। উম্‌রাও জান্ আদাও সেই সভায় কয়েকটি 'ঘজল' আবৃত্তি ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গতজীবনের সহিত বিজড়িত তথ্যাদির সমাবেশে কিছু হাস্যরসের অবতারণা করিবার প্রয়াস পান। ইহাতে মুগ্ধ হইয়া লেখক তাঁহাকে তাঁহার আত্মচরিত লিখিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু উমরাও জান্ কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বে রুস্বয়াকেই তাঁহার বর্ণিত কাহিনীর সম্পাদনা করিবার ভার অর্পণ করেন। এইরূপে উমরাও জান্ আদার রচিত কাহিনী উপন্যাসাকারে রচিত হয়। ইহার সহিত বাঙ্‌লার প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত'-র সাদৃশ্য অনেকটা পরিলক্ষিত হয়।

উম্‌রাও জানের চরিত্র-বিশ্লেষণে রুস্বয়া যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শিল্পীমনেরই মাধুর্য অনুভব করিতে পারি। চরিত্র বিশ্লেষণের কোন অবকাশ লেখকের নাই, কিন্তু উমরাও জানের জীবনকাহিনীর স্বাভাবিক বর্ণনার মধ্য দিয়া একটি নর্তকীর যে 'মানুষ'-পরিচয়টি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে পাঠক মাত্রেই একটি হেয়, সমাজ-অবহেলিত নর্তকীর প্রতিও সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠে। তাই বলিয়া উমরাও জান্ কোন শ্রেষ্ঠ চরিত্র নয়, সকল দোষে-গুণে মানুষ। এইরূপ স্বাভাবিক চরিত্রের মাধ্যমেই তিনি অনেক সময় নীতিবাগীশ চরিত্রকার নহেন বলিয়া নিন্দিত হইলেও— যে স্বাভাবিক মন-বীক্ষণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। এই

গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খানম্, বুয়া হুসেইনী এবং মৌলবী সাহেব। খানম্ নর্তকীদের তত্ত্বাবধায়িকা হইয়া সমাজজীবনে একটি হীন পেশা অবলম্বন করিলেও অনেক সাধারণ গৃহস্থ মহিলা হইতে ভাল। আবার বুআ হুসেইনী এবং মৌলবী সাহেব তাহাদের অসৎ চরিত্রের মধ্য দিয়াও যে নীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে রুস্বয়ার সকল চরিত্রই সহজ, স্বাভাবিক, পার্থিব মানুষেই রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

রুস্বয়ার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে জাতে-শরীফ্, শরীফ্-জাদা, অখ্তরী বেগম, খূনীভেদ্, খূনী আশিক্ এবং রুস্ কা শাহ্জাদা-র নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের কোনটিই উমরাও জান্ আদার মত প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। জাতে-শরীফের বর্ণনাভঙ্গি অনেকটা উমরাও জানের মত হইলেও ইহার চরিত্র-চিত্রণ মোটেই সাফল্যলাভ করে নাই। ইহার কয়েকটি চিত্র বর্ণনা, যথা প্রেতসিদ্ধির অবতারণা বা লখনোর সমাজ-চিত্র, মোটেই পাঠক-চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান চরিত্র ছোটে-নবাব নিজ-সম্ভ্রান্ত অবস্থা হইতে তাহার নির্বুদ্ধিতার জন্য যেমন শেষ পর্যন্ত একজন নর্তকীর কেনা-গুলামে পরিণত হইয়াছে, তেমনি শরীফ্-জাদায় একজন সাধারণ গরীব যুবক তাহার উদ্যম ও প্রতিভাদ্বারা নিজজীবনে কেমন ভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র। শরীফ-জাদা পাঠ করিলে মনে হয় রুস্বয়া যেন তাঁহার নিজ জীবনই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে বৈশিষ্ট্যের কোন ছাপ লক্ষিত হয় না।

রুস্বয়া আধুনিক উপন্যাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে জাতে-শরীফের শেষাংশে নিজেই লিখিয়াছেন, হমারে নাবীল্ ন ট্রেজিডী হৈঁ ন কমিডী। ন হমারে হীরো তলোয়ার সে কতল হোতে হৈঁ অওর্ ন উন্ মেঁ সে কিসী নে খুদ্‌কশী কী হৈ। ন হিজর্ হোয়া হৈ ন ওঅসল্। হমারে নাবিলুন্ কো মৌজুদহ জবানা কী তারীখী সমঝ্না চাহিয়ে।

অর্থাৎ, আমাদের নবেল বা উপন্যাস ট্রাজেডিও নয়, কমেডিও নয়। আর আমাদের হিরো বা নায়ক কাহারো জীবন নাশ করে না, বা কাহারো কর্তৃক নিহতও হয় না। এখানে বিরহ বা মিলনের কোন কথা নাই। আমাদের আধুনিক উপন্যাসকে বস্তুতঃ সমাজ-জীবনের ইতিহাস বলিয়া মনে করিতে হইবে।

রুস্বআ-উপন্যাসে যেমন লখনো সমাজ-জীবন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি লখনোর শুদ্ধ কথ্য ভাষা তাঁহার সাহিত্যে এবং কথোপকথনে

লখনোয়ী বোল-চালই স্থানলাভ করিয়াছে। তাঁহার ভাষায় যেমন মাধুর্য ও লালিত্য রহিয়াছে, তেমনি তাঁহার প্রকাশের স্বাভাবিকতা ও অনুভূতির প্রাখর্য পাঠককে বস্তুতঃই মুগ্ধ করে। তাছাড়া তাঁহার কাহিনীতে একদিকে যেমন রাজারাজড়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিত্রিত হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে হেয় ও সমাজ-অবহেলিত আপামর গরীব জনসাধারণেরও সামাজিক অবস্থা ও চারিত্রিক গুণগরিমা কীর্তিত হইয়াছে। এক কথায় বলা যায় যে সমাজের প্রত্যেকটি প্রতিবিম্ব যেন তাঁহার উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

রাশিদুল-খয়রী অনেকটা আধুনিক হইয়াও প্রাচীনপন্থী—কি ভাব, কি বিন্যাসে। তাঁহাকে নজীর আহমদের অনুকারী মনে করা হয়। অনুকারী ঠিকই, তাহা হইলেও তাঁহার মধ্যে এমন কতকগুলি স্বকীয়তা আছে –যাহার জন্য তাঁহার নাম উর্দু সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। তিনিই বোধ হয় উর্দু সাহিত্যে সর্বাধিক উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাছাড়া তাঁহার নানা সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ এবং অন্যান্য নিবন্ধের সংগ্রহ-গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে।

রাশিদুল্-খয়রী একজন খাঁটি সমাজ-সংস্কারক। তিনি তাঁহার ছোটগল্পে বা উপন্যাসসমূহে সামাজিক সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই লেখনী চালিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার দরদ-ভরা অনুভূতিপূর্ণ যুদ্ধাভিনয়ের দরুন পাঠক-চিত্তকে সহজেই তাঁহার পক্ষে আনিতে সক্ষম হইয়াছেন—এইরূপে সমাজ-সংস্কারে অনেকটা সাফল্য লাভও করিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। তিনিও নজীর আহমদের ন্যায় সমাজচিত্তকে তাঁহার লেখনীর মাধ্যমে অনেক উপদেশই দিয়াছেন। এই বিষয়ে নজীর আহমদ হইতে আরো নীতিবাগীশ হইয়াও তাঁহার অধিক সাফল্য লাভ করার অন্যতম কারণ, তিনি এই সকল কুসংস্কারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অত্যধিক করুণ ও দুঃখময় চিত্রের রেখাপাত করিয়াছেন। এইজন্য অনেক সময়ে তিনি 'মুসব্বিরে-ঘম্' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

নজীর আহমদের সহিত খয়রীর আরো অনেক বিষয়েই সামঞ্জস্য আছে। তাঁহারা উভয়েই মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন এবং স্ত্রী-চরিত্রের উপকর্ষেই বেশী সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। তাছাড়া তাঁহারা উভয়েই একই দিহলবী উর্দুর অবতারণা করিয়াছেন। তাহা হইলেও রাশিদুল্-খয়রীর ভাষা যেমন জোরালো ও দরদপূর্ণ, নজীর আহমদের সেইরূপ নহে।

আবার, নজীর আহমদ যতটা হাস্যরসের জোগান দিতে পারিয়াছেন, ততটা রাশিদুল্-খয়রী পারেন নাই।

মুসলিম সমাজে যে সকল কুসংস্কারের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটি নিয়াই রাশিদুল-খয়রী উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নৌহয়ে-জিন্দগীতে যেমন বিধবা বিবাহের আনুকুল্যে বলা হইয়াছে, তেমনি বিমাতার কর্তৃত্বাধীনে বাল্যবিবাহের কুফল বর্ণিত হইয়াছে তাহার ফসানয়ে-সাঈদে। বহুবিবাহের ফলে স্ত্রীলোকদের যে কত দুঃখকষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করিতে হয় তাহার সার্থক প্রকাশ পাই 'সৌকন্ কা জলাপা'-তে। সন্জোগ, সাত রূহোন্কে আমল্নামা এবং গৌহরে-মক্স্সুদে-ও এই কুপ্রথারই বিষময় পরিণাম চিত্রিত হইয়াছে। অর্থলোভে যে বিবাহ তাহার অনর্থও বিন্যস্ত হইয়াছে 'সন্জোগ' উপন্যাসে। অত্যধিক নীতি ও আচারের গোঁড়ামীর পরিণাম বর্ণনা করিয়াছে তুফানে-হয়াৎ। আবার, আধুনিক পার্থিব ভোগ-সম্ভোগ প্রীতি ও ধর্মসংস্কারের বিরুদ্ধাচার যে সমাজকে কত দুর্নীতিগ্রস্ত ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে, তাহা সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে তাঁহার কয়েকটি উপন্যাসেই—সরাবে-মক্রিব, বিস্তুল্-উঅক্ৎ, সৎবন্তী এবং জোহরে-ক্দামৎ-এ। মুসলিম সমাজে সম্পত্তির যে সমানাধিকার পুত্রকন্যাকে দেওয়া হয়, তাহার ন্যায্য অংশ বিবাহিত কন্যাকে না দেওয়ার অন্যায় কাহিনী পাই তাঁহার 'মৌদহ' উপন্যাসে। বিবাহ-বিচ্ছেদ বা খুলা-র দাবী যে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও থাকা উচিত, তাহার সমর্থনে তিনি লিখিয়াছেন তক্সীরে ইস্মৎ। পুত্রকন্যাদের অত্যধিক আদর দিলে কি বিষময় ফল দাঁড়ায় তাহার ব্যাখ্যান রহিয়াছে মনাজিলুস্-সায়েরহ্-তে। তেমনি আবার সৎ মহিলারা কেমন করিয়া তাঁহাদের চরিত্রমাধুর্য দ্বারা তাঁহাদের পরিবার তথা মানব-ব্যষ্টি ও সমাজকে আদর্শের পথে উন্নীত করিতে পারে তাহার বর্ণনাও ইহাতে আছে। তাঁহার স্বুবহে-জিন্দগী, শামে-জিন্দগী এবং শবে-জিন্দগী-তেও সমাজচিত্রের আদর্শই বর্ণিত হইয়াছে—তবে এই তিনটি গ্রন্থই নজীর আহমদের উপন্যাসের হুবহু অনুকরণ মাত্র।

এই অনুকারী শেষ তিনটি গ্রন্থ ছাড়া রাশিদুল্-খয়রীর প্রত্যেকটি উপন্যাসই ইহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁহার কোন চরিত্রই খুব হেয় বা ঘৃণিত ব্যক্তি নহে। তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই স্নেহ বা দয়ামায়া প্রভৃতি মানবোচিত সকল গুণই রহিয়াছে, কিন্তু চারিত্রিক বলিষ্ঠতার অভাবে সমাজ কুসংস্কারের উর্ধ্বে তাহারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই বলিয়াই

কাহিনী শেষ পর্যন্ত ট্রেজেডিতে রূপান্তর লাভ করিয়াছে। 'মৌদ'-য় মুহসিনের পিতা মৌদূদ, নৌহয়ে-জিন্দগী-তে স্বফিয়ার পিতা বা রূহোন্কে আমল্নামায় আহমদের চরিত্র ইহার সার্থক দৃষ্টান্ত। সমাজ-সংস্কারের কুঠারাঘাতে তাঁহার উপন্যাসে স্ত্রী-চরিত্রই সাধারণতঃ বলিপ্রদত্ত হইয়াছে। যেমন, সন্জোগে কুদ্সিয়া, সাত রূহোন্কে আমল্নামায় কয়সরা বা গৌহরে-মকস্থদে স্বালেহ-র চরিত্র। তাহারা যেন নূতন জুতার আবির্ভাবে পুরানো জুতার ন্যায় অবহেলিত হইয়া দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচারেই জর্জরিত হইয়াছে।

চরিত্র-চিত্রণে রাশিদুল-খয়রী পাশাপাশি দুই বোনের বিরুদ্ধ শিক্ষা ও চরিত্রের সমাবেশ দ্বারা অনেকটা নজীর আহমদের ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন। জৌহরে-কদামতে ইহা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। জহীদা তাহার মাতার নিকট হইতে ইসলামীয় চিন্তাধারানুযায়ী প্রাচীন পন্থায় শিক্ষালাভ করিয়াছে; আর তাহার বোন শাহিদা তাহার পিতা কর্তৃক আধুনিক ফ্যাসানে শিক্ষিত। তাই সকল মানবোচিত গুণের অধিকারী হইয়াও আধুনিক শিক্ষার চাকচিক্য, বাহ্যাড়ম্বর ও চটপটে ভাবের অভাবহেতু গরীবের ঘরে জহীদার বিবাহ হয়। তাহা হইলেও চারিত্রিক সাহস, ধৈর্য ও মাধুর্যদ্বারা সে শেষ পর্যন্ত তাহার পরিবারটিকে সুষমামণ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আর শাহিদা আধুনিক চাকচিক্যময় সর্বগুণের আধার হইয়াও তাহার প্রকৃত মানবোচিত খাঁটি গুণের অভাবে অপেক্ষাকৃত ধনী গৃহে পতিত হইয়াও বৎসর দুই তাহার বেশ সুখে কাটিলেও —তাহার স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণুতা ও দরদীমনের অভাবের ফলে সে কাহাকেও শেষ পর্যন্ত সুখ ও শান্তি দিতে পারে নাই এবং অচিরেই তাহার জীবন যেমন দুঃসহ হইয়া উঠে, তেমনি অন্যান্য সকলের জীবনও সে দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে। সুখের সময়ে সকলেই বেশ ভালই ছিল, কিন্তু যখনই তাহার পরিবারে অভাবের আভাস অনুভূত হয়, শাহিদার চরিত্রে তাহার সকল অপূর্ণতা দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং সে ক্রমে তাহার স্বামী হসনকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তারপরে সে তাহার খাঁটি জিনিষটিকে হারাইয়া কত মরীচিকার পেছনেই ছুটিয়াছে, কিন্তু কোথাও কোন সফলতা দূরে থাকুক, তাহার জীবনকে সে যেমন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি অন্যেরাও তাহার বিষোদ্গীরণ হইতে অব্যাহতি পায় নাই। বেগম ইক্রামুল্লা সত্যই বলিয়াছেন, শাহিদাই বোধ হয় রাশিদুল-খয়রীর সবচেয়ে স্বাভাবিক ও সার্থক চরিত্র-সৃষ্টি।

আধুনিক সভ্যতার আর একটি বৈশিষ্ট্য অন্তঃসারশূন্য সমাজসেবার বাগাড়ম্বর। এইরূপ চিত্র-বিশ্লেষণের সমাহার খয়রীর কয়েকটি চরিত্রেই দৃষ্ট হয়। সরাবে-মকরিবের ইক্‌রামী বেগম এবং বিন্তুল্‌-উঅকতের ফরখুন্দা এইরূপ চিত্রেরই স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। ইক্‌রামী বেগম মুখে সকল সময়ই বলেন, দুঃস্থ গরীবদের সাহায্য করিতে তিনি সদা প্রস্তুত। কিন্তু তখনই হয়তঃ একটি অসহায়, পঙ্গু হতভাগ্য তাঁহার দ্বারে সাহায্যপ্রার্থী। সে ইক্‌রামী বেগমের নিকট হইতে আধুনিকাদের ন্যায় একই উত্তর শুনিতে পাইবে, ভিখারী মাত্রেই সমাজের ভারস্বরূপ—তাদের খেটে খাওয়া উচিত। ফর্খুন্দা অশিক্ষিতাদের দোষত্রুটি মোচনার্থে সদা ব্যস্ত। তাই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার স্বামীকে ভীষণ জরে আক্রান্ত দেখিয়াও তিনি সভায় বক্তৃতা দিবার উদেশ্যে যাইতেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই জানেন না যে অন্যের দোষত্রুটি মোচনের পূর্বে তাঁহার নিজের কর্তব্যজ্ঞানের প্রতি আরো বিশেষ সমীহ হওয়া উচিত।

নানা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও রাশিদুল-খয়রী তাঁহার সামাজিক উপন্যাসেই বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতির মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাস্যকৌতুকের চিত্র উদ্ভাবনে তিনি মোটেই কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ধর্ম-প্রবণতার প্রতি অতি আকর্ষণ হেতু তাঁহার অনেক চরিত্রসৃষ্টি সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই। তাছাড়া তাঁহার আর একটি ত্রুটি লক্ষণীয় যে তাঁহার চরিত্র সমাবেশের মধ্য হইতে তাঁহার চিন্তাধারার ঐক্যবোধটি ব্যাহত বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু বেগম ইক্রামুল্লার মতে আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কোন অনৈক্য নাই।

তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসে রাশিদুল্‌-খয়রী মোটেই সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। ইহাতে কোন চরিত্রই সজীব নহে। বিশেষ করিয়া সমসাময়িক সমাজ-চিত্র বা রীতিনীতির কোন বৈশিষ্ট্যই তাঁহার নিবিড়ভাবে জানা না থাকায়, গ্রন্থাদির নামধাম বা ঘটনাদির বিবরণ হইতেই কেবল মনে হয় যে এই সকল ঐাতহাসিক উপন্যাস। উপন্যাস হইয়াও ঐতিহাসিক কাহিনী হইতে এই সকল বিশেষ কোন উপাদেয় হয় নাই। মাহে-আজমে মুসলিম অভ্যুত্থানের প্রথম শতাব্দীতে পারস্যদেশে ঘটিত বেশ উপাদেয় ও চমকপ্রদ চরিত্র-চিত্রেরই সমাবেশ করা হইয়াছে। খলিফা উমর, বাদশা মামুন, মালিকা জুবাইদা, বা য়জ্দগিরদের কন্যা শহরবানুর জীবন-কাহিনী-

সমূহ বেশ চিত্তচাঞ্চল্যকর এবং চমকপ্রদ ঠিকই, কিন্তু কেবল কল্পনাপ্রসূত লেখনীতে চরিত্র-চিত্রণে আমরা সেই স্বাভাবিক চিত্তচাঞ্চল্যকর প্রাণের সাড়া পাই না।

আরুসে-করবলাকে রাশিদুল্‌-খয়রীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইহাও মাহে-আজম্‌ হইতে কোন উন্নত স্তরের বলিয়া মনে হয় না। মুয়াবিয়া ও হজরৎ আলীর যুদ্ধ এবং তাহার পরবর্তী কারবালার বিষাদ-কাহিনী ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ীই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই ঐতিহাসিক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া যে নাম-চরিত্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে—তাহার মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত নাই। কুল্‌সুম্‌-পিতা মুয়াবিয়ার আদেশে নিহত হন। তাঁহার অপরাধ—তিনি মুয়াবিয়াকে বিষ খাওয়াইয়া খাঁটি ইসলাম বিরোধীকে প্রাণে বধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কুল্‌সুম তাহার চাচা খালিদের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হইতে লাগিল। কিন্তু খালিদ-পত্নী হিংসার বশবর্তী হইয়া খালিদের অজ্ঞাতসারে তাহাকে প্রাণে বধ করিবার ইচ্ছায় এক নির্জন কূপে নিক্ষেপ করেন। সেখান হইতে এক খৃষ্টান দম্পতি কর্তৃক কুলসুম্‌ উদ্ধার পায় এবং তাহার নূতন নামকরণ হয় Rose. বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া রৌজ্‌ বা কুলসুম্‌ ইসলাম ধর্মের প্রতিই আকৃষ্ট হয় এবং কয়েকজন খৃষ্টান যুবকের সহিতই বিবাহিত হইতে আপত্তি প্রকাশ করে। এই সময়েই হজরৎ আলীর বংশোদ্ভূত উবয়িদ নামক এক যুবকের সহিত তাহার পরিচয় হওয়ায় কুলসুম্‌ ক্রমশঃ সেই যুবক ও তাহার ধর্মের প্রতি আরো অধিক আকৃষ্ট হইতে থাকে। ইহাতে তাহার পালক পিতামাতা তাহাকে ভীষণভাবে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাহার এই অসহায় অবস্থায় উবায়িদ তাহাকে উদ্ধার করে। এই সময়েই আবার যুদ্ধের ঝড়-ঝাপটা হুসেইনের উপর বেশ চলিতে থাকে। কুলসুমের উৎসাহ ও উদ্দীপনায়ই উবায়িদ কুফাবাসীদের হুসেইনের পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ইব্‌নে-জিয়াদের কৌশলে উবায়িদ এই কাজে ব্যর্থ হয়। কুলসুমও ইব্‌নে-জিয়াদের প্রাণহানির চেষ্টা করে, কিন্তু তাহারা উভয়েই ইব্‌নে-জিয়াদ কর্তৃক দুইবারই বন্দী হয় এবং এই দুইবারই তাহারা বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। তারপর তাহারা উভয়েই হুসেইনের পক্ষ সমর্থন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে উপস্থিত হয়। তথায় উবায়িদ আহত এবং কুলসুম য়জিদ-সেনাপতি কর্তৃক বন্দী হয়। সেনাপতি ইব্‌নে-সঅদ্‌ তাহার প্রতি মুগ্ধ হইয়া কুলসুমকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইব্‌নে-জিয়াদ্‌-ও

তাহার প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিল এবং তাহার পালক পিতামাতার অনুমতি-ক্রমে কুলসুমের অনিচ্ছাসত্ত্বেই তাহাকে বিবাহ করে। কিন্তু সুযোগ বুঝিয়া একদিন কুলসুম পলায়ন করে এবং একই সঙ্গে তাহারা উভয়েই য়জীদকে তাহাদের নালিশ জানায়। আবার য়জীদ তাহার প্রতি অনুরক্তি বশতঃ নিজেই কুলসুমকে বিবাহ করিয়া ফেলেন। এইদিকে তাহারই জন্য নিযুক্ত এক দাসীর নিকট হইতে য়জীদের জন্মরহস্য জানিতে পারিয়া কুলসুম তাহার পিতৃহত্যার প্রতিশোধার্থে গোপনে য়জীদকে ছুরিকাঘাতে বধ করে। ঠিক সেই সময়েই একই উদ্দেশ্য লইয়া উবয়িদও তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদের উভয়ের তথায় সাক্ষাৎ হয়। ঘটনাচক্রে কুলসুমের পালক পিতা-মাতা ও তাহার চাচা-চাচীও আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং তাহাদের সকলের সম্মতিক্রমেই কুলসুম-উবয়িদের প্রণয়ের মধ্য দিয়া উপন্যাসের সমাপ্তি।

কাহিনী ঘটনাবহুল বলিয়া আরুসে-করবলা ততটা সুসংবদ্ধ নহে। ঘটনার অনুশীলনে অনেক যায়গায়ই সূত্র-ছেদ বলিয়া মনে হয়। ইব্‌নে-জিয়াদ এবং য়জীদকে নরপিশাচরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, আবার ইমাম হুসেইন ও তাঁহার অনুসরণকারীদের মানুষরূপী দেবতা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের কাহারো কাহারো চরিত্র বিশ্লেষণের কোন প্রচেষ্টা নাই। এইরূপ আরো কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও একটি ঐতিহাসিক বিষাদময় কাহিনীর মধ্য দিয়া রাশিদুল্‌-খয়রী যে কল্পনাত্মক সুরম্য কাহিনী উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন—তাহার জন্য তাঁহার যে কৃতিত্ব তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

রাশিদুল্‌-খয়রীর আরো কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের উল্লেখ আছে—যেমন, আমীন্ কা দমে উআপসীন্, স্ময়র্ন কা চাঁদ, ইয়াস্‌মিনে-শাম এবং দুরে-শহওয়ার্। তাহা হইলেও তাঁহার প্রসিদ্ধি বিশেষ করিয়া সামাজিক উপন্যাসের জন্যই। তিনি অনেক ছোটগল্পও লিখিয়া গিয়াছেন—ইহা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। মোট কথা, তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়া তিনি মুসলিম নারী সমাজের উন্নতিরই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এবং এই জন্য তিনি দুইটি মাসিক পত্রিকারও প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম ইস্‌মৎ এবং বনাৎ। ইস্‌মৎ তাঁহার মৃত্যুর (১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ) পরও চালু থাকে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে কয়েকজন মহিলা-ঔপন্যাসিকও

কতকটা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন —মুহম্মদী বেগম, নজরে-সজ্জাদ্ হায়দার, উআলিদা আফজল আলী, বেগম শাহ নোআজ এবং জীয়া বানু। তাঁহাদের প্রায় সকলেই নজীর আহমদ এবং রাশিদুল্-খয়রীকেই বিশেষ করিয়া অনুসরণ করিয়াছেন। নজরে-সজ্জাদ্ হয়দারই বোধহয় ইঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক—তাহা হইলেও মুহম্মদী বেগমই মহিলা ঔপন্যাসিকদের পথপ্রদর্শক এবং তিনিই সর্বপ্রথম মহিলা সম্পাদক হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে শরীফ্ বেটী, স্বয়ফহ্ বেগম্, আজকল এবং জীন্‌তুল-নিসওআন্ উল্লেখযোগ্য। এবং শরীফ বেটীই সম্ভবতঃ কিছুটা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাঁহার চন্দনহারকে উপন্যাস না বলিয়া বরং ছোটগল্প বলাই বিধেয়; আর প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রসিদ্ধ ছোটগল্প লেখক মোপশাঁ-র 'The Necklace'-এর অনুবাদ মাত্র।

নজরে-সজ্জাদ্ হয়দার উপন্যাস ছাড়া অনেক ছোটগল্পও লিখিয়াছেন। আর তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসই তহজীবে-নিস্‌ওআন্ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম উপন্যাস অখ্‌তরুল-নিসা বেগম। ইহা তাঁহার প্রথম বয়সেই লিখিত হইলেও সুপরিকল্পিক আখ্যানবস্তুর জন্য এই যুগের কেবল বর্ণনামূলক অনেক উপন্যাস হইতেই ইহার প্রাধান্য রহিয়াছে। কাঁচা হাতের লেখা হইয়াও চরিত্র চিত্রণেও তিনি অনেকটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন। ইহার আখ্যানবস্তু সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায়: এক বালিকা তাহার বিমাতার চক্রান্তে একটি অশিক্ষিত ও দুর্দান্ত পরিবারে বিবাহিত হয়। কিন্তু তাহার শিক্ষার গুণে যথেষ্ট দুঃখকষ্টের মধ্যেও অবশেষে জীবনে সুখ ও শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য —আহে-মজলুমান্ (১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত), হিরমান্ নসীব্ (১৯২০ খৃষ্টাব্দ), স্যুরায়া (১৯৩০) এবং জান্‌বাজ্। জান্‌বাজের কিছু অংশ ১৯১৯ এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইস্‌মৎ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে শেষাংশ অনেক পরে রচিত বলিয়া আখ্যানবস্তুর চিন্তাধারা শেষ পর্যন্ত সুসমঞ্জস হয় নাই। ইহার প্রধান নায়িকা জুবায়িদাকে প্রথমদিকে দেখিতে পাই যে তিনি নন্-কো-অপরেশান বা অসহযোগ আন্দোলনের আওতায় পড়িয়া কমরের সহিত বিবাহের প্রস্তাব পর্যন্ত বাতিল করিয়া দিতেছেন, কিন্তু আখ্যানের শেষ দিকে ইহার প্রভাব কিছুই বর্ণিত

হয় নাই। তাহা হইলেও আখ্যানবস্তুর জটিলতা কাহিনীকে বেশ উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

উআলিদা আফজল আলী তহজীবের নিয়মিত লেখিকা হইলেও তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস গূদড় কা লাল সর্বপ্রথম শরীফ বীবী পত্রিকায় ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ইহা গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় অনেক পরে। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত এবং তিনটি পরিবারের ভাগ্যলিপি বিবৃত হইয়া কাহিনী বেশ দীর্ঘ হইলেও প্রকাশের মাধুর্যে অনেক সময় মনেই হয় না যে কাহিনী বস্তুতঃ দীর্ঘ। তাছাড়া আখ্যানবস্তু বেশ জটিল এবং ছোট বড় অনেকগুলি চরিত্রসৃষ্টি হইলেও প্রত্যেকটি চরিত্র তাহাদের নিজেদের বিশেষত্ব দ্বারা আমাদের মুগ্ধ করে।

জিয়াবান্নু প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহার ফুকানে-অশরফ, অন্জামে-জিন্দগী এবং ফরেবে-জিন্দগী নামক তিনটি উপন্যাস লিখিয়া। এই তিনটি উপন্যাসই দিহলবী ভাষায় অনেকটা রাশিদুল-খয়রীর অনুকরণে রচিত। ইহাদের কোনটিতেই আখ্যানবস্তুর কোন সুদৃঢ় বন্ধন না থাকিলেও প্রকাশ-ভঙ্গির সরলতা ও সরসতার জন্য পাঠকচিত্তকে সহজেই তৃপ্ত করে।

'হুসন্ আরা বেগম' লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বেগম শাহ নোয়াজ। কিন্তু এই গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষত্ব অনুভূত হয় না। এই যুগের আরো কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিকের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের কয়েকটি উপন্যাসও কিছুটা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে—যেমন, রৌশ্নক্ বেগম, শৌকৎ আরা বেগম,এবং (আব্বাসী বেগম-কৃত) জোহরা বেগম। এখানে লক্ষণীয় যে মহিলা ঔপন্যাসিকগণ যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাদের প্রায় প্রত্যেক-টিতেই আমরা দেখিতে পাই, পিতামাতার ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্য দিয়া বিবাহ স্থিরীকৃত হওয়ায় মেয়েদের অশেষ লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে হাদী রুস্ওয়াই আধুনিক যুগের পুরোধা। বস্তুতঃ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে যে সকল উপন্যাস রচিত হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও আধুনিকতার ছাপ আরো গভীরভাবে নিহিত রহিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই যুগের পাঠকচিত্ত ছোটগল্পের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট বলিয়া এই যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণও ছোটগল্পেই বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক তাড়াহুড়ার যুগে যেমন পাঠকচিত্ত দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ উপন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন না, তেমনি সাহিত্যিকদের উপন্যাসসমূহও কেমন যেন

শিথিল ও আলগা। আখ্যানবস্তুর কোন সুদৃঢ় বন্ধন নাই। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকেই সাহিত্যিকচিত্ত ধাবমান। তথাকথিত সমাজ-অবহেলিত নরনারীর মধ্যেও যে অনেক মহৎগুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার বিশ্লেষণ দ্বারা এবং আপাতদৃষ্টিতে ভাল মানুষও যে অনেক সময় গুপ্ত নর-পিশাচ, তাহার চরিতার্থতা দ্বারা মানব মনের মানস-উন্মেষ ও জীবনরহস্যের গভীর অনুভূতির দিকেই তাঁহাদের লেখনী চালিত করিয়া বিশ্ব উপন্যাস-সাহিত্যের সমপর্যায়ে উন্নীত হইতেই তাঁহারা সচেষ্ট হইয়াছেন।

এই যুগের প্রসিদ্ধ প্রেমচন্দ, নিয়াজ ফতেহপুরী, মুহম্মদ অস্‌লম্‌, আজীম্‌ বেগ চঘ্‌তাই এবং সজ্জাদ জহীর প্রভৃতি সকলেই ছোটগল্পেই বিশেষ প্রসিদ্ধলাভ করিয়াছেন। তাহা হইলেও উপন্যাসেও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা কম নহে। নিয়াজ ফতেহপুরী একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচকও এবং এই বিষয়ে তাঁহার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। কেবল উপন্যাস লিখিয়াই যাঁহারা প্রসিদ্ধলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন—হাদী হসন রুস্বয়া এবং মীর্জা মুহম্মদ সায়িদ। রুস্বয়া সম্বন্ধে পূর্বেই আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। খ্বাবে-হাস্তী এবং ইয়াস্‌মীন্‌-ই-মীর্জা সায়িদের প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ। এই দুইটি উপন্যাসেরই দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে যেমন রুস্বয়ার উপন্যাস হইতে অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির, তেমনি অতি আধুনিকদের উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখার নূতন পথ দেখাইয়া দিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন।

মীর্জা সায়িদ হতভাগ্য যুবক সমাজের মনের গভীরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া তাহাদের জীবন-দ্বন্দ্বের মধ্যেও যে বস্তুতঃ প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধির একটা প্রচেষ্টা রহিয়াছে, তাহাই চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। খ্বাবে-হাস্তী যুবক-মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া উর্দু সাহিত্যে একটি নূতন ধারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেও উপন্যাস হিসাবে ইহা খুব সার্থক হয় নাই। ইহার মূল কারণ ইহার ভাবসম্পদের সহিত কার্যপরম্পরা ও লেখনীর প্রকাশনা সমান তালে পা ফেলিতে পারে নাই। উভয় উপন্যাসই প্রায় একই ধারায় লিখিত হইলেও সায়িদ তাঁহার ইয়াস্‌মীন্‌-এই অধিকতর সাফল্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ইয়াস্‌মীনের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ অন্তরে গভীর সৌন্দর্যানুভূতির প্রতি অসীম নেশা থাকিলেও গ্রন্থের নায়ক আখতর সংযম ও কঠোরতার মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার পিতার ইচ্ছানুসারেই গ্রাম্য শিক্ষায় শিক্ষিত স্বফিয়াকে বিবাহ করে। এবং সে নিজেও তখন ভাবিয়া

দেখে নাই যে সৌন্দর্য লিপ্সা ও বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রতি তাহার কোন মোহ থাকিতে পারে। তাই শীঘ্রই স্বফিয়া তাহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠে। এই সময়ে তাহার বন্ধু মস্উদের নিকট হইতে জানিতে পারে যে তাহার মানস প্রেমিক 'Maiden's Dream'-এর চিত্রকার একজন যুবতী এবং সে কলিকাতায় বাস করে। ইহা তাহার মনের অজ্ঞাতসারেই আখতরকে কলিকাতায় আকর্ষণ করে এবং যাহার বাড়ীতে সে প্রথম কলিকাতায় গিয়া উঠে, ঘটনাচক্রে তাহারই একজন নিকট আত্মীয়া গ্রন্থের নায়িকা ও তাহার মানস প্রেমিক ইয়াস্মীন। ক্রমশঃ সম্বন্ধের গভীরতার মধ্য দিয়া তাহারা উভয়েই একসঙ্গে পলায়ন করে এবং বেশ কতকদিন স্থখেই বাস করে। কিন্তু ইতিমধ্যে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া আখতরের এক চক্ষু নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, তাহাকে আর ইয়াসমীনের মনে ধরিল না এবং সে তাহার আর একজন গুণমুগ্ধর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহাতে মানসিক আঘাত পাইয়া আখতর জুয়াখেলায় নিজেকে নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করে। ফলে নিঃস্ব হইয়া জেলে যায় এবং তথায় তাহার পুরানো বন্ধু মসউদের জামিনে মুক্তি পায়। বন্ধুর অনুরোধে সে কলিকাতা ছাড়িয়া লখনো যায়, কিন্তু নিজ বাড়ীতে যাইতে তখনো সে স্বীকৃত হইতে পারিল না। ইতিমধ্যে সে শুনিতে পায় যে তাহাদের সম্মিলিত পুত্রকেও ইয়াসমীন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে সেই পুত্র আত্মহত্যা করিয়াছে। এই দুঃসংবাদ আখতরকে গভীরভাবে বিহ্বল করিয়া তোলে। গ্রন্থের সমাপ্তিতে আমরা দেখিতে পাই যে আখতর আবার তাহার নিজ বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইতেছে।

মীর্জা সায়িদ এখানে একদিকে যেমন আমাদের পাশ্চাত্য স্ত্রী শিক্ষাকে ভীষণভাবে আঘাত করিয়াছেন, তেমনি ভারতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বফিয়ার প্রতি অতি দরদী। এবং আমরা দেখিতে পাই যে এই দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী অন্যান্য উপন্যাস, যথা, শহাব্ কী সরগুজশৎ এবং লণ্ডন কী য়ক্ রাত প্রভৃতিতে আরো প্রভাবান্বিত হইয়াছে। শহাব কী সরগুজশৎ লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন নিয়াজ ফতেহ্পুরী। ইহাতে আখ্যানভাগ হইতে তত্ত্ববিশ্লেষণই যেন বেশী প্রাধান্যলাভ করিয়াছে এবং ইহা পড়িতে পড়িতে অনেকসময় রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'-কে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহার মধ্যে যে তত্ত্বটি নিহিত আছে, তাহাকে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে বিবাহের সহিত খাঁটি প্রেমের কোন সম্পর্ক নাই, এবং আদর্শ প্রেমের জয় সর্বত্র। আর বিবাহ যদি করিতেই হয়, তাহা কখনো কামনার বশবর্তী

হইয়া করা উচিত নয়—বিবাহের বন্ধন সমাজ কল্যাণার্থেই নিয়োজিত হওয়া প্রশস্ত। উপন্যাসের নায়ক শহাব যেন ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর তাহার বন্ধু মহমুদকে দেখিতে পাই, সে তাহার প্রথমা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া অথতর বাঈয়ের প্রেমে মুগ্ধ হইলেও সকীনার আদর্শপ্রেম তাহাকে শেষ পর্যন্ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয়। এই উপন্যাসে নিয়াজ ফতেহপূরী তাঁহার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও গ্রন্থকার যে পাঠকচিত্তে নূতন চিন্তাধারার যোগান দিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

'লণ্ডন কী য়কৃরাত' লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন সজ্জাদ জহীর। আধুনিক যুগের একজন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও ছোটগল্প লেখক মুল্‌কৃরাজ আনন্দ্‌ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, আধুনিক সাহিত্য-জগতের মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই মন্তব্য কিছুটা বাড়াবাড়ি হইয়া থাকিলেও ইহা যে উর্দু সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ অবদান—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে লণ্ডনবাসী নায়িম নামক এক ভারতীয় ছাত্রের বাড়ীতে মদের পার্টির বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা পড়িতে পড়িতে কতকটা বাঙ্‌লা সাহিত্যের যাযাবর লিখিত 'জনান্তিক'-কে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই কতটুকু সময়ের মধ্যে গ্রন্থকার বিচিত্র চরিত্রের যে সার্থক চিত্রণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ না দিয়া পারা যায় না। তাছাড়া বিলাতী শিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের চরিত্র-চিত্রণ আধুনিক যুগে বোধ হয় আর কেহ করেন নাই—এইদিক দিয়াও ইহার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

নাজিমহ্‌ কী আপ্‌ বয়তী (বা নাজিমার আত্মকাহিনী)-তে মহম্মদ অস্‌লম্‌ নাজিমার চিঠিপত্রের মাধ্যমে যেমন ইহার প্রধান নায়িকার আত্ম-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তেমনি আরো অনেক চরিত্র-চিত্রণে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় বিশেষ করিয়া পঞ্জাবী মুসলমানদের চারিত্রিক অবস্থার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার চিন্তা-ধারার প্রকাশের দিকেই বিশেষ মনযোগ দেওয়ায়, যেমন তিনি তাঁহার গ্রন্থের খাঁটি চরিত্র চিত্রণে সমর্থ হন নাই, তেমনি ভাব সম্পদেও কেমন যেন একটা শিথিলভাব দৃষ্ট হয়। তাহা হইলেও চিঠিপত্রের মাধ্যমে উপন্যাস রচনার প্রয়াসে একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে নিশ্চয়ই।

এই সম্পর্কে কাজী আব্দুল ঘফ্‌ফার রচিত লয়লাকে খতুত্‌ এবং মজনূঁ কী ডয়রী-র নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটির মধ্যে চিঠিপত্রের

মাধ্যমে পতিতা লায়লার আত্মকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয়টিতে ধর্ম ও নীতির প্রতি অতি-উপেক্ষপ্রবণ মজনূনের দিনলিপি রচিত হইয়াছে। উভয়েই তাহাদের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ধর্ম ও সমাজের চিত্র বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু দিনলিপি বা চিঠিপত্র যে কেবলমাত্র একটি সংকীর্ণ জগতের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে, তাহা ভুলিয়া গিয়া অনেক সময় মনে হয় গ্রন্থকার যেন বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছেন। তাহাতে ইহার সাহিত্য-রস একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে।

ছোটগল্প লেখক হিসাবেই বিশেষ প্রসিদ্ধলাভ করিলেও প্রেমচন্দ ঔপন্যাসিক হিসাবেও অন্যান্য অনেক উর্দু-ঔপন্যাসিক হইতে অনেক বেশী সফলতা লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার উপন্যাস তাঁহার ছোটগল্পের সমপর্যায়ে উন্নীত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ, ছোটগল্পের ন্যায় তাঁহার উপন্যাস যেমন দৃঢ় সংবদ্ধ নয়, তেমনি কাহিনীর আরম্ভ যতটুকু সুন্দরভাবে সূচিত হইয়াছে, ইহার অগ্রগতিতে ঘটনা পরম্পরা তেমনভাবে সুবিন্যস্ত হয় নাই। তাহা হইলেও বর্ণনাভঙ্গির প্রকাশনায় তাঁহার উপন্যাস চিরদিন উর্দু-সাহিত্যে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

বাজারে-হুসন প্রেমচন্দের প্রথম দীর্ঘ উপন্যাস। এবং ইহা হইতেই তাঁহার উপন্যাসের ধারা বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। যুবতী সমন্ তাহার স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া বাজারে-হুসন্-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সমাজ-সেবক মাধুরাম কর্তৃক তাহা হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সে নীতিবোধের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। ইহাতে সমনের সহজ চরিত্র বেশ দরদের সহিতই সুনিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু মাধুরামের কাহিনী বর্ণনে মানব-মনবিক্ষণে তিনি যতটা সফলকাম হইতে পারিয়াছেন, ততটা তাহার জটিল চরিত্র চিত্রণে সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্যান্য অনেক উপন্যাস, যেমন, গোশয়ে-আফিয়ৎ, চৌঘানে-হাস্তী, এবং ময়দানে-আমলেও একই ধারা প্রবর্তিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে কোন ক্ষুদ্র ঘটনা বা চিত্র-চিত্রণেই তাঁহার সমধিক সাফল্য—সুবিন্যস্তভাবে ঘটনারাশির দৃঢ়-সংবদ্ধ দ্বারা বিশাল চরিত্র চিত্রণে তাঁহার লেখনী মোটেই সিদ্ধহস্ত হয় নাই।

বাজারে-হুসনে একটি পারিবারিক কাহিনী যেমন সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়াছে, তেমনি গোশয়ে-আফিয়তে একটি সমাজ-জীবন বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে জমিদার ও চাষার সংঘর্ষের কাহিনীর মধ্য দিয়া মনোহর,

এবং বলরাজ প্রভৃতি চাষার আত্মচেতনবোধ তিনি জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আবার জমিদার গ্যানশঙ্করের দুর্দান্ত প্রতাপ আমেরিকা হইতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত গরীবদুঃখীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাহার ভাই প্রেমশঙ্করের মাধ্যমে কতকটা সমাহিত হয়। ইহাই আরো চরমে উঠিয়া ময়দানে-আমল্ কেবল জমিদার ও চাষার সংঘর্ষই বর্ণনা করে নাই, ইহাতে ধনী ও দরিদ্র, তথা মিল-মালিক এবং মিল-মজুরদের সংঘর্ষের কাহিনী রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়া নানাভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

এইসকল ছাড়া প্রেমচন্দের আরো কয়েকটি উপন্যাস উল্লেখযোগ্য :— ঘবন্, বেওআ, নিরমলা, এবং পরদয়ে-মজাজ। ঘবন একটি সার্থক পারিবারিক উপন্যাস। বেওয়াতে বিধবার দুঃখ-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার যে বিষময় ফল দাঁড়ায় তাহাই নির্মলা-চরিত্রে চিত্রিত হইয়াছে। প্রকৃতই নির্মলার জীবন পাঠকচিত্তকে বিষাদপূর্ণ করিয়া তোলে। পর্দয়ে-মজাজে আবার জমিদার ও চাষা এবং লক্ষপতি ও সামান্য মজদুরের সংঘর্ষের কাহিনী রূপায়িত হইয়াছে।

প্রেমচন্দের বর্ণনাভঙ্গির নিদর্শনস্বরূপ এখানে আমরা তাহার কয়েক পঙক্তি ময়দানে-আমল হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। সমরকান্ত তাঁহার পুত্রবধূ সুগ্দাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, অভী আনে কী কিয়া জল্দী থী বহূ দো চার দিন অওর দেখ লেতেঁ—তব তক খজানহ কা সাপঁ উড় গিয়া হোতা। উঅ লোণ্ডা সমঝতা হৈ মুঝে দৌলত বালবচ্চোঁ সে পিয়ারী হৈ। লেকিন্ ইয় জোড়া থা কিস লিয়ে? অপনে লিয়ে? তো বাল্বচ্চে কিয়োন্ পয়দা কিয়ে? ইসী লোণ্ডী কো জো আজ মুঝে দুশ্মন সমঝতা হৈ ছাতী সে লগায়ে কিয়োন্ উঝে, সিয়ানোঁ, বৈদোঁ অওর হকীমোঁ কে পাশ দৌড়তা ফিরা? খুদ কভী অচ্ছা নহীঁ খায়া, অচ্ছা নহীঁ পহনা কিস কে লিয়ে? কন্জুসী কী, বে-ঈমানী কী, খুশামুদ কী, অপনে জমীর কী হত্তীয়া কী কিস্ কে লিয়ে? জিস্কে লিয়ে চোরী কী ওহী আজ মুঝে চোর কহতা হৈ।

ابھی آنے کی کیا جلدی تھی بہو دو چار دن اور دیکھہ لیتیں - تب تک خزانہ کا سانپ اڑ گیا ہوتا - وہ لونڈا سمجھتا ہے مجھے دولت بال بچوں سے پیاری ہے - لیکن یہ جوڑا تھا کس لئے ؟ اپنے لئے ؟ تو بال بچے کیوں پیدا کئے ؟ اسی لونڈے کو جو آج مجھے دشمن سمجھتا ہے چھاتی سے لگائے کیوں اوجھے سیانوں ویدوں اور حکیموں کے پاس دوڑتا

پھرا ؟ خود کبھی اچھا نہیں کھایا اچھا نہیں پہنا کس کے لئے ؟ کنجوسی
کی بےایمانی کی خوشامد کی اپنے ضمیر کی ھتیا کی کس کے لئے ؟
جس کے لئے چوری کی وھی آج مجھے چور کہتا ھے -

অর্থাৎ, বউ এখনই আসিবার কি তাড়াতাড়ি ছিল, দুই চারিদিন আরো দেখিয়া লইতে—ইতিমধ্যে ধনের সাপ (অর্থাৎ রক্ষক) বিনষ্ট হইয়া যাইত। সে মনে করিয়াছে যে ছেলেপুলে হইতে টাকাই আমার বেশী প্রিয়। কিন্তু ইহা আমি জুড়িয়াছিলাম, কি জন্য ? আমার জন্য ? তাহা হইলে ছেলে-পিলের জন্ম দিয়াছিলাম কি জন্য ? সে আমাকে আজ তাহার শত্রু মনে করে, কিন্তু ওকেই বুকে চাপিয়া কি জন্য ওঝা, শেয়ানা, বৈদ্য ও হেকিমের নিকট দৌড়াদৌড়ি করিয়াছি ? নিজে কখন ভাল খাই নাই, ভাল পরি নাই—কি জন্য ? কৃপণতা করিয়াছি, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি, খুশামুদি করিয়াছি, নিজের মনপ্রাণকে বঞ্চিত করিয়াছি—কি জন্য ?—যাহার জন্য চুরি করিয়াছি, সেই আমাকে এখন চোর বলে।

---

(৩) ছোটগল্প : ইহার সূচনা ও বিকাশ

'ছোটগল্প' বস্তুতঃ আধুনিক সৃষ্টি। উপন্যাসের ন্যায় পাশ্চাত্য-প্রভাবের ফলেই এই ছোটগল্প-সাহিত্যের আবির্ভাবও এই যুগেই হয়। প্রাচীন উপদেশ-পূর্ণ পশুপাখির গল্প বা রূপকথার কাহিনীর সহিত কিছুটা সম্পর্ক থাকিলেও আধুনিক যুগে ছোটগল্প বলিতে যাহা বুঝি তাহাতে সজীব মানুষ-মনেরই চরিত্র বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে। এইদিকে লক্ষ্য করিলে প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস ও ছোটগল্পে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তাহা হইলেও সংক্ষিপ্ত উপন্যাসকেই ছোটগল্প বলা যায় না। ইহাতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা মনের অবস্থাকে উপলক্ষ করিয়া অল্প কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যেই মানস-মনের পূর্ণ স্বরূপটি প্রকাশ করিতে হইবে।

উর্দু সাহিত্যে ছোটগল্পের অভ্যুত্থান বোধহয় মুন্সী সজ্জাদ হুসেন কর্তৃক 'অওধ্-পঞ্চ' প্রকাশনার (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ) সঙ্গে সঙ্গেই সূচিত হয়। ইহার মাধ্যমে যে সকল হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গ চিত্রের প্রকাশ হইয়াছে, তাহার

মধ্যে চরিত্র বিশ্লেষণের'ও কতকটা আভাস পাওয়া যায়। অওধ্ পঞ্চের প্রায় সকল নিয়মিত লেখকদের মধ্যেই ব্যঙ্গ চিত্রাদির মধ্য দিয়া এই ইঙ্গিতটি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন—সজ্জাদ হুসেন, জুআলা পরশাদ বর্ক, মচ্ছূ বেগ সীতম্ জরীফ এবং নবাব সৈয়দ মহম্মদ আজাদ। তাঁহাদের সম্পর্কে পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে। তাঁহাদের ব্যঙ্গ চিত্রাদির মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট আখ্যানবস্তু না থাকিলেও চরিত্র-চিত্রণের যে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। এখানে উদাহরণস্বরূপ নবাব সৈয়দ মহম্মদ আজাদের রচিত 'নঈ রৌশনী কী ডিক্সিনারী' হইতে কয়েকটি লাইন নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য জীবন প্রভাবে যে সকল নূতন শব্দ তথা নূতন আবেষ্টনীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য নবাব সাহেব এই নূতন আগত শব্দাদি যথা, আয়া, পাপা, বিয়ারার এবং ছোটা হাজরী ইত্যাদির নূতন অভিধান প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাদের প্রত্যেকটিই নিখুঁত চরিত্র চিত্রণ। আয়া সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, মগ্‌রিবী নিসওআনী আজাদী—শোখী অওর চুস্তী কী বিগড়ী হোয়ী তসবীর্—বা-উজুদে-বদরনগ হোনে কে হজারোঁ উমদা রনগ স্বাহেবানে-আলীশান্ কী কোঠী মেঁ ইস্তিমাল পজীর—মেম স্বাহেবান্ কী খিদমত কা জান্দার আলা—কোঠী তমাম্ আরায়িশ কী চীজোঁ কে অইলান্ কা বড়া নক্কারা—বাবা লোগ কে সোনে কা মজবুত ও মহফুজ চর্মী গহওআরা।

مغربی نسوانی آزادی شوخی اور چستی کی بگڑی ہوئی تصویر - باوجود بد رنگ ہونے کے ہزاروں عمدہ رنگ صاحبان عالیشان کی کوٹھی میں استعمال پذیر - میم صاحبان کی خدمت کا جاندار آلہ - کوٹھی کی تمام آرائش کی چیزوں کے اعلان کا بڑا نقارہ - بابا لوگ کے سونے کا مضبوط و محفوظ چرمی گہوارہ -

অর্থাৎ, পাশ্চাত্য স্ত্রী-স্বাধীনতার (প্রভাবযুক্ত) চাঞ্চল্য ও চতুরতার বিকৃত রূপ। কুশ্রী চেহারার জন্য হাজার হাজার সুশ্রী বিত্তশালী সাহেবের কুঠিতে সদা কার্য সম্পাদনে লিপ্ত। মেম সাহেবদের সেবার (সাহায্যার্থে) একটি জীবন্ত যন্ত্র। গৃহের সাজসজ্জার ব্যবস্থাপনার সংবাদ প্রকাশনের একটি বড় বাদ্যযন্ত্র। বাবা লোগ বা শিশুদের শয়ন করিবার একটি মজবুৎ ও নিরাপদ চামড়ার দোলা।

নবাব সাহেবের 'পুরানী রৌশনী কে নামে পয়াম্' এবং নয়ী রৌশনী কে নামে পয়াম্'-এও চিঠিপত্রের মাধ্যমে এইরূপ ব্যঙ্গ চরিত্র চিত্রণই করা হইয়াছে।

'অওধ্ পঞ্চ্' যেমন ব্যঙ্গ চিত্রের মাধ্যমে ছোটগল্পের বিকাশসাধনে সহায়তা করিয়াছে, তেমনি সাহিত্য সমালোচনারও দিকভঙ্গি কতকটা স্থিরীকৃত করিতে সাহায্য করিয়াছে। তাহা হইলেও ইহার শ্লেষাত্মক প্রকাশভঙ্গি কতকটা নিচুস্তরের। মার্জিত রুচির মাধ্যমে যেমন সাহিত্য-সমালোচনা, তেমনি ছোটগল্পের রূপায়নে সাহিত্য পত্রিকা 'মখজন্'-ই বোধ হয় সর্বপ্রথম উর্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বস্তুতঃ সাহিত্য জগতে ছোটগল্পের রূপায়নে সাহিত্য-পত্রিকাই সর্বদেশে আমাদের সহায়ে আসিয়াছে। এখানেও ইহার অন্যথা হয় নাই। মখজন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্যার আব্দুল কাদির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেখ আব্দুল কাদির লুধিয়ানায় জন্মগ্রহণকরেন। তথায় তাঁহার পিতা একজন উচ্চপদস্থ রাজস্ব কর্মচারী ছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লখনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বেশ কৃতিত্বের সহিত সসম্মানে বি. এ. পাশ করিয়া পঞ্জাব 'অবজারভার' নামক পত্রিকার সম্পাদক-বিভাগে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রধান সম্পাদক পদে উন্নীত হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পড়িবার উদ্দেশ্যে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। এবং ব্যারিষ্টারী পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের নানা দেশ ভ্রমণ পূর্বক বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া দিল্লীতে তাঁহার নূতন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া তিনি প্রধান বিচারপতি পদে উন্নীত হন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব মন্ত্রীসভায় তিনি শিক্ষামন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং তাহার পরবর্তী বৎসর জেনেভা কনফারেন্সে ভারত প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ডক্টর কাদির উর্দু সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত উর্দু কনফারন্সের সভাপতি নির্বাচিত হন। এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহারই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মখজন পত্রিকার অনরারী এডিটর ছিলেন। এই পত্রিকার সহিত যাঁহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হইলেন—সজ্জাদ হয়দর ইয়লদরিম্, হসন নিজামী, সুলত্বান হয়দর জোশ, আব্দুল মজীদ খান সালিক, এবং রাশিদুল খয়রী। তাঁহাদের প্রায়

সকলেরই উর্দু সাহিত্য জগতে বিশেষ প্রতিপত্তি থাকিলেও তাঁহারা প্রথম জীবনে এই মখজন্ পত্রিকার মাধ্যমেই পাঠকবর্গের নিকট সুপরিচিত হন।

মখজনের অনুকরণে আরো কয়েকটি পত্রিকা সেই যুগে প্রকাশিত হয়। ইহাদের কোনটিই বিশেষ স্থায়িত্বলাভ না করিলেও এইগুলির মাধ্যমে পাঠক-চিত্ত যে ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং সাহিত্যিকবর্গও যে ছোটগল্প রচনার সাধনায় উদ্বুদ্ধ হইবার সুযোগ পায়—এইদিক লক্ষ্য করিয়া এই পত্রিকাসমূহের যথেষ্ট মূল্য আছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল হসরৎ মোহানী সম্পাদিত উর্দুয়ে-মুঅল্লা, রাশিদুল-খয়রী সম্পাদিত তমদ্দুন্, সৈয়দ ইম্‌তিয়াজ আলী তাজ সম্পাদিত কহকশান্, জহুর আহমদ উঅহশী সম্পাদিত দিন-দুনিয়া এবং হসন নিজামী সম্পাদিত দরবেশ।

সৈয়দ সজ্জাদ হয়দরই বোধ হয় উর্দু-সাহিত্যের সর্বপ্রথম ছোটগল্প লেখক। তাঁহার প্রায় সকল গল্পেই মূল-বিষয় অন্যান্য ভাষা বিশেষ করিয়া তুর্কী ভাষা হইতে গ্রহণ করা হইলেও ইহার আখ্যানভাগের স্থানকালানুযায়ী নূতন রূপদানে ও বর্ণনাভঙ্গির মাধুর্যে তিনি একটা স্বকীয় রূপ দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি কাল্পনিক সুষমাযুক্ত ছোটগল্পই অধিক লিখিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি সমাজ-মন বিশ্লেষক ছোটগল্পেরও উল্লেখ আছে। তাঁহার নিম্নলিখিত গল্প উল্লেখযোগ্য :—লয়লা-মজনূঁ, খয়ালিস্তান, নিকাহে-সানী, অজ্‌দওআজে-মুহব্বৎ ও সুহবতে-নাজিন্স্। তাঁহার কয়েকটি হাস্যকৌতুক-পূর্ণ ছোটগল্পেরও উল্লেখ আছে—যেমন, চিড়ে চিড়িয়া কী কহানী, হজরতে-দিল কী সওআনেহ্ উমরী এবং সৌদায়ে-সন্‌গীন্।

হসন নিজামী সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার ছোটগল্পে তো প্রসিদ্ধি আছেই—তাছাড়া তিনি একজন বিখ্যাত সাংবাদিক। বস্তুতঃ উর্দু-সাহিত্য জগতে তিনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যরসিক ব্যক্তি। যেমন তিনি সাহিত্যিক, তেমনি তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ। দেশদ্রোহী হিসাবে ব্রিটিশ আমলে তিনি কারাবরণ করিয়াছেন বলিয়াও উল্লেখ আছে। তিনি অনেক ছোটগল্পই লিখিয়াছেন। এইসকল সংগৃহীত হইয়া একত্রে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের দুইটি খণ্ড বেগমাৎ কে আন্‌সূ এবং অঙ্‌রেজোঁ কী বিপতা সত্য ঘটনাকেই বেশ কতকটা রং ফলাইয়া গভীর অনুভূতির মাধ্যমে রচিত হইয়াছে। আর তৃতীয় খণ্ড জগ্ বয়তী কহানিয়াঁ সম্পূর্ণ কল্পনামূলক এবং কতকটা হাস্যরসাত্মক।

বেগমাৎ কে আন্‌সূ ২৩টি ছোটগল্পের সংগ্রহ। ইহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত

মুঘল সাম্রাজ্যের অবহেলিত রাজপুত্র বা রাজকন্যাদের জীবনের টুকরা কাহিনীসমূহ বেশ দরদ ও সহানুভূতির সহিত বিবৃত হইয়াছে। সত্য ঘটনাই কল্পনার মাধুরীদ্বারা এত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে তাহার তুলনা হয় না। ইহাদের বর্ণনাভঙ্গিও নানাপ্রকার। কোনটিতে গল্পের নায়ক যেন নিজেই তাহার কাহিনী বলিয়া যাইতেছে। বিন্তে-বহাদুর শাহ নামক ছোটগল্পে গল্পের নায়িকার মাধ্যমেই গল্পটি সূচিত হইতেছে, হোনে কো তো ঘদর পঁচাস বরস্ কী কহানী হৈ। মগর মুঝ্ সে পূছো তো কল্ কী সী বাৎ মালুম হোতী হৈ। ইন্ দিনোঁ মেরী উমর সোল সতর বরস কী থী। মৈঁ অপনে ভাঈ সে দো বরস ছোটী অওর মরনেওআলী বহন্ নাজ্‌বানূ সে ছহ্ সাল বড়ী হোঁ। মেরা নাম সুলত্বান বানূ হৈ। আব্বাজান্ মির্জা কুরেশ বহাদুর জিল্লে-সুবহানী হজরৎ বহাদুর শাহকে ফরজন্দ্ থে।

ہونے کو تو غدر پچاس برس کی کہانی ہے - مگر مجھ سے پوچھو تو کل کی سی معلوم ہوتی ہے - ان دنوں میری عمر سولہ سترہ برس کی تھی - میں اپنے بھائی سے دو برس چھوٹی اور مرنے والی بہن ناز بانو سے چھ سال بڑی ہوں - میرا نام سلطان بانو ہے - ابا جان مرزا قریش بہادر ظل سبحانی حضرت بہادر شاہ کے فرزند تھے -

অর্থাৎ, বিদ্রোহের পর তো পঞ্চাশ বৎসরের কাহিনী—আমার কাছে কিন্তু কেবল গতকল্যকার কাহিনী বলিয়া মনে হয়। তখন আমার বয়স ষোল কি সতের। আমি আমার ভাই হইতে দুই বৎসরের ছোট এবং মৃতপ্রায় বোন নাজবানু হইতে ছয় বৎসরের বড়; আমার নাম সুলতান বানু। আমার বাবা জির্জা কুরেশ বহাদুর স্বর্গীয় বহাদুর শা-র পুত্র ছিলেন।

হসন কেবল ঘটনার দুঃখপূর্ণ বিবরণদ্বারাই পাঠকচিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই; তাঁহার বর্ণনার মধ্যে সকলসময়েই লেখনীর এমন একটি সংযম আছে—যাহাতে আপনা হইতেই বিষাদ-চিত্রের রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাছাড়া তাঁহার প্রকাশভঙ্গির বিচিত্র ধারা নানাভাবে আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁহার গল্পের ঘটনাসমূহ তিনি এমন সুন্দর নাটকীয় ভঙ্গিতে আমাদের উপস্থাপিত করিয়াছেন যে অনেকসময় মনে হয় আর কোনপ্রকারেই বুঝি ইহার ব্যঞ্জনা অধিকতর সুস্পষ্ট হইত না। বেচারে শাহজাদী কী থাকী ছপরখাট, কফনী, ফাকে মেঁ রোজহ এবং য়তীম শাহজাদে কী ঈদ্ প্রভৃতি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ তাঁহার কলাকৌশলের আশ্চর্য ক্ষমতাই তাঁহার ছোটগল্পকার হিসাবে প্রসিদ্ধির মূল কারণ।

তাঁহার ঠেলেওআলে শাহজাদা-তে কি সুন্দর নাটকীয় ভঙ্গিতে গল্পের মূল-কাহিনী এবং নায়ক চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। কাহিনীর প্রথমেই একটি ঠেলাগাড়ী ও মোটরগাড়ীর মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে মোটরচালক ঠেলাগাড়ীওয়ালাকে মারধর করে। ঠেলাওয়ালাও ইহা নিরুত্তরে সহ্য না করিয়া গাড়ীচালককে বেশ উত্তম-মধ্যম দেয়। ফলে বিচারালয়ে এই মকদ্দমা উপস্থাপিত করা হয়। সেইখানে ঠেলাওয়ালা তাহার জবানবন্দীতে বলিতেছে, মেরা নাম জফর সুলতান হৈ। মৈঁ মির্জা বাবর বহাদুর শাহ-কে ভাঈ কা বেটা হেঁা। মেরে দাদা হিন্দুস্তান কে শহন্‌শাহ মুঈনুদ্দীন-আকবার শাহ সানী থে। ঘদর কে বঅদ্ মৈঁ হজারো পরীশানোঁ কে ব্‌অদ্ মুল্‌কোঁ মুল্‌কোঁ ফিরতা হুআ দিহলী মেঁ আগিয়া অওর ঠেলা চলানে কা কাম করনে লগা। ১১ মে সনে ১৯১৭ ইসাবী জো ১১ জুন সনে ১৮৫৭ ইসাবী কী ত্বরহ গরম অওর সখ্‌ৎ থী। ইস উআক্তঅ কী তারীখ হৈ। মৈঁ বহরা হেঁা। মৈ নে মোটর কী আওয়াজ নহীঁ সুনী। মোটরওআলোঁ নে মেরী উমর অওর হালৎ পর রহম ন কিয়া অওর মেরে চার কোড়ে লগায়ে। মেরে বদন মেঁ জো খূন হৈ ইস্ কো মার খানে কী অওর জুলুম্ ও জোর সহনে কী। আব তো আদৎ হো গয়ী হৈ। পর পহলে নে থী। জিস জগহ অদালৎ কী কুর্সী হৈ ইস মকাম পর ঘদর পহলে মেরে হুকুম সে বারহা বহুৎ সে শরীরোঁ অওর সরকশোন্‌কো সজাঈন্ দী গয়ী হৈঁ।

میرا نام ظفر سلطان ہے ـ میں مرزا بابر بہادر شاہ کے بھائی کا بیٹا ہوں ـ میرے دادا ہندوستان کے شہنشاہ معین الدین اکبر شاہ ثانی تھے - غدر کے بعد میں ہزاروں پریشانیوں کے بعد ملکوں ملکوں پھرتا ہوا دھلی میں آ گیا ـ اور ٹھیلا چلانے کا کام کرنے لگا ـــ

۱۱ مئی سنہ ۱۹۱۷ع جو ۱۱ جون سنہ ۱۸۵۷ع کی طرح گرم اور سخت تھی ـ اس واقعہ کی تاریخ ہے ـ میں بہرا ہوں ـ میں نے موٹر کی آواز نہیں سنی ـ موٹر والوں نے میری عمر اور حالت پر رحم نہ کیا - اور چار کوڑے لگائے ـ میرے بدن میں جو خون ہے اس کو مار کھانے کی اور ظلم و جور سہنے کی - اب تو عادت ہو گئی ہے - پھر پہلے نہ تھی - جس جگہ عدالت کی کرسی ہے اس مقام پر غدر سے پہلے میرے حکم سے بارہا بہت سے شریروں اور سرکشوں کو سزائیں دی گئی ہیں ـــ

অর্থাৎ, আমার নাম জফর সুলতান। আমি বাবর বহাদুর শা-র ভাইপো। আমার ঠাকুরদা ছিলেন হিন্দুস্তানের শাহনশা মুইনুদ্দীন আকবর শা সানী (বা দ্বিতীয়)। সিপাহী বিদ্রোহের পরে অতি দুঃখকষ্টের মধ্যে নানা শহর ঘুরিতে ঘুরিতে (আবার) দিল্লী আসি ও ঠেলাগাড়ী চালানোর কাজ আরম্ভ করি।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১১ জুনের মতই গরম অসহ্য ছিল। ইহাই ঘটনার তারিখ। আমি কানে খাট। আমি মোটরের শব্দ শুনিতে পাই নাই। কিন্তু মোটরচালক আমার বয়স ও অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কয়েক ঘা লাগাইয়া দেয়। আমার মুখে যে রক্ত তাহা সেই মারেরই দাগ ও জোরজুলুম সহ্য করারই চিহ্ন। ইহা এখন সহ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন সময়ে এরূপ ছিল না। যেখানে বিচারের আসন স্থাপিত, সেইস্থান হইতেই বিদ্রোহের পূর্বে অনেকবারই দুর্দান্ত ও অত্যাচারীদের শাস্তি দিয়াছি।

এইরূপে দরদপূর্ণ কাহিনীর মধ্য দিয়া নায়কচিত্রের বর্ণনায় গল্পের সমাপ্তি হইয়াছে। বর্ণনার মাধুর্য ও ভাষার সরলতা প্রকৃতই লক্ষণীয়। এইরূপ হসনের আরো কয়েকটি ছোটগল্প, যেমন পীর জী ঘসিয়ারে, ঘদর কী জচ্চহ, ঘদর কী সৈদানী, ঘদর কী বিনা ঘলত্‌ ফহমিয়াঁ বেশ উল্লেখযোগ্য।

অন্‌গ্‌রেজোঁ কী বিপতা ১১টি ছোটগল্পের সংগ্রহ। ইহাতে বিশেষ করিয়া সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজগণ যে দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাহারই বিষাদকাহিনী গল্পাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার কাহিনী বিষাদপূর্ণ হইলেও কতকটা মনের দরদের অভাবে কাহিনী যেমন স্বাভাবিক হয় নাই, তেমনি চরিত্র চিত্রণেরও কোন বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

জগ্‌ বয়তী কহানিয়াঁ-তে ৮টি ছোটগল্পের সংগ্রহ রহিয়াছে। ইহাতে চরিত্র চিত্রণের কোন প্রচেষ্টা বা কাহিনীর সুসংবদ্ধতার দিকে লেখকের বিশেষ কোন লক্ষ্য না থাকিলেও ইহার প্রত্যেকটি গল্পই বেশ চিত্তার্ষক ও উপাদেয়। এখানে সাধারণতঃ দুই বিরুদ্ধ অবস্থা বা প্রতিবেশ, কিংবা বিপরীত অর্থবোধক শব্দাদির ব্যবহার দ্বারা পাঠকমনে চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া হাস্যরস উদ্ভাবনের প্রয়াস করা হইয়াছে।

রাশিদুল্‌-খয়রী তাঁহার শেষ জীবনে উপন্যাস লিখিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তিনি ছোটগল্প লিখিয়াই সাহিত্যে তাঁহার হাত পাকাইয়াছিলেন। উপন্যাসে যে ধারা ও প্রকাশভঙ্গি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন,

তাহার সকল দোষগুণই আমরা তাঁহার ছোটগল্পেও দেখিতে পাই। তাঁহার প্রথম জীবনের ছোটগল্পসমূহ জৌহরে-ইস্‌মৎ এবং কত্‌রয়ে-অশ্‌ক নামক ছোটগল্প সংগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছে। আর তাঁহার শেষ জীবনের ছোটগল্প-সমূহ সৈলাবে-অশ্‌ক, তুফানে-অশ্‌ক, বিলায়তে-নন্‌হী এবং আরূসে-মশরিক্‌ প্রভৃতি ছোটগল্প সংগ্রহে স্থানলাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রথম জীবনের ছোটগল্পই বেশ উপাদেয় ও চিত্তাকর্ষক। তাঁহার শেষ জীবনের ছোটগল্পে বিশেষ কোন সাহিত্য-প্রতিভা লক্ষিত হয় না। তাছাড়া এইগুলি অনেকটা পরের দাবীতেই সাধারণতঃ লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ইম্‌তিয়াজ আলী তাজ তাঁহার পরবর্তী জীবনে নাটক ও অন্যান্য বিবিধ প্রবন্ধ লিখিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও তাঁহার প্রথম জীবনে তিনি কয়েকটি বেশ চিত্তাকর্ষক ছোটগল্প লিখিয়াছেন। তারা, মায়ূস্‌, অন্নহ, সল্‌মা এবং লা-উআরিস্‌ বচ্চহ প্রভৃতি তাঁহার ১৫ বৎসর হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে রচিত ছোটগল্প। এইসব গল্পে যেমন তাঁহার বর্ণনাভঙ্গি প্রেমচন্দের অনুকরণে হইয়াছে, তেমনি কাহিনীর বিষয় ও চরিত্র চিত্রণেও প্রেমচন্দকেই তাঁহার আদর্শ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ তাঁহার বিভিন্ন স্তরের সমাজচিত্রসমূহ তাঁহার দরদভরা সুনিপুণ লেখনীতে বেশ স্পষ্ট ও স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্নহ-তে নিরাশ বার্দ্ধক্যের হতাশ চিত্র যেমন সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়াছে, তেমনি তাঁহার 'তারা'-তে অবহেলিত বালিকার ব্যথাতুর চিত্ত অতি দরদের সহিত চিত্রিত হইয়াছে।

'অন্নহ' (বা ধাইমা) তাহার প্রভুপুত্র মহমুদকে তাহার অন্তরের সহিতই যত্ন ও সেবা দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিয়াছে ; কিন্তু এখন সে বড় হইয়াছে এবং তাহার নূতন বিবাহিত পত্নী হশমৎ-কে নিয়া বেশ ব্যস্ত ও সুখী জীবন যাপন করিতেছে। তাহাদের আর তাহার ধাইমার পূর্ব জীবনের সেবা ও যত্নের কথা মনে রাখিবার কোন আবশ্যক নাই। তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নীও এখন আর জীবিত নাই। তাই অবহেলিত অন্নহ তাহার নির্জন ছোট কুঠরিতে একাই বসবাস করে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন যখন শুনিতে পায় যে মামুদের একটি পুত্র হইয়াছে, তাহার হৃদয় আবার নূতন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। হশমৎ-ও অসুস্থ হইয়া পড়ায়, সে তাহার ইচ্ছামত সেবা ও যত্নদ্বারা ছোট্ট শিশুটিকে মানুষ করিয়া তুলে। তাহার জীবনেরও যে একটা মূল্য আছে, তাহা আবার বুঝিতে পারিয়া সে বিশেষ প্রীতিলাভ করে! কিন্তু হশমৎ আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া, একটি সাধারণ ত্রুটির জন্য ছেলের

লালনপালনের ভার বৃদ্ধা ধাইমার হাত হইতে ছিনাইয়া নেয় এবং একটি যুবতী ধাইয়ের উপর পুত্রভার ন্যস্ত করে। এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়া গল্পের সমাপ্তিতে অন্‌ন-র আশার আলো যেন একেবারে নিবিয়া গেল। এখানে অন্‌নার নিঃসঙ্গ জীবনের পাশাপাশি নব-বিবাহিত স্বামীস্ত্রীর পরিপূর্ণ জীবন যেমন চিত্রিত হইয়াছে, তেমনি তাহাদের কঠোর ও নির্বোধ উক্তিসমূহ তাঁহার ছোটগল্পটিকে বেশ রসঘন করিয়া তুলিয়াছে।

আহমদ শুজা-ই বোধহয় সর্বপ্রথম ছোটগল্পের সামান্য কাহিনীকে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া বিশ্ব-ছোটগল্প সাহিত্যের আধুনিক বিশেষত্ব পরিবেষণ করিয়াছেন। এবং এই বিষয়ে উর্দু সাহিত্যে বস্তুতঃ তিনিই পুরোধা। তাঁহার হুসন্ কী কীমৎ অওর দুসরে আফসানে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে দুই একজন মানুষের জীবনের দুই চারিটি ঘটনার টুকরাকে অবলম্বন করিয়া ছোটগল্প রচিত হইয়াছে এবং তাহার মধ্যেই ইহাদের চরিত্র চিত্রণেরও একটা প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এখন চরিত্র চিত্রণ হইতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকেই যেন বেশী আকর্ষণ এবং এখানে কোন ঘটনার বিশেষ বিবৃতি নাই। আবছা-আবছা ঘটনার মধ্য দিয়া সমাজ-চিত্রকে রূপায়িত করার প্রচেষ্টাই এখানে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

হুসন কী কীমৎ-এ কাহিনী যদি কিছু থাকিয়া থাকে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে,—যে স্বামী যৌবনে ধন ও রূপের মোহে তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, সে তাহার বার্দ্ধক্যে জানিতে পারিল যে বস্তুতঃ ধন ও রূপের কোন মূল্য নাই, পতিব্রতা স্ত্রীর মধ্যেই প্রকৃত প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে ঘটনাবিন্যাসের বিশেষ কোন মূল্য দেওয়া হয় নাই। ইউসুফের জীবন-দর্শনের স্বরূপটিই যেন সুনিপুণভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। সে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিতে চায় এবং সেইজন্য আমাদের সংস্কারগত পাপের মূলভিত্তিতে তাহার কোন বিশ্বাস নাই। পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই মানুষ তাহার নিজ সত্তাকে জানিতে পারে। তাহার মতে পাপের অভিজ্ঞতা না থাকিলে, পুণ্যের মাধুর্য লোকে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবে! অভিজ্ঞতার পরিস্ফূর্তির জন্যই তথাকথিত পাপকে ভয় না করিয়া সুকর্মের ন্যায় কুকর্মেও মানুষ লিপ্ত হইতে পারে—তাই বলিয়া পাপের মধ্যেই নিজেকে বিলাইয়া দিলে চলিবে না। নির্লিপ্তভাবেই মসঊদকে সে প্রেমের খেলা খেলিতে উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু মসঊদের পক্ষে তাহা

সম্ভব হয়৹ নাই। মসউদ সেইজন্য তাহার জীবন-বার্দ্ধক্যে নিজে বিশেষ অনুতপ্ত মনে করিতেছে। কিন্তু ইউসুফের মতে এই অভিজ্ঞতার মূল্যও অপরিসীম। তাই তাহাকে দেখিতে পাই যে কাহিনীর শেষে মসউদকে সে বলিতেছে, মসউদ মুঝ্ সে দূর ভাগনে কী কোশিশ্ মৎ করো। মেরা সুক্‌রিয়া আদা করো। মৈঁ নে তুম পর ইহসান কিয়া হৈ। তুমহেঁ এক আবদী ইজাব সে বচায়য়া। পহলে তুম্ ম্‌অস্‌মুম্ থে; অব্ নেক্ হো। মঅস্‌মুমিয়ৎ অওর নেকী মেঁ বড়া ফর্রক্ হৈ। গুণাহ কে বেঘঈর ইন্‌সান্ নেক নহীঁ হো সক্‌তা। সুনো ইহী শয়ত্বান্ কী পয়দায়েশ্ কা রাজ হৈ। ইয় কহকর ইউসুফ মস্‌উদ্ কো ইসী ত্বরহ হয়রান্ অওর শশ্‌দর ছোড় কর এক গহনী ঝাড়ী মেঁ ঘায়েব হো গিয়া।

مسعود مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ میرا شکریہ ادا کرو۔ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ تمہیں ایک ابدی عذاب سے بچایا۔ پہلے تم معصوم تھے۔ اب نیک ہو۔ معصومیت اور نیکی میں بڑا فرق ہے۔ گناہ کے بغیر انسان نیک نہیں ہوسکتا۔ سنو یہی شیطان کی پیدائش کا راز ہے۔ یہ کہکر یوسف مسعود کو اسی طرح حیران اور ششدر چھوڑ کر ایک گھنی جھاڑی میں غائب ہوگیا —

অর্থাৎ, মাসুদ, আমা হতে দূরে থাকতে চেষ্টা করো না। আমাকে ধন্যবাদ দাও। বরং আমি তোমার ভালই করেছি। তোমাকে এক মূলীভূত পাপ হতে বাঁচিয়ে দিয়েছি। প্রথমে তুমি পাপী ছিলে, এখন তুমি সৎ হয়েছ। পাপ ও পুণ্যে যথেষ্ট তফাৎ। পাপের অভিজ্ঞতা ছাড়া মানুষ পুণ্যবান হতে পারে না। শুনো, এই হলো শয়তানের সৃষ্টি-রহস্য। এই বলে মাসুদকে হয়রানি ও বিহ্বলতার মধ্যে রেখে সে এক ঘন জঙ্গলে মিশিয়ে গেল।

এই গল্প-সংগ্রহের প্রত্যেকটি রচনাই, যেমন, আরাম শাহ্ কী বেটী, অন্ধা দেওতা এবং গুনাহ্ কী রাৎ প্রভৃতি আহমদ শুজার নিজস্ব সরল ও স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গির গুণে এবং তত্ত্ববিশ্লেষণপূর্ণ চারিত্রিক মাধুর্যে উর্দু-সাহিত্যে এক নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছে।

• আব্দুল মজীদ সালিকও এই যুগের একজন প্রসিদ্ধ ছোটগল্প লেখক। অনুভূতিপূর্ণ সহজ ও স্বাভাবিক চিত্র রূপায়নের জন্যই তাঁহার সমাদর। তাঁহার কয়েকটি ছোটগল্পই, যথা, চম্পা, হিমালয়হ কী কোটী, ইশ্‌ক কী দুল্‌হন্ অথবা খ্বাবে-পরীশান্ আধুনিক যুগের সমাজ-চিত্র রূপায়নে বিশেষ সাফল্য-

লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে খ্‌্বাবে-পরীশানই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। একটি ঘটনা বিন্যাসের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যিক তাঁহার নায়ক-নায়িকার চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনার পূর্বাভাস বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।

মাসুদ ও সলমা তাহাদের নব-বিবাহিত জীবনের কয়েকটি মাস বেশ সুখ ও শান্তিতেই কাটায়। কিন্তু ঘটনাচক্রে মাসুদের চাচার নিমন্ত্রণ গ্রহণ উপলক্ষ করিয়াই তাহাদের জীবনে দারুণ বিপত্তির সৃষ্টি হয়। মাসুদের চাচার সহিত সলমার বাবার কখনই সদভাব ছিল না। তাহা হইলেও সলমা নিমন্ত্রণ গ্রহণে রাজি হয় এবং তাহাদের চাচার প্রতি কোন রূঢ় ব্যবহার করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু কার্যস্থলে সে স্পষ্টাস্পষ্টি কোন খারাপ ব্যবহার না করিলেও তাহার একান্ত দূর-দূর ভাবই যেন কেমন একটা অপমান বলিয়া অনুভূত হয়। তদুপরি অন্য কোন কথা না বলিলেও মাসুদকে প্রদত্ত কোন একটি মাছের তরকারী খাইতে নিষেধ করিবার জন্যই কেবল যখন সলমা তাহার মুখ খুলে,—ইহা মাসুদের মনে বিশেষ কষ্টের উদ্রেক করে এবং এই ঘটনা নিয়া তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এই মনোমালিন্যের মধ্যেই উভয়ে একই শয্যায় নিদ্রা যায় এবং স্বপ্নের ঘোরে বোবা-ধরার মধ্য দিয়া মাসুদ তাহার স্ত্রীকে হত্যা করে। ভোরে উঠিয়াও সে প্রথম ভাবিতেই পারে নাই যে প্রকৃতই সে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। প্রকৃত অবস্থা যখন সে সঠিক বুঝিতে পারে, সেও আইডিন খাইয়া প্রাণত্যাগ করে।

আধুনিক ছোটগল্পের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষক সৃজনী প্রতিভার মধ্যে আব্দুল মজীদ সালিক অথবা সুলতান হয়দর জোশের ছোটগল্প অনেক সময় উপদেশ-পূর্ণ কাহিনী বলিয়া মনে হইলেও উর্দু ছোটগল্প সাহিত্যের প্রস্তুতি হিসাবে তাঁহাদের অবদানেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। ছোটগল্প ছাড়া জোশ বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখিয়াও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং ছোটগল্প একসঙ্গে যুক্ত হইয়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ফসানায়ে-জোশ প্রকাশিত হয়। তাঁহার ফসানায়ে-জোশ এবং পরবর্তী ফিকরে-জোশ নামক ছোটগল্প সংগ্রহের কোনটিরই সাহিত্য হিসাবে বিশেষ মূল্য নাই। তাহা হইলেও তাঁহার বর্ণনাভঙ্গি বেশ চিত্তাকর্ষক এবং হাস্যরসের উদ্দীপনায় তিনি কতকটা সফলতা লাভ করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ফসানায়ে-জোশের অন্তর্ভুক্ত তলাশে-আজীব এবং ঝোঁকে-আদম-ই বোধ হয় তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্প।

এই দুইটি গল্পেই হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে বন্ধুবান্ধব সংমিশ্রিত পারিবারিক জীবনের কাহিনী ব্যক্ত হইয়াছে।

মহিলা ঔপন্যাসিকের ন্যায় ছোটগল্প-লেখিকা হিসাবেও এই যুগে কয়েকজন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। আব্বাসী বেগম এবং নজরে-সজ্জাদ হুসেনের নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ছোটগল্প লেখিকা হিসাবেও তাঁহাদের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। আব্বাসী বেগমের নিম্নলিখিত ছোটগল্প বেশ উল্লেখযোগ্য :—গরীফ্ তারে-কফস্, জুল্মে-বেকসান এবং দো-শাহজাদী।

নজরে-সজ্জাদ হয়দার অনেক ছোটগল্প রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে খূনে-অরমান্, হুরে-স্বহরান্, নৈরঙ্গে-জমানহ এবং হক্ ব-হক্‌দার সুলিখিত। উপন্যাসের ন্যায় ছোটগল্পেও সমসাময়িক অসহযোগ আন্দোলনের বিষয় নিয়াই তাঁহার প্রায় সকল আখ্যানকাহিনী রচিত হইয়াছে।

আরো অনেক মহিলাই ছোটগল্পের চর্চা করিলেও কাহারো নামে ২।১ টি ছোটগল্পের বেশী রচনা বড় পাওয়া যায় না। এই দিক লক্ষ্য করিয়া খাতূনে-অকরামের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২৪ বৎসর বয়সের সময়েই তাঁহার অকালমৃত্যু হইলেও ইতিমধ্যেই তাঁহার ছোটগল্প সংগ্রহ গুলিস্তানে-খাতূন্ প্রকাশিত হইবার সুযোগ লাভ করে। এবং ইহারই অন্তর্গত কতকটা দীর্ঘ ছোটগল্প পয়করে-উঅফা এবং বিছড়ী বেটী পৃথকভাবেও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার ছোটগল্পে সাধারণতঃ প্রেমচন্দ অথবা রাশিদুল্-খয়রীর ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গিই অনুকরণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে জনসাধারণের সমাজ-জীবনের নিত্যকার ঘটনাই বেশ দরদ ও সহানুভূতির সহিত লিখিত হইলেও মৌলিকতার বিশেষ কোন ছাপ ইহাতে লক্ষিত হয় না।

এইদিক বিচার করিলে অম্‌তুল্-উঅহীর 'শহীদে-উঅফা' ছোটগল্প সংগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার গল্পসমূহের অধিকাংশই তহজীব এবং ইস্‌মতে প্রকাশিত হয়। শহীদে-উঅফা নামক ছোটগল্পটিও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তহজীবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং সম্ভবতঃ উল্লিখিত ছোটগল্প সংগ্রহের এই ছোটগল্পটিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। বস্তুতঃ ইহার ভাব-বিন্যাস এবং বিশেষ করিয়া নায়িকা সল্‌মার চরিত্র চিত্রণে তিনি যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা উর্দু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য।

সল্‌মা ও সঈদের বিবাহিত জীবনকে সম্পূর্ণ সুখী করিয়া তুলে তাহাদের নবজাত শিশু জমীলের আবির্ভাব। মিহিরুন্-নিসা তাহার ধাই নিযুক্ত হয়।

তাহার সেবাযত্ন ও আদর-আপ্যায়নে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বেশ সন্তুষ্ট এবং ধাইটি সম্ভ্রান্তবংশীয় জানিয়া তাহার প্রতি তাহারা উভয়েই বেশ সহানুভূতি-সম্পন্ন। কিন্তু শীঘ্রই মিহিরুন্-নিসার মধ্যে মানসিক চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। সে যে ক্রমে ক্রমে সঈদের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়ে—ইহা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই লক্ষ্য করে এবং তাহার নিকট হইতে অব্যাহতি লাভেরও চেষ্টা উভয়েই করে। অবশেষে অবস্থার বিপাকে সল্‌মা নিজেই বাধ্য হইয়া মিহিরুন্-নিসাকে তাহার স্বামীর সহিত বিবাহ দেন। প্রথমে সঈদ তাঁহার পূর্ব-স্ত্রীর প্রতি সমভাবই রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে নূতন স্ত্রীর সহিত অধিকতর ঘনিষ্টতার সুযোগে তাঁহার মনের ভাবের পরিবর্তন হয় এবং সল্‌মাকে লখনোতে তাঁহার মার নিকট প্রেরণ করে। তথায় শীঘ্রই সল্‌মার শ্বাশুড়ীর প্রাণত্যাগে স্বামীর বিষয়-আশয়েই সল্‌মার জীবিকা নির্বাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে সে তাহার স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিল।

এখানেই গল্প একরকম শেষ হইয়া গেলেও ভারতীয় নারীর মহনীয়তা ও স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে সলমার জীবন-কাহিনীকে আমাদের লেখিকা আরো দীর্ঘ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পরে মিহিরন্-নিসার নিঃসন্তান জীবনকে মধুর করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে, তাহার স্বামী সলমার একমাত্র সম্বল জমীলকেও তাহার হইতে ছিনাইয়া নেয়। এই মর্মান্তিক ঘটনা জমীলের অনুসরণ করিয়া তাহাকে লাহোর যাইতে বাধ্য করে। সেখানে সে অপরিচিত ভাবেই তাহার আদরের পুত্তলিককে দেখিবার সুযোগ পায়। ইতিমধ্যে মিহিরুন-নিসার অসুখে সে-ই তাহার পরিচর্যা করে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে। শীঘ্রই সঈদ-ও অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং ডাক্তার যখন জানাইলেন যে রক্তদান ছাড়া তাহার আরোগ্যলাভের আর কোন উপায় নাই—সলমা স্বেচ্ছায় তাহার নিজ রক্ত দিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু রক্তদানের ফলে সে নিজেই বড় দুর্বল হইয়া পড়ে। গল্পের শেষে মৃত্যুশয্যায় তাহাকে তাহারা সকলেই জানিতে পারে এবং স্বামী পুত্রের সম্মুখেই সলমা তাহার শেষ স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে।

মহিলা সাহিত্যিকগণ সাধারণতঃ স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি শেষ পর্যন্ত অনুরক্ত রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এখানে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তাহা হইলেও প্রথম স্ত্রীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত সঈদের মহান চরিত্রকে ক্রমপরিবর্তনশীল মনোবিশ্লেষণ সহকারে যেমন ভাবে আমাদের

নিকট বর্তমান লেখিকা উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাছাড়া সলমার সরলতা, জীবন-মাধুর্য ও স্বার্থত্যাগ পাঠকচিত্ত মাত্রেই করুণরসে আপ্লুত করিয়া তুলে। বেগম ইক্রামুল্লার মতে উর্দু সাহিত্যে এই গল্পটি মনোবিশ্লেষক কাহিনীর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ইহাদের ছাড়া আরো অনেক ছোটগল্প লেখিকাই ইস্‌মৎ, তহজীব, হুমায়ুন, আদবে-দুনিয়া এবং নয়রঙ্গ-খয়াল্ প্রভৃতি সাহিত্য-পত্রিকায় তাঁহাদের সাহিত্যিক নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন! তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন —রাহৎ আরা বেগম, ইস্‌মৎ চুঘ্‌তাঈ, স্বালিহ আবিদ্ হুসেন, হিজাব ইস্‌মাইল এবং রশীদা জফর। এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পৃথকভাবে ছোটগল্প সংগ্রহ-ও প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রেমচন্দ উর্দু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখক। প্রেমচন্দ উপাধিতেই প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও তাঁহার আসল নাম ধনপৎ রায়। তিনি সম্বৎ ১৯৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুন্সী আজায়িব লাল বেনারসের নিকটবর্তী পাণ্ডেপুরের বাসিন্দা ছিলেন। প্রথমজীবনে ধনপৎ ফারসী শিক্ষালাভ করিয়া ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্যে বেনরস কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং তথা হইতে এন্‌ট্রান্স পাশ করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতা-মাতা উভয়েই প্রাণত্যাগ করেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতেই প্রেমচন্দের সাহিত্যিক-জীবন সূচিত হয়। এবং 'জমানহ' পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম হিন্দী উপন্যাস 'প্রেমা' প্রকাশিত হয়। আর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে জলওয়ে-ইসার এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে দুই খণ্ডে বজারে-হুসন প্রকাশিত হয়। তাঁহার উর্দু উপন্যাস সম্বন্ধে পূর্বেই বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। বস্তুতঃ উর্দুর ন্যায় হিন্দীতেও তিনি অনেক সার্থক উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সেওআ সদন, প্রেম আশ্রম, রঙ্গভূম এবং কায়াকল্প উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তাঁহার 'করবলা' নামক একটি ঐতিহাসিক নাটকেরও উল্লেখ আছে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রেমচন্দ ছোটগল্প লিখিতে আরম্ভ করেন এবং সার্থকভাবে জীবনের শেষকাল (১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত ছোটগল্পই বিশেষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ৮টি ছোটগল্প সংগ্রহের উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রেম-পচ্চীসী, প্রেম-বত্তীসী এবং প্রেম-চালীসী তাঁহার প্রথম জীবনের ছোটগল্প-সংগ্রহ। আর উআরদাৎ, আখিরী তোহফহ, দূদ্ কী কীমৎ, খ্বাব ও খয়াল এবং জাদে-রাহ শেষ জীবনের।

উর্দু সাহিত্যে ছোটগল্পকে প্রেমচন্দই সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করেন। এক-কথায় তাঁহার অবদানেই উর্দু সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রসার এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধারাই এখন পর্যন্ত উর্দু ছোটগল্পে অনুসৃত হইতেছে। তাঁহার এই সার্থকতার মূল কারণ, সাধারণ গৃহস্থ ও দরিদ্র চাষাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যধারা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া সহজ, সরলভাবে প্রাণস্পর্শ লেখনীর সাহায্যে তিনি এই সকল বিন্যাস করিয়াছেন। ছোট্ট ঘটনা বা নগণ্য কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া সাধারণ মানবজীবনের যে সূক্ষ্ম মন-বিশ্লেষণ তিনি করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব। এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে তাঁহার মন-বিশ্লেষণ বাগাড়ম্বর দ্বারা অঙ্গুলি নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না, কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়া ইহা স্বাভাবিক ভাবেই প্রকটিত হইয়াছে।

ইমাম কা ফয়স্বলহ তাঁহার প্রথম জীবনের একটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প। একটি বিশ্বস্ত কর্মচারী লোভের বশবর্তী হইয়া কেমন করিয়া তাহার কর্তব্য-বোধ হারাইয়া ফেলে, আবার বিশ্বাসের জোরেই কার্যপরাম্পরায় কি করিয়া তাহার হৃত-কর্তব্যবোধ ফিরিয়া পায়, তাহা অতি নাটকীয় ভঙ্গিতে সুবিন্যস্ত করা হইয়াছে। মকদ্দমায় পরাজিত হইয়াও যখন বিধবা জমিদার-পত্নী তাঁহার পূর্ব বিশ্বস্ত কর্মচারী শেঠ নরায়নলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইমাম্ সে বতা দো গাঁও কিস্ কা? তখন যে উত্তর পাওয়া গেল, তাহা বিচার বা যুক্তির রায় নহে, তাহা বিবেকের উত্তর—আপ্ কা।

মানব মনের এই যে সততা বা বিবেকাধীন কর্তব্যবোধের জয়,—তাহা প্রেমচন্দের অন্যান্য অনেক ছোটগল্পেই বিবৃত হইয়াছে; যেমন, দুর্গা কা মন্দির, জেওর কা ডিব্বা, ইস্‌লাহ, অথবা স্বির্ফ য়ক আওআজ।

নারী-প্রেমের বিরুদ্ধ মনোবৃত্তি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে প্রেমচন্দের 'সৌৎ' নামক ছোটগল্পে। গোদাবরীর স্বেচ্ছাকৃত স্বার্থত্যাগই যে সতীন-বিদ্বেষের প্রকোপে শেষ পর্যন্ত নিজকে গঙ্গায় জীবন বিসর্জন করিতে বাধ্য করে, তাহা সত্যই অতি করুণ ও নির্মম। স-পত্নী গোম্‌তীই যে ইহার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী, তাহাও ঠিক বলা যায় না। পদাধিকারের দাবীতে সে তাহার ন্যায্য দখল হইতে কেন দূরে সরিয়া থাকিবে? কিন্তু গোদাবরী ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে পারে নাই যে একান্ত শান্তপ্রকৃতি পণ্ডিত দেওদৎ তাহাদের ১৫ বৎসরের সুশৃঙ্খল দাম্পত্য-জীবনকে অকাতরে অবহেলা করিয়া গোমতীকেই গৃহ-লক্ষ্মীরূপে নিযুক্ত করিবে। সুগৃহিণীর অহঙ্কার, আত্মবিশ্বাসের দুর্বলতা এবং অহেতুক নিজকে হেয় মনে করার প্রবৃত্তিই

তাহার ঐই পরিণামের মূল কারণ। কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়া নারী-চিত্তের অন্তর্দাহের বিশ্লেষণ এরূপ স্বাভাবিকভাবে প্রেমচন্দ আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, উর্দু সাহিত্যে তাহার তুলনা হয় না। বস্তুতঃ একটু দরদ ও স্নেহমাখা তুষ্টিবচনের অভাবেই গোদাবরীর প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। মাল্‌কন, ভূরী কাকী প্রভৃতি ছোটগল্পেও অনেকটা এইরূপ করুণ চিত্রেরই সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

আইন-অমান্য আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া প্রেমচন্দ অনেক ছোটগল্প লিখিয়াছেন। যেমন, আখরী তোহফহ, আশীয়াঁ বরবাদ এবং দামিল কা কয়দী। এমন কি হরিজন আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়াও তাঁহার ছোটগল্প রহিয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক বা রাজনীতিপুষ্ট সামাজিক আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল ছোটগল্প লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি ততটা সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই, যতটা তিনি পারিবারিক বা নিছক সামাজিক চরিত্র-চিত্রণে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ভাব-চিত্তের কৃত্রিম রূপায়নই এই অসাফল্যের মূল কারণ।

আবার, ছুঁৎমার্গ যেখানে স্বাভাবিক রূপায়ন লাভ করিয়াছে, সেই সকল সামাজিক চিত্রবিন্যাসে প্রেমচন্দ বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার কফন, দূদ্‌ কী কীমৎ, অথবা নিজাৎ প্রভৃতি ছোটগল্প উর্দু-সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

নিজাতে ব্রাহ্মণের প্রতি 'অছুৎ' বা ছোটজাতির ব্যবহার ও অছুতের প্রতি ব্রাহ্মণের ব্যবহারের পাশাপাশি চিত্র অতি সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। দুখী চমার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দেবতা বলিয়া মনে করে এবং তাঁহার সেবাতেই তাহার মুক্তি, এইরূপ একটা মনোবৃত্তি তাহার দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যুগযুগান্তরের তাচ্ছিল্য বা অবহেলা তাহার এত গা-সহা হইয়া গিয়াছে যে, তাহার নিজেরও যে আত্মচেতনা বা আত্মসম্মান থাকিতে পারে, তাহাই যেন সে ভুলিয়া গিয়াছে। অন্যদিকে পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে কেবল নীচ ও ছোটজাত বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাহার যে একটা চেতনাবোধ থাকিতে পারে, তাহাই তাহার খেয়াল নাই। পণ্ডিতমহাশয়ের আদেশে সে খালি-পেটে সারাদিন কাজ করিয়াই চলিয়াছে। একটু বিশ্রাম নিতে গেলেই গালিগালাজ। শেষ পর্যন্ত নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কর্মক্লান্ত দেহেই সে প্রাণত্যাগ করে। এই অবস্থায়ও পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতি তাহার কোন আক্রোশ নাই। এইঅন্তিম অবস্থায়ও সে বরং চিন্তিত যে তাহার

এই 'অছূৎ'-দেহ ব্রাহ্মণ-ভূমিকে কলুষিত করিবে, তাই সে কষ্টেসৃষ্টে তাহার দেহকে শকুন, গৃধিনীতে ভক্ষণ করিবার জন্য কোন নিকটবর্তী মাঠে টানিয়া লইয়া গেল। ইহাই তাহার সারা জীবনের সেবা, ভক্তি ও বিশ্বাসের পরম-পুরস্কার (ইহী উস্‌কী তমাম জিন্দগী কী ভক্তি, খিদমৎ অওর ইতিক্বাদ কা ঈনাম থা)।

ঔপন্যাসিক প্রেমচন্দের আলোচনা কালেই তাঁহার প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। ছোটগল্পই হউক, কি উপন্যাসই হউক তাঁহার কাহিনী-অংশ সকল সময়েই বর্ণনামূলক,—ইহাতে তথ্য-আলোচনার কোন সুযোগ নাই। তবে যে কোন তথ্য নিবেশিত হয় নাই তাহা নহে। তাঁহার সাহিত্যে তথ্যের বিশ্লেষণ যথেষ্টই আছে, কিন্তু তাহা প্রচেষ্টাসাপেক্ষ নহে। ঘটনাপ্রবাহের অগ্রগতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এইসকল আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। সেইজন্যই তাঁহার সাহিত্যের এত আদর। তাছাড়া তাঁহার বর্ণনাও খুবই স্বাভাবিক—মনে হয় যেন সামনাসামনি আলাপ করিয়া যাইতেছেন। প্রত্যেকটি বর্ণনাই যেন চাক্ষুষ ও তাই প্রাণবেগের আবেগে মূর্ত।

যেমন ভাবের স্বাভাবিকতা, তেমনি ভাষার সমতা ও সরলতাই প্রেমচন্দ-সাহিত্যের প্রধান উৎকর্ষ। সাধারণ বোলচাল হইলেও তাঁহার সাহিত্যে যেমন (সংস্কৃত হইতে আগত) অনেক শুদ্ধ হিন্দী শব্দ আছে, তেমনি অনেক (উর্দুর সংস্কৃত-রূপ তথা) আরবী-ফারসী শব্দও রহিয়াছে। উর্দু-ভাষীদের নিকট এই সকল শুদ্ধ হিন্দী শব্দ অনেক সময় স্বাভাবিক মনে হয় না ; আবার সাধারণ হিন্দুস্তানী ভাষাভাষী পাঠক এইসকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ আরবী-ফারসী শব্দ পছন্দ করেন না। কিন্তু প্রেমচন্দ উভয় শব্দেরই এরূপ সুসংগত ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহাতে কাহারো নিকট এইসকল বিসদৃশ লাগে নাই। সেই সুসঙ্গত লেখনীর জোরেই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন,

হাথ চোমেঙ্গে মেরে গবর ও মুসলমান দুনোঁ।

ہاتھ چومینگے میرے گبر و مسلمان دونوں —

অর্থাৎ, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই আমার লেখনীর আস্বাদ লাভ করিবে। আরো লক্ষণীয় যে তাঁহার সাহিত্যে বিশেষ করিয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ ও পারিবারিক জীবনই অতি সূক্ষ্ম পর্যালোচনা ও অনুভূতি সহকারে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা হইলেও তাঁহার অনুভূতির গভীরতা এবং প্রকাশ-ভঙ্গির আন্তরিকতাই সর্বশ্রেণীর লোককে তাঁহার সাহিত্যের পাঠকান্তর্ভুক্ত

করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাছাড়া তাঁহার শেষজীবনের সাহিত্যসমূহ এত কাব্য-রসে সিক্ত যে কোন সাহিত্য-রসিকই তাহার আস্বাদ না করিয়া থাকিতে পারে না।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মাত্রেই তাঁহার অনুগামীর অপেক্ষা রাখে। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হইলেন সুদর্শন। পণ্ডিত বদরীনাথ সুদর্শন পঞ্জাবের অধিবাসী। ছোটগল্প লিখিয়াই প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ ও অনুবাদ-সাহিত্যেরও উল্লেখ আছে। মুহব্বৎ কা ইন্‌তিক্বাম্ লিখিয়া তিনি পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইহা প্রথমে হিন্দীতে রচিত হয় এবং পরে উর্দুতে অনুবাদ করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র অনুবাদ করিয়া তিনি ইহার নামকরণ করেন জহরেলা আবে-হয়াৎ। এবং তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধের অনুবাদ-সংগ্রহ তহজীব্ কে তাজিয়ানে নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার বেগুনাহ মুজ্‌রিম্-ও বাঙ্‌লা ও ফারসী হইতে অনূদিত প্রবন্ধ-সংগ্রহ মাত্র।

'সদা বহার ফুল' সুদর্শনের ১৬ বৎসর বয়সে লিখিত ছোটগল্পের সংগ্রহ। ইহাতে তিনি প্রেমচন্দকেই অনেকটা অনুকরণ করিয়াছেন। তাহা হইলেও তাঁহার প্রথম জীবনের লেখা হিসাবে অন্যান্য অনেক প্রেমচন্দ-অনুগামীদের তুলনায় প্রশংসনীয় বলা যাইতে পারে। তাঁহার পরবর্তী ছোটগল্প-সংগ্রহ 'বহারিস্তান্' এবং 'বঙ্গাল্ বেটী' তুলনায় আরো উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এইসব গল্পে তিনি যেন অনেকটা সংস্কারকরূপেই প্রতিভাসিত হইয়াছেন। তাই উপদেশপূর্ণ কাহিনী সাহিত্য-রস পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই। তাঁহার শেষজীবনের গল্প-সংগ্রহ সোল-নিগার-এ কতকটা সাম্যবাদ প্রকাশের প্রচেষ্টা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার কয়েকটি গল্পেই (যথা, মজদূর, সরউৎ কা নিশা অথবা ত্বর্জে-আমল) অত্যাচারিতদের তাহাদের উৎপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই উত্তেজনা নিছক শব্দের বাগাড়ম্বর নহে—আখ্যানভাগের একটি সুবিন্যস্ত অগ্রগতি এবং বর্ণনাভঙ্গির মধ্যেও বেশ সহৃদয়তা ও সরসতার আমেজ রহিয়াছে।

প্রেমচন্দের পরবর্তী অনুকারীদের মধ্যে আহমদ নসীম কাসমী এবং আলী আব্বাস হুসেনী কতকটা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই প্রেমচন্দের অনুকারী হইলেও তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যও যথেষ্ট আছে। উভয়েই গ্রাম্যজীবনের পারিবারিক ঘটনাসমূহই বিবৃত করিয়াছেন। তাহা হইলেও

কাসমী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের অজ্ঞতা, দুঃখদুর্দশা, অসহায় অবস্থা এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার সুযোগ নিয়া ধনীদের স্বার্থসাধন। তাঁহার কাহিনী হইয়াছে প্রেমচন্দ হইতে আরো করুণ, এবং সেই জন্য ইহার মধ্যে হাস্যরসের উদ্ভাবনারই সুযোগ নাই। তাছাড়া আমরা দেখিতে পাই যে এই যুগের প্রায় সাহিত্যিকই যুক্তপ্রদেশ, তথা দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের পারিপার্শ্বিক ছবিই চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু কাসমীর কাহিনী-প্রচ্ছদপটে রহিয়াছে পঞ্জাবের গ্রাম্যজীবন এবং পঞ্জাবীদের চরিত্র-চিত্রণই তথায় সার্থক-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার চৌপাল নামক ছোটগল্প-সংগ্রহের প্রত্যেকটি গল্পই এই কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত।

আলী আব্বাস হুসেনীর তিনটি ছোটগল্প-সংগ্রহের উল্লেখ আছে---আই. সি. এস. (ও অন্যান্য ছোটগল্প), বাসীফুল্ এবং কুছ্ হঁসী নহীঁ হৈ। তাঁহার ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমে গভীর ভাবের সরবরাহ। তিনিও গ্রাম্যজীবনই ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে রহিয়াছে তাহাদের চরিত্রের বিভিন্ন রূপ। বাহ্যিক ভাবে অসভ্য বা অভদ্র হইলেও তাহাদের মধ্যেও যে নানা মানবোচিত গুণের সমাবেশ রহিয়াছে তাহা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আবার, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সঙ্গে সঙ্গে একের প্রতি অন্যের ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি গুণে-দোষে জড়িত হইলেও শহরবাসীদের ন্যায় বাহ্য ভদ্রতার ছোঁয়াচ তাহাদের নাই। এই সকল বিভিন্ন চরিত্র-চিত্রণে তিনি অনেকটা সাফল্যলাভ করিয়াছেন নিশ্চয়ই। আর এই সকল বিভিন্ন রূপ পরিবেশনে তিনি আমাদের যথেষ্ট হাসির খোরাকও যোগান দিতে পারিয়াছেন।

উপন্যাসের ন্যায় উর্দু-ছোটগল্পেও বিশ্ব-আধুনিকতার ছাপ পড়িয়াছে। এই সকল ছোটগল্পে আখ্যানভাগ হইতে চরিত্র-চিত্রণেই বিশেষ নজর। এই চরিত্র-চিত্রণ উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণ নহে। এখানে মনের একটি বিশিষ্ট অবস্থাকেই সাধারণতঃ রূপায়িত করা হয়। এই আধুনিকতা-বিশিষ্ট উর্দু ছোটগল্পকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, প্রেমচন্দ ও তাঁহার অনুকারিগণ। তাঁহাদের ছোটগল্পে যে চরিত্র-চিত্রণ রহিয়াছে তাহা কাহিনীর উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ কাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া চরিত্র-চিত্রণ অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু এই চরিত্র-চিত্রণে কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ নাই। আহমদ নদীম, আলী আব্বাস, হুসেনী অথবা আবিদ আলী প্রেমচন্দকেই অনুসরণ করিলেও তাঁহাদের চরিত্র-চিত্রণে একটা বৈশিষ্ট্যের

ছাপ লক্ষিত হয়,—অর্থাৎ প্রত্যেকটি চরিত্র ভিন্ন রূপে আমাদের নিকট দেখা দিয়াছে। আবার, তাঁহাদের পরবর্তী ছোটগল্প লেখকদের কাহিনীর দিকে বিশেষ খেয়াল নাই, চরিত্র-চিত্রণ বা কোন একটি মনের অবস্থাকে রূপায়িত করাই যেন তাঁহাদের গল্পের মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া এইসব লেখকদের মধ্যে একটা বিদ্রোহের সুর আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সকল মানুষেরই বাঁচিয়া থাকিবার একটা ন্যায্য অধিকার রহিয়াছে—এই মূল নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তাঁহারা এই বিদ্রোহের সুর তাঁহাদের লেখনীতে ঝঙ্কৃত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেন—রশীদা জফর, আলী সর্দার জাফরী, আহমদ আলী এবং হয়াতুল্লা-অনস্বারী।

রশীদা জফরের আউরৎ অওর দুসরে অফসানে নামক ছোটগল্প-সংগ্রহে যে সকল ভাবধারা লক্ষিত হয় তাহার প্রত্যেকটিতেই বিদ্রোহের সুরই ঝঙ্কৃত হইতেছে। রশীদাও পূর্ব-সুরীদের ন্যায় সমাজের দুর্নীতি, গরীবের দুঃখদুর্দশা প্রভৃতিই বিবৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মূল বক্তব্য হইল কেন উৎপীড়িতেরা নির্বিবাদে অত্যাচারীদের অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইবে? গরীব ও ধনীদের মধ্যে যে সামাজিক বৈষম্য তাহার মূল উচ্ছেদ করিয়া দিতে হইবে। অদৃষ্টের দোহাই, ধর্মে মানুষের প্রভেদ বা স্ত্রীপুরুষের সামাজিক বিভেদের মূলে যে প্রতিষ্ঠাবান পুরুষদের স্বার্থসিদ্ধিই লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাই প্রমাণের এখানে প্রচেষ্টা।

আলী সর্দার জাফরীর চিন্তাধারা আরো বিদ্রোহাত্মক। বর্ণ-বৈষম্য বা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে তিনি আরো কঠোর হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মনজিল নামক ছোটগল্প-সংগ্রহের প্রত্যেকটি গল্পই এইরূপ ভাবধারায় পরিপূর্ণ। সীপাহী কী মৌৎ-এ যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা কতকটা বাড়াবাড়ি হইলেও কার্যপরম্পরার ভিতর দিয়া তাঁহার বক্তব্যে তিনি সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। জনাকীর্ণ হাসপাতালে ইউরোপীয় সৈনিকের স্থান-অকুলানের সুবিধার্থে ইচ্ছা করিয়াই একজন ভারতীয় সৈনিককে অতিরিক্ত মাত্রায় ঔষধ সেবন করান হইয়াছে, যদিও সে তাহার প্রভু-শাসনকর্তার স্বার্থের জন্যই বহু দূরদেশে গিয়া নিজকে আত্মবলি দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। অধিকন্তু ইউরোপীয় সৈনিকটি হইতে ভারত-সৈনিকটিরই প্রাণে বাঁচিবার আশা ছিল বেশী—তাহা হইলেও অধীনস্থ প্রজাকেই যে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই যে বলশালী শাসনকর্তার বিধান ও প্রভুভক্ত সৈন্যের পুরস্কার! এইরূপভাবে তাঁহার

অন্যান্য গল্পেও কঠোরভাবে বিদ্রোহাত্মক চিত্রের পরিবেশ করা হইয়াছে। 'পাপ' অথবা 'আদমজাদে' আমরা দেখিতে পাই যে পুরুষের হস্তে ন্যস্ত সামাজিক শাসনের ফলে একটু দুর্বলতার জন্য মেয়েরা কঠোর শাস্তি পাইয়া থাকে কিন্তু তাহা হইতে অনেক বেশী অন্যায় করিয়াও পুরুষেরা সহজভাবেই সমাজে আধিপত্য করিতেছে।

হয়াতুল্লা-আনস্বারীও এইরূপ বিদ্রোহের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু কৌতুকের আমেজ দ্বারা এই সকল ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ছোটগল্প এতটা তিক্ত হয় নাই। তাঁহার মুস্বীবৎ নামক ছোটগল্প-সংগ্রহে যে সকল গল্প রহিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কমজোর পৌদা-য় দেখিতে পাই যে এখানেও 'পাপ' বা 'আদমজাদ'-এর ন্যায় সমাজ-অধিকারের ফলে পুরুষেরাই মেয়েদের অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, তবে এখানে স্বর বিদ্রোহাত্মক হইয়াও হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়া অনেকটা করুণরসে সিক্ত। মেয়েদের অসহায় অবস্থা কি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইতেছে—যখন গরীব গ্রামবাসী বলিতেছে, কিসী কা নাম কিয়োঁ লেতে হো—আপনী কিসমৎ কো কহো। অর্থাৎ, কারো নাম বলে আর কি লাভ, আপন অদৃষ্টই দায়ী।

দুলারীর পিতা ঠিক একই স্বরে বলিতেছে, বশীর মিয়াঁ কা তো কুছ নহীঁ গিয়া—ইস্ কম্‌বখ্‌ৎ কী জিন্দগী খরাব্ কর দী। অর্থাৎ, বশীর মিঞার আর কি ক্ষতি হলো, কিন্তু এই হতভাগার জীবন যে একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল!

খেয়ালের বশে বশীর নিরীহ, নিরপরাধ দুলারীকে প্রেমজালে জড়িত করিয়া তাহার যে সর্বনাশ করিল—এই দুঃখপূর্ণ কাহিনীই অতি সুন্দরভাবে কমজোর পৌদায় ব্যক্ত হইয়াছে।

এই গল্প-সংগ্রহে ঢাঈ সের আটা ঝাঁঝাল হাস্য-রসের মাধ্যমে বেশ একটি বাস্তব চিত্র। বাড়ীর গৃহিণী তাঁহার আড়াই সের আটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। ইহা বাড়ীর দাসীকে দিয়া দেওয়া হয়। সে ইহা খাইবার অনুপযুক্ত মনে করিয়া এক ফকীরকে বিলাইয়া দেয়। ফকীরও ইহা রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। কিন্তু একজন কর্মচ্যুত মজুর পরম আনন্দে ইহা কুড়াইয়া নিয়া সমারোহের সহিত অতিভোজরূপে গ্রহণ করে। এখানে মজদুর জীবনের অসহায় অবস্থা অতি সহৃদয়তার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে।

এই যুগে আধুনিকতার পরিপোষক ছোটগল্পে যেমন সমাজ-চিত্রের

চিত্রণ রহিয়াছে, তেমনি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষক নানা ছোটগল্পও তাহারই আঙ্গিক প্রেমকাহিনীর চিত্রও যথেষ্ট লক্ষিত হয়। প্রেমপূর্ণ কাহিনী বা আবেগময় কামনা-লালসার চরিত্র-চিত্রণে যাঁহারা কতকটা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন—মহম্মদ অসলাম এবং আবিদ আলী। কিন্তু বেগম ইক্রামুল্লার মতে চিন্তাধারার মৌলিকতা, ভাব ও ভাষার সুসামঞ্জস চিত্রণ বা অন্তরের গভীর অনুভূতি দ্বারা লেখনীকে সুসংযত করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারা কেহই পূর্ববর্তী ছোটগল্প লেখকদের সমকক্ষ নহেন।

মুখ্যতঃ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষক ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন—খাজা আব্দুল ঘফ্ফার, নিয়াজ ফতেহপূরী, হাফিজ জালন্ধরী এবং হিজাব ইস্মাঈল। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন নিয়াজ ফতেহপূরী এবং অধুনা ইম্তিয়াজ আলী তাজ সাহেবা নামধারী হিজাব ইস্মাঈল। ঔপন্যাসিক বা রস-সাহিত্যিকার হিসাবে পূর্বেও ইঁহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। ছোটগল্পকার হিসাবেও তাঁহারা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া একদিকে নূতনত্বের সন্ধান দিতে পারিলেও আধুনিক খাঁটি ছোটগল্প লেখকদের সমপর্যায়ে তাঁহারা পৌছিতে পারেন নাই।

কবি হিসাবে জালন্ধরী সাহেবের আলোচনা আমরা ইতিপূর্বেও করিয়াছি। ছোটগল্প হিসাবে তাঁহার আফসানা দর ফসানা, হোশিয়ার দেওআনা এবং খুদ্-কুশী কতকটা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আধা-পাগল চরিত্রের মন বিশ্লেষণে হোশিয়ার-দেওয়ানায় তিনি অনেকটা সফলতা অর্জন করিয়াছেন বলিতেই হইবে।

ঔপন্যাসিক ঘফ্ফারের আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। তাঁহার ছোটগল্প-সংগ্রহ 'তীন পয়সে কী ছোকরী' উল্লেখযোগ্য। এই সংগ্রহে ডিপুটী স্বাহেব কা কুত্তা-ই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। ইহাতে এক অত্যাচারী দারোগার মানসিক পরিবর্তনের রূপটি বেশ হাস্যরসের মাধ্যমে চিত্রিত হইয়াছে। সে গ্রামের সকলকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। যদি কোন কুকুর তাহার পেছনে ধায়, তাহা হইলে তো আর কোন কথাই নাই। ইহার প্রতি সে অতি রূঢ় ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করে না। কিন্তু ক্রন্দনরত বেচারা কুকুরটি সম্বন্ধেই যখন কোন গ্রামবাসী জানায় যে ইহা ডিপুটি সাহেবেরও হইতে পারে। তখনই দারোগার মনের পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। মুহূর্তেই সেই কুকুর তাহার নিকট শান্তশিষ্ট ভদ্র কুকুররূপে পরিবর্তন লাভ করে এবং ইহাকে সে সসম্মানে ডিপুটি সাহেবের বাড়ীতে পৌছাইয়া দেয়।

মনস্তত্ব বিশ্লেষণকারী উপন্যাস বা ছোটগল্প রচনায় নিয়াজ ফতেহপূরীই বোধ হয় উর্দু সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তবে উপন্যাস বা ছোটগল্প—যে আখ্যাই দেওয়া যাউক না কেন, তাঁহার তথাকথিত উপন্যাস বা ছোটগল্পের মধ্যে কোন সুসংবদ্ধ কাহিনী নাই। তথায় বিষয়বস্তুতে যে ভাষার ধারা তিনি প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহা অভিনব। নিগারিস্তান নামক ছোটগল্প-সংগ্রহে একমাত্র সতী নামক গল্পটিতেই একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনী বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য তথাকথিত ছোটগল্প তথা এক মুসব্বির, এক শব কী কীমৎ, মুহব্বৎ কী দেবী অথবা অপনে চন্দ সে প্রভৃতি যেন গল্পের ভাষায় একটি মনস্তাত্বিক ভাবের সুসংবদ্ধ প্রকাশ। রূহ কী ফরীব, কারিয়ানে ছোটগল্পের আভাসে তিনি প্রেম ও সত্যের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত করিয়াছেন। কুর্বানগাহে-হুসন্-এ সৌন্দর্য-গর্বিত ও অহঙ্কারদীপ্ত নারী কেমন করিয়া সাধারণ মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, তাহার একটি মনস্তত্বমূলক আলোচনা। কুপিড অওর সঙ্গীকী-র কাহিনীভাগ গ্রীসদেশীয় রূপকথার অবলম্বনে লিখিত হইলেও নিয়াজ ইহাকে আরো সম্প্রসারণ করিয়া মনোমুগ্ধকর মনস্তাত্বিক আলোচনায় পর্যবসিত করিয়াছেন।

হিজাব ইম্‌তিয়াজ আলী তাজ একজন প্রসিদ্ধ ছোটগল্প লেখিকা। সরস, সুললিত ভাষায় কাব্য-ছন্দে আধাসত্যি, আধামিথ্যা বা বাস্তব ও কল্পনার রং মিশাইয়া অনেক ছোটগল্পই তিনি আমাদের উপহার দিয়াছেন। তাঁহার প্রায় গল্পেই 'রূহী'-র জীবন কাহিনীর নানা ঘটনা পৃথক পৃথক চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। এই রূহীকে লেখিকার নিজ জীবন-আলেক্ষ্য বলিয়াও কেহ কেহ মনে করেন। বস্তুতঃ তাঁহার প্রথম ছোটগল্প-সংগ্রহ 'মেরী না তমাম মুহব্বৎ অওর দুসরে অফসানে-তে রূহীর প্রেমকাহিনী সংলাপই রূপলাভ করিয়াছে। তাঁহার পরবর্তী ছোটগল্প-সংগ্রহ 'কাউন্ট ইলিয়াস' এবং লাশ অওর দুসরে অফসানে-তে আধা-রোমাঞ্চকর এবং আধা-কল্পনাত্মক কাহিনীর সমাবেশ। এখানেও প্রায় গল্পেই রূহীর জীবনের ঘটনাসমূহই বিবৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে অনেক আজগুবি ঘটনার বর্ণনা থাকিলেও ঘটনার সুষ্ঠুবিন্যাস এবং বর্ণনায় আন্তরিকতার মাধুর্যের জন্য এই আজগুবি ঘটনাসমূহও অনেক সময় বাস্তব বলিয়াই অনুভূত হয়।

মজনূঁ গোরখপূরী-র অধিকাংশ ছোটগল্পই ইংরেজী সাহিত্যের অনুবাদ মাত্র। ধার করা হইলেও বর্ণনার ভঙ্গি ও নিজস্ব চিন্তাধারার মাধুর্যে অনেক সময় এইগুলিও খাঁটি ছোটগল্প বলিয়া স্বীকৃত হয়। তাহা হইলেও এই

ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবেই সাহিত্য আলোচনামূলক অনেক প্রবন্ধ তিনি লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার 'আদব অওর জিন্দগী অওর তন্‌কীদী হাশিয়ে' সাহিত্য-আলোচনার একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিসাবে উর্দু-সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবে। কবি হিসাবেও মজনূঁ-র প্রসিদ্ধি আছে।

নবীন উর্দু ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে কির্শন্ চন্দর এবং ইস্‌মৎ চুঘ্‌-তাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের ছাড়া আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে—জলীল কিদ্‌ওআয়ী, আজম্ কুরীবী, আখতর, সাদৎ হুসন মিণ্টু, কৌসর চান্দপুরী, নসীম অন্‌হোনবী, বাকর মালিক রিজবানী, হামিদ আলী খান, ফজল হুসন, কুরেইসী, রাজেন্দর নাথ বেদী এবং উপেন্দর নাথ অশ্‌ক্।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে অওধ্-পঞ্চ্-এর ব্যঙ্গ-চিত্রাদির মাধ্যমেই উর্দু সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাস ও ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়। এইসঙ্গে ব্যঙ্গ-চিত্রাদিও ক্রমশঃ পরিপূর্ণতা লাভ করে। ছোটগল্প ও উপন্যাস যেমন সমাজ-চরিত্রকে উন্নত করিতে পারে, তেমনি ব্যঙ্গচিত্রও সমাজ-জীবনের অনেক কুপ্রথাকে দূরীভূত করার ক্ষমতা রাখে। অওধ্-পঞ্চের সময়কার কোন ব্যঙ্গচিত্রই চরিত্র-রূপায়নে উন্নীত হয় নাই। সৈয়দ ইম্‌তিয়াজ আলী তাজ-ই বোধ হয় সর্বপ্রথম তাঁহার চচা চক্‌কন্-এর মাধ্যমে ব্যঙ্গচিত্রকে চরিত্রে রূপায়নে সফলকাম হন। তাঁহার অনেক ব্যঙ্গচিত্রেই একটা কাহিনীর সঙ্গে চরিত্রের পরিপুষ্টিও লক্ষিত হয়। এবং তাঁহার অনুকরণে মহম্মদ অসলম, মুল্লা রুমূজী এবং আজীম বেগ ব্যঙ্গচিত্রকে চরিত্রে রূপায়নে সহায়তা করিয়াছেন।

ব্যঙ্গচরিত্র রূপায়নে শৌকৎ থানবী-র স্বদেশী রেল-ই উর্দু সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের নৈরঙ্গে-খেয়ালের বিশেষ সংখ্যায় ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা এতই প্রসিদ্ধিলাভ করে যে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা এবং ইংরাজীতেও ইহা অনূদিত হয়। কংগ্রেস সভা ফেরৎ কোন কংগ্রেসসেবী ষ্টেশনে আসিয়া শুনিতে পায় যে ইতিমধ্যে 'স্বরাজ' লাভ হইয়া গিয়াছে। কানপুর অভিমুখী কংগ্রেস-সেবকটি স্বরাজলাভের ফলে ষ্টেশনে নানা বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলাই দেখিতে পায়। অবশেষে গাড়ী কানপুর রওয়ানা হইলে সংঘর্ষ ঘটিয়া নিদ্রোত্থিত ব্যক্তিটি বুঝিতে পারে যে কাহিনীটি স্বপ্নমাত্র। নানা ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মাধ্যমে লেখক দেখাইতে চেষ্টা

করিয়াছেন যে অনুপযুক্তের হাতে যদি আশাতিরিক্ত ফলও লাভ হয়, তাহা হইলেও সে তাহা সার্থকভাবে কাজে লাগাইতে পারিবে না।

শৌকৎ কাব্য-সাধনাও করিয়াছেন। এবং ঘজল বা গীতি-কবিতার সংগ্রহরূপে তাঁহার গহরে-স্তান নামক একটি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইলেও তাঁহার খ্যাতি হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পেই। ইতিমধ্যে তাঁহার চারিটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের নাম যথাক্রমে—মৌজে-তবস্সুম্, বহরে-তবস্সুম্, সীলাবে-তবস্সুম্ এবং তুফানে-তবস্সুম। শশ্-মহল নামে তাঁহার একটি চিন্তামূলক সাহিত্য গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে।

খানবীর পরবর্তী ব্যঙ্গ-চিত্র ও হাস্যকৌতুকপূর্ণ ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন—পতরাস্, ফরহৎ উল্লা বেগ, রশীদ আহমদ সিদ্দিকী এবং কনহিয়া লাল কপূর। পতরাসের ব্যঙ্গ-রসাত্মক গল্পসমূহের একত্রে নামকরণ হইয়াছে মজামিনে-পতরস। এবং ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে লাহোর কা জুগ্‌রাফিয়া।

আধুনিক যুগের মির্জা ফরহৎ উল্লা বেগ-ই খাঁটি কৌতুকপ্রিয় লেখক। নজীর আহমদ এবং নাস্বির ফিরাকের অনুকরণে সুন্দর সুন্দর শব্দচয়ণ ও চটুল বাক্যাংশের দ্বারা তিনি বিষয়বস্তুকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। বিষয়-বস্তুতে ব্যঙ্গার্থ বিশেষ কিছুই দৃষ্ট হয় না। তাঁহার চরিত্র-চিত্রণ ছোটগল্পাকারে রচিত হইলেও তাঁহাকে রসাত্মক আলোচনার মাধ্যমেই বিষয়বস্তুকে উপভোগ্য করিতে সচেষ্ট দেখা যায়। তাঁহার রসাত্মক প্রবন্ধ ও ছোটগল্পসমূহ কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া মজামিনে-ফরহতুল্লা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাঁহার রসাত্মক ছোটগল্পের মধ্যে মৌলবী স্বাহেব কী বীবী, মিয়াঁ বীবী কী লড়াঈ এবং হকীম স্বাহিব প্রভৃতি বেশ উপাদেয়।

রশীদ আহমদ সিদ্দীকী আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। তাই তাঁহার লেখনীতে যেমন কঠিন আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার, তেমনি বিষয়বস্তু শ্লেষাত্মক হইয়াও অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাঁহার বিষয়বস্তুও প্রায় সময়েই প্রবন্ধাকারে লিখিত। 'খন্দান্' আখ্যায় তাঁহার রসাত্মক আলোচনা সমূহ গঞ্জহায়ে-গরানমায়হ নামক সংগ্রহরূপে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

মুল্লা রুমূজীর লেখনী যেমন হাস্যসমুজ্জ্বল, তেমনি আবার ব্যঙ্গার্থক ও গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ। যেমন তাঁহার রসাত্মক আলোচনায় সহজ, সরল শব্দ ও বাক্যাদির সমাবেশ হইয়াছে, তেমনি আবার ইঙ্গিতপূর্ণ দ্ব্যর্থক শব্দার্থালঙ্কারে

পরিপূর্ণ। যেমন তিনি সাধারণ খোশ-মেজাজী রসসমৃদ্ধ আলোচনা করিয়াছেন, তেমনি আবার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনায়ও আগ্রহ দেখাইয়াছেন। যে রকম আলোচনাই তিনি করুন না কেন, একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে সমাজ-চেতনার উন্নয়নেই কেবল যেন তিনি মসী ধারণ করিয়াছেন এবং এই সকল আলোচনায় তিনি ছিলেন নির্ভীক। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ভূপালে তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়।

সুবিন্যস্ত আখ্যানভাগ এবং সুনির্দিষ্ট কাহিনীর জন্য আজীম বেগ চুঘ্তায়ী উল্লেখযোগ্য। তাঁহার হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের মধ্যে কোল-তার এবং শরীর বীবী গল্প-সংগ্রহই বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি অনেক গ্রন্থই লিখিয়াছেন। হাস্যরসাত্মক ছোটগল্প ছাড়া, তাঁহার অন্যান্য দরদপূর্ণ সামাজিক ছোটগল্পেরও উল্লেখ আছে, তবে তাহাতে তিনি বিশেষ সফলকাম হন নাই। এই সকল ছাড়া তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'কোরান অওর পর্দা' নামক একটি আলোচনা-গ্রন্থেরও প্রসিদ্ধি আছে। যোধপুর রাজ্যের প্রধান বিচারপতি থাকা কালীন ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

কনহিয়ালাল কপূর অতি আধুনিক যুগের একজন প্রসিদ্ধ শ্লেষাত্মক হাস্যরসিক সাহিত্যিক। তিনি সহজ, সরলভাবে এমনি শব্দমালার যোজনা করিয়াছেন যে মনে হয় যেন কথা বলিয়া যাইতেছেন। বাহ্যিক কোন গুঢ় অর্থ নাই, কিন্তু ইহা শ্লেষপূর্ণ ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। এই শ্লেষপূর্ণ ইঙ্গিতের প্রয়োগে তিনি দেশনেতা, সমাজ-সংস্কারক, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বা চলচ্চিত্র পরিচালক প্রভৃতি কাহারো অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহার নিজের কোন পাণ্ডিত্যের অভিমান বা ধর্ম ও কৃষ্টি সম্পর্কে কোন গোঁড়ামীও নাই। তিনি সাধারণতঃ দিল্লীর টেকসালী ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার চারিটি ছোটগল্প-সংগ্রহের উল্লেখ আছে—সন্‌গ্‌ ও খিশ্‌ৎ, চঙ্গ ও রিবাব্‌, নোকে-নশ্‌তর্‌ এবং শীশা ও তীশা।

(৪) নাটকের সূচনা ও বিকাশ

উর্দু সাহিত্যে নাটকের সূচনা হয় ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। আমরা জানি যে, উর্দু সাহিত্যের ভিত্তি-ভূমি ভারতে হইলেও কৃষ্টি ও তত্ত্ব-জীবনে ইহা আরব ও পারস্যের মুখাপেক্ষীই হইয়া আছে। কিন্তু নাটকের

ইতিহাসে সেই প্রভাব আরবী ও ফারসী হইতে বিশেষ না পাওয়ায়, ইহাকে অন্যান্য স্থানীয় ও বিদেশীয় সাহিত্য প্রভাবান্বিত করিয়াছে। সংস্কৃত নাটক-সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত নাটক পরবর্তী যুগে বিশেষ চালু না থাকায়, তাহা হইতে উর্দু নাটক বিশেষ প্রভাবান্বিত হয় নাই। উর্দু নাটক বিশেষ করিয়া প্রভাবান্বিত হইয়াছে সমসাময়িক চালু বাঙলা, হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় অভিনীত কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ গান ও অন্যান্য ধর্মমূলক যাত্রাভিনয় হইতে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মৌলানা ঘনীমৎ কাশ্মিরী কর্তৃক রচিত নৈরঙ্গে-ইশ্‌ক কাব্যে এই সকল অভিনয়কারীদের বলা হইয়াছে 'ভগৎ-বাজ্' এবং এইসকল ধর্মাভিনয় কেমনভাবে ভারতীয় মুসলমানগণকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বর্ণনা তথায় পাওয়া যায়। যদিও অনেক গোঁড়া মুসলমানের মতে কোন অভিনয় মাত্রই পাপ—হিন্দুদের ধর্মাভিনয়ের তো কথাই নাই। তাহা হইলেও দেখিতে পাই যে অযোধ্যার নবাব উআজিদ আলী শা নিজেই কানাই (বা কৃষ্ণ) সাজিয়া নিজ অন্তঃপুর মহিলাদের নিয়া কৃষ্ণলীলার অভিনয় দ্বারা এইসকল যাত্রাভিনয়ের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। সমসাময়িক ইংলিশ ষ্টেজ এবং ইংরেজী ড্রামার নাটকাভিনয়ও উর্দু নাটককে বেশ প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তাহার ফলেই দেখিতে পাই অনেক ইংরেজী নাটকই উর্দু সাহিত্যে অনূদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে। এইসঙ্গে আরবী-ফারসীসম্ভূত হাসান-হোসেনের পালা, ইউসুফ জোলেখা ও লায়লা-মজনূঁ প্রভৃতির বিয়োগান্ত দৃশ্য বা প্রেমপূর্ণ কাহিনী উর্দু নাটকের সূচনায় যথেষ্ট কার্যকরী হইয়াছে।

প্রথম যুগের উর্দু নাটকে কোনো মহৎ চিন্তাধারার আদর্শ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খেলো হাস্যকৌতুক, আমোদ-আহ্লাদ এবং রঙ্ তামাসা নিয়াই মুঘল অধঃপতনের যুগের বাদশাগণ লিপ্ত থাকিতেন। সেই সময়কার দিল্লীর বাদশা ও তৎপরবর্তী অযোধ্যা ও লখনোর নবাবগণ কর্তৃকই প্রথম উর্দু নাটক 'দরবারী' পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। কথিত আছে, 'রঙ্গীলা' বাদশা নামে প্রসিদ্ধ সদা হাস্যরস ও কৌতুকপ্রিয় মুহম্মদ শাহ যখন এইরূপ গানবাজনা ও আমোদ-আহ্লাদে লিপ্ত ছিলেন, তখনই নাদির শা-র দিল্লী আক্রমণবার্তা অবগত হইয়াও রাজকর্মচারিবৃন্দ সেই দুঃসংবাদ বাদশাকে জানাইতে সাহস পান নাই এবং তাঁহার সহকর্মী অভিনেতাদের মাধ্যমেই এই সংবাদ সর্বপ্রথম রাজসমীপে প্রচারিত হয়।

প্রথম উল্লেখযোগ্য উর্দু নাটক 'ইন্দর সভা'। নবাব উআজিদ আলী

শার ইচ্ছায়ই কবি নাসিখের শিষ্য আমানৎ ইহা কাব্যকারে প্রণয়ন করেন। ইহা সঙ্গীতলহরীতে পূর্ণ। আর ইন্দ্র ও তাঁহার অপ্সরা বা পরীদের নাচগান ও তাহাদের কামোদ্দীপক হাস্যালাপই সহজ, সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দর-সভা এতই প্রসিদ্ধিলাভ করে যে ইহা ভারতীয় নানা ভাষা এবং বিদেশীয় ইংরেজী এবং জারমনী ভাষায়ও অনূদিত হয়।

ওয়াজিদ আলী শা-র নির্বাসনের পর উর্দু নাটক দরবারী পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইলেও ব্যবসার খাতিরে পার্শীগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিলেন। এইসকল আমোদ আহ্লাদে দেশবাসিগণ বিশেষ অনুরক্ত দেখিয়া কয়েকজন পার্শী ব্যবসাদারই ইংলিশ ষ্টেজের অনুকরণে অনেক থিয়েটার কোম্পানী স্থাপন করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে উর্দু নাটকের বিকাশে সহায়তা করিয়াছেন। সর্বপ্রথম উর্দু ষ্টেজ স্থাপয়িতা হইলেন শেঠ পেস্তনজী ফ্রামজী এবং তাঁহার কোম্পানীর নাম ছিল ওরিজিনেল থিয়েট্রিকেল কোম্পানী (Original Theatrical Company)। অন্যান্য নাটক কোম্পানীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল—দি ভিক্টোরিয়া নাটক কোম্পানী, দি অলফ্রেড থিয়েট্রিকেল কোম্পানী, নিউ অলফ্রেড কোম্পানী, ওল্ড পার্শী থিয়েট্রিকেল কোম্পানী এবং জুবিলী কোম্পানী। এইসকল থিয়েটারের জন্য যে সকল উর্দু নাটক রচিত হইত, তাহাদের ভাষা দিহলবী বা লখনোয়ী উর্দু হইলেও ভাষা ছিল অতি সহজ, সরল ও সর্বজনবোধ্য।

এইসকল কোম্পানীর জন্য লিখিত প্রথম উল্লেখযোগ্য উর্দু নাটক রচনাকারী হইলেন রৌনক্ বেনারসী এবং জরীফ নামে প্রসিদ্ধ মিয়াঁ হুসেইনী। তাঁহারা অনেকটা ইন্দর-সভার অনুকরণেই তাঁহাদের নাটকাদি লিখিয়াছেন। রৌনকের নাটকসমূহের মধ্যে ইন্সাফে-মহমুদ শাহ্-ই উল্লেখযোগ্য। তিনি অধিকাংশ সময় বোম্বাই শহরেই বসবাস করিতেন। এবং তাঁহার এই উর্দু নাটকটি গুজরাটি অক্ষরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। জরীফের নিম্নলিখিত উর্দু নাটক উল্লেখযোগ্য—নতীজয়ে-অস্ম‍্মৎ, খুদা-দোস্ত্, চান্দ বীবী এবং বুলবুলে-বিমার।

ভিক্টোরিয়া নাটক কোম্পানী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার জন্য নিযুক্ত নাটক রচনাকার ছিলেন বিনায়ক প্রসাদ ত্বালিব বেনারসী। তিনি উর্দু নাটকের যেমন অনেক সংস্কার করিয়াছেন, তেমনি ভাব ও ভাষারও যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার নিম্নলিখিত উর্দু নাটক উল্লেখযোগ্য:—(১) বিক্রম বিলাস,

(২) নাজ্জান, (৩) নিগাহে-ঘফ্লৎ, (৪) গোপী চন্দ, (৫) হরিশচন্দ্র এবং (৬) লয়ল ও নহার।

অহসন লখনোয়ী নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ মহদী হসন ছিলেন অলফ্রেড থিয়েট্রিকেল কোম্পানীর প্রথম নিযুক্ত নাটক রচনাকার। তাঁহার কেবল কাব্যেই নৈপুণ্য ছিল না, তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। উর্দু নাটক ছাড়া প্রসিদ্ধ মরসিয়া কাব্যকার মীর আনীসের জীবন কাহিনী সম্বলিত উআকিআতে-আনীস নামক একটি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যের ভাষা ছিল বেশ মার্জিত ও পরিশুদ্ধ। তাঁহার নিম্নলিখিত উর্দু-নাট্য উল্লেখযোগ্য :—হমলেট, ফীরুজে-গুলনার, চন্দ্রাবলী, দিল ফরুশ, ভুল-ভুলিয়াঁ, বকাওঅলী এবং চল্‌তা পুর্জহ।

অহসন লখনোয়ীর পর অলফ্রেড কোম্পানীর নাটক রচনাকার নিযুক্ত হইলেন নরায়ন পরশাদ বেতাব দিহলবী। বেতাব পণ্ডিত ডহ্‌লারায়ের পুত্র এবং (প্রসিদ্ধ কবি ঘালিব-শিষ্য) সরদার মহম্মদ খান স্বালিবের কবি-শিষ্য। নাটক রচনাই তাঁহার পেশা এবং তিনি ছিলেন বোম্বাই শহরেরই বাসিন্দা। শেক্সপিয়র নামক একটি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করিতেন। ইহাতে সমসাময়িক সকল প্রসিদ্ধ নাটকের উর্দু অনুবাদ হইত। কৎলে-নজীর তাঁহার সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ নাটক। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত উর্দু নাটক উল্লেখযোগ্য :—মহাভারত, জহরী সাঁপ, ফরীব মুহব্বৎ, রামায়ন, গোরখ্ ধন্ধা, পত্নী পরতাপ এবং কির্ষন-সুদামা।

দিল্লীর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বেশ্যা নজীরের মৃত্যুকাহিনী অবলম্বনে কৎলে-নজীর রচিত। উর্দু মহাভারত নাটক ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক চিত্র ও ঘটনার মাধ্যমে বেতাব ইহাকে সুখপাঠ্য এবং সু-অভিনয়যোগ্য করিবার সুযোগলাভ করিয়াছেন। হিন্দী ও উর্দু তথা সংস্কৃত ও আরবী ফারসী শব্দ সমভাবেই তাঁহার কাব্যে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার ভাব ও আবেগপূর্ণ ছন্দিত গদ্য সকলেরই আকর্ষণীয় হইয়াছে বিশেষ করিয়া হিন্দী গীতিকবিতাসমূহ ইহার এক প্রধান সম্পদ। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ বা স্বর্গ ও নরকের দৃশ্যের অবতারণা অনেকের দৃষ্টিকটু হইলেও বস্তুতঃ এই সকল দৃশ্য ভক্ত দর্শকবৃন্দকে সহজেই আপ্যায়িত করে। এই মহাভারত নাটক অভিনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রসিদ্ধি ছড়াইয়া পড়ে এবং উর্দু সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া ইহা এখনো গণ্য হয়। তাঁহার শেষ প্রসিদ্ধ নাটক কৃষ্ণ-সুদামা ১৯১২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

আঘা মহম্মদ শাহ হশর ছিলেন প্রথমে নিউ অলফ্রেড কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত নাটক রচয়িতা। পরে নিজেই শেক্সপিয়র থিয়েট্রিকেল কোম্পানী নামে একটি নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন। শিয়ালকোটে অবস্থিত তাঁহার নাট্য-দল কয়েক বৎসর সুখ্যাতি অর্জন করার পরে বহু আর্থিক ক্ষতির মধ্য দিয়া ইহা বিনষ্ট হইয়া যায়। তৎপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া তথাকার মদন এণ্ড কোঃ নামক এক ফিল্ম কোম্পানীর অভিনেতা নিযুক্ত হন এবং পরে ইহার প্রযোজক বা ডাইরেক্টার পদে উন্নীত হইলেন। তিনি যেমন ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও ডাইরেক্টার, তেমনি একজন প্রসিদ্ধ নাটক রচয়িতা।

হশর কশ্মীরীর আদি নিবাস কাশ্মীর হইলেও তাঁহার পরিবার বেনারসেই বসবাস পূর্বক শালের ব্যবসা করিতেন। হশরের জন্ম হয় অমৃতসরে। বস্তুতঃ তাঁহার প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি যেমন ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় নাটক হইতে উর্দু নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার নিজস্ব মৌলিক উর্দু নাটকও রহিয়াছে। তাঁহার কয়েকটি হিন্দী নাটকেরও উল্লেখ আছে, যথা, সুরদাস, গঙ্গা উতরণ, বনদেবী এবং সীতার বনবাস। তাঁহার নিম্নলিখিত উর্দু নাটক উল্লেখযোগ্য :—নেক্ পরবীন, শহীদে-নাজ, মুরীদে-শক, অসীরে-হির্স, তুর্কী হুর, খুব সুরৎ বলা, সুফীদ খূন এবং মীঠী ছুরী।

আঘা হশরকে বাঙ্গালী নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। করুণ রসের প্রাবল্য, অকারণ মৃত্যুর আতিশয্য, চরিত্রের অতিরঞ্জন ও পাশাপাশি দুইটি বিরুদ্ধ-চরিত্রের দ্বারা চরিত্র বিকাশের চেষ্টা এই উভয় নাট্যকার ও অভিনেতার মধ্যেই লক্ষিত হয়। কিন্তু অনেক সময়েই অতি গভীর করুণ দৃশ্যের পাশেই হাস্যরসপূর্ণ চিত্রাদির দ্বারা নাটকীয় পরিবেশকে হালকা করিবার প্রচেষ্টা থাকিলেও ইহাতে ক্রমবর্ধমান নাটকীয় চিত্তচাঞ্চল্য বা চিন্তাসৌষ্ঠব বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পাঠকমনকে নাটকীয় গভীর রসের উপলব্ধি হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। হশর তাঁহার নাটকে গদ্যের পাশাপাশি কবিতাও ব্যবহার করিয়াছেন। গভীর ভাবের সহিত ছন্দযুক্ত কবিতার সমাবেশ তাঁহার নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধই করিয়াছে বলিতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে আর যে সকল নাট্যকার প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হইলেন—হাফিজ মহম্মদ আব্দুল্লাহ এবং তাঁহার শিষ্য নজীর বেগ আকবরাবাদী, মুন্সী ঘুলাম আলী দেওয়ানা, মুন্সী মহম্মদ ইব্রাহীম মহশর অম্বালবী এবং মুন্সী রহমৎ আলী। তাঁহাদের মধ্যে ইব্রাহীম মহশর ছিলেন আঘা হশরের নাট্যশিষ্য এবং তাঁহার নিম্নলিখিত নাটক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে:—আতিশীন্-নাগ, নিগাহে নাজ, খুদ্ পরস্ত্, শকুন্তলা, জোশে-তৌহীদ, মীরাবাঈ এবং জঙ্গে-জর্মন। মুন্সী রহমত আলীও একজন নাট্যকার ও অভিনেতা। তিনি প্রথমে আলবর্ট থিয়েট্রিকেল কোম্পানীর পরিচালক ছিলেন—পরে তিনি নিজেই বোম্বাই সহরে অবস্থিত পার্শী থিয়েট্রিকেল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নিম্নলিখিত নাটক উল্লেখযোগ্য :—দর্দে-জিগর, বা-উফা কাতিল এবং মুহব্বৎ কা ফূল।

আধুনিক যুগে যে সকল নাট্যকার প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হইলেন বিশম্বর সহায় বিয়াকুল। তিনি প্রসিদ্ধ ভারত বিয়াকুল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। ইহা মীরাটে অবস্থিত এবং সারা উত্তর ভারতের নাট্যামোদীদের সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। 'বুদ্ধদেব' বিশম্বর সহায়ের সার্থক নাট্য রচনা। ইহা শান্তি-রস মাধুর্যের প্রকাশ দ্বারা উর্দু নাট্যকলাকে প্রকৃতই উন্নত ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। জবান পত্রিকার সম্পাদক মুন্সী জানেশ্বর প্রসাদ মাঈল-ও এই কোম্পানীর জন্য নূরে-হিন্দ তথা চন্দ্রগুপ্ত এবং তেঘে-সিতম নামক দুইটি নাটক রচনা করিয়াছেন। লালা কুঁওর সেন বিশেষ করিয়া নাট্য সাহিত্যের সমালোচক হিসাবেই প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড নাটক বেশ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ইহাতে দেবতাগণ নাটক-চরিত্র হিসাবে স্থানলাভ করিয়াছে। কুঁওর একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি লাহোর ল (বা আইন) কলেজের অধ্যক্ষ এবং পরে কাশ্মীর উচ্চ-বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আধুনিক যুগের অনেক উর্দু সাহিত্যিক তথা ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প লেখক এবং সাহিত্য-সমালোচনাকার-ও উর্দু নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের বিষয়ে পূর্বেও আলোচনা করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন—হকীম আহমদ শুজা, সৈয়দ ইম্তিয়াজ আলী, খান আহমদ হুসেন, রাধেশ্যাম, সুদর্শন, আব্দুল হলীম শরর, আজীজ মির্জা, পণ্ডিত জওলা প্রসাদ বর্ক, হকীম অজহর, নূর ইলাহী, আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী, পণ্ডিত ব্রিজ মোহন এবং কিশেন চন্দ জেবা।

প্রসিদ্ধ হজার দস্তানের সম্পাদক আহমদ শুজা যেমন একজন ঔপন্যাসিক,

তেমনি নাটক রচনায়ও তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বাপ কা গুনাহ্, ভারত কা লাল এবং জানবাজী তাঁহার উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা। তাঁহার কয়েকটি বাঙ্‌লা নাটকের উর্দু তরজমারও উল্লেখ আছে। ইম্‌তিয়াজ আলী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন অনরকলী ও দুলহন-এর রচনাদ্বারা এবং কয়েকটি ইংরেজী গ্রন্থের উর্দু নাট্যরূপ দান করিয়া। আহমদ হুসেন ছোট-গল্পকার হিসাবেই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও তাঁহার হুসন কা বাজার নাটকটি মন্দ নয়। রাধেশ্যাম বিশেষ করিয়া হিন্দু পুরাণসমূহের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াই তাঁহার উর্দু নাটক রচনা করিয়াছেন। এবং এই সকল নাটক সাধারণ দর্শকবৃন্দকে সহজেই আপ্যায়িত করিয়াছে। সুদর্শন কয়েকটি হাস্যকৌতুকপূর্ণ নাটক রচনা করিয়াছেন এবং কয়েকটি বিদেশী গ্রন্থেরও উর্দু নাট্যরূপ দান করিয়াছেন।

উর্দু সাহিত্যে সামাজিক বা রাজনৈতিক নাটক যেমন সমাদৃত হয় নাই, তেমনি কাব্য-রসপূর্ণ নাটকাদিরও উর্দু সাহিত্যিক সমাজে বিশেষ সম্মান হয় নাই। ইহার কারণ পূর্বেই কতকটা আলোচিত হইয়াছে। তাছাড়া সিনেমার অত্যধিক প্রভাবও ইহার আর একটি অন্যতম কারণ। কাব্যরসসিক্ত নাটকের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য মগুকয়ে-ফরঙ্গ। ইহা বস্তুতঃ সেক্সপিয়ারের প্রসিদ্ধ রোমিও এণ্ড জুলিয়টের উর্দু কাব্যানুবাদ। ইহার রচনাকার জওলা পরসাদ সেক্সপিয়ারের অন্যান্য নাটকেরও উর্দু তরজমা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক আব্দুল হলীম শররের শহীদে-উঅফা-ও একটি সাহিত্যরসপূর্ণ নাটক। কালিদাসের বিক্রম উর্বশী-র কাব্যানুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন আজীজ মির্জা। প্রসিদ্ধ উর্দু নাট্য ইতিহাস 'নাটক সাগর'-এর যুগ্ম-সম্পাদক নূর ইলাহী এবং মুন্সী মহম্মদ উমর মিলিতভাবে অনেক বিদেশীয় গ্রন্থের উর্দু নাট্যরূপ দান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল :—(১) রূহে-সিয়াসৎ : ইহাতে আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রেসিডেন্ট ইব্রাহাম লিঙ্কনের জীবন উর্দু নাট্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। (২) জানে-জরাফৎ : প্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মৌলিয়ারের একটি ব্যঙ্গ নাটকের উর্দু অনুবাদ। (৩) বিগড়ী-দিল : মৌলিয়ারেরই আর একটি ব্যঙ্গ নাটকের নাট্যরূপ। (৪) কজাক্ : জর্মন কবি ও নাট্যকার শিলরের রবার Robber গ্রন্থের উর্দু নাট্যরূপ। (৫) জফর কী মৌৎ : মিটরলিঙ্কের একটি আধ্যাত্মিক নাটকের উর্দু নাট্যরূপ।

উর্দু সামাজিক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল—জদ পশীমান,

রাজ-দুলারী এবং মেওআয়ে-তল্‌খ্‌। জর্দ পশীমান লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী। ইহাতে বাল্য-বিবাহ সমস্যা বিবৃত হইয়াছে। রাজ দুলারী এবং মুরারী দাদা লিখিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন পণ্ডিত ব্রিজমোহন দত্তাত্রিয় কৈফী। প্রসিদ্ধ নাট্য-সাহিত্য সমালোচক কুঁওর সেন ব্রিজমোহনকে বর্নড্‌ শ-র সহিত তুলনা করিয়াছেন। কবি হিসাবেও ব্রিজমোহনের সুখ্যাতি আছে। খুম্‌খানায়ে-কৈফী নামে তাঁহার কাব্যসঙ্কলন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। মেওয়ায়ে-তল্‌খ লিখিয়াছেন আব্দুল হলীম শরর। ইহাতে নিষ্ঠুর পর্দা-প্রথার প্রতি বিষবাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়াও উর্দু নাটক রচিত হইয়াছে। কিন্তু কোনটাই নাট্যরস-সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই। ইহাদের মধ্যে কিশেন চন্দ জেবা-র জখ্‌মী পঞ্জাব্‌ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে অসহযোগ আন্দোলনে পঞ্জাবের দান কতকটা সাফল্যের সহিতই চিত্রিত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

বাঙলায় উর্দু সাহিত্যের চর্চা

হিন্দী বা পশ্চিমা হিন্দী ও উর্দু একই ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত হইলেও হিন্দীকে মাতৃভাষা হিসাবে গণ্য করা হয় কেবল মাত্র দিল্লী ও পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহে ; আর সাহিত্যিক-ভাষা হিসাবে ইহাকে সারা উত্তর-ভারতই গ্রহণ করিয়াছে। অন্যথায় উর্দু ভারতের কোন প্রদেশেরই আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষা নহে। ইহাতে উর্দুর প্রসারতা একদিকে সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হইলেও মুসলিম কৃষ্টি বা আরবী ফারসী ভাষার সহিত সংস্পৃষ্ট বলিয়া যেখানেই মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, তথায়ই উর্দু ভাষার চর্চা হইয়াছে। উর্দু ভাষার ইতিহাস আলোচনাকালে ইহাই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

মুসলমানগণ তাঁহাদের সভ্যতা বা কৃষ্টির ভাষারূপে আরবী ফারসীকেই সাধারণভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারই সুযোগ নিয়া মুসলমান মাত্রেই উর্দুর প্রতি কতকটা আকৃষ্ট হয়, যদিও তাহার মাতৃভাষা হয়তঃ হিন্দী (বা ইহার সহোদরা স্থানীয়) উর্দু নহে। ইহা বস্তুতঃই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু হয়ত হিন্দী জানেন না বা ইহার বিশেষ আলোচনা করেন না, কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমান মাত্রেই কম-বেশী উর্দুর প্রতি আকৃষ্ট। ইহারই আঙ্গিকরূপে আমরা বলিতে পারি যে বাঙলায় ইসলামীয় কৃষ্টির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই (বিশেষ করিয়া) মুসলমানগণ যেমন আরবী ফারসীর আলোচনা করিয়াছেন, তেমনি উর্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইহারও আলাপ আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন।

বাঙলায় উর্দু সাহিত্যের চর্চা বিশেষ করিয়া সূচিত হয় মুর্শিদাবাদের নবাবী আমল হইতে এবং আমরা দেখিতে পাই যে উর্দু সাহিত্যের (দেহলবী-) উর্দুর সমৃদ্ধির যুগেই সোজ মুর্শিদাবাদে উর্দু সাহিত্যের চর্চা করিয়াছেন। আর প্রসিদ্ধ ইন্‌শার জন্মভূমিই তো বাঙলা তথা মুর্শিদাবাদে। ইহার পরবর্তীকালেও অনেক উর্দু কবি ও সাহিত্যিক নবাব দরবারে সাহিত্যালোচনার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। আর কলিকাতায় উর্দু সাহিত্য আলোচনার সুযোগ হয় ১৯শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। এবং দেশী-বিদেশী যে সকল বিদ্বজ্জন তথায় উর্দু সাহিত্যের চর্চা করিয়াছেন, তাহার বিবরণ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার

পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে যখন ফারসীর স্থলে উর্দু সরকারী ভাষারূপে গণ্য হয়, তখন ইহাই স্বাভাবিক যে শিক্ষিত মাত্রেই উর্দু সাহিত্যের চর্চা করিবেন— যেমন তাঁহারা পূর্ববর্তী যুগে করিয়াছেন ফারসী সাহিত্যের আলোচনা।

কলিকাতায় উর্দু সাহিত্যের নূতন উদ্দীপনা দৃষ্ট হয়, যখন অযোধ্যার নবাব উআজিদ আলি শা অন্তরীন অবস্থায় (১৮৫৬-৮৭) কলিকাতার মেটিয়াবুরুজে বসবাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়কার দুইজন বাঙ্গালী উর্দু সাহিত্যিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের একজন হইলেন হুগলী অধিবাসী কাজি মহম্মদ সাদিক খান আখতর এবং অন্যজন রাজসাহী (বা মতান্তরে ফরীদপুর)-র মৌলবী আব্দুল ঘফুর। ইঁহাদের সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের সমসাময়িক অন্যান্য কবি বা সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন—ফরীদপুরের শাহিদ, চট্টগ্রামের রম্‌জ এবং মুর্শিদাবাদের ফরিয়াদ। কবি উল্‌ফৎ হুসেন ফরিয়াদের 'তারিখে-নাদিরী' নামক একটি গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে।

'আহমদ' কবি-নামধারী আহমদ আলীর জন্মভূমি ঢাকা। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ঈরানের অধিবাসী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি আরবী ও ফারসী এই উভয় ভাষায়ই সুপণ্ডিত ছিলেন। এবং তাঁহার ফারসী ও উর্দু এই উভয় ভাষায়ই কবিতার উল্লেখ আছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ২২।২৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং তথায়ই তাঁহার পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করেন। 'মদ্‌রসহ্‌-ই-আহমদিয়' নামে তাঁহার আরবী-ফারসীর একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের উল্লেখ আছে। তিনি কলিকাতার 'মদ্‌রসহ্‌-ই আলিয়া'-র একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য :—(১) মুয়িদে-বুর্হান : ইহা প্রসিদ্ধ কবি ঘালিবের বুর্হান-কাত্বে-র জবাব-স্বরূপ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। (২) শম্‌শীরে-তেজতর : ইহা লেখা হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ঘালিবেরই 'তেঘে-তেজ'-এর জবাব রূপে। (৩) তরানা : কবিতা-সংগ্রহ। (৪) ইশ্‌তিকাক্‌ : ফার্সী ব্যাকরণ সম্বন্ধীয়। (৫) হফ্‌ত্‌-আসমান : ইহা মসনবী-কাব্যের সপ্ত-ছন্দের বিশদ ব্যাখ্যা। ইহার প্রথম অধ্যায়টি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় 'আসমানে-আওয়াল' নামে প্রকাশিত হয়। আহমদ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় প্রাণত্যাগ করেন।

ঢাকার নবাব-পরিবারভুক্ত সৈয়দ মহমুদ আজাদ এবং খান বহাদুর মহম্মদ আজাদ ভ্রাতৃদ্বয় উর্দু সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। অউধ-পঞ্চের

সহিত সংস্পৃষ্ট নবাব মহম্মদ আজাদের নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার জেষ্ঠ্য-ভ্রাতা সৈয়দ মহমুদ আজাদ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায়ই ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তিনি উপরি-উল্লিখিত আহম্মদ আলীর একজন উপযুক্ত ছাত্র ছিলেন। তাছাড়া তিনি সমসাময়িক অন্যান্য কবি বিশেষ করিয়া প্রসিদ্ধ ঘালিব হইতেও কাব্যে পাঠ-গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঘালিবের ন্যায় উর্দু হইতে ফারসীর প্রতিই তিনি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার একটি ফারসী ও উর্দুর (সম্মিলিত) দেওয়ান বা কবিতাসমূহের উল্লেখ আছে।

'শাহবাজ'-কবিনামধারী কলিকাতাবাসী অধ্যাপক সৈয়দ মহম্মদ আব্দুল ঘফুরও একজন বাঙ্গালী উর্দু সাহিত্যিক। তিনি তখনকার উর্দু পত্রিকাসমূহ তথা (লক্ষ্ণৌর) অউধ-পঞ্জ, (কলিকাতা হইতে প্রকাশিত) দারুস্-সুল্ত্বানৎ এবং উর্দু-গাইডের নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যেও একজন বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাছাড়া আরবী, ফারসী ও বাঙলাতেও তাঁহার পাণ্ডিত্য কম ছিল না। তিনি নানাপ্রকার উর্দু কবিতাই লিখিয়াছেন। তাঁহার নজীর আকবরাবাদী সম্বন্ধীয় 'জিন্দগানিয়ে-বেনজীর' নামে একটি উর্দু গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে। উর্দু কাব্যে প্রতিষ্ঠাবশতঃ তিনি পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যে একটি অধ্যাপকপদ লাভ করেন এবং তথায়ই তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়।

'শম্স্' কবিনামধারী আবুল কাসিম মহম্মদ মজহরুল হক্ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন প্রসিদ্ধ উর্দু কবি নস্সাখ। বাল্যকাল হইতেই শম্স উর্দু কাব্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার প্রিয় কবি ছিলেন প্রসিদ্ধ দাঘ। তাঁহার নিকট হইতে তিনি পত্র মারফৎ কাব্য-পাঠও গ্রহণ করিয়াছেন। কথিত আছে, তাঁহার কোন কবিতা পাঠ করিয়া দাঘ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনিও এইরূপ কবিতা লিখিতে সমর্থ নহেন। এই বাক্যের সমর্থন রহিয়াছে 'মুকালাতে-ওহশৎ'-এ। এবং ইহারই গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী উর্দু কবি ওহশৎ ছিলেন শম্সের একজন প্রিয় কাব্যশিষ্য। শম্স ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। এবং তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন 'আরিফ' কবিনামধারী মুর্শিদাবাদের নবাব নস্বীরুল্-মুল্ক এবং আব্দুল হলীম আস্বীম। তাঁহারা উভয়েই প্রসিদ্ধ উর্দু কবি এবং শেষোক্ত কবির অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'লালায়ে-আস্বীম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"আরজূ"-কবিনামধারী সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লখ্নোতে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কলিকাতায়ই বসবাস করেন এবং তাঁহার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত অনেক বাঙ্গাল কবিই আধুনিক উর্দু সাহিত্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। উর্দু সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়ই আরজূর বিশেষ দখল ছিল। নানাপ্রকার কাব্য, উর্দু-সাহিত্য বিশ্লেষণ এবং কয়েকটি নাটকও তিনি লিখিয়াছেন, তাহা হইলেও পরবর্তী জীবনে উর্দু গানের বিশেষজ্ঞ হিসাবে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ফিল্ম কোম্পানী নিউ থিয়েটার্সের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। পরবর্তী কালে বোম্বাই নেশানেল কোম্পানীর আহ্বানে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তথায় গমন করেন এবং তাঁহার শেষজীবন তথায়ই অতিবাহিত হয়।

মহম্মদ আফজল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ঢাকাতেই তিনি ফারসী ও ইংরেজীতে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং নবাব মহম্মদ আজাদকে তাঁহার কাব্যগুরু হিসাবে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য নানাপ্রকার কবিতা লিখিলেও 'তারীখ'-কবিতার প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এবং তাঁহার তিন খণ্ড 'মুজ্মুয়ায়ে-তরারীখ'-এর উল্লেখ রহিয়াছে। এই 'তারীখ'-প্রীতি বশতঃ তাঁহাকে অনেক সময় 'আফজল্-উল্-মুওরখীন্' ও 'নস্সাখে-সানী' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

'হস্রৎ'-কবিনামধারী মুন্সী দলীলুদ্দীন আহ্মদ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বিশেষ কাব্যস্পৃহা ছিল। প্রথমে নস্সাখ হইতে কাব্যে-পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরবর্তীকালে তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র কবিবর 'শম্স' হইতে কাব্যানুশীলন করিয়াছেন। তিনি ভারতের মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতার সকল কেন্দ্রস্থল ঘুরিয়া মুসলিম সাহিত্যে সকল পারদর্শীদের নিকট হইতেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্তানী অধ্যাপক ছিলেন।

'বীদার' কবিনামধারী খাজা মহম্মদ বীদার বখ্ৎ খাজা মহম্মদ আকবর নক্শবন্দীর পুত্র। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। যে সকল বাঙ্গালী উর্দু কবি প্রসিদ্ধ দাঘের নিকট হইতে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেন 'শম্স' ও 'বীদার'। ডক্টর অন্দলীব শাদানী তাঁহার 'মশ্রিকী পাকিস্তান কে উর্দু আদীব'-এ বীদারের অনেক কবিতার উদ্ধৃতি সহকারে তাঁহার কাব্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

এবং এই সঙ্গে দাঘের প্রশংসাসূচক বাক্যটি আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন—"আপনে ঘজল খুব কহী, মুঝে বহুৎ পসন্দ আয়ী।"

'আহসন'-কবিনামধারী শফাউল্-মুল্‌ক হকীম হবিবুর-রহমান উর্দু-সাহিত্যের একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পেশোয়ারের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা তথা হইতে প্রথমে দেওবন্দে আসেন, এবং তথায় কিছুকাল বসবাসের পর ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ মৌলানা আশরফ আলী থানবী তাঁহার একজন সহপাঠী ছিলেন। আমাদের কবিবর আহসন ঢাকায়ই ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তথায় প্রাণত্যাগ করেন। তিনি একজন হকীমী ডাক্তার ছিলেন এবং ঢাকায় 'ত্বিব্বিয়া হবীবিয়া কলেজ'-এর প্রতিষ্ঠা তাঁহার একটি অক্ষয় কীর্তি। তাছাড়া উর্দু-সাহিত্যের পরম বান্ধব হিসাবে ঢাকায় তিনি সর্বপ্রথম ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উর্দু সংবাদ-পত্র 'মশ্‌রিক'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে 'জাদূ'-নামে একটি উর্দু মাসিক পত্রিকাও তিনি তথায় প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটি উর্দু-গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে, যেমন—সলাসায়ে-ঘস্সার, আসূদগানে-ঢাকা, কুছ আপনী বাতীন এবং ঢাকা কী তারীখী ইমারতীন প্রভৃতি। তিনি একদিকে যেমন হেকিমী চিকিৎসক ছিলেন, আবার অন্যদিকে উর্দু ও আরবী-ফার্সীর একজন কৃতী পণ্ডিত ছিলেন। এবং এই উভয় কারণেই নানাস্থানে ঘুরিয়া মুসলিম হেকিমী চিকিৎসক এবং আরবী-ফারসী সাহিত্যের পণ্ডিতদের সাহচর্য লাভ করিয়াছেন।

সুসাহিত্যিক 'খালিদ বঙ্গালী' নামে প্রসিদ্ধ মহমূদুর-রব সিদ্দিকী ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত বৌলাই নামক এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সুযোগ্য পিতা আব্দুল হাই আখতর অন্ততঃ ৫০ খানি গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। খালিদ বঙ্গালী একজন গ্রাম্য-কবি এবং সমস্ত জীবন একেবারে পাড়াগাঁয়ে কাটাইয়া গেলেও তাঁহাকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের একজন প্রসিদ্ধ উর্দু-কবি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে রফা রাশিদী বলিয়াছেন, "খালিদ বঙ্গালী কা শুমার বিসুয়িন স্বদী কে আওয়ালীন দৌর কে মায়য়ায়ে-নাজ ব জলীলুল্-কদর ইন্‌শা-পর্দাজ আওর বিল্-কমাল শায়েরোন মেঁ হোতা হৈ।" তাঁহার অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ সমসাময়িক সকল প্রসিদ্ধ উর্দু পত্রিকায়ই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি নিজেও একটি মাসিক উর্দু পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন

এবং সেই 'আখতর' নামক উর্দু পত্রিকাটি তাঁহার নিজ গ্রাম বৌলাই, হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম প্রকাশ হয় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। এবং ইহার নিয়মিত লেখক ছিলেন উঅশৎ কলকত্তয়ী, নাত্বিক লখ্নবী, আর্জু লখ্নবী, নিয়াজ ফতহপুরী, দিলগীর ইলহাবাদী, মায়িল ইলহাবাদী ও অন্যান্য সকল সমসাময়িক প্রসিদ্ধ উর্দু সাহিত্যিক। বস্তুতঃ ইহা এক পরম আশ্চর্য ও গৌরবের কথা যে কোন এক নিরেট গ্রাম হইতে (যেখানের অধিবাসী সকলেই বাঙ্গালী এবং সম্পূর্ণভাবে বাঙ্‌লাই যাহাদের মাতৃভাষা) একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশ হইতে পারে। আমাদের কবিবর খালিদ বঙ্গালীর পক্ষে ইহা উর্দু সাহিত্যের সেবা ও সাধনার একনিষ্ঠ পরিচয়। ইহা আমাদের বাঙ্গালীর পক্ষে এক পরম অক্ষয় কীর্তি।

খালিদ কেবল উর্দু সাহিত্যেরই সেবক ছিলেন না। তিনি আরবী ও ফারসী সাহিত্যেও একজন বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নানা প্রকার উর্দু-কবিতারই উল্লেখ আছে। এখানে আমরা তাঁহার কবিতার নিদর্শনস্বরূপ একটি 'নিয়ৎ'-কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

خسرو سرمد تخت نہ مسند فخر اب و جد یعنی محمد
نور ممجد روح معنبر صلی اللہ علیہ و سلم —
گوهر وحدت آئینۂ رحمت کان فتوت بحر نبوت
عاشق امت شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم —
جان دو عالم حق کے مکرم اپنے رب کی شان معظم
لطف مجسم خاصۂ داور صلی اللہ علیہ وسلم —
یاد نبی ہے یمن سے مملو روز شفاعت ثغل ترازو
جسم کی خوشبو عطر سے بڑھکر صلی اللہ علیہ وسلم —
نور سے جس کے طور ہوں سینے بغض ہو دل میں اور نہ کینے
جاؤ مدینے گر نہیں باور صلی اللہ علیہ وسلم —
مجد شمائل وصف میں کامل اقصی جن کی پہلی منزل
سید عادل فقر کے باور صلی اللہ علہ وسلم —
نیر بطحی انجم طٰہٰ ماہ دنی اور مہر تدلی
زنعت کعبہ رونق ممبر صلی اللہ علیہ وسلم —

খসরবে-সর্মদ্ তখ্তে-নুহ মসনদ্ ফখ্রে-অব্ ব জদ্ ইয়নে মুহম্মদ ;
নূরে-মুমজ্জদ্ রূহে-মুঅম্বর স্বল্লা আল্লাহু অলয়হি ব সল্লমু।

গৌহরে-রহদৎ আয়নয়ে-রহমৎ কানে-ফুতুরৎ বহরে-নবুরৎ ;
'আশিক়ে-উম্মৎ শাফিয়ে-মহশর স্বল্লা আল্লাহু অলয়হি র সল্লম্।
জানে-দো আলম্ হক্ কে মুকর্রম্ অপ্‌নে রব্ কী শানে-মু'অজ্জম্ ;
লুত্ফে-মুজস্‌সম্ খাস্বয়ে-দারর স্বল্লা আল্লাহু অলয়হি র সল্লম্।
ইয়াদে-নবী হৈ ইয়মন্ সে মম্‌লূ রূজে-শফায়েৎ সক্‌লে-তরাজূ ;
জিস্‌ম্ কী খোশবূ 'অম্বর্ সে বঢ় কর স্বল্লা আল্লাহু অলয়হি র সল্লম্।
নূর সে জিস্‌কে ত্বূর হৈঁ। সীনে বুঘ্‌জ্ হো দিল্ মেঁ আওর নহ কীনে ;
জাও মদীনে গর নহীন বাওর স্বল্লা আল্লাহু অলয়হি র সল্লম্।
মজদে-শমায়িল্ রম্বফ্ মেঁ কামিল্ আক্‌স্বা জিন্ কী পহলী মঞ্জিল্ ;
সৈয়দে-'আদিল্ ফক্‌র্ কে বাওর স্বল্লা আল্লাহু অলয়হি র স্বল্লম্।
নয়রে-বত্বহা অনজুমে-তুন্ন মাহে-দনী আওর মিহরে-তদল্লী ;
জে-নিয়তে কাবা রৌনকে-মিম্বর স্বল্লা আল্লাহু অলয়হি র স্বল্লম্।[১]

অধুনা পরলোকগত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আবুল কলাম আজাদের উল্লেখ আমরা পূর্বেও করিয়াছি। মুহী উদ্দীন আবুল কলাম আজাদ ইমামুল্-হিন্দ ও তাঁহার পূর্বপুরুষদের স্থায়ী বাসস্থান দিল্লী। তাঁহার পিতা মৌলানা খয়রুদ্দীন সিপাহী বিদ্রোহের পরে হজ মানসে মক্কায় গিয়াছিলেন এবং তথায় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আমাদের পরলোকগত শিক্ষামন্ত্রীর জন্ম হয়। শীঘ্রই মক্কা হইতে তাঁহার পিতা ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং আজাদের বাল্যকাল কলিকাতায় অতিবাহিত হয়। তিনি বাল্যকালে অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন—তবে তিনি আরবী ও ফারসীতেই বিশেষ শিক্ষালাভ করেন। আর কথিত আছে, আরবী-ফারসী শিক্ষা তিনি তাঁহার মাতৃদেবী হইতেই লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন আরবী মহিলা। বস্তুতঃ আজাদের নিকট কলিকাতাই ছিল তাঁহার জন্মভূমি সমতুল্য। এবং এই বিষয়ে তিনি নিজেই তাঁহার তজকিরয়ে-আজাদে লিখিয়াছেন, "১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মার্চের বাঙলা সরকার ডিফেন্স এক্টের ৩নং ধারানুযায়ী হুকুম জারি করিলেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক—হায় অদৃষ্ট! প্রাণ খুলিয়া কান্নার আর অবসর রহিল কোথায়—রোনা কহান্ হোয়া মুঝে দিল খুল্ কর্ নসীব।—দুই চক্ষু হইতে

১। শব্দ-ঝঙ্কার ও ইহার অন্তর্নিহিত অর্থমাধুর্যে ইহা এক অপূর্ব সঙ্গীতে রূপান্তর লাভ করিয়াছে। ইহার আক্ষরিক অনুবাদ দ্বারা এই রস-মাধুর্যকে লাঘব করিতে সাহস করি নাই।

অশ্রু-ধারা বহিতে লাগিল। জন্মভূমিতুল্য বাল্যকালের খেলাঘর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ৩০শে মার্চ রাঁচি রওনা হইলাম।

নিগহম্ নক্‌ব্ হমী জদ্ ব-নিহান্ খানায়ে-দিল্;
মুঝ্‌দহ বাদ্ অহলে-দিয়ারা কি জে-মুনিরান্ রফ্‌তম্।

অর্থাৎ, সহসা আমার অন্তরের গুপ্ত কোণে যেন বজ্রপাত হইল—হে স্বদেশ-বাসী, তোমাদের শুভ সংবাদ যে আমার সুহৃদদের হইতে আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।"

উর্দু-সাপ্তাহিক 'আল-হিলাল্' সম্পাদনার মাধ্যমেই আজাদের রাজনৈতিক জীবন সুরু হয়। এবং এই পত্রিকার সহিত লিপ্ত থাকার জন্যই তাঁহাকে তাঁহার যৌবন বয়সেই জন্মভূমি সমতুল কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

আজাদ আধুনিক উর্দু গদ্য সাহিত্যের একজন পুরোধা। এবং তাঁহার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা হইয়াছে। আধুনিক ভারতের আরবী ও ফারসী সাহিত্যেরও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি।

সৈয়দ রিজা আলী উঅশত (রশত) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার মাদরাসায়ে-আলিয়া হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী লাভ না করিলেও তিনি নিজে নিজেই ইংরেজী এবং আরবী ফারসী ও উর্দুর বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কিছুকাল ইম্পিরিয়েল ডিপার্টমেণ্টর ফারসী বিভাগে প্রাধান মৌলবী হিসাবে কাজ করার পরে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের ফারসী ও উর্দু বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরেজ সরকার হইতে 'খান বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণের পরে তিনি আবার ১৯৪১ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা ব্রাবোর্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ভারত বিভাগের পরে তিনি ঢাকায়ই তাঁহার বসবাস নির্দিষ্ট করেন এবং তথায়ই সম্প্রতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

১৫ বৎসর বয়স হইতেই উঅশত উর্দু কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার কাব্য-গুরু ছিলেন 'শম্‌স'। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) পরে আমাদের কবিবর মির্জা ঘালিবকে আদর্শ করিয়া কাব্য-সাধনা করিতে থাকেন। এবং তাঁহার কাব্য-প্রসিদ্ধি সমসাময়িক কোন উর্দু কবি হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম উর্দু দীবান

প্রকাশিত হয় এবং ইহা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত সমাজ ইহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। ইহাতে উর্দু ঘজল কবিতারই সমাবেশ হইয়াছে, তবে শেষাংশে কিছুটা ফারসী কবিতাও আছে। তাঁহার কাব্যে যেমন আছে ফারসী বাগ্‌ধারার সুসমঞ্জস ব্যবহার, তেমনি রহিয়াছে তাঁহার আদর্শ কবি ঘালিবের চিন্তাধারার সুমহান অনুস্মৃতি। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় দীবান 'তরানায়ে-উঅশৎ' লাহোর হইতে প্রকাশিত হয়। অতি আধুনিক যুগের পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলার প্রায় সকল উর্দু সাহিত্যিকই তাঁহার কবি-শিষ্য বা তাঁহার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাপ্রবণ। তাঁহারই একজন সমসাময়িক কবি নাত্বিক্ লখনবী কি গভীর শ্রদ্ধাসহকারে উঅশৎ সম্বন্ধে একটি রুবায়ী গাহিয়াছেন!

ইস্ শমা কে কুরবান হো অয় পরওয়ানো ;
ইয় জৌহরে-কাবিল হৈ ইসে পহুচানো।
ইস রঙ্গ্ কে সরমস্ত্ ন পাওগে কহীন ;
উঅশৎ কী ক্বদর করো আরে দেওয়ানো॥

اس شمع کے قربان هو ای پروانو
یه جوهر قابل هے اسے پهچانو —
اس رنگ کے سرمست نہ پاؤ گے کہیں
وحشت کی کرو قدر ارے دیوانو —

অর্থাৎ, হে পতঙ্গ, এই আলোর নিকটে নিজকে বিলাইয়া দাও ; ইহা একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন—ইহাকে চিনিয়া রাখ। এই আলো-বর্তিকার গুঢ়-রহস্য সঠিক বুঝিতে পারিবে না—হে পাগল, উঅশতের শ্রদ্ধা (সকল সময়ই) কর।

ডক্টর অন্দলীব শাদানী অধুনা পূর্বপাকিস্তানের একজন প্রসিদ্ধ উর্দু কবি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ও উর্দু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রামপুরে তাঁহার জন্ম হয় এবং তথা হইতেই 'মদরসয়ে-আলিয়া'-র মাধ্যম পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২০ ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মুন্সী আলিম ও মুন্সী ফাজিল উপাধি অতি কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন। তৎপর যথারীতি প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই মেট্রিকুলেশন, ইণ্টারমিডিয়েট, বি. এ. এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ফারসীতে এম. এ. পাশ করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন হইতে ফারসীতে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর হিন্দু কলেজে ফারসী ও উর্দুর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসী ও উর্দু বিভাগে তিনি একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে তিনি ইহার রীডার ও প্রধান অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। দুইবার তিনি ঈরান ভ্রমণ করিয়াছেন—প্রথম ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে।

অধ্যাপনা ছাড়া পাণ্ডিত্যের নিদর্শনস্বরূপ তিনি অনেক উর্দু প্রবন্ধ, অনুবাদ ও অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে—ইন্‌শায়ে-আবুল-ফজল, চহার মুকালা ও রুবাইয়াতে-বাবা ত্বাহির উরিয়ানীর উর্দু অনুবাদ, ফারসী জদীদ কী লুঘাৎ (অর্থাৎ আধুনিক ফারসী-উর্দু অভিধান), সচ্চী-কহানিয়ান, নোশ্ ব্র নেশ এবং ঝুটা খুদা উল্লেখযোগ্য।

ডক্টর শাদানী বাল্যকাল হইতেই উর্দু সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট। তাঁহার কবিনাম অন্দলীব। তিনি কাব্যে কাহারো নিকট হইতে কোন শিক্ষালাভ করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার কাব্যের ধারা এক স্বতন্ত্র পথে চালিত হইয়াছে। তাঁহার কাব্য পাঠে মনে হয় যেন নিজের কথা আপন মনেই বলিয়া যাইতেছেন। ইহা কাহারো নিকট কিছু বলিবার বিষয় নহে। কবিবরের নিজের উক্তিতেই রহিয়াছে, "মৈঁ নে জিন্দগী মেঁ এক শঅর ভী অইসা নহীন্ কহা জিস্ পর্ আপ্ বয়তী কা ইত্‌লাক্ ন হো সকে।"

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতেই ঢাকায় তিনি বসবাস করিতে থাকেন এবং ঢাকায় উর্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতির তিনি একজন পুরোধা। ভারত বিভাগের পরে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তথায় 'মশ্‌রিকী পাকিস্তান' নামে একটি দৈনিক সংবাদ পত্রের প্রবর্তন করেন এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে 'থাউর' নামে একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন। অধুনা উভয়ই অচল।

'শরফ' কবিনামধারী সৈয়দ আবুল ফতেহ মহম্মদ শরফুদ্দীন আমাদের প্রসিদ্ধ নবাব সৈয়দ আজাদ ভ্রাতৃদ্বয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতেই শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি প্রসিদ্ধ উর্দু-কবি শাহবাজের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতেই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ-মর্যাদার সুযোগে তিনি অনরারী ম্যাজিস্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য প্রভৃতি পদে থাকিয়া জনসাধারণের সেবা করিয়াছেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি অন্যান্য সকল কাজ হইতে বিরত হইয়া কেবল সাহিত্য-সাধনায়ই মনঃসংযোগ করেন। শরফের প্রথম

'দীৱান' ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সিতারায়ে-হিন্দ প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ 'গুলিস্তানে-শরফ' উর্দু বিদ্বজ্জন কর্তৃক বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। ডক্টর অন্দলীব শাদানী তাঁহার উল্লেখ করিয়া নিজ ঘজল সম্বন্ধে বলিতেছেন, "এক হজরত শরফ্ কে সিওয়া আব তো অন্দলীব; ঢাকা মেঁ আওর কোয়ি সুখনদান নহীন্ রহা।

اک حضرت شرف کے سوا اب تو عندلیب

ڈھاکہ میں اور کوئی سخندان نہیں رہا —

বাঙলা সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ কবি হইয়াও কাজী নজরুল ইসলাম আরবী, ফারসী বা উর্দু সাহিত্যের সাধনা যথেষ্ট করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। তিনি যেমন করিয়াছেন বাঙলায় কোরানের কাব্যানুবাদ, তেমনি রহিয়াছে তাঁহার প্রসিদ্ধ ফারসী কবি হাফিজের রুবইয়াৎ-কবিতার বঙ্গানুবাদ। তাছাড়া আরবী ফারসী হইতে আহৃত সুসমঞ্জস শব্দ ও অর্থের প্রয়োগ বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার মত আর কেহই বোধ হয় করিতে পারেন নাই। অনেক আরবী, ফারসী ও উর্দু বাগধারা এবং বাক্যাদি পর্যন্ত তিনি তাঁহার বাঙলা কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। লক্ষ্য করিলে আমরা এমনও দেখিতে পাইব যে বাঙলা অক্ষরে তিনি যেন সময় সময় উর্দু কবিতাই বলিয়া যাইতেছেন, যেমন—

নরগিস বাগ মেঁ বহার কী আগ মেঁ
ভরে দিল দাগ মেঁ কহাঁ মেরে পিয়ারে
আও আও পিয়ারে।
দরদে-দিল জোর রঙ্গীলা কোসর
শরাবান তহোরা লাও সাকী ভর
পিয়ালা তু ভর দে মস্তানা কর দে॥

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পশ্চিম বাঙলার বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত চুরুলিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে ভগ্নস্বাস্থ্য ও অনেকটা বিকৃতমস্তিষ্ক হইলেও 'বিদ্রোহী কবি' নজরুলের স্থান বাঙলা সাহিত্যে খুবই উচ্চে।

'জমীল' কবি-নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ কাজিম আলী কাজিমী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিহারের আজিমাবাদ-পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। উর্দু সাহিত্য-জগতে তিনি সাধারণতঃ জমীল মজহরী নামে প্রসিদ্ধ। অতি অল্প বয়সেই তিনি তাঁহার পিতার সহিত কলিকাতায় আসেন এবং তথায়ই তাঁহার বাসস্থান

নির্দিষ্ট করেন। কলিকাতায়ই তাঁহার সমস্ত শিক্ষালাভ করিয়া অবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পাশ করেন।

কলিকাতার উর্দু-দৈনিক 'আসরে-জদীদ'-এর সহিত তিনি অনেককাল যুক্ত থাকিয়া ইহার সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদনা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গতঃ আঘা হশরের সুপারিশে তিনি কতককাল ফিল্ম-জগতের সহিতও যুক্ত ছিলেন। তারপর তিনি কিছুকাল বিহার সরকারের প্রচার বিভাগ সংক্রান্ত উর্দু বিভাগে কাজ করিবার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু শীঘ্রই রাজকীয় দোষ ত্রুটির জন্য তাঁহাকে কারাবাস বরণ করিতে হয়। ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া আবার কোন ফিল্ম-কোম্পানীতে যোগদান করেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বিহার সরকার তাঁহাকে প্রচার বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টার নির্বাচিত করেন কিন্তু শীঘ্রই এই চাকরী স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসী ও উর্দু বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। বস্তুতঃ জমীল একজন স্বাধীনচেতা রাজনীতিবিদ্ এবং তিনি প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ মৌলানা আবুল কলাম আজাদের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সূচনায় জমীল তাঁহার পিতার নিকট হইতেই শিক্ষালাভ করেন। এবং কলেজীয় শিক্ষার সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ উর্দু কবি উঅশতের সংস্পর্শে আসিয়া সাহিত্য-সাধনায় উৎকর্ষলাভের সুযোগ গ্রহণ করেন। আধুনিক উর্দু সাহিত্য-জগতে জমীল একজন প্রসিদ্ধ কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার এবং রসজ্ঞ দার্শনিক রাজনীতিবিদ্। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার সাহিত্য মাধ্যমে মুসলিম-সমাজকে এক নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহু পূর্বেই তাঁহার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'নক্‌শে-জমীল' পাটনা হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার উর্দু গল্প-সঞ্চয়ন 'আফসানায়ে-ফতেহ ব শিকস্ত্' প্রকাশিত হয়। এক বৎসরের মধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় ইহা সহজেই অনুমিত হয় উর্দু-পাঠক কি ভাবে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই 'আফসনা' বস্তুতঃ প্রসিদ্ধ উর্দু-পত্রিকাসমূহে পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তাছাড়া তাঁহার লেখনী-প্রসূত নানা প্রকার কবিতা ও প্রবন্ধ বিভিন্ন উর্দু পত্রিকায়ই ছড়াইয়া রহিয়াছে।

'আস্বফ্' ও 'উআস্বিফ্' নামে দুই কবি-ভ্রাতাই উর্দু সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের পিতার সহিত অতি শৈশবকালেই বেনারস হইতে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। সাধারণভাবে

উচ্চ-শিক্ষিত না হইলেও উভয় ভ্রাতাই উর্দু সাহিত্যের একান্ত সাধক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আম্বফ একজন প্রসিদ্ধ উর্দু কবি এবং আধুনিক উদীয়মান অনেক উর্দু কবিই তাঁহাকে তাঁহাদের কাব্য-গুরুরূপে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। ভারত-বিভাগের পরে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ঢাকায়ই বসবাস করিতেছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা উআম্বিফ উর্দু-দৈনিক আম্বরে-জদীদের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া সাহিত্য-সাধনায় যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছেন। এবং তাঁহার অনেক কাব্য, নাটক ও বিভিন্ন প্রবন্ধের উল্লেখ আছে।

আব্দুস-সমাদ কমর সিদ্দীকী ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায়ই তাঁহার শিক্ষা-জীবন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফারসী ও উর্দু সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। কিছুকাল লা মার্টিনিয়ার কলেজে ফারসী ও উর্দুতে অধ্যাপনা করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সৈন্য-বিভাগে শিক্ষালাভান্তে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। এবং ভারতবিভাগের পরে পাকিস্তানান্তর্ভুক্ত রাউলপিণ্ডিতে সৈন্যবিভাগের কাজে যোগদান করেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় বদলী হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শীঘ্রই অকালে দেহত্যাগ করায় উর্দু-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

প্রসিদ্ধ উর্দু-কবি উঅশৎ ক্যাপ্টেন কমরকে পুত্রতুল্য স্নেহ করিতেন। কথিত আছে, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ইসলামিয়া কলেজের (বর্তমান মোলানা আজাদ কলেজ) কোন সাহিত্য-সভায় ক্যাপ্টেন তাঁহার চাকরীর অবসরে যোগদান করিলে কবিবর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

> কমর্ কে আনে সে মহফিল কো চার চান্দ্ লগে;
> সুখুন কমর কে লিয়ে হৈ কমর সুখুন কে লিয়ে।

সকল উর্দু-সাহিত্য সমিতিতেই যোগদান করা তাঁহার ছিল স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ। এবং তিনি নানা প্রকার কবিতাই লিখিয়া গিয়াছেন, তবে ঘজল কবিতাতেই তাঁহার ছিল বিশেষ আকর্ষণ। একদিকে তাঁহার যেমন সহজ ও সরস কবিতা রহিয়াছে, তেমনি অপরপক্ষে দার্শনিক, চিন্তামূলক কবিতারও অভাব নাই। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন কবি ঘালিবের অনুভাবী ও কবি উঅশতের অনুসারী।

কবি উঅশতের অনুসারী তেমনি তাঁহার আর একজন প্রিয় শিষ্য হইলেন আব্বাস আলী খান বেখুদ। তিনিও ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায়ই জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায়ই শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করিয়া ফারসী ও

উর্দুতে এম. এ. পাশ করেন। তিনি বর্তমানে মৌলানা আজাদ (পূর্বতন ইসলামিয়া) কলেজের আরবী, ফারসী ও উর্দু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। তিনি যেমন অধ্যাপনা তেমনি সাহিত্য-সাধনায় সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু সর্বোপরি তাঁহার সরল, অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করে। তাঁহার কাব্য-সংগ্রহ 'জামে-বেখুদী' ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

পরভেজ সাহিদী নামে প্রসিদ্ধ ইক্রাম হোসেন পাটনার অধিবাসী হইলেও তিনি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতায়ই বসবাস করিয়া আসিতেছেন। কিছুকাল মেদিনীপুর কলেজ ও কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ফারসী ও উর্দুর অধ্যাপকরূপে চাকরী করিয়া বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। তিনি একজন স্বভাব-কবি। যেমন তাঁহার রহিয়াছে চরিত্রের মাধুর্য, তেমনি তাঁহার সুকণ্ঠ আবৃত্তি সাহিত্য-রসিককে স্বতঃই মুগ্ধ করে। মাসিক জদীদে-উর্দুর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় তাঁহার কাব্য-সাধনার বিশেষ সুযোগ হইয়াছে। তাঁহার নানা প্রকার কবিতারই উল্লেখ আছে, তবে তিনি রুবায়ী কবিতাতেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট। নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার ২।১টি রুবায়ী উল্লিখিত হইল।

মস্তী মেঁ নজর চমক্ রহী হৈ সাকী ;
সারী মহফিল বহক রহী হৈ সাকী।
কিয়া কয়ফ রুবাইয়ুন্ মেঁ ভর্ লায়া হুঁ ;
হর লফ্জ্ সে মৈ ছলক রহী হৈ সাকী ॥

مستی میں نظر چمک رهی هے ساقی
ساری محفل بہک رهی هے ساقی —
کیا کیف رباعیوں میں بھر لایا هوں
هر لفظ سے مئی چھلک رهی هے ساقی —

অথবা,

অব্ রন্গ্ নহীঁ রাৎ কা কালা সাকী ;
হৈ নূর্ সে পুর্ চান্দ্ কা পিয়ালা সাকী।
তারা বন্কর্ চটক্ গয়ী হৈঁ বুন্দীন্ ;
সাঘির তো নহীন্ তুনে উছালা সাকী ॥

اب رنگ نہیں رات کا کالا ساقی
هے نور سے پر چاند کا پیالہ ساقی —

تارا بنکر چٹک گئی ہیں بوندیں
ساغر تو نہیں تونے اچھالا ساقی —

সৈয়দ আমীর রিজা মজহরী অল্‌-কাজিমী প্রসিদ্ধ কবি ও প্রবন্ধকার জমীল মজহরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিহার-অন্তর্গত মজফরপুর জিলার কোন গ্রামে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্য-শিক্ষা তিনি নিজ জিলায়ই লাভ করেন। কলেজিয় শিক্ষা নানাস্থানে প্রাপ্ত হন—যথা, মুর্শিদাবাদ, আলিগড় এবং কলিকাতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. ও বি. টি. পাশ করিয়া তিনি বর্তমানে মাদরাসায়ে-আলিয়ার স্কুল বিভাগের প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কবি রিজার লেখা বেশ ধীরগতি হইলেও তিনি বিশেষ সুচিন্তিত লেখক এবং তাঁহার কাব্যের ভাষা গভীর ও অর্থপূর্ণ। তাঁহার দরদী মন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কয়েকটি বাঙলা উপন্যাসই তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা তাঁহার নিকট হইতে এখনো উর্দু সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করিতে পারি।

ইঁহাদের ছাড়া যে সকল ব্যক্তি উভয় বাঙলায় উর্দু সাহিত্যের চর্চা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন—সৈয়দ মহমুদ ত্বর্জী, অধ্যাপক আব্দুল কাইয়ুম হসরৎ মুমানী, অধ্যাপক ত্বাহের বিজরী, অধ্যাপক মহফুজুল্‌ হক, আমীরুল ইসলাম আমীর শরকী এবং অধ্যাপক আখতর হুসেন আখতর।

অক্ষরান্তরীকরণ পদ্ধতি

ا	ঃ	আ, অ
ب	ঃ	ব
پ	ঃ	প
ٹ	ঃ	ট
ت	ঃ	ত
ث	ঃ	স (স.)
ج	ঃ	জ
چ	ঃ	চ
ح	ঃ	হ (ঃহ)
خ	ঃ	খ
د	ঃ	দ
ذ	ঃ	জ (ধ)
ر	ঃ	র
ڑ	ঃ	ড়
ز	ঃ	জ (জ.)
ژ	ঃ	ঝ
س	ঃ	স
ش	ঃ	স (শ, ষ)
ص	ঃ	স (স্ব)
ض	ঃ	জ (দ্ব)
ط	ঃ	ত (ত্ব)
ظ	ঃ	জ (জ্ব)
ع	ঃ	আ (ʻ)
غ	ঃ	গ (ঘ)
ف	ঃ	ফ
ق	ঃ	ক (ক্ব)
ک	ঃ	ক
گ	ঃ	গ
ل	ঃ	ল
م	ঃ	ম
ن	ঃ	ন
و	ঃ	ও, উ (ব্ব, ব)
ہ	ঃ	হ, অ, আ
ی	ঃ	ঈ, এ, য়
اَ (জবর)	ঃ	অ
اِ (জের)	ঃ	ই, এ
اُ (পেশ)	ঃ	উ, ও

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
৩	৩	মনীষীদের	মণীষীদের
২০	১৬	আব্দুর	আব্দূর
৩৭	৬	কাব্যাকারে	কাব্যকারে
৪৮	১১	بہرے	بہری
৫১	১৬	প্রেমকাহিনীর	প্রেমকাহিনী
৫২	৮	تیرے گال	ترے
৬২	১০	সো	নো
৬৩	৬	উঅজদীকে	ওজদীতে
	২৯	بعد از ان	ازان
৭২	২৫	কবি সাদী	সাদী
৯৯	১৪	কোয়ী	কোরী
১২৩	৬	উদার	দার
১৩৮	১২	হজ	হিজ
১৪৭	৬	যাঁহার	যাঁহারা
১৫৯	১২	তাহার	তাঁহার
১৬৭	২	ত্যাগ	তাগ
১৭৯	৩১	জুলুম্	জূলুমে্
১৮৬	৯	উঅ	উথ
১৮৯	১৩	مصطفه	مصطقه
১৯৮	২৭	দস্তনবুয়ে	দস্তনবয়ে
২০৬	২৭	স্মরৎ	স্বরৎ
২২২	১৫	সর্রিশতাদার	সরিশতাদার
২২৮	৪	উচ্ছৃলতা	উচ্ছুলতা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
২৩৬	৩১	خیال	حال
	৩০	حال	خیال
২৪৪	১২	স্ব্‌রতে	স্বরতে
২৪৮	২৭	তালীম	নালীম
২৫৮	৩০	سخن ایجاد	ایجاد
২৬১	৩	সুসমঞ্জস	সুসামঞ্জস
২৬২	২৯	ফ্‌ল	ফল
২৬৫	১৯	ফজলু্‌ল	কজলুল
২৬৭	২৫	تاثیر کا	کا
৩০৬	৪	نہین	نوین
৩১১	৩১	মুঅর্রিখ	মুঅরিখ
৩১৩	৭	ফ্লোরেণ্ডা	ফ্লোরেন্ডা
৩৩৯	২২	পাস	পাশ
	২৯	جو	حو
৩৪১	১৭	কোঠী কী	কোঠী
৩৪৪	২১	মির্জা	জির্জা
৩৪৫	৮	আকবর	আকবার
	৩১	شریرون	شویرون
৩৪৬	২৫	চিত্তাকর্ষক	চিত্তার্ষক
৩৪৯	১৬	ششدر	شسدو
		جہازی	جہازی
৩৫৬	২৬	دنون	دندن
৩৭১	৩১	জ্‌দ	জদ
৩৭৮	২১	شغاعت	شقاعس
		ثقل	ثغل
৩৮৩	১০	যেমন	যেনন

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
৩৮৭	১৭	রিজ্‌বী	বিজ্‌বী
।৶০	৪	মূর্তো	মৃতোঁ
।৵০	১৫	জাত্যভিমান	জাত্যাভিমান
।৶০	৭	ত্রুটি	ত্রূতি
	১২	শনিবারের	শত্রিবারের